ওমর তিলিমেসানী ও ইখওয়ান

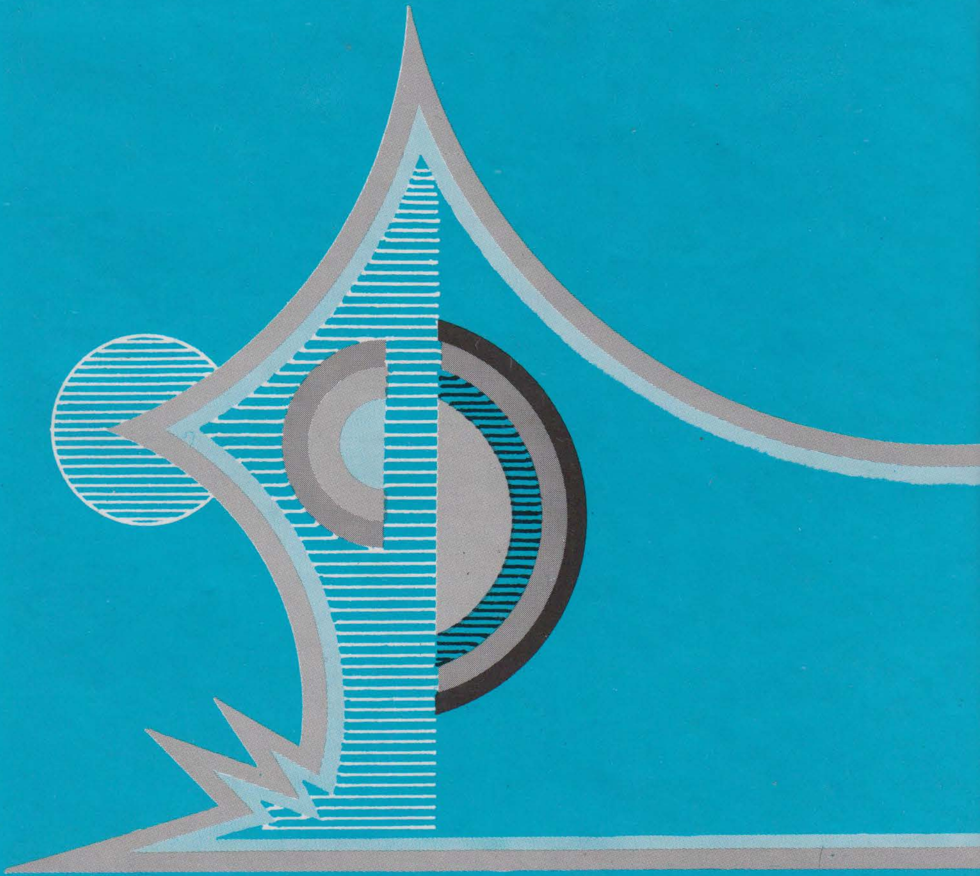

www.amarboi.org

ওমর তিলমেসানী
ও
ইখওয়ান

অনুবাদ ঃ এম. আমীর হোসাইন আল মাদানী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২১৬

২য় প্রকাশ

সফর	১৪২৪
বৈশাখ	১৪১০
এপ্রিল	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

يادون كي امانت -এর বাংলা অনুবাদ

UMAR TELMISANI-O-EKHWAN. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 150.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

বিষয়সূচী

গ্রন্থকার পরিচিতি ২১
উপক্রমণিকা ২৭

প্রথম অধ্যায় ৪৯

আমার পরিচয় ৪৯
শহর থেকে গ্রাম ৪৯
জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা ৫০
পিতামহের জায়গীরসমূহ ও তার শাহী মেজাজ ৫০
পূর্বপুরুষের দেশ আলজেরিয়া ৫১
মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের সাথে সম্পর্ক ৫১
শিক্ষা জীবনের সূচনা ৫২
কল্পনার জগতে বিচরণ ৫৩
সহজাত প্রবণতা ৫৪
কাব্য ও কবিত্ব এবং সাহিত্য ও সংগীত ৫৫
দ্বীনী জ্ঞান চর্চার দিকে প্রত্যাবর্তন ৫৫
আল্লাহর সন্তুষ্টি ৫৬
সিনেমা দেখা ৫৬
আদরের দুলাল ৫৭
জাতীয় মর্যাদাবোধ ৫৭
গ্রাম থেকে শহরে ৫৮
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৫৮
বি. এ. ডিগ্রী লাভ ৫৯
মুষ্টিযুদ্ধ ৬০
কঠোর তত্ত্বাবধান ৬০
বিবাহ বন্ধন ৬১
আদর্শ জীবন সংগিনী ৬২
সতী সাধ্বী স্ত্রী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামী ৬৩
যুবক যুবতীদের প্রতি উপদেশ ৬৪
আইনের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা ৬৫
আদর্শ শিক্ষকমণ্ডলী ৬৬
মহিলাদের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভংগী ৬৭
ভুল বুঝাবুঝির অবসান ৬৮

www.amarboi.org

প্রাচীন প্রতিনিধিত্ব	৬৯
ইনসাফের দাবী	৭০
আইন ব্যবসা শুরু	৭১
সততা ও দ্বীনদারী	৭২
নির্বাচনে অংশগ্রহণ	৭২
আত্মপ্রচার বিমুখতা	৭৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	**৭৫**
ইবরাহীম আবদুল হাদীর নির্যাতন	৭৯
বর্বরতা ও পাশবিকতার প্রতীক নাসের	৮০
শিক্ষালাভের জন্য দর্শন	৮০
পিস্তলের নল	৮০
উজীরে আযমের প্রতিক্রিয়া	৮১
ইমাম হাসানুল বান্নার শাহাদাত	৮১
বায়ুমান যন্ত্র মোরগ	৮২
এই মহত্ব নীচতা	৮২
ফেরেশতা থেকে শয়তান	৮৩
বিপ্লবের প্রাথমিক গতি-প্রকৃতি	৮৩
রাজনৈতিক উপলব্ধি	৮৩
সংবাদপত্র পাঠ	৮৪
আলো ছায়া	৮৪
জনসাধারণের রেফারেন্ডাম	৮৫
আইন কলেজের শিক্ষা সমাপণী	৮৫
যৌবন কাল ও দুরন্তপনা	৮৫
আইন কলেজের মর্যাদা	৮৬
সাহিত্য রসিকতা	৮৬
অবসর গ্রহণ ও অধ্যয়ন	৮৭
দ্বীনি বই-পুস্তকের প্রতি অনুরাগ	৮৭
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি	৮৭
চুপ থাকাই কল্যাণকর	৮৮
হালাল রিযিক	৮৮
সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদের প্রলোভন	৮৯
ওকালতির পেশা একটি প্রশস্ত ময়দান	৮৯
দ্বীনের দাবী	৮৯

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায় ৯১
নির্বাপিত প্রেমাগ্নি আলোহীন ৯১
কালের দুর্যোগ ও সময়ের দুর্বিপাক ৯২
তুমিই বলো এ কেমন কথা ৯৩
ইখওয়ানে যোগদানের পর ৯৩
ঘৃণা ও ভালবাসা সবই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ৯৪
আমার কর্মপন্থা আমীরি নয় ফকীরি ৯৫
গ্রন্থকীট নয় গ্রন্থকার ৯৫
আমীর-উমরাহ ও মন্ত্রীর দরবারেও বে-নিয়াজী ৯৬
সত্য পথের আহবায়ক আল্লাহর দ্বারের ভিক্ষুক ৯৭
মঙ্গলবারের দারস ও উহার প্রেক্ষিত ৯৮
দরবেশের দরবার ৯৯

চতুর্থ অধ্যায় ১০১
মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের সাথে স্মরণীয় সফর ১০১
বায়ুর গতি নির্ণয়ক যন্ত্র ১০১
এখানে হতাশার কোন স্থান নেই ১০৩
নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ ১০৩
আদর্শ সমালোচনা ১০৬
সাহিত্য সমালোচনা ১০৮

পঞ্চম অধ্যায় ১০৯
আকীদাগত কারণে ইসরাঈলের সাথে শত্রুতা ১১০
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ১১১
ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ১১৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ১১৬
কচিকাঁচাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা ১১৬
পরিবর্তনের সূচনা ১১৯
কুরআন ও তলোয়ার ১২০
ইখওয়ানের প্রতি অপবাদ ১২৪
দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার ১২৫
ইউনিভারসিটিতে দাওয়াতের কাজ ১২৭
সাংবাদিকতার জগতে ইসলামী আন্দোলন ১২৮
সংগঠনে শামিল হওয়ার বিভিন্ন পর্যায় ১২৮
ইখওয়ানের সংগঠনভুক্ত ও দলবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য ১২৯
নামকরণ ১৩০

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায় ১৩২
ইখওয়ানের প্রশিক্ষণ শিবিরসমূহ ১৩২
কুরআন এবং তলোয়ার ১৩৩
শান্তির শ্লোগান ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ১৩৪
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে
উৎসর্গীত আমার পিতা-মাতা ১৩৪
তরবারী ধারণকারী বাহু ১৩৫
পরাজয় আমাদের ভাগ্যলিপি নয় ১৩৬
কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে ১৩৭
ভিত্তিহীন অভিযোগ ১৩৮
ইখওয়ানের দাওয়াত শরীয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ১৩৯

অষ্টম অধ্যায় ১৪৪
মহান সন্তানের পরাজয় ১৪৫
মু'মিনগণ একে অপরের ভাই ১৪৫
তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী ১৪৬
ইখওয়ানের ফিকহী দৃষ্টিভংগী ১৪৭
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার ১৪৭
করণীয় কি ? ১৪৮
ইসলামী শিক্ষা ও তার প্রভাব ১৪৯
একটা মজার ব্যাপার ১৫০
ধূমপান বর্জন ১৫১
প্রশংসনীয় নৈতিক চরিত্র ১৫২
অদম্য সাহস থাকলে পাথরও পানির মত মনে হয় ১৫২
মু'মিনের আসল সম্পদ ঈমান ১৫৩
আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা ১৫৩
নাহাস পাশা ও ইংরেজদের রক্তচক্ষু ১৫৪
মতবিরোধের অধিকার ১৫৫
হাসানুল বান্না এবং হাসান আল হুদাইবি ১৫৫
মানুষ হচ্ছে খনি সদৃশ ১৫৬
দাওয়াতে হকের আলোচনা ১৫৭
চিন্তা ও কাজের সমন্বয় ১৫৮
জিহাদের প্রকারভেদ ১৫৯

www.amarboi.org

নবম অধ্যায় ১৬০

দু'টো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ ১৬০

স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করণের উদ্দেশ্য ১৬১

জেলখানার মধ্যে মজার কুস্তী ১৬১

কারাগারের দারোগাগণ ১৬২

অত্যাচারীদের পরিণাম ১৬২

দৃঢ় সংকল্প অথবা অনুমতি ১৬৩

গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা ১৬৫

অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ১৬৫

মৌলিক ও সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী ১৬৬

মু'মিনসুলভ বিচক্ষণতা ১৬৭

এই বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের কঠোর হস্তক্ষেপ রহস্যময় ১৬৮

জুলুমের দানব ও ধৈর্যের পাহাড় ১৬৮

নিম্নে পতিতদেরও নিম্নতম ১৬৯

অবশ্যই আখেরাতের আযাব খুবই অপমানকর ১৭০

প্রীতি ও সৌহার্দ্যের শাহাদাতগাহ ১৭০

মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি ১৭১

ইমাম শহীদের পয়গাম ১৭৩

ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ১৭৪

শক্তি অর্জন ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন ১৭৫

সব সংশয়ের সমাধান এবং সব জটিলতার চাবিকাঠি ১৭৬

ব্যাপকভিত্তিক ঘোষণাপত্র ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচী ১৭৭

আল্লাহর আইন ১৭৭

মুসলিমদের ইসলাম বিচ্যুতি ১৭৮

আমাদের হাতিয়ার ১৭৯

মুসলিম উম্মাহর নিকট আমাদের দাবী ১৭৯

বিপর্যস্ত ও ষড়যন্ত্র চিহ্নিত করণ ১৭৯

ব্যথার উপশম ১৮০

'নাহওয়ান নূর' পুস্তিকা ১৮১

ইমাম হাসানুল বান্নার দ্বিতীয় পুস্তিকা ১৮১

ইখওয়ানের দৃষ্টিতে সমাধান ১৮৩

জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের রহস্য ১৮৪

সৌভাগ্যের দিন ১৮৪

www.amarboi.org

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক ঐক্যের মূল উৎস ১৮৫
রাজনৈতিক দলসমূহ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন ১৮৫
বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলন ১৮৫
মিসরীয় যুবসমাজ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন ১৮৬
নিশ্চয়ই তোমাদের এ উম্মাত একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত ১৮৬
আমাদের দাওয়াত পূর্ববর্তীদের দাওয়াতের নতুন সংস্করণ ১৮৭
শত্রুর সাক্ষ্য ১৮৭
বাইয়াতের তাৎপর্য ১৮৮
সংস্কারের পর্যায়সমূহ ১৮৮
জিহাদের সংজ্ঞা ১৮৯
অনুকূল ও প্রতিকূল সর্বাবস্থায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ই উদ্দেশ্য ১৮৯
ইতিহাস ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিসমূহ ১৯০
ফুঁৎকারে এ প্রদীপ নির্বাপিত করা যাবে না ১৯০
ভূপৃষ্ঠে আমাদের স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠিত ১৯১
হত্যার চক্রান্ত ১৯১
নেতার আনুগত্য ১৯২
ইবলীস ও তাঁর পরামর্শ সভা ১৯৩
প্রদীপ্ত সূর্য ঢাকা পড়লো অন্ধকারে ১৯৩
মজলুমের আর্তনাদ ১৯৪
অত্যাচারীকে অবকাশ দেয়ারও তাৎপর্য রয়েছে ১৯৪
দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম-এর নির্বাচন ১৯৫
মুর্শিদে আম হাসান আল হুদাইবির ব্যক্তিত্ব ১৯৬
প্রথম ও দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম-এর ব্যক্তিত্বের তুলনা ১৯৮
দৃঢ়তার পাহাড় ১৯৮
নতুন ফাঁদে পুরাতন শিকারী ১৯৯
এ সংগীত বসন্তের মুখাপেক্ষী নয় ১৯৯
শকুনী ও বাজপাখীর জগত এক নয় ২০০

দশম অধ্যায় ২০১
আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা দাতা ২০১
সর্বক্ষণ বেগবান ২০২
সসম্মানে মুক্তিদান ২০২
নাসেরকে কাফের ঘোষণা করার ব্যাপারে হাসান আল হুদাইবির ভূমিকা ২০২

www.amarboi.org

জামায়াতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ	২০৪
সা'দাত কর্তৃক আলোচনার আহ্বান ও তার ফলাফল	২০৪
সম্ভাবনাসমূহ	২০৫
ইখওয়ানের লিখিত ভূমিকা	২০৬
ইখওয়ানের গুরুত্ব ও দেশপ্রেম	২০৭
প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত	২০৮
রটানো নির্দেশ	২০৯
আমীরুল উমারা	২০৯
মিথ্যার কোন ভিত্তি থাকে না	২১০
আতিথেয়তার পরীক্ষা	২১২
ইখওয়ানের প্রতি নাসেরের শত্রুতা	২১৩
একাদশ অধ্যায়	**২১৫**
শহীদ আবদুল কাদের আওদার জনপ্রিয়তা	২১৫
জেল-জুলুম ও বন্দিত্ব	২১৬
নাসেরের দয়াদ্রচিত্ততা ও ইনসাফ	২১৭
আদালতের আচরণ	২১৭
যিনি হন্তা তিনিই সাক্ষী ও বিচারক	২১৮
অত্যাচারীরা সাবধান	২১৮
মন্ত্রীত্বের প্রলোভন	২১৯
শাইখ আল বাকুরী	২১৯
রাজনৈতিক পরিশুদ্ধি	২২০
সেই ওয়াদা করেছে যা পূর্ণতা লাভ	২২০
উম্মে কুলসুমের গান ও আমরা	২২১
শিল্প ও শিল্পি	২২২
নীল উপত্যকার আধুনিক ফেরাউন	২২২
খর্বকায় নেতা ও মিসরের ইতিহাস	২২৩
হোসনী মোবারকের অপূর্ণাঙ্গ সংস্কার	২২৪
ইসলামী দুনিয়ার পথিকৃৎ	২২৪
সাজসরঞ্জাম কম থাক আর বেশী থাক বেরিয়ে পড়ো	২২৫
আল্লাহ জুলুমকেই জুলুমের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেন	২২৫
যদি সত্যবাদী হও তাহলে আস	২২৭
মর্দে মু'মিন	২২৭
জামাল আবদুন নাসেরের বিদ্বেষ	২২৮

www.amarboi.org

কৃষি সংস্কার না কৃষি বিপর্যয়	২২৯
যে ভূমি থেকে কৃষক তার খাদ্য পায় না	২৩০
দ্বাদশ অধ্যায়	**২৩২**
প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ উদঘাটন	২৩২
বৃটিশ দূতাবাসের সাথে আলোচনা	২৩২
দুশ্চরিত্রদের বাহানার অন্ত থাকে না	২৩৩
বিশৃংখল রাজ্য অযোগ্য রাজা	২৩৫
সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে	২৩৫
মু'মিনের দূরদৃষ্টি ও শয়তানী চক্রান্ত	২৩৬
নাসেরের সাথে সাক্ষাত	২৩৬
নাজীবের বিরুদ্ধে নাসেরের ষড়যন্ত্র	২৩৭
গৃহযুদ্ধের আশংকা	২৩৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	**২৩৯**
বিপ্লবের রোয়েদাদ	২৩৯
পাশ্চাত্য দূতাবাসসমূহ ও ইখওয়ান	২৪০
হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করো তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর	২৪০
জুলুমের রাতের আবসান	২৪১
একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ	২৪১
এই উচ্চ মর্যাদা যিনি লাভ করেছেন	২৪২
স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ	২৪২
প্রবৃত্তির আকাংখা ও তার পূজা	২৪৩
মুর্শিদে আ'ম-এর আহবান ও আমার উপস্থিতি	২৪৪
মুসিবত কেটে গেল	২৪৫
সিদ্ধি সাহেবের পুরস্কার ও পরিণতি	২৪৬
চতুর্দশ অধ্যায়	**২৪৭**
ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা	২৪৭
জেনারেল নাজিবের সাথে নাসের পন্থিদের দুর্ব্যবহার	২৪৮
ইখওয়ান ও আযাদ অফিসার-এর প্রথম পরিচয়	২৪৯
একটা মজার অভিজ্ঞতা	২৪৯
নাসের কাপুরুষ না বীরপুরুষ	২৫০
জীবনপাত করার পুরস্কার	২৫০
ক্ষমতার লোভ ও সেনাবাহিনী	২৫১

www.amarboi.org

রক্তই আর্তনাদ করে বলে দেবে খুনীর বাহুর পরিচয়	২৫২
নাসেরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনে যোগদান	২৫৪
ফারুকের দেশ ত্যাগ	২৫৫
আসল চেহারা	২৫৬
কৃতকর্মের ফলশ্রুতি ও নাসের	২৫৬
বিক্রয়যোগ্য সম্পদ নাকি শিষ্টাচার	২৫৭
নিঃসন্দেহে দুঃখের পর রয়েছে সুখ	২৫৯
ওগো মু'মিন বান্দাহ—তুমিই সৌভাগ্যবান আবার তুমিই হতভাগা	২৬১
জামাল সালেমের পরিণতি	২৬১
পঞ্চদশ অধ্যায়	**২৬৩**
মাহফিল পন্ড	২৬৩
নিকৃষ্টতম গুপ্তচরবৃত্তি	২৬৩
যেমন রাজা তেমন প্রজা	২৬৪
চেষ্টা দ্বারাই অভ্যাস গড়ে ওঠে	২৬৫
আমাদের দূরদৃষ্টিকে ব্যাপকতা দাও	২৬৬
ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা	২৬৬
সিরাজের দাওয়াত	২৬৮
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল	২৬৮
আমি কি আর আমার ক্ষমতাইবা কি ?	২৭০
বদদোয়া ও তার লক্ষ্য	২৭০
জিহাদে অংশ গ্রহণের দাবী	২৭১
ইখওয়ানের নামে ব্যাংগ বিদ্রূপ	২৭২
ফিরিঙ্গি সভ্যতার দাস	২৭২
ষষ্ঠদশ অধ্যায়	**২৭৪**
হাতের কঙ্কন দেখতে আর্শির কি প্রয়োজন ?	২৭৪
রেকর্ড সংশোধনের জন্যে	২৭৫
শাহ্ ফারুকের শাসনকালের প্রাথমিক অধ্যায়	২৭৬
ইখওয়ানের আদর্শপ্রীতি	২৭৭
সপ্তদশ অধ্যায়	**২৭৮**
আমার সমালোচনা পদ্ধতি	২৭৮
গন্তব্যে তারাই গিয়ে উপনীত হয়েছে যারা সফরে অংশগ্রহণ করেনি	২৭৯
নাসেরের সর্প স্বভাব ব্যক্তিত্ব	২৭৯
গুজবে কান দেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়	২৮০

www.amarboi.org

মাথা উলংগ অথচ পায়ে মাথার রাজ মুকুট ২৮১

অষ্টাদশ অধ্যায় ২৮৫

ঊনবিংশতম অধ্যায় ২৯১

ইংরেজদের প্রতি আমাদের ঘৃণার কারণ ২৯৫
শহীদ ইবরাহীম আত তীব ২৯৫
শহীদ হিন্দাভী দুওয়াইর ২৯৬
শহীদ আবদুল কাদের আওদার চিঠি ২৯৬
হে দিব্যদৃষ্টির অধিকারীগণ ! শক্তির নেশা বিপজ্জনক ২৯৭
ইখওয়ানের ওপর নির্যাতন চালানোর পুরস্কার ২৯৮
বাদী নিজেই বিচারক ২৯৮
জামাল সালেমের পরিণতি ২৯৯

বিংশতম অধ্যায় ৩০০

ইখওয়ানের নেতৃত্ব ৩০০
কাকে বিশ্বাস করবেন ৩০১
আবেগের ওপর যুক্তির বিজয় ৩০২
আপন বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত ৩০২
তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ্ তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন ৩০৩

একবিংশতম অধ্যায় ৩০৪

কৌশলের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষা অত্যাবশ্যক ৩০৪
ব্যক্তিত্বের লালন ও খ্যাতির আনন্দ ৩০৫
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ৩০৭
মুসলমানদের ঘাড়ের শিরা ও ইহুদী থাবা ৩০৭
সাংবাদিকতার ইসলামী নীতি ৩০৮
স্বৈরাচারীরা সাবধান ! ৩০৯

বাইশতম অধ্যায় ৩১১

পরিবার সংগঠন ও তার বাস্তবরূপ ৩১১
গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য ৩১২
ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ ৩১৩
ভিন্ন ভিন্ন মানদন্ড ৩১৪
তাঁরই সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক রয়েছে অবনত ৩১৪
আমেরিকান দূতাবাসের যোগাযোগ ৩১৫
"আদ দাওয়া" অফিসে ইহুদী বুদ্ধিজীবিদের আগমন ৩১৬

www.amarboi.org

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আতিথেয়তা ৩১৭
আফগান জিহাদ এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন ৩১৭
হয়তো আমার কথা তোমার ভাল লাগবে ৩১৮
নির্বাচনী ময়দানে ৩১৯

তেইশতম অধ্যায় ৩২০

সুদান আশার আলোকচ্ছটা ! ৩২০
কামাল আতাতুর্কের ধর্মহীন গণতন্ত্র ৩২০
বিপ্লবী কাউন্সিল কর্তৃক ইখওয়ানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ৩২১
মিসর ও সিরিয়ার ঐক্য ৩২১
জেনারেল নাজীবের সাময়িক পদত্যাগ ৩২২
ওয়াফদ পার্টির শাসনকাল ৩২২
গোপন অধিবেশন ৩২২
ভ্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মপন্থা ও তার ফলাফল ৩২৩
দাসদেরকে দাসত্বে সম্মত করা ৩২৪
কালের আয়নায় মিসর ও মিসরের বাইরের অবস্থা ৩২৫
মুর্শিদে আ'ম-এর সিরিয়া ও লেবানন সফর ৩২৫
এসব কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত ৩২৫
আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তোমরা শুধু তাই লাভ করতে পারো ৩২৬
সর্বাবস্থায় অস্থিরতা জাঁহাপনা ! ৩২৮
মিষ্টার গান্ধির উদ্ধৃতি ও উদাহরণ ৩২৮
মূর্তির প্রেম থেকে হাত গুটিয়ে নাও এবং আপন খুদীতে নিমগ্ন হয়ে যাও ৩২৯
দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ—এই আত্মীয়-পরিজনের সম্পর্ক ৩৩০
হাসানের উৎসাহ এবং সৌন্দর্য থেকে বঞ্চনা ৩৩১

চব্বিশতম অধ্যায় ৩৩২

ইখওয়ানের সামরিক সংগঠন ৩৩২
দেশ ও জাতির হিফাজতে সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা ৩৩৩
হাসান আল হুদাইবির নির্দেশনা বনাম সামরিক সংগঠন ৩৩৪
বিষনাশক বিষে রূপান্তরিত হলো ৩৩৪
তোমাদের কিন্তু লজ্জা নেই ৩৩৫
নাসেরের ব্যক্তিত্ব ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক ৩৩৫
সাদাত নাসেরের স্থলাভিষিক্ত ৩৩৬
সাদাতের দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম ৩৩৭

www.amarboi.org

সেনাবাহিনীর কাজ দেশের সীমান্ত রক্ষা, রাজনীতি নয়	৩৩৭
বস্তুত তোমরা খুব কমই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো	৩৩৮
একমুষ্টি মাটি কিন্তু জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত	৩৩৮
সুয়েজখাল জাতীয়করণ	৩৩৯
হোসনি মোবারকের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগী	৩৪১
পঁচিশতম অধ্যায়	**৩৪২**
সাদাতের হত্যা এবং ইখওয়ান	৩৪২
বিশ্লেষণ ও গুজব	৩৪৩
আমার পথ ধনীর পথ নয় দারিদ্রের	৩৪৪
সাদাতের বক্তৃতা	৩৪৫
ধৈর্যের শেষ সীমা	৩৪৬
কাঁপছে পাহাড় কাঁপছে তৃণভূমি ও নদীনালা	৩৪৭
ঔদ্ধত্যে মোহাবিষ্ট দুর্বিনীত মস্তক অবনত হলো	৩৪৮
আবারো জুলুমের ঝঞ্ঝা	৩৪৮
জিন্দানখানার পুরনো মেহমান	৩৪৯
এসো হে বুলবুল ! এক সাথে আহাজারি করি	৩৫০
সাদাত ও তার ইসরাঈলী বন্ধু	৩৫২
ছাব্বিশতম অধ্যায়	**৩৫৩**
ইসলাম না সমাজতন্ত্র	৩৫৩
দাস আর প্রভু বলে কিছুই রইল না	৩৫৩
যারা আসতে চাও জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়ে এসো	৩৫৪
বিশ্ব রাজনীতি পরিক্রমা ও ইখওয়ান	৩৫৪
ভালুক ও নেকড়ের বানরের ন্যায় পিঠা বন্টন	৩৫৫
আত্মনির্ভরতার অভাব ও মানসিক গোলামী	৩৫৫
মিসরের অর্থনীতি এবং সরকারের ধ্বংসনীতি	৩৫৬
সমৃদ্ধি লাভ কি এভাবেই সম্ভব !	৩৫৭
করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ	৩৫৮
মুসলিম দূতাবাসগুলোর স্বপ্ন	৩৫৯
সাংস্কৃতিক দল ঃ উম্মাতে মুসলিমার প্রতিনিধি	৩৬০
ইরাক-ইরান যুদ্ধ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ছাড়া কিছুই নয়	৩৬০
হোসনি মোবারক ও জাফর নিমেরীর সাক্ষাতকার	৩৬১
মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে	৩৬২

www.amarboi.org

সাতাইশতম অধ্যায় ৩৬৩

মাঝে মধ্যেই সেই প্রাচীন কিস্‌সা কাহিনীর সান্নিধ্যলাভ ৩৬৩

হিজাযের পথের ধূলাবালির আকাংখা ৩৬৩

যবের রুটি ও আলী হায়দারের বাহু ৩৬৩

আযাদ অফিসার-এর বিশ্বাসঘাতকতা ৩৬৫

তাকওয়াই সর্বোত্তম পথের সম্বল ৩৬৬

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ৩৬৬

উন্নত নৈতিক চরিত্রের নমুনা ও বীরত্বের উদাহরণ ৩৬৭

কালের অবদান যুগ স্রষ্টা ৩৬৭

সমস্যাবলীর সমাধান করার উত্তম যোগ্যতা ৩৬৮

ঈমান প্রবৃদ্ধিকর ঘটনাবলী ৩৬৯

আটাশতম অধ্যায় ৩৭৩

শোকাহত হৃদয়ের বেদনাদায়ক ক্ষত ৩৭৩

জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ অধপতন থেকে মুক্তির পথ ৩৭৩

কর্মফলেই জান্নাত ও জাহান্নাম ৩৭৬

নব্যক্রুসেডের যুদ্ধসমূহ ৩৭৭

মহাবিচারকের আদালত ৩৭৮

আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে ৩৭৯

উনত্রিশতম অধ্যায় ৩৮২

ইসলামী ঐক্যের আহ্বায়ক ৩৮২

আবু লাহাব নীতির বিদায় ও নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ৩৮৩

যাদের শৌর্যবীর্য ৩৮৪

হিকমাত ও কৌশল মু'মিনের হারানো মিরাস ৩৮৫

যুগের বিপ্লব ৩৮৬

বিভিন্ন মানদন্ড ও পরস্পর বিরোধী আচরণ ৩৮৬

আল্লাহ্ তায়ালা তার নূরকে (দ্বীনকে) পূর্ণতা দান করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে ৩৮৬

ইখওয়ান ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ ৩৮৮

সুস্পষ্ট ঘোষণা ৩৮৯

ত্রিশতম অধ্যায় ৩৯১

মন্ত্রীত্বের আকাংখায় ৩৯১

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় ৩৯১

www.amarboi.org

স্মরণীয় ছবি	৩৯২
বন্ধুদের মাঝে বিনম্র কিন্তু হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে ইস্পাত কঠিন	৩৯৩
সৎলোকদের সাহচর্যের প্রভাব	৩৯৪
মুরীদ থেকে মুর্শিদে আ'ম	৩৯৫
একটা তাজা উদ্যম একটা মহৎ ইচ্ছা	৩৯৭
তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল	৩৯৯
পরিপূর্ণ সৌন্দর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রেম	৩৯৯
একত্রিশতম অধ্যায়	**৪০১**
সত্যের পথে আহ্বানকারীর জীবন ও চরিত্র	৪০১
বাহুবল ও শক্তি প্রয়োগ	৪০৩
সা'দ জগলুল পাশার গাম্ভীর্য	৪০৪
শাহ্ অপেক্ষাও অধিক শাহ্ পূজারী	৪০৬
ইখওয়ানের শহীদগণকে ইহুদীদের ইংগীতেই ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে	৪০৭
বিশ্রি ও ন্যক্কারজনক খেলা	৪০৮
পি. এইচ. ডি-এর থিসিস ও ইখওয়ান	৪১০
যাতে করে আল্লাহ্‌র দ্বীনের পতাকাই থাকে সমুন্নত	৪১১
বত্রিশতম অধ্যায়	**৪১৫**
আশা-আকাংখা ক্ষীণ কিন্তু উদ্দেশ্য মহান	৪১৫
চিত্তাকর্ষক বাচনভংগী ও মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি	৪১৫
অন্তর ও দৃষ্টির মুসলিম	৪১৬
বাঁচার জন্য খাওয়া নাকি খাওয়ার জন্য বাঁচা	৪১৭
আমাদের মত কেউই নয়	৪১৯
সাইয়েদ কুতুব শহীদ	৪২০
সাইয়েদ কুতুব শহীদের উপর মিথ্যা অভিযোগসমূহ	৪২১
আবদুর রহমান সিন্ধি মরহুম	৪২২
আবদুল কাদের আওদা শহীদ	৪২৩
জনাব সালেহ্ আবু রাকীক	৪২৫
উম্মাতের নামে পয়গাম	৪২৫
মানুষের অসহায়ত্ব	৪২৭
স্বাধীনতার ইসলামী তাৎপর্য	৪২৭
স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত প্রসংগ কথা	৪২৮

www.amarboi.org

গ্রন্থকার পরিচিতি

মুহতারাম ওমর তেলমিসানী ইখওয়ানুল মুসলিমুনের তৃতীয় মুর্শিদে আম। বর্তমানে তিনি জীবনের আশিটি বসন্ত পাড়ি দিয়ে এসেছেন। তাঁর সুনাম ও মর্যাদা সমকালীন ইতিহাসে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। ইখওয়ানের ওপর বিপদ মুসিবতের সময় অতিবাহিত হয়েছে। সে সময় তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দী জীবনযাপন করেছেন। তাসত্ত্বেও কোন স্বৈরাচারী শাসকের সম্মুখে তাঁর মস্তক অবনত হয়নি। ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের সাহায্যেও তাঁকে বাগে আনার বহু চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে অনমনীয়তা দান করেছেন।

পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন আইনজীবি। তথাপি তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আজীবন দাওয়াতে হকের দায়িত্ব পালন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নাম শোনার সংগে সংগে দাওয়াতে হকের একজন একনিষ্ঠ কর্মী এবং ইসলামী আন্দোলনের একজন অক্লান্ত পথপ্রদর্শকের চিত্র চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি যৌবন উন্মেষের শুভ সন্ধিক্ষণ থেকেই সকল প্রকার আকর্ষণ মুক্ত একটা অদম্য কাফেলার সাথে এসে একাত্ম হন এবং তাদের সাথেই সারাজীবন পথ পরিক্রমা অব্যাহত রাখেন। একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত এক সাথীরূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। যখন নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয় তখন এ মহান যিম্মাদারী ও দায়িত্বের বোঝা তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, উন্নত দৃষ্টিভংগী ও সুকোমল ব্যবহারের নেয়ামত দ্বারাও পরিপূর্ণরূপে ধন্য করেছেন। তিনি ছিলেন একটি শ্রেষ্ঠ কাফেলার প্রধান।

"তাঁর স্মৃতিকথা" সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক দৈনিক "আশ্‌শারকুল আওসাত" পত্রিকায় ১৯৮৪ সালের ৩রা জুলাই রোজ সোমবার থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তার এ "স্মৃতিকথা" একটা সাক্ষাতকার হিসেবে প্রখ্যাত সাংবাদিক ইমাম আল গাজী বিন্যস্ত করেন। "আশ্‌শারকুল আওসাত"- এ প্রকাশিত তার "স্মৃতিকথার" প্রথম কিস্তিই সৌভাগ্যবশতঃ আমি পড়ার সুযোগ পেয়ে যাই এবং তখনই আমার মনে হয় যে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হওয়া দরকার। আমি তখন উচ্চ শিক্ষার্থে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সউদী সরকারের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। ইতিমধ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ইসলামী বিপ্লব হয়ে গেছে। সুতরাং ইরানের বিপ্লবী আন্দোলন ও ইখওয়ান সংগঠনের নিষ্ঠাবান কর্মী এবং দায়িত্বশীলগণের সাথে মিলিত হবার যখনই সুযোগ পেতাম, খোলামেলা আলাপচারিতার মাধ্যমে তাদের সুদীর্ঘ ও তিক্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা জেনে নিয়ে আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য নিজের ঈমান, মনোবল ও যোগ্যতাকে

www.amarboi.org

আরো শানিত করে নিতে চেষ্টা করতাম। সুতরাং মুর্শিদে আম-এর জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঞ্চয় অবগত হবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তাই অল্প কয়েকদিনেই আমি কয়েক কিস্তির বাংলা তরজমা করে ফেললাম এবং আমি এ অনুবাদকর্ম ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই সমাপ্ত করে ফেলি। অনুবাদের কাজ সাধারণত তখন করতাম যখন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ থাকতো না। প্রধানত সালাতুল আছর থেকে এশা পর্যন্ত সময়কেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করতাম। প্রতি সপ্তায় দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়া যেতো। শেষের দিকে ভ্রাতৃপ্রতীম ক্বারী হাবীবুর রহমান যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করে। আমি তার দ্বারা অনুবাদ লিখার কাজ করাতাম আর তিনিও দ্রুত গতিতে এবং নির্ভুলভাবে তা লেখার দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে খুব অল্প সময়েই কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যায়। অতপর এ অংশগুলো সংশোধনও করে নেয়া হয়। আল্লাহ্ তায়ালা ক্বারী সাহেবকে সর্বোত্তম বিনিময় দ্বারা ধন্য করুন। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে গ্রন্থাকার পরিচিতি তুলে ধরার আবশ্যকতা বোধ করছি।

ঈসায়ী চলতি শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বীনের সংস্কার সাধন ও পুনরুজ্জীবন দানের মহতী আন্দোলন "ইখওয়ানুল মুসলিমুন" নামে মিসরে শুরু হয়। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদ। এ সুমহান ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত মহৎগুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন। তাঁর পরিচালিত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এতবেশী জনপ্রিয়, সর্বব্যাপী ও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় যে বাতিল পন্থী সমস্ত দলের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাতিল দল মত নির্বিশেষে এ আন্দোলনকে উৎখাত করার জন্য সযত্ন প্রয়াস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার নূর তথা দ্বীনে হক কখনো বাতিলের ফুৎকারে নির্বাপিত হয়ে যেতে পারে না। আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। অথচ তা নিশ্চিহ্ন করার দূরভিসন্ধি গ্রহণকারীরা ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর জনাব হাসান আল হুদাইবি আন্দোলনের মুর্শিদে আম নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিজ্ঞজনোচিতভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তার নেতৃত্বকালীন সময় ছিলো কঠোর পরীক্ষার অধ্যায়। এ পর্যায়েই সাইয়েদ কুতুব ও ইখওয়ানের অন্যান্য বহু গুণধর ব্যক্তিত্বকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলানো হয়। তথাপি আত্মনিবেদিত ও প্রবল ঈমানের বলে বলীয়ান ইখওয়ান ত্যাগ স্বীকার করতে থাকে এবং অকুতোভয়ে তাদের লক্ষ পানে অগ্রসর হতে থাকে। হাসান আল হুদাইবি (র)-এর ইনতিকালের পর ইখওয়ানের প্রাক্তন সদস্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর মূর্তপ্রতীক শাইখ ওমর তিলমেসানী মুর্শিদে আম নির্বাচিত হন। তিনি ইখওয়ানের তৃতীয় আমীর বা মুর্শিদে আম। তার বয়স এখন আশি বছর। তা সত্ত্বেও তার যুবকসুলভ মনোবল দেখে ঈমান তাজা হয়ে ওঠে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস জন্মে যে আল্লাহর প্রেমে বিভোর ব্যক্তি কখনো বুড়িয়ে যায় না বা দুর্বল হয়ে পড়ে না।

www.amarboi.org

ওমর তিলমিসানী হচ্ছেন ইখওয়ানের ইতিহাসের আমানতদার। তাঁর বক্ষ এমন উজ্জ্বল ও অকৃত্রিম ইতিহাসের উৎস, যা বর্তমান শতাব্দীতে সালফ ও সালেহীনদের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। অন্যুন প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত এ সংগঠনের প্রথম সারিতে কাজ করার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। আরবী ভাষায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক দৈনিক "আশ্‌শারকুল আওসাত" পত্রিকার পক্ষ থেকে একবার উস্তাদ তিলমিসানীর সাথে সাক্ষাতকারের আবেদন জানানো হয়। তখন মুর্শিদে আম-এর শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিলো না। তদুপরী অতিসম্প্রতি সুইজারল্যান্ডে একটা বড়ো ধরনের অপারেশান করা হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও যে তিনি পত্রিকার প্রতিনিধি ইমাম আল গাজীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তার স্মৃতিকথাকে সাক্ষাতকার হিসেবে পাঠকগণের সমীপে উপস্থাপন করবেন। তার ঈমান প্রবৃদ্ধিকর স্মৃতি কথামালাগুলোই এখন "আশ্‌শারকুল আওসাত" পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৮৪ সালের ২৩শে জুলাই সোমবার এর প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। তারপর প্রতি সপ্তাহে তিন দিন সোম, বৃহস্পতি ও শনিবার তা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।

"আশ্‌শারকুল আওসাত" আমাদের সময়কার সংবাদপত্র জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি দৈনিক। এ দৈনিকটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে একই সাথে বিশ্বের ছয়টি স্থান থেকে প্রকাশিত হয়। লন্ডন, প্যারিস, জিদ্দা, রিয়াদ, কাসাব্লাঙ্কা (মরক্কো) এবং নিউইয়র্ক-এর মুদ্রণ ও প্রকাশনার কেন্দ্র। এ পত্রিকায় ইস-লামী ও পশ্চিমাজগতের পণ্ডিত, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ এমনকি বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়াবিদগণের স্মৃতিকথা প্রকাশ করে আসছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পত্রিকাটির প্রকাশনা অনেক বেশী। সাক্ষাতকার প্রদানকারী খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ অথবা আত্মকাহিনী লেখক সাহিত্যিকদেরকে অত্যন্ত মোটা অংকের সম্মানী প্রদান করা হয়। পত্রিকার প্রতিনিধি যখন মুর্শিদে আমের খেদমতে তা প্রকাশ করেন। তখন তিনি অত্যন্ত দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন, "আমি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ইতিহাস বিক্রি করতে চাই না।"

আমি যখন প্রথম কিস্তিতে এ খবর পাঠ করি, তখন তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হই। কিন্তু মনের মধ্যে একথাও জাগে যে, পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তা ইখওয়ানের বাইতুলমালে জমা দিলে তাতে তো কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পর আমাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে একথা বলতে বাধ্য হতে হয়েছে যে, মুর্শিদে আম-এর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ছিলো সঠিক ও যথার্থ। আমি জানতে পেয়েছি যে, "আশ্‌শারকুল আওসাত"-এর সুধী পাঠকগণের ওপর এ মন্তব্যের এমন সুদূর প্রসারী প্রভাবই পড়েছে যা হাজার হাজার কর্মী বছরের পর বছর অবিশ্রান্ত মেহনতের পরও ফেলতে পারতো না।

মুর্শিদে আম-এর এ সাক্ষাতকার থেকে তার ব্যক্তিগত অবস্থার পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু মোটামুটিভাবে এটা সংগঠন, আন্দোলন এবং এর কঠোর প্রাণ কাফেলার সামগ্রিক কার্যক্রম অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর রক্তে সিক্ত ঘটনা প্রবাহ প্রকাশ করার মোক্ষম সুযোগ বিশেষ।

www.amarboi.org

আজকের প্রকাশনায় সাইয়েদ হাসানুল বান্নার সাথে উস্তাদ তিলমিসানীর প্রথম সাক্ষাতকারের পর্যালোচনা সম্মানিত পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ আলোচনা তাঁর সাক্ষাতকারের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে।

অনুবাদের কাজ চলাকালীন সময়ে মনে মনে ভাবছিলাম যে এ "স্মৃতিকথা" গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলে এর নাম কি রাখা যেতে পারে ? সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই মনের কোণে ভেসে ওঠে "স্মৃতির আমানত"। আর এখন এটা আল্লাহর রহমতে "ওমর তিলমেসানী ও ইখওয়ান" নামে গুণীজন ও সুধী পাঠকগণের খেদমতে হাজির করা হলো।

অবশ্য এ সাক্ষাতকার কিংবা "স্মৃতিকথাগুলোকে" সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়নি। এ স্মৃতিকথা পড়তে গিয়ে সুধী পাঠকগণ বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন যে, মুর্শিদে আম নিজেও এদিকে ইংগিত দিয়েছেন। কখনো কখনো মনে হয় যেন কোন কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও জনাব তিলমিসানী কেবলমাত্র তার স্মৃতি শক্তির সাহায্যে এবং কোন প্রকার লিখিত রেকর্ডের সাহায্য না নিয়েই সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং কোন প্রকার লৌকিকতা ছাড়াই তার স্মৃতির প্রদীপ প্রজ্জলিত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল এই যে, স্বীয় পয়গাম ও আন্দোলনের পরিচিতি পাঠকদের নিকট পৌঁছে দেয়া। সুতরাং এ চিন্তাধারাকে কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে তিনি সাক্ষাতকার প্রদান করেন। আমার তো মনে হয় যে জনাব মুর্শিদে আম মৌমাছির মত প্রতিটি ফুল থেকে রস আহরণ করেছেন এবং রোগ নিরাময়কারী মধু দ্বারা তাঁর মৌচাক ভর্তি করেছেন। তিনি কোন কথা বর্ণনা করার সময় যেমন কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নেননি। তেমনি কোন প্রকার মেকিত্বের প্রলেপ দিতেও চেষ্টা করেননি। সত্যিই ন্যায় ও সত্যের একজন নিষ্ঠাবান দায়ীর চরিত্র মাহাত্ম্য এরূপ হওয়াই শোভনীয়। এরপর থাকে চরম উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার কথা। সেটা কেবল আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর অংশ। সাধারণ মানুষ ভুল ভ্রান্তিও করে আবার সঠিক পথের সন্ধানও লাভ করে। কিন্তু সে নিষ্পাপ নয়। আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র নবী রাসূলগণকেই নিষ্পাপ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

জনাব মুর্শিদে আম-এর কথা আরবী ও ইংরেজী সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকায় বহুবার পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর সাক্ষাতকার দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। তাঁর লিখিত কতিপয় দুর্লভ ও মূল্যবান প্রবন্ধ 'আদ দাওয়া' এবং 'আল মুখতারুল ইসলামী'-এর মত পত্রিকার পৃষ্ঠায় আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের দুর্লভ সুযোগও আমি পেয়ে যাই। তিনি সুদানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগমন করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের সুযোগও আমার হয়েছিলো। সেখানেই তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। যে ভালবাসা ও একান্ত আপনার মত করে তিনি আমাকে সান্নিধ্য দান করেন। তা চিরদিন স্মৃতিপটে গাঁথা থাকবে। যদিও তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ক্লান্ত এবং দুর্বল কিন্তু জেহাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত এ মহাপ্রাণ ব্যক্তি সর্বদা কর্মমুখর ও প্রাণ চঞ্চল থাকেন।

কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে তাঁর কোন প্রোগ্রাম বা ভাষণ দেয়ার দায়িত্ব ছিলো না। কিন্তু সম্মেলন কক্ষে অথবা তার বাইরে যেখানেই তাকে পাওয়া যেতো, উপস্থিত

www.amarboi.org

সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো তাঁর উপর। অধিবেশনের বিরতির সময়ও মানুষ ভক্তি ভরে ও আবেগ আপ্লুত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে যেতো। এটা ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রতি জনসাধারণের আবেগ ও ভক্তির বহির্প্রকাশ। আমি যখনই তার প্রতি লক্ষ্য করতাম, তখনই ইখওয়ানের ইতিহাস আমার মনের দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। তিনি এ ইতিহাসেরই আমানতদার এবং আন্দোলনের প্রাণ প্রবাহ।

মিসর এবং মিসরের বাইরে যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই হক-এর অনুসন্ধানকারীগণ তাঁর প্রতি দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতো। মিসর সরকার তার প্রোগ্রাম বানচাল করার জন্য যতই বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা করতো, ততই তার সুনাম ও সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো। সম্মানিত পাঠকগণ ! এ স্মৃতিকথা পাঠের সময়ও দেখতে পাবেন যে তিনি তাঁর বিদেশ সফরের আলোচনা করেছেন। রওয়ানা হওয়ার এবং ফিরে আসার সময় যেভাবে এয়ার পোর্টে এবং ইমিগ্রেশনে অফিসারগণ তাঁকে কষ্ট দিতো তা শুধু অনুতাপের বিষয়ই নয় বরং পুরোপুরি লজ্জাজনক ও কঠোরভাবে নিন্দার যোগ্যও বটে। তার অসীম উৎসাহ উদ্দীপনা ও একান্ত সদিচ্ছা আন্তরিকতার কারণেই তিনি তাদের এরূপ অশালীন আচরণে কখনো কিছু মনে করতেন না।

কুয়েতের প্রভাবশালী সাময়িকী "আল মুজতামা" তার ১৯৮৫ সালের পহেলা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখেছেন ঃ জীবনের আশিটি বছর অতিক্রম করে আসার পরও শাইখ ওমর তিলমিসানীর অদম্য সাহস এবং সৎ উৎসাহ তাঁকে প্রাণ চঞ্চল করে রাখছে। গত সপ্তায় এক দিনেই তিনি তিনটি জনসমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। প্রথম অধিবেশন "হিযবুত তাজাম্মুম" (মিসরের একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল)-এর কেন্দ্রীয় দফতরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হয়। অতপর যুব চিকিৎসক ইউনিয়নদের ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কায়রোতে অবস্থিত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দফতরের এক বিরাট সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় অধিবেশনের আয়োজন করে আইনজীবিদের ইউনিয়ন সিরাতুন্নবী (সা) উপলক্ষে। সেখানেও তিনি ভাষণ দান করেন। প্রতিটি অধিবেশনেই তিন সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়।

একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হিযবুত তাজাম্মুর কেন্দ্রীয় দফতরে যখন তিনি তাশরীফ আনেন তখন উপস্থিত সকলের মধ্যে অত্যন্ত আবেগময় অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য একাধারে তিন মিনিট পর্যন্ত করতালি দেয়া হতে থাকে এবং মূহর্মূহ গগনবিদারী শ্লোগানের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকে। এমন সাদর ও উষ্ণ অভ্যর্থনা কোন বক্তা বা নেতাকে জানানো হয়নি। অথচ স্বয়ং "হিযবুত তাজাম্মুর" প্রধান জনাব খালেদ মুহীউদ্দীনও বক্তাদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

আরো মনে রাখা দরকার যে, সাইয়েদ তিলমিসানী তাঁর বাম চক্ষুর অপারেশন শেষে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি সক্রিয় নেতা হিসেবে সর্বদা কর্মতৎপর থাকেন।

www.amarboi.org

এ খবরটি চলতি সপ্তাহের একটা আরবী পত্রিকা থেকে শুধু নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করলাম। অন্যথায় মুর্শিদে আমের কর্মব্যস্ততার বিস্তারিত বিবরণ খুবই বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ।

ইখওয়ান ও জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা সম্বলিত একটা নিবন্ধ এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আশা করি সুধী পাঠকগণ "ওমর তিলমেসানী ও ইখওয়ান" পাঠ করে সাইয়েদ ওমর তিলমিসানী এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন তথা মিসর ও আরব দেশসমূহের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য অবগত হতে পারবেন। এ প্রবন্ধ থেকে দু'টি ইসলামী আন্দোলনকে তুলনা করে পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, সংস্কার আন্দোলনগুলোকে দুনিয়ার সবখানেই একই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়া সব আন্দোলনের মনযিলে মকসুদ এক হওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ এলাকা ও পরিবেশ তাদেরকে আপনাপন কর্মসূচী তৈরী করে নিতে হচ্ছে।

অনুবাদকালে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে বক্তার মূল বক্তব্য সঠিকভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা যায়। তাই এটা শাব্দিক বা আক্ষরিক অনুবাদ নয় বরং ভাবানুবাদের সযত্ন প্রয়াস মাত্র। বিজ্ঞ সুধী ও গুণীজনদের খেদমতে আরজ এই যে, কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা যেন সেদিকে যথাযথভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করতে মর্জি করেন।

মূল প্রবন্ধ অধ্যয়ন করার সময় সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে যে, যেসব চিন্তাধারা আল্লামা ইকবাল মারহুম মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রান্তকর প্রয়াস পেয়েছিলেন, শাইখ ওমর তিলমিসানীও সেই একই ভাবধারায় উদ্দীপ্ত।

অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সমস্ত উপশিরোনামগুলো আমাদেরই উদ্ভাবিত। যে নিয়তে মুর্শিদে আম তার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়েছেন আল্লাহ সেই মহৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার তাওফিক দান করেন। অথাৎ চিন্তা চেতনার ধারা যেন বদলে যায় এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তি তাদের হারানো মর্যাদা পুনরায় অর্জন করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কবির ভাষায় ঃ তোমার চেতনায় যদি বিপ্লবের সৃষ্টি হয় তাহলে ! আশ্চর্য নয় যে চারদিকের বিরাজমান পরিবেশই বদলে যাবে !! তোমার প্রার্থনা হচ্ছে যেন তোমার আকাংখা পূরণ হয় ! আর আমার দোয়া হচ্ছে যেন তোমার আকাংখাই বদলে যায় !!

কবি আরো বলেছেন ঃ

"জগত যদিও অন্য রকম হয়ে গেছে বলে মনে হয় !

তবুও দাঁড়াও তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে !!

এ জমিন, এ আলো বাতাসে তোমরা রুখে দাঁড়াও আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে।

'আনাল হক' ধ্বনিকে যিনি আগুনের রূপান্তরিত করেছেন তোমর শিরা উপশিরায় সেই রক্ত প্রবহমান। অতএব উঠে দাঁড়াও।

ওয়াসসালাম।

www.amarboi.org

উপক্রমনিকা

বিংশ শতাব্দির দু'টো বিরাট ইসলামী আন্দোলন

বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতি ও সমকালীন বিশ্বের লোকদের সামনে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। ঐসব নবী রাসূল প্রেরণের শেষ পর্যায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত আদম সন্তানের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের মানুষের জন্য হিদায়াতের পথের আহবায়ক এবং পথপ্রদর্শক। তাঁর পর আর কোন নবী রাসূলের আগমন ঘটবে না।

বনী আদমের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব তথা মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং পবিত্র সুন্নাহ উম্মাতের নিকট সোপর্দ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন ঃ "যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টো মৌলিক উৎসের শিক্ষা মুজবুতভাবে অনুসরণ করে চলবে ততদিন কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।"

তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, আমার উম্মাতের ওলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের আম্বিয়ায়ে এক্বামদের সমান।

অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, আলেমদেরকে নুবায়াতের সমান মর্যাদা কিংবা নবীদের ন্যায় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। বরং তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলকে উম্মাতের সংশোধন সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হতো, এখন থেকে সেই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হলো ওলামায়ে ইসলামের উপর।

দ্বীনের সংস্কার সাধন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ উম্মাতের মধ্য থেকে সাহসী আলেম ও সৎব্যক্তিগণকে তাওফীক দিয়ে আসছেন যাতে তারা দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ভ্রান্ত রীতিনীতি ও আচার আচরণের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর বান্দাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর স্বচ্ছ ঝর্ণাধারার কাছে নিয়ে আসতে পারেন। দ্বীনের সংস্কার সাধন ও পুনর্জীবনের আন্দোলন সকল যুগে ও সকল দেশেই কার্যকর ছিলো। সংস্কারকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞতা ও গোমরাহীর মোকাবেলায় প্রকৃত জ্ঞান এবং দ্বীনে হানিফকে পরিশুদ্ধ করে দেন। তথাপি এ কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং ধৈর্যের দাবিদার। এ কাজ কেবল সেইসব লোকের পক্ষে করা সম্ভব যারা সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবার জন্য সর্বদা জিহাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত থাকে।

www.amarboi.org

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী উম্মাহ্ পশ্চাৎপদতা অধঃপতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে রাজনৈতিক গোলামীর সাথে সাথে চিন্তাগত স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে নীলনদ উপত্যকায় আল্লাহ্ তায়ালা তার এক সত্যপ্রিয় বান্দাকে বাতিলের মোকাবিলা করার জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত গুণাবলীর অধিকারী। আল্লাহ্ তাকে সবরকমের গুণ দান করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি মুসলিম উম্মার করুণ অবস্থা আবলোকন করে চিন্তিত ছিলেন। তিনিই তার যৌবন কালে মাত্র একুশ বছর বয়সে উম্মাহকে সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯২৭ সালে ইসমাঈলিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তখন তার সাথে ছয় জন সাথী ছিলেন। এই বিশাল ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদ এখন আর কারো পরিচয় করিয়ে দেয়ার অপেক্ষা থাকে না। তার পরিচালিত আন্দোলনই ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন যার প্রভাব মুসলিম বিশ্ব এবং.আরব জাহান ছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুভূত করা হচ্ছে।

হাসানুল বান্না যে সময় মিসরে সংস্কার আন্দোলন জোরদার করছিলেন ঠিক সেই সময়েই পাক ভারতীয় উপমহাদেশে তারই সমসাময়িক অপর এক নওজোয়ান মর্দে মু'মীন সম্পূর্ণ একই আঙ্গিকে ও একই প্রেক্ষাপটে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিলেন। তিনি তার ঈমান উদ্দীপক লেখনী দ্বারা প্রতিটি জাগ্রত বিবেক, সচেতন ও নিষ্ঠাবান মুসলিমের অন্তরে সমকালীন জাহেলীয়াত ও পরিবেশ পরিস্থিতি সংস্কারের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। এ যুবকের নাম ছিলো সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মারহুম। তিনি ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভাষ্যকার ও মুখপাত্র। তিনি ইসলামী আন্দোলনের একটা মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার নাম প্রস্তাব করা হয় "জামায়াতে ইসলামী"। সত্যের এ কাফেলায় সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর জন. কাফেলার অগ্রাভিযান শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সালে। বর্তমানে এ সংগঠন ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর ন্যায় বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী।

সৌভাগ্যবশত এ দু'টি সংগঠনেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খুবই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, অদম্য সাহসিকতা ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং এলেম ও আমলের গুণাবলীতে একজনের সাথে অন্যজনের রয়েছে পুরোপুরি সাদৃশ্য। উভয়ের যৌবন ছিলো নির্দোষ ও নিষ্কলুষ এবং চিন্তা-চেতনা ঊষা লগ্ন থেকেই ছিলো কুরআন সুন্নাহর আলোকে আলোকিত : দুই ব্যক্তিত্বকেই অল্প বিস্তর প্রায় একই রকম পরিবেশ পরিস্থিতিতে উম্মাহর সংস্কারে কাজ দু'টো পৃথক প্রক্রিয়ায় আঞ্জাম দিতে হয়। বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-দৈন্যের প্রকৃতিও ছিলো প্রায় একই ধরনের। উভয়েই জাতির সামনে যে শ্লোগান পেশ করেন তাও ছিলো হুবহু একই। সেই শ্লোগান ছিল اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً। "পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।"

www.amarboi.org

আর এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপারও নয়। কেননা বীজ যে বৃক্ষের হবে তা থেকে সেই বৃক্ষই উৎপন্ন হবে। যদিও দু'টো আলাদা ভূখন্ডে একই আবহাওয়ায় ঐ বীজ বপন করা হয়। দু'জনেরই চিন্তা একই সূত্রে গাঁথা ছিলো। তাই রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসায় পার্থক্য হওয়া সম্ভবই ছিল না।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধবাদীরা প্রত্যেকটি আন্দোলনের উপরই তাদের নিজ নিজ গোপন আস্তানা থেকে একই অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করে থাকে। অভিযোগ উত্থাপন এবং দোষারোপের ফিরিস্তি দেখলে এবং সেগুলোর ভাষা বিশ্লেষণ করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মনে হয় যেন এসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ একই কারখানায় তৈরী হয়ে আসছে। জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীরা নির্বোধের মত অভিযোগ আরোপের সাথে সাথে অপেক্ষাকৃত একটি হালকা ভিত্তিহীন অপবাদও আরোপ করে থাকে যে এরা ইখওয়ানের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় থাকে। মিসর ও অন্যান্য আরব দেশে যা কিছু লেখা হয় এরা অবিকল তাই নিজেদের দেশে ভাষান্তরিত করে থাকে। আমরা এখানে এসব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে বা সেগুলোর পর্যালোচনায় যেতে চাই না। এ পর্যায়ে বরং সাইয়েদ কুতুব শহীদের দু' শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত জবাবই যথেষ্ট। প্রকাশ থাকে যে, ইখওয়ানের বিরোধীরা তাদের উপরও একই অভিযোগ আরোপ করতো যে, তারা জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারারই ব্যপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। সাইয়েদ কুতুব এর লেখনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন আবার সাইয়েদ মওদূদীর লেখাও অধ্যয়ন করে দেখুন। মনে হবে যেন দু'জন লেখকেরই চিন্তাধারা একই উৎস থেকে উৎসারিত। বিশেষেতঃ "তাফহীমুল কুরআন" ও "ফি যিলালিল কুরআন"-এর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

একবার সাইয়েদ কুতুব-এর সামনে জনৈক ব্যক্তি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তার লেখনী সাইয়েদ মওদূদীর লেখনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি এর জবাবে বলেছিলেন ঃ আমাদের চিন্তাধারার উৎস এক ও অভিন্ন। মাত্র দু'শব্দের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এ জবাব সুদীর্ঘ রচনা বা প্রবন্ধ বরং বিশাল আয়তনের গ্রন্থ থেকে বেশী অর্থবোধক اِنَّ فِى ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِى الْأَلْبَابِ "নিশ্চয়ই এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগায়।"

সাইয়েদ মওদূদী ও সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদের পরস্পরের সাথে কখনো সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। তথাপি দুই মহান নেতার মধ্যে তাদের উভয়েরই বন্ধু কুয়েতের প্রখ্যাত ইসলামী নেতা শাইখ আবদুল আযীয আলী আল মাতলু-এর মাধ্যমে পত্রের আদান প্রদান হতো। এতে ইখওয়ান এবং জামায়াতের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং নিয়মিত দেখা সাক্ষাত হতে থাকে। সাইয়েদ মওদূদী ও সাইয়েদ হাসানুল বান্না দুই সংগঠনের প্রত্যেকটিকে অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরিপূরক মনে করতেন। তাদের মধ্যে এ অনুভূতি ছিল যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। কেবলমাত্র ভৌগোলিক অবস্থান এবং কর্মক্ষেত্র আলাদা। আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, জামায়াতে ইসলামী ও

www.amarboi.org

ইখওয়ানের দু'জন কর্মী দুনিয়ার যে কোন স্থানে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলে তারা মনে করে যে তারা দু'জন একই বংশোদ্ভূত। যদি পৃথিবীর কোন অংশে কোন ইখওয়ানী ভাইয়ের ওপর অত্যাচার হয় তাহলে জামায়াত ইসলামীর প্রত্যেক কর্মী তার অন্তরের অন্তস্থলে বেদনা অনুভব করে। অনুরূপভাবে জামায়াত বা এর কোন কর্মীর ওপর নির্যাতন চালানো হলে সমগ্র পৃথিবীর ইখওয়ানী ভাইয়েরা তড়পাতে থাকে। এমনটা হবেই বা না কেন ? আমাদের মনযিলে মকসুদ ও জীবন লক্ষ্য যে এক ও অভিন্ন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার বহুবার এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোন অজ্ঞতা অপরিচিত পরিবেশের কোন এয়ার পোর্টে কিংবা প্লেনের মধ্যে অথবা অন্য কোন স্থানে হঠাৎ কোন ইখওয়ানী ভ্রাতার সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলে কথার ফাঁকে যখনই আমাদের কারো জানার সুযোগ হয় যে অপরজন ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত। অমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরস্পর গলাগলি কোলাকুলি হয়ে যায়। বিদেশী ও অপরিচিতির লেশমাত্র তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। মুহূর্তের মধ্যেই মনে হয় যেন আমরা বাল্যকাল থেকেই একত্রে বসবাস করে আসছি।

এটা ইসলামী আন্দোলনেরই কৃতিত্ব যে তার কর্মীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস اَلْحُبُّ فِى للّٰهِ وَالْبُغْضُ للّٰهِ (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে সকল প্রকার ভালবাসা এবং বৈরিতা) -এর জীবন্ত নমুনা বানিয়ে দিয়েছে।

দু'টি সংগঠনেরই দাওয়াত ও কর্মনীতির প্রতি লক্ষ করুন এবং বুনিয়াদী সাহিত্য সম্ভার পড়ে দেখুন। দায়িত্বশীলগণের বক্তৃতা বিবৃতি চিন্তাবিদগণের চিন্তা-ভাবনা লেখক সাহিত্যিকগণের লেখনী সাংবাদিকগণের পর্যালোচনা মোদ্দা-কথা যে কোন অংগনের উপর দৃষ্টিপাত করে দেখলে আপনার কাছে প্রতীয়মান হবে যে উভয় ফুলের তোড়ায় একই গাছের ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

এতোসব সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও আপনাপন পরিমন্ডলে এবং কর্মক্ষেত্রে দু'সংগঠনের অগ্রগতি এবং জিহাদের পক্রিয়া ও পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হাসানুর বান্না সাহিত্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষের মন-মানসিকতা গঠনে ছিলেন বেশী তৎপর। পক্ষান্তরে সাইয়েদ মওদূদী যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী তৈরীর সাথে সাথে সাহিত্য রচনারও দিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। হাসানুল বান্নাও ছিলেন সৃজনশীল লেখক ও সাহিত্যিক কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছিলো বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরদিকে সাইয়েদ মওদূদী খুব তেজস্বী বক্তা ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর ময়দানই ছিলো বেশী প্রশস্ত। বলিষ্ঠ ও গতিশীল লেখনীর এক এমন মহৎ গুণ তার মধ্যে ছিলো যার বদৌলতে তিনি তার সমকালীন সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তেমনিভাবে নীল নদের অববাহিকা চলতি শতাব্দীতে হাসানুল বান্না শহীদ অপেক্ষা আর কোন বড় বক্তা দেখতে পায়নি।

www.amarboi.org

সাইয়েদ মওদূদী প্রত্যেক বিষয়ের ওপর কলম ধরেছেন। এমনকি সত্য কথা বলতে গেলে প্রত্যেক বিষয়ের হকও তিনি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাফহীমুল কুরআন নামক কিতাবুল্লাহর তাফসীর ব্যতিক্রমী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এ বিষয়ে বহু চিন্তাবিদ পুরোদস্তুর মূল্যায়ণ করে এবং প্রাচীন ও আধুনিক অসংখ্য তাফসীরের সাথে তুলনা করে প্রমাণ করেছেন যে, এটা এক অতুলনীয় ও ব্যতিক্রম ধর্মী সৃষ্টি। জন্মনিয়ন্ত্রণ, পর্দা ও সুদ এর মত সংবেদনশীল বিষয়াবলীর ওপরও তিনি কলম ধরেছেন। বিশেষত এমন যুগ সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য দর্শনের সম্মুখে ইসলামের বড় বড় মাশায়েখগণ হতবাক ও বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কারণ প্রদর্শন না করেই সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোতে ইসলামের দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত সাহসিকতা এবং প্রামাণ্য তথ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করেন। তার ক্ষুরধার লেখনীর সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট ও পরিপূর্ণতা হচ্ছে এই যে, তিনি পশ্চিমা দার্শনিক পন্ডিতদেরকে তাদের নিজেদের লেখনী এবং বাস্তবতার নিরীখে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। এমনকি তাদের দুর্বিনীত মস্তক অবনত করতে বাধ্য করেছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। শুধু উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা বইয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো। সারকথা এই যে তিনি একাই তার সংগঠনকে এত বিপুল পরিমাণে বিশ্বাস ও চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ অস্ত্রযোগান দিয়ে গিয়েছেন যে, যদি কর্মীরা কাজ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে কোন ময়দানেই তাদের পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জিত হতে হবে না।

হাসানুল বান্না শহীদের যে সংক্ষিপ্ত অবকাশ নসীব হয়েছিলো, তাতেই তিনি ইসালামী আন্দোলনের চারা মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে ভাষায় ও সহজবোধ্য বর্ণনা ভংগীতে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার পয়গাম ছড়িয়ে দেন। কৃষক মজুর জনতা তার পার্শ্বে এসে সমবেত হয়। সাহিত্য রচনা এবং প্রত্যেক বিষয়ের চিন্তা-চেতনাকে সঠিক খাতে প্রবাবিত করার নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে তার অনুসারীগণ অত্যন্ত চমৎকারভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি মন ও মস্তিষ্কের নিকট আবেদন রাখেন। কিন্তু তার আবেদন দেমাগের তুলনায় দিলের নিকটই ছিলো বেশী। একইভাবে সাইয়েদ মওদূদী মানুষের মন ও মস্তিষ্ক উভয়ের উপরই করাঘাত করেছিলেন ; তবে তার লক্ষ্য ও গুরুত্ব ছিলো দেমাগের উপরই সমাধিক।

জামায়াতে সাইয়েদ মওদূদীর পরও চিন্তাশীলগণের ঘাটতি দেখা দেয়নি। তথাপি সত্য কথা হলো এ পর্যায় জামায়াত অপেক্ষা ইখওয়ান অনেক অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। জামায়াতের চিন্তাবিদগণের মধ্যে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, মাসউদ আলম নদভী মারহুম, অধ্যাপক আবদুল হামিদ সিদ্দিকী মারহুম, অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ, মালেক গোলাম আলী, নাঈম সিদ্দিকী, জান মুহাম্মদ ভূট্টো, সাইয়েদ হামেদ আলী, সাইয়েদ আসআদ গিলানী, আবাদ শাহপুরী, মুহতারাম খলিল আহমদ হামিদী, খুররম জাহ মুরাদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, মুহতারিমা মরিয়ম জামিলা, মুহাম্মদ সুলতান, মুহতারাম আবুল লাইছ, ডক্টর

www.amarboi.org

নাজাত উল্লাহ সিদ্দিকী, সদরুদ্দীন ইসলাহী, মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, সাইয়েদ সরুজ কাদেরী, মুহতারাম আবদুল হাই, মারহুম আবদুর রহীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কলম ধরেছিলেন এবং অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থাবলী দ্বারা সুধী পাঠক মন্ডলীকে ধন্য করেছেন ও আজো করে চলেছেন। কিন্তু ইখওয়ান চিন্তাবিদগণের অবস্থান এক্ষেত্রে অনেক উর্ধে। হাসান আল হুদাইবি মারহুম, আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ, মুহাম্মদ আল গাযালী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মুহাম্মদ কুতুব, ইউসুফ আল কারযাভী, মুস্তাফা সিবায়ী মারহুম, মুস্তাফা যারকা, আল বাহী আল খলি, ফাতহী ইয়াকীন, সাঈদ হাওয়া, যায়নাব আল গাযালী, সাঈদ রামাদান, ইমাম আল খাত্তাব এর ন্যায় আরো অনেকে ছিলেন বা আছেন এরা এমন দূরদর্শী বিদগ্ধ সুপন্ডিত ব্যক্তিত্ব যে ইসলামকে জীবনের বিস্তীর্ণ অংগনে বলিষ্ঠ দলীল প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন। তারা শুধুমাত্র তাদের অনন্য সাধারণ জ্ঞান প্রতিভা ও লেখনী শক্তির স্বীকৃতিই সমসাময়িক বিশ্ব থেকে আদায় করেননি। বরং জ্ঞানের প্রতিটি মানদন্ডে এবং সাহিত্যিক হিসেবেও তাদের মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। কোন নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ও সমালোচকই এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না। তাদের লেখনীতে নতুনের ছাপ এবং শক্তি অনেক বেশী। পতিপক্ষকে লাজবাব করে দেবার মত তাদের যুক্তির বাস্তবতা। আপন দীপ্তিতে ভাস্বর যদি আমরা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ করি তাহলে সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অনাগত কালের বংশধরদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তুত এ স্বর্ণমালার সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ক্রমশ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে ইখওয়ানের মধ্যে এর বাঁধন আগামী দিনগুলোতে আরো সুবিন্যস্ত হবে বলে মনে হয়।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত ইংরেজী মাসিক আরাবিয়া (ARABIA) পত্রিকার ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার উপসম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব ফাতহী উসমান "মুহতারাম মওদূদীর জীবনী ও কৃতিত্ব" শিরোনামে একটা প্রামাণ্য তথ্যবহুল ও মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি যদিও মৌলিকভাবে সাইয়েদ মওদূদীর (র) জীবনী ও কর্মতৎপরতার ওপর লিখিত হয়েছিলো, তথাপি বিদগ্ধ লেখক সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদ এবং সাইয়েদ মওদূদী উভয়ের সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী তুলনামূলক আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে সাইয়েদ হাসানুল বান্না শুরুতেই দলীয় শৃংখলা বিধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী বিশেষত গ্রামীণ জনপদকে আন্দোলন সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত করে তোলেন, অথচ তার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে সাইয়েদ মওদূদী লেখনী ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে তার সংস্কার কাজের শুভ সূচনা করেন। দলীয় ভিত্তি রচনার পূর্বে তার আকৃতি প্রকৃতি কাল্পনিক স্বরূপ ও মনস্তাত্বিক রূপরেখা পূর্ণাঙ্গ এবং ভারসাম্যপূর্ণ দলিল প্রমাণ সহ সাধারণ মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেন। সাইয়েদ মওদূদী বিরচিত গ্রন্থ "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" গ্রন্থের নাম এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যা আল্লামা ইকবাল এবং মুহাম্মদ আলী জাওহার এর মত মহান নেতা ও পথনির্দেশকগণের ভূয়সী প্রশংসা ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আদায় করতে

www.amarboi.org

সক্ষম হয়। এ দু'পথপ্রদর্শকই নওজোয়ান মওদূদীর অফুরন্ত সম্ভাবনা ও প্রতিভা লক্ষ্য করে তাকে নীরবে ও সুশৃংখলভাবে কাজ করে যাবার জন্য উৎসাহিত করেন, প্রাচ্যের কবি সম্রাটের ঐকান্তিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাইয়েদ মওদূদী সপরিবারে হিজরত করে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসেন এবং দারুল ইসলাম নামক আদর্শ পল্লীর ভিত্তি স্থপান করেন...........

ফাতহী উসমান একদিকে যেমন ছিলেন একজন প্রখ্যাত কলামিষ্ট, সমালোচক ও আলেমে দ্বীন। তেমনি অন্যদিকে ছিলেন ইখওয়ানের অন্যতম নিবেদিত প্রাণ সদস্য। উপরোল্লেখিত লেখায় আল্লামা মওদূদী সম্পর্কে তার মূল্যায়ণ ও পর্যালোচনায় একথাও উল্লেখ করেন যে, মারহুম উন্নত চিন্তার দিক থেকে স্বতন্ত্র মর্যদার অধিকারী এবং এ কারণে ইখওয়ানের সমস্ত নেতা ও লেখকের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

আল্লামা সাইয়েদ মওদূদীর গ্রন্থাবলী যখন আরবী ভাষায় অনুদিত হয়ে ইখওয়ানী যুবক এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের হাতে পৌছে, তখন তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তারা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর লেখায় অত্যন্ত গভীরতা, প্রভাব ও যুক্তির বলিষ্ঠতা রয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক তথা প্রতিটি দিক ও বিভাগে তার রচিত গ্রন্থারাজি এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যার কোন তুলনা মেলে না..........

জনাব ফাতহী উসমানের এ মূল্যায়ণ যথার্থ যে আল্লাম মওদূদীর পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। বিদগ্ধ পন্ডিত সমাজ তাঁর লেখা পাঠ করে সম্বিত ফিরে পায়। তাঁর সাথে সাথে যদি সমকালীন ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে একমাত্র উস্তাদ মওদূদী ব্যতীত অবশিষ্ট সকল লেখকের (জামায়াত ও ইখওয়ানের লেখকবৃন্দসহ) মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ইখওয়ানের অধিকাংশ লেখক যাদের নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এর চিন্তা এবং লেখায় নতুনত্ব ও মৌলিকত্ব রয়েছে। কিন্তু জামায়াতের লেখকগণের মধ্যে অধিকাংশের ইলমী কাজ উন্নত মান ও মূল্য এবং কল্যাণকারিতাসহ সুবিন্যস্ত তথ্যের মর্যাদা রাখে।

এ বিষয়ে অধিক লেখার অবকাশ নেই। অন্যথায় উদারহণসহ বিভিন্ন লেখকের কাজের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করা যেতে পারতো। আরব ও পশ্চিমা দেশগুলোতে মাষ্টার্স এবং ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য সমকালীন সময়ে বহু মূল্যবান, তথ্যবহুল প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে মুর্শিদে আম তার স্মৃতি চারণ গ্রন্থে এরূপ একটা প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন, আমার মনে হয় মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও এসব বিষয়ে থিসিস লেখার সুযোগ দেয়া উচিত। উপরোল্লেখিত বিষয়টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এর তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধের শিরোনাম হতে পারে।

ইখওয়ানের প্রথম মুর্শিদে আম মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে ১৯৪৯ সালে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন। কিন্তু শাহাদাতের পূর্বে তিনি সমাজ জীবনের

www.amarboi.org

প্রত্যেক স্তরে সংগঠন কায়েম করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে ইখওয়ানের কাজ শুরু থেকেই খুব শক্তিশালী ও সুশৃংখল ছিলো। গ্রামীণ চাষা-ভুষা ও কিষাণ-মজুর ছিলো এ সংগঠনের অগ্রণী বাহিনী। জামায়াত প্রথম থেকেই তার কর্মসূচীর মধ্যে এসব পেশাজীবি ও শ্রমজীবিশ্রেণীর মানুষদের সুশৃংখল করার বলিষ্ঠ সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কার্যক্ষেত্রে এ কাজ অনেক দেরীতে শুরু হয়। ফলে জামায়াত তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি ; ইখওয়ান সংশ্লিষ্ট অংগনে যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলো। কেবলমাত্র ছাত্ররাই এমন একটা শ্রেণী যাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী ছাত্র সংগঠন 'জমিয়তে তালাবা' প্রথম থেকেই তৎপর ছিলো। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্য হাতেগোনা কিছু প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনে কখনো কখনো জামায়াত তার প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করেছে। যেখানে গ্রাম গ্রামান্তরে শতকরা আশিজন লোকের বাস—তারা আজও জামায়াতের দাওয়াত থেকে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বহুদূরে অবস্থান করছে।

সাংবাদিকতার ময়দানে অবশ্য দু'টি সংগঠনই বেশ কিছু কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই ছিলেন একজন উচ্চস্তরের এবং সর্বজন স্বীকৃত সাংবাদিক। তিনি ছাড়াও মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয মারহুম, মিসবাহুল ইসলাম ফারুকী মারহুম, মুহতারাম আবদুল হামিদ সিদ্দিকী,নাঈম সিদ্দিকী, মাহেরুল কাদেরী মারহুম, চৌধুরী গোলাম জিলানী, হাসের ফারুকী, মাহমুদ আহমাদ মাদানী, মুজাফফর বেগ অনেক নওজোয়ান সাংবাদিক সাংবাদিকতার জগতে তাদের আসন করে নিয়েছেন। ইখওয়ানও সাংবাদিকতার ময়দানে অনেক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জনাব উমর তিলমিসানী, হুসাইন আশুর, জনাব সালেহ আল ইসমাদী মারহুম, ফাতহী উসমান, নিশাত আল মিসরী, মুহাম্মাদ সালাহ উদ্দীন (আল মাদীনা), ইসমাঈল শাত্তী, ডক্টর মুহাম্মদ মাওরিদ এবং আরো অগণিত ইখওয়ানী সাংবাদিক এ পেশায় তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি আদায় করেছেন। অনেক বিধিনিষেধ আরোপ সত্ত্বেও বেশ কয়েকটা সংবাদপত্র দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সাংবাদিকতার জগতে দু'টি সংগঠনের লেখকগণই ধর্মনিরপেক্ষ, কমিউনিষ্ট, বেদ্বীন, সুযোগসন্ধানী সরকারের বেতনভোগী সাংবাদিকদের সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন।

উপরে জনাব ফাতহী উসমানের যে প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে তিনি ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ও সাইয়েদ মওদূদীর (র) ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছেন যে, দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বি ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই দ্বীনি এবং আধুনিক জ্ঞানে সুগভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। দ্বীনের সামগ্রিক ধারণা তাদের চিন্তা-চেতনা এবং মতামতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা উভয়েই ইসলামকে দ্বীন ও দুনিয়ার একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ বলে মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে দ্বীন ও সরকার দু'টি ভিন্ন জিনিস ছিল না। বরং একই যন্ত্রের দু'টো অংশ মাত্র

www.amarboi.org

ছিলো। আলেম সমাজ ও রাজনীতিবিদ এই দুই শ্রেণীর জন্যই এ ধারণা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই সরকার এবং মিম্বর ও মিহ্রাব উভয়স্থান থেকেই তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে।

বস্তুত ফাতহী উসমান সাহেবের এই মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ। মিসরে যদিও আলেমদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা ততটা জোরদার হয়নি যতটা দেখা গিয়েছে এ উপমহাদেশে। তথাপি আলেমদের একটা ক্ষুদ্র অংশ ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ফতোয়া দান এবং তাদেরকে "বিভ্রান্ত সংগঠন" বলে মন্তব্য করাকে তাদের জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলো। এখন থাকে জামায়াতে ইসলামী ও এ উপমহাদেশের আলেমদের ব্যাপার। এক্ষেত্রে এই বেদনাদায়ক বাস্তবতা কারো নিকটই অস্পষ্ট নয়। উলামা শ্রেণী প্রথম দিন থেকেই জামায়াত এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসেছিলো। সত্যনিষ্ঠ নগণ্য সংখ্যক আলেম ছাড়া সবাই তাদের সে অনমনীয় আচরণের ওপর এখনো অটল রয়েছে। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিরোধিতা তো কিছুটা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু দ্বীনি আলেমদের এ কর্মনীতি একাধারে দুঃখজনক এবং বিস্ময়কর!

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি ভিন্ন নয়। এ কারণেই ইখওয়ান ও জামায়াত উভয় সংগঠনই যুগপৎ জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগের সংশোধন সংস্কারে সাথে সাথে রাজনৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইখওয়ান কখনো রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের অনুমতিই লাভ করেনি। জামায়াতে ইসলামীও রাজনৈতিক ময়দানে বাহ্যতঃ তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। যদিও সংগোপনে ও একান্তভাবে অর্থাৎ সাংগঠনিকভাবে প্রচুর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, এসেম্বলী এবং কাউন্সিল নির্বাচনী আসনসমূহের অধিকাংশ ক্ষেত্রে জামায়াতের ব্যর্থতা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ রাজনৈতিক ময়দানে শাসনতন্ত্র ও সংবিধান প্রণয়ন ও পরিবর্তনে অনৈসলামিক দৃষিভংগীর মোকাবিলায় প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও জনমত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ প্রেমিক এবং ইসলামপ্রিয় শক্তির সাথে জামায়াতের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ও দেদীপ্যমান। জামায়াতের সুসংগঠিত প্রচেষ্টা এবং এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিরুদ্ধবাদীদের নিকট থেকেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। কোন ব্যতিক্রম ছাড়া দেশে আজ পর্যন্ত কোন আন্দোলনই জামায়াতের অংশগ্রহণ ছাড়া সফলতার মুখ দেখতে পায়নি।

প্রাধানমন্ত্রী ভুট্টোর ফাঁসির পর বেগম নুসরাত ভুট্টো যখন তার প্রতিশোধমূলক রাজনীতিকে সফল করার লক্ষ্যে গণতন্ত্র "পুনর্বহাল আন্দোলন" নামে একটা আন্দোলন পরিচালনা করতে চাইলে দেশের বড় বড় রাজনীতিবিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেন। আন্দোলন পরিচালনার সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিলো তখন নুসরাত ভুট্টো সাহেবাকে এরূপ মন্তব্য করতে হয়েছিলো যেঃ

www.amarboi.org

"যতদিন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী কোন আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ না করে, ততদিন তার সফলতা নিশ্চিত হতে পারে না।"

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা জামায়াতের জন্য এমন একটা সার্টিফিকেট যা একজন প্রবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মরহুম একবার বলেছিলেন যে, এদেশের প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের একটা মূল্য আছে; কারো কম আবার কারো কিছু বেশী। সে মূল্য আদায় করে দিলেই আপনি তাকে পেয়ে যাবেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর লোকদের কোন মূল্য নেই। তাদেরকে না খরিদ করা যায় না দমন করা যায়। প্রায় একই রকম বিবৃতি আইয়ুব খান সাহেবেরই এক ঘনিষ্ঠ সাথী এ, কে, সুমার মরহুমও করাচীতে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীন এম, এন, এ নির্বাচিত হবার পর দিয়েছিলেন।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে জামায়াত কখনো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে বিজয়ী হতে পারেনি। কিন্তু ভুট্টোর মত একনায়ক যিনি ক্ষমতার মসনদ মজবুত হওয়ার ব্যাপারে গর্বিত ছিলো শেষ পর্যন্ত ইছরায় অবস্থানরত দরবেশের নিকট গিয়ে হাজির হতে হয়েছিলো। এটা জামায়াতের শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অনস্বীকার্য প্রমাণ। দেশে যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও স্বাধীন ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকতো, তাহলে জামায়াত দেশের রাজনীতিতে এসেম্বলীতেও এতদিনে একটা শক্তি-হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো। তাছাড়া পাকিস্তান আরো একটা সমস্যার সম্মুখীন আর তা হচ্ছে এখানকার নির্বাচন পদ্ধতি। যদি কখনো ভুলক্রমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছেও তাহলে কারচুপি ও অসৎ পন্থা ছাড়াও তা হয়ে থাকে। বৃটিশ পদ্ধতির নির্বাচন সে বিষয়ে স্বয়ং বৃটেনের রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনমত বর্তমানে সন্তুষ্ট নয়। ভোটার সিন্ধুর ভালুকাময় প্রান্তরে, বেলুচিস্তানের কঙ্করময় উপত্যকায়, পাঞ্জাবের গ্রামে গঞ্জে এবং সীমান্তের বরফাবৃত পর্বত চূড়ায় অর্থাৎ দেশের সর্বত্রই জামায়াতের ভোটার রয়েছে। কিন্তু তারা আছে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে যদি আনুমানিক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে সব ভোট জাতীয় বা প্রাদেশিক পর্যায় একত্র হয়ে নির্বাচনের ফলাফলকেই বদলে দিতে পারতো।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই জামায়াতকে ভয় পায়। এদেশের ক্ষমতার মসনদে কোন ধর্মহীন অথবা মদ্যপায়ী আরোহণ করুক কিংবা বাহ্যত কোন দ্বীনদার নামাযী শাসনকর্তা জেঁকে বসুক সরকারের গোটা মেশিনারী জামায়াতের অগ্রগতিতে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত করে। এটা কতই না বিস্ময়কর যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দেশের চারটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ঘোষণাপত্রে আনুমানিক প্রতিনিধিত্বের দাবী পেশ করা হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত অন্যসব রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের ঘোষণাপত্র থেকে দূরে সরে গিয়েছে। পিপলস পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, তাহরীকে ইস্তিকলাল ও জামায়াতে ইসলামী সকলেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী

www.amarboi.org

করেছিলেন। যদিও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা অন্যান্য পার্টি লাভবান হতে পারতো। কিন্তু বিদ্বেষের কারণে তারা সবারই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে অনীহা দেখা যায়।

রাজনৈতিক ময়দানে ইখওয়ান কখনো স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণের অনুমতি পায়নি। সিরিয়া, মিসর, জর্দান এবং সুদানে এ সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, ইখওয়ানকে যদি জামায়াতের ন্যায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে আরব বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যটাই বদলে যাবে। গত বছর মিসরে যে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির নির্বাচন হয়ে গেলো তার উল্লেখ করেছেন মুর্শিদে আম তিলমিসানী (র) তার স্মৃতিচারণ গ্রন্থে। এ নির্বাচনে ইখওয়ান ছাড়াও দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে অংশ গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। কোন বৈধ রাজনৈতিক দলের সাথে জোট গঠন ও ঐক্যফ্রন্ট করা ব্যতীত ইখওয়ানের কোন গত্যন্তর ছিলো না। অতএব সংগত কারণেই ইখওয়ান "হিজবুল অফদুল জাদীদ"-এর সাথে মোর্চা গঠন করে। প্রায় সাড়ে চারশত আসনের মধ্যে "হিজবুল অফদ" ইখওয়ানকে শুধু আঠারটি আসনে তাদের প্রার্থী মনোনয়নের অনুমতি প্রদান করে। অথচ ইখওয়ানের দাবী ছিলো তাদেরকে অন্তত শতাধিক আসনে প্রার্থী মনোয়নের অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু হিজবুল অফদ তাদের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকে। ফলে ইখওয়ান আঠারটি আসন ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত আসনেই হিজবুল অফদ এর প্রার্থীকে নির্বাচনী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেয়।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পর সকলেই হতবাক হয়ে যায় এবং চোখ কপালে তুলে নেয়। হিজবুল অফদ এবং ক্ষমতাসীনদল ছাড়া অন্যান্য পার্টি হিজবুত তাজাম্মু ও হিজবুল আহরার প্রভৃতির কেউ-ই একটা আসনও লাভ করতে পারেনি। হিজবুল অফদ সর্বমোট আটান্ন আসন পেয়ে যায়। তন্মধ্যে আট চল্লিশ আসনে জয়লাভ করে হিজবুল অফদ এর সদস্যরা। অবশিষ্ট দশ আসন লাভ করে ইখওয়ান। ইখওয়ান আঠারজনের মধ্যে দশজন প্রতিনিধির বিজয়লাভ বড় রকমের সফলতাই বটে। আরো উল্লেখ যে অন্য কয়েকটি আসনেও ইখওয়ানের প্রার্থীগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের চেয়ে অধিক ভোট লাভ করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন পদ্ধতিই এমন ছিল যে, তাদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, প্রত্যেক জেলাকে নির্বাচনী এলাকা ঘোষণা করা হয়েছিলো এবং জেলার সীমানা সরকার তার মর্জিমত করে নিয়েছিলো। এখন মনে করুন একটা নির্বাচনী জেলায় চার কিংবা পাঁচটি আসন রয়েছে। প্রত্যেক পার্টি তাদের চার অথবা পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়ন দান করবে এবং প্রত্যেক প্রার্থী নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত জেলায় তার প্রতিদ্বন্দ্বির মোকাবিলা করবে। কিন্তু ফলাফলের ঘোষণা দেয়ার কথা সামষ্টিক ভোটের আলোকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। মনে করি 'ক' নামক জিলায় রয়েছে চারটি আসন আর এ আসনগুলোতে নিম্নোক্ত প্রতিনিধি ও দলসমূহ অংশ গ্রহণ করছে।

www.amarboi.org

নির্বাচনী জিলা–ক

এলাকা নং–১

ক্ষমতাশীন দল	অফ্দ পার্টি	অন্যান্য পার্টি
১২ হাজার	(অফদী) ৯ হাজার	২ হাজার

এলাকা নং–২

ক্ষমতাশীন	অফ্দ পার্টি	অন্যান্য দল
দল ১৫	(অফ্দী) ১১ হাজার	২ হাজার

এলাকা নং–৩

ক্ষমতাশীন দল	অফ্দ পার্টি	অন্যান্য দল
৯ হাজার	(ইখওয়ানী) ১৪ হাজার	৩ হাজার

এলাকা নং–৪

ক্ষমতাশীন	অফ্দ পার্টি	অন্যান্য দল
দল ২৬ হাজার	(অফ্দী) ১৩ হাজার	১ হজার

উপরোক্ত নকশার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে অফদ পার্টি 'ক' জেলার অধীন চারটি আসনের প্রত্যেকটিতেই তার প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলো। তন্মধ্যে তিন অঞ্চলেই ছিলো অফদ পার্টির প্রার্থী এবং মাত্র একটা এলাকায় ছিলো ('ক' অঞ্চল-৩) ইখওয়ানের প্রার্থী। ইখওয়ানের মনোনীত প্রার্থীগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের উপর সুস্পষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছিলো। কেননা ঐ অঞ্চলে সর্বমোট ছাব্বিশ হাজার ভোট পড়েছিলো। তন্মধ্যে ইখওয়ানের প্রার্থী লাভ করে চৌদ্দ হাজার ভোট, ক্ষমতাশীন দলের প্রার্থী পায় নয় হাজার ভোট আর অন্যান্য দলের প্রার্থীরা পায় মাত্র তিন হাজার ভোট। এরূপ একক ও নিরংকুশ বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও ইখওয়ানের প্রতিনিধিকে বিজয়ী ঘোষণা করা যেতে পারে না। কেনানা তার অপর তিন সাথী তাকে নিয়েই ভরাডুবির শিকার হয়েছে। তাই ভোট গণনা করার সময় চার অঞ্চলের সংগৃহিত ভোটই একত্রিত করা হয় এবং গড় গণণায় যে দলের প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে, তারাই সমস্ত আসনে জিতে যায়। তা ছাড়া যেদল বা জোট শতকরা আট ভাগেরও কম ভোট পায়। তাদের প্রাপ্ত ভোটেও এগিয়ে থাকা দলের অনুকূলে হিসেব করা হয়।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী 'ক' জিলার ভোটার সংখ্যা ও আসনসমূহ চিহ্নিত করার জন্য চার অঞ্চলের ভোট এক পুলে নিয়ে একত্র করা হয়।

	ক্ষমতাশীন দল	অফ্দ পার্টি	অন্যান্য দল
'ক' নির্বাচনী অঞ্চল	১২ হাজার	৯ হাজার	২ হাজার
'খ' ,, ,,	১৫ হাজার	১১ হাজার	২ হাজার
'গ' ,, ,,	৯ হাজার	১৪ হাজার	৩ হাজার
'ঘ' ,, ,,	১৬ হাজার	১৩ হাজার	১ হাজার
নির্বাচনী ফলাফল	৫২ হাজার	৪৭ হাজার	৮ হাজার

www.amarboi.org

এভাবে চার আসনেই সরকারীদল বিজয়ী হয়ে যায়। এদিকে অফদ ও ইখওয়ান সম্মিলিতভাবে যে আটান্ন আসনে বিজয় লাভ করে, তা বিভিন্ন নির্বাচনী জেলায় সামষ্টিক বিজয়ের কারণে হয়। ইখওয়ানের মুর্শিদে আম মুহতারাম উমর তিলমিসানী(র) নির্বাচনোত্তরকালে এক সাক্ষাতকারে এ তথ্য প্রকাশ করেন যে, কিছু সংখ্যক ইখওয়ান অফদ পার্টির এলাকা থেকেও নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে পৌছে গেছে। তিনি অবশ্য তাদের সংখ্যা ও নাম বলতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সরাসরি ইখওয়ানের পরিচয়ে ও তাদের ব্যানারে যেহেতু আমাদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অনুমোদন নেই, তাই আমরা অত্যন্ত সুকৌশলে প্রত্যেক প্লাটফরম ব্যবহার করে পার্লামেন্টে গিয়ে পৌছার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। মিসরীয় পার্লামেন্টে গমনকারী দশজন ইখওয়ানী সদস্যের প্রত্যেকে খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং স্বীয় দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণাতার সাথে সম্পাদনে সদা প্রস্তুত। বিদায়ী পার্লামেন্টেও ইখওয়ানের কোন কোন সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলো। তাদের মধ্যে শাইখ সালাহ্ আবু ইসমাঈলও ছিলেন। তিনি এবারও বিজয়ী দশজন সদস্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন—যারা অফদ পার্টির টিকেটে বিজয় লাভ করেছে। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন লাভের কোন সুযোগ নেই। শাইখ সালাহ্ আবু ইসমাঈলই অফদ পার্টিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন পার্লামেন্টে। যার ফল দাঁড়ায় এই যে, সরকার ইখওয়ান ব্যতীত অন্য সকল দলের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়। যেসব পার্লামেন্ট সদস্য স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন, তাদেরকেও এখতিয়ার দেয়া হয় যে, তারা ইচ্ছা করলে কোন দলের পতাকা তলে সমবেত হতে পারেন। হিযবে অফদ এর প্রধান ফুয়াদ সিরাজ উদ্দীন গিয়ে শাইখ সালাহ্ আবু ইসমাঈলের নিকট আবেদন জানায় যে, তিনি যেন অফদ পার্টির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন যেহেতু ইখওয়ানের ওপর বরাবর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিলো সেহেতু পারস্পরিক পরামর্শক্রমে ইখওয়ান এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে শাইখ সালাহ্ অফদের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

শাইখ সালাহ্ ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী, সামাজিক, বন্ধুপ্রতীম, খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং অনুপম নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন। তার সুন্দর চেহারায় সর্বদা লেগে থাকতো মুচকী হাসির দৃপ্তি। সুদানে তার সাথে আমার সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত বক্তিত্ব, যুক্তি-প্রমাণসহ স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন করা তার বৈশিষ্ট্য। কিছু দিন তিনি পার্লামেন্টে একাকী ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই আরো আটজন সদস্য তার সাথে এসে মিলিত হয়। অফদ এর বর্তমান পার্লামেন্টারীদলের নেতা মমতাজ নাসার ছিলেন এ গ্রুপে এসে শামিল হওয়া সর্বশেষ সদস্য।

শাইখ সালাহ আবু ইসমাঈল মূলত একজন আলেমে দ্বীন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে এবং বিশেষ করে পার্লামেন্টারী বিষয়েও তাঁর রয়েছে সুগভীর পান্ডিত্যপূর্ণ দৃষ্টিভংগী। বিগত পার্লামেন্টে তিনি যেরূপ বিচক্ষণতার সাথে কয়েকটা বিল উত্থাপন

www.amarboi.org

করেছিলেন এবং পার্লামেন্টে আলোচনা পর্যালোচনা চলাকালে অকাট্য যুক্তি ও বাক চাতুর্য দ্বারা তার দৃষ্টিভংগী তুলে ধরেছেন এবং সেগুলো পাশ করিয়ে ছেড়েছেন তা পার্লামেন্টারী ইতিহাসে কোন একক ব্যক্তির মহাকৃতিত্ব হিসেবে উজ্জল ও ভাস্কর হয়ে থাকবে। এটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐ সব আইনে সাক্ষরদানকারী ক্ষমতাসীনদের তাতে স্বাক্ষর দিয়ে ইতিহাসে নিজেদের সুখ্যাতি লিপিবদ্ধ করানোর তাওফীক ও সৌভাগ্য হয় না।

বর্তমানে পার্লামেন্টে এক ভাষণ দানকালে জনাব মুহাম্মদ আল মুরাগী (ইখওয়ানের প্রখ্যাত সদস্য) সরকারের নিকট দাবী জানান যে, ইখওয়ানকে আইনানুগভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং পার্লামেন্টারী গ্রুপ গঠন করার অনুমতি দেয়া হোক। তিনি আরো বলেন, আমি প্রথমেও ইখওয়ানী এবং শেষেও ইখওয়ানী এবং সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য। যা থেকে আমি কখনো কোন অবস্থায়ই উদাসীন থাকতে পারি না।

এ ঘটনার উল্লেখ করে কুয়েতের মাসিক ম্যাগাজিন 'আল মুজতামা' ১৯৮৫ ঈসায়ীর ৮ই জানুয়ারী সংখ্যায় যে জনাব আল মুরাগীর বক্তব্যের জবাবে পার্লামেন্ট বিষয়ক মন্ত্রী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে স্বীকার করেন যে, ইখওয়ান প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক এবং ইসলামের পতাকাবাহী দল। জনসাধারণ এ দলকে খুবই ভালবাসা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। মন্ত্রী তাওফীক আবদুহু ইসমাঈলের এ সাহসিকতাপূর্ণ স্বীকৃতি সমগ্র মিসর এমনকি পুরো মুসলিম জাহানে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে শ্রুত হয়। ইখওয়ানের মুর্শিদে আম জনাব ওমর তিলমিসানী এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বললেন ঃ

সত্য সত্যই, কেউ তা স্বীকার করুক বা নাই করুক। তথাপি ইখওয়ানের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত এমন অকপটে ও দ্বিধাহীন চিত্তে কোন মন্ত্রী প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে নিলো। আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মনে করি যে এটা একটা সঠিক পদক্ষেপ যার ফলাফল ইনশাআল্লাহ দেশ, জাতি এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য খুবই উপকারী ও আনন্দদায়ক হবে।

অতিসম্প্রতি উমর তিলমিসানীর একটি সাক্ষাতকার আরবী প্রকাশিত দৈনিকগুলোতে হয়েছে। মিসরে ইখওয়ানের সমর্থকদের সংখ্যা কত এ বিষয়ের সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি অকপটে তাৎক্ষণিক জবাব দেন যে, "শতকরা নববই ভাগ কিংবা তদপেক্ষা কিছু বেশী"। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ বিস্মিত হয়েও পুনরায় জিজ্ঞেস করে যে, "এর প্রামাণ কি"? তিনি জবাবে বলেন ঃ আজই ইখওয়ানকে আইনগত অধিকার দিয়ে দেখো এবং দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করো। তাহলে প্রমাণ পেয়ে যাবে। যদিও মুর্শিদে আম-এর এ অনুমান বাহ্যতঃ প্রত্যাশা বলেই মনে হয়। তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে সর্বসাধারণের নিকট ইখওয়ান খুবই প্রিয় একটি সংগঠন।

www.amarboi.org

৭১ পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টের ইতিহাসে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য অতি নগণ্য সংখ্যায় জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদে তাদের তৎপরতা সর্বদা গৌরবোজ্জলও প্রমাণিত হয়েছে। ইউনাইটেড পাকিস্তানে মাওলানা আবদুস সোবহান, এ, কে, এম ইউসুফ এবং আব্বাস আলী খান এবং বিভাগোত্তর পাকিস্তানের অধ্যাপক গফুর আহমদ মাহমুদ আযম ফারুকী, ডাক্তার নাজির আহমদ শহীদ এবং সাহেব জাদা শফি উল্লাহ প্রমূখ যোগ্যতম পার্লামেন্টেরীয়ান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রশ্নোত্তর পর থেকে কিংবা বাজেট, পররাষ্ট্র বিষয় অথবা আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা বিধানের বিল পার্লামেন্টে আলোচনার বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করুক –প্রত্যেক ক্ষেত্রে সকল পর্যায়েই হাতেগণা এই পার্লামেন্ট সদস্যগণ তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থান কোন ক্ষেত্রেই—কম নয় বলে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। জনগণের মধ্যে কবে নাগাদ এ উপলব্ধি জাগ্রত হবে যে, এসব লোকই তাদের অধিকারের বিশ্বস্ত সংরক্ষক যাদের কর্মজীবন নিষ্কলুস এবং যাদের যাবতীয় প্রয়াস-প্রচেষ্টা পংকিলতা ও আবিলতা মুক্ত। জামায়াতে ইসলামীরও দায়িত্ব রয়েছে যে, অফিসের সীমানার বাইরে গিয়ে এবং তাদের রিপোর্টের পর্দা ছিন্ন করে বাস্তব ময়দানের চাহিদা ও সময়ের দাবীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে। ইখওয়ান জনগণকে সচেতন করে ও জাগিয়ে তুলে নিজেদের সাথে একাত্ম করে নিয়েছে। জামায়াতকে এ ক্ষেত্রে এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে।

অবশ্য ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামী উভয় সংগঠনই কঠোর পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করেছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, দুনিয়াতে হকের বিজয়ের জন্য যখনই কোন ব্যক্তি বা দল সাহসিকতার সাথে মাথা উঁচু করেছে তখনই তাদেরকে এসব মনযিল অতিক্রম করতে হয়েছে। কুরআন মজীদে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান ও ঈমানের পরীক্ষাকে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে উল্লেখ করেছেন।

মুর্শিদে আম জনাব ওমর তিলমিসানীর এই স্মৃতি কথার স্থানে স্থানে এমন সব ঘটনা বর্ণনা আপনার দৃষ্টিগোচর হবে যা থেকে আপনি সহজেই অনুমান রকতে পারবেন যে বলিষ্ঠ ঈমান ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ইখওয়ানী মুজাহিদগণ তাদের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্দির স্বার্থে সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করার জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে থাকতো। বাতিল তার সমস্ত শক্তি ও নষ্টামী সত্ত্বেও তাদের মজবুত অবস্থানে কোন প্রকার বিচ্যুতি সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রথম মুর্শিদে আমকে তাঁর পূর্ণ যৌবনে মাত্র তিতাল্লিশ বছর বয়সে যেরূপ নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয় সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার ওপর বেশ কয়েকটা বই লেখা হয়েছে। আবদুল কাদের আওদা শহীদ ও তার সংগীদেরকে ১৯৫৪ সালে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। এসব অমূল্য জীবনের অকাল পরিসমাপ্তি শুধুমাত্র নীল উপত্যকারই ক্ষতি হয়নি বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ অদ্যাবধি এ ক্ষতির জন্য তড়পাচ্ছে।

www.amarboi.org

১৯৬৬ সালে পুনবার সমকালীন ফেরাউন চলতি শতাব্দীর মহান ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামের কৃতি সন্তান সাইয়েদ কুতুব ও তার সাথীদেরকে ফাঁসি দেয়। এ ক্ষত কোন দিনও শুকাবে না কিংবা এ ব্যাপক ক্ষতির কোন ক্ষতিপূরণও কোন দিন হবে না। এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিলো সত্যের এ কাফেলাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়া। কিন্তু এ অশুভ উদ্দেশ্য লাভে তাগুতি শক্তি কি আদৌ সফলকাম হয়েছে ? কখখনো না।

জামায়াতে ইসলামীর উপরও বহু পরীক্ষা এসেছে। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতাকে মৃত্যুদন্ড শুনানো হয়েছিল এবং তার ঘনিষ্ঠ সাথীদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। এটা ১৯৫৩ সালের কথা, অর্থাৎ আওদা শহীদের শাহাদাতের এক বছর পূর্বে এবং ইমাম হাসানুল বান্না শাহাদাতের চার বছর পরে। ক্ষমা প্রার্থনার কথা উঠলে সাইয়েদ মওদূদী (র)-এর মুখ থেকে সেই ঐতিহাসিক উক্তি উচ্চারিত হয় যা সোনালী হরফে লেখা হয়ে আছে এবং যার দীপ্তি কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের পথের পথপ্রদর্শনের পথ দেখাতে থাকবে। তিনি বলেছিলেন ঃ "শুনে রাখো-----মৃত্যু এবং জীবনের ফয়সালা এ জমিনের উপর হয় না। বরং আসমানে হয়ে থাকে। যদি আমার মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আর যদি আমার জীবনের সময় এখনো বাকি থেকে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরাই উল্টো ফাঁসিতে ঝুলে যাবে। আমাকে মারতে পারবে না। এরপর থাকে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনের ব্যাপারটি। এরূপ দয়া ভিক্ষা কেবল একটি সত্তার কাছেই করা যেতে পারে যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তোমাদের কাছে আমার জুতার কাঁটাও ক্ষমা চাইবে না---------।"

এ উক্তির প্রতিধ্বনিতে বাতিলের প্রাসাদে ভূমিকম্পের কাঁপন ধরেছিলো এবং উক্তিকারী যে দৃঢ় বিশ্বাস থেকে একথা উচ্চারণ করেছিলেন সেই বিশ্বাসই ছিল তাঁর কর্ম ও পুঁজি। জীবন অবশিষ্ট ছিল। তাই ফাঁসির কুঠরিতে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া এবং ফাঁসির রজ্জু গলায় পরার সময় ক্ষণ নির্ধারিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সত্যের সৈনিক বেঁচে থাকলেন। মৃত্যু পরাভূত হয়েছিল এবং জীবন আশাভরা দৃষ্টিতে মুচকি হেসে ভবিষ্যত পানে তাকাচ্ছিলো।

আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী দ্বারা আক্রমণ করানো হয়। এবারেও লক্ষ্য ছিলো সেই মর্দে দরবেশ যিনি ইতিপূর্বে আল্লাহর হুকুমে মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করেই গুলী বর্ষিত হচ্ছিলো এবং তাঁকে বসে পড়ার পরামর্শও দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর কণ্ঠ আরেকবার গর্জে উঠলো এবং চির অমর হয়ে থাকলো। "যদি আমি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে ?" ১৯৫৩ সনের ঘটনা বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখ থেকে শুনেছিলাম এবং বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম। কিন্তু এ ঘটনা হাজার হাজার মানুষের মতো লেখক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলো এবং ঈমান দীপ্ত কথা নিজ কানে শুনেছিলো। আজও ঐ কথাটির মধুরতা

www.amarboi.org

এবং তার সাথে ঈমানী শক্তি ও উষ্ণতা আমি নিজ কানে শুনেছিলাম এবং হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করেছিলাম।

আল্লাহ্ বখশ শহীদ জীবনের নজরানা পেশ করলেন। এই অমূল্য জীবন হক এর রাস্তায় কুরবানী করার পর আন্দোলনের নেতা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

"আমি এ মোকদ্দমা এমন এক আদালতে দায়ের করেছি যেখানে হক ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা হয়ে থাকে।" কবির ভাষায় ঃ

এ শহীদানের রক্তপণ গীর্জাধিপতিদের নিকট চেতনা!
যে খুনের মর্যাদা ও মূল্য হারাম শরীফ থেকেও পবিত্র !!

সে আদালাতে ফয়সালার দিন তো নির্ধারিত সময়েই আসবে কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আল্লাহ্ এই নশ্বর পৃথিবীতেও শ্রেষ্ঠ এ ঘটনার নায়কদের যে ভয়বহ্ পরিণতির সম্মুখীন করেছিল তা সত্যিই শিক্ষণীয়।

কারা জীবনের দুঃখকষ্ট জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা এবং মজলিশে শূরার সকল সদস্যকে বার বার ভোগ করতে হয়েছে। তথাপি বাতিলের সম্মুখে তারা কখনো মাথানত করেনি বা নতজানু হয়নি। সন্ত্রাস ও ভয়-ভীতি দ্বারা সত্যানুরাগীদের হত্যোদম ও ভগ্নোৎসাহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রলোভনের ইন্দ্রজাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাজপাখীকে কোন মূল্যেই ফাঁদে ফেলা যায়নি।

মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই বিশ্বস্তদের অবিশ্বাসী ও নীতিহীন লোকদের সম্মুখে নত করানো যায়নি। ভুট্টো ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার পর দেশবাসী তার নিকট থেকে জঘন্য একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসন উপহার পেয়েছে। প্রথমে দেশকে টুকরো টুকরো করা হলো। তারপর দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের নাম ও নিশানা মুছে ফেলার ঘৃণ্যতম পরিকল্পিত চক্রান্ত করা হলো। মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে গ্রেফতার করার পর জিন্দানখানায় তার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করা হয় যা সকল যুগের বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অথচ তিনি ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যার স্বভাবজাত সৌজন্য ও আভিজাত্য তার কট্টর বিরোধীরাও অকপটে স্বীকার করে থাকে। তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গুন্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে একান্ত নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মারা হয়। তিনি দিনরাত তাদের অশ্রাব্য গালি গালাজের শিকার হতে থাকেন। তথাপি তাঁর অবিচল পায়ে না একটু কম্পন সৃষ্টি হয়েছে না তার আন্দোলনের সাথীদের উৎসাহ উদ্দীপনায় কোন প্রকার ভাটা পড়েছে।

ডাক্তার নাযীর আহ্মদ এবং অন্যান্য অগণিত অকুতোভয় নেতা ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীদেরকে পিপলস পার্টির গুন্ডা এবং এফ, এইচ, এফ-এর হায়েনারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। তা সত্ত্বেও কাফেলার অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি। এসব ঘটনাপ্রবাহ এখন ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্র এসব কাহিনী সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল রয়েছে।

www.amarboi.org

জামায়াতের উপর যেসব কঠোর পরীক্ষা আপতিত হয়েছে তা ছিল জামায়াতের ধৈর্যের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য। কিন্তু ইখওয়ানের ওপর অত্যাচার উৎপীড়নের কোন তুলনাই মেলে না। বছরের পর বছর এ মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ যে পরিমাণ জুলুমের চাকায় পিষ্ট হয়েছেন কলম তা লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম। তথাপি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পানে আগুয়ান এ কাফেলা আজও তার মনজিলে মাকসুদ অভিমুখে নিরন্তর ধাবমান রয়েছে। এটা তাদের বলিষ্ঠ ঈমান ও জিহাদী উদ্দীপনার অনস্বীকার্য প্রমাণ। বস্তুত বর্তমান শতাব্দীতে পরিচালিত দুনিয়ার কোন আন্দোলনের উপর এমন দুঃসহ বিপদ মুসিবত আসেনি যা এসেছে ইখওয়ানের ওপর। এ বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দ প্রচুর লিখেছেন যা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে সত্যানুসন্ধানীদের ঈমানের উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত রয়েছে। মুর্শিদে আম-এর এ স্মৃতিচারণ গ্রন্থে উল্লেখিত কিছু সংখ্যক ঘটনা পড়লে শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায় এবং মনের মণিকোঠা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে এরূপ দৃঢ়চিত্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য দোয়া বেরিয়ে আসে।

মুর্শিদে আম তিলমিসানী (আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবি করুন) তার এ গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী ছাড়াও সম্প্রতি অপর এক সাক্ষাতকারে আরো কিছু হৃদয় বিদারক ও লোমহর্ষক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। "আল অতানুল আরাবী" পত্রিকায় প্রকাশিত এ সাক্ষাতকার থেকে একটা ঘটনা "আল মুজতামা" সাময়িকী তার ১৯৮৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ মিসরের নিবেদিত প্রাণ মুসলিম নওজোয়ানদের সম্পর্কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে মুর্শিদে আম তার জবাবে বলেন ঃ

তোমরা এ মানবতা বিধ্বংসী অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতি কেন শুধু অসহায়ের মত দৃষ্টিপাত করতে চাও, যা এ যুবকদের ওপর মিসরীয় কয়েদখানায় চলছে। মিসরের জেলখানায় বন্দী ইসলামী চিন্তাধারার অধিকারী যুবকদেরকে এমন পাশবিকতার লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে যা কল্পনাতীত। এরূপ অস্বাভাবিক ও অমানবিক আচরণের যথোপযুক্ত জবাব স্বরূপ যদি এ যুবকগণও রুঢ় আচরণ করতে উদ্যত হতো, তাহলে সে জন্য রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো এমন হৈ চৈ আরম্ভ করে দিতো যা থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের নিরাপদ রাখুন।

মিসরের জেলখানায় ১৯৫৪ এবং ১৯৬৫ সালে আমাদের সাথে নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। তা অভিশপ্ত ইবলিশের চিন্তায়ও হয়তো কখনো স্থান পায়নি। আমি তোমাদেরকে কেবলমাত্র একটা কথাই বলে দিতে চাই যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো যে, এ পৃথিবীর বুকে ও যবনিকার অন্তরালে কত দুঃখজনক ঘটনা সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে। "কারাগারের অভ্যন্তরে একবার আমার কুঠুরীর সম্মুখে আমারই এক সহোদরাকে এনে হাজির করা হয়। আমি কুঠুরীর ভেতর বন্দী ছিলাম এবং আমার পায়ে বেড়ি পরানো ছিল। জেল কর্মকর্তাদের সমাবেশের সামনে আমার ভগ্নিকে মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ঠ শিশুর মত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে ফেলা হয়। এ দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছিলো আমার কুঠুরীর ঠিক সামনে------।"

www.amarboi.org

পাকিস্তানে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের ধমকই দিয়ে আসছে কিংবা পত্র-পত্রিকায় ও মঞ্চে ময়দানে ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারীনী দ্বীনি ভগ্নিগণের পবিত্র চরিত্রের ওপর অপবাদ ও কলঙ্ক লেপনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এমন কি মিসর ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে এসব পৈচাশিক ও বর্বরোচিত আচরণ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

ইখওয়ানের পরীক্ষা ছিল জামায়াতের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন ও হৃদয় বিদারক। কিন্তু ইসলামের এসব কৃতি সন্তানের প্রশংসা করতে হয়। কারণ, তাদের সংকল্প ও বলিষ্ঠতায় কখনো কোন দুর্বলতা স্থান পায়নি। এমন লোকেরাই নবী রাসূলদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং এরাই উজ্জ্বল দ্বীপশিখা। আমার অন্তর সর্বদা তাদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় সিক্ত হয়ে থাকে। কবি বলেছেন ঃ

থেকে যাবে তুমিই পৃথিবীতে অনন্য ও অদ্বিতীয় হয়ে !
কারণ তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে লা'শারীকা লাহ্ !!

জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানের সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও অনুপম। দু'টি সংগঠনই তার কর্মীদেরকে এ শিক্ষা প্রদান করে থাকে যে সর্বপ্রথম নিজের ওপর কুরআন ও সুন্নাহকে কার্যকরী করবে এবং তারপর আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টা সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে। ইসলামী আহকামের দৃষ্টিতে আমীরের আনুগত্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালবাসা এ আন্দোলনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। যদিও এ সংগঠন থেকেও কোন কোন ব্যক্তি সময় বিশেষ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, কেউ একবার বুঝে শুনে তাদের সাথে গিয়ে শামিল হলে তারপর সারা জীবন এর সাথে একাত্ম থেকেই জীবন অতিবাহিত করে দেয়।

আশ্চার্যজনক কিছু করা এসব আন্দোলনের নীতি নয়। নীতি নৈতিকতা ও আইন কানুনের চৌহর্দ্দিতে থেকে লক্ষ অর্জনে ব্রতী হওয়াই এ দু'টি আন্দোলনের মৌলিক গুণ। শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ এবং দাওয়াত ও তাবলীগ ইত্যাদি এমন সব বৈশিষ্ট্য যার মোকাবেলা অন্য কোন দল করতে পারে না। মুর্শিদে আম তার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। জামায়াতের সাহিত্যও এ চিন্তাধারাকে তার কর্মী ও সদস্যদের মনে খুব বলিষ্ঠভাবে বদ্ধমুল করে দেয়।

নিয়মিত বৈঠক এবং প্রতিটা বিষয় সংগঠিত আন্দোলন ও চেষ্টা সাধনা এ আন্দোলনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। প্রতি মংগলবারে ইখওয়ানের দারসে কুরআনের আলোচনা এ স্মৃতিকথার মধ্যে বড়ই ঈমান প্রবৃদ্ধিকারী। জামায়াতেরও সাপ্তাহিক বৈঠক এবং দারসে কুরআন ও হাদীসের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর যাতে কখনো কোন অচলবস্থার সৃষ্টি হয় না।

সৌভাগ্য বশত ইখওয়ানের বর্তমান মুর্শিদে আম জনাব উমর তিলমিসানী এবং জামায়াতের বর্তমান আমীর জনাব মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ এর অনেক কথা ও কাজে

www.amarboi.org

পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই পেশাগত দিক থেকে আইনজীবি। দু'জনই বাল্যকাল থেকেই দ্বীনের প্রতি অনুরাগী এবং সকল প্রকার অন্যায় অপকর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী ছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত সভ্রান্ত এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং ত্যাগ, ক্ষমা ও মহত্বের মূর্ত প্রতীক। শুরুতে উভয়েই যখন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তখন পাশ্চাত্য পোশাক ও তাহযীব তামাদ্দুনে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু আন্দোলনে শামিল হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে বদলে যান। উস্তাদ ওমর কিছু দিন ওকালতির পেশা অব্যাহত রাখেন কিন্তু মিয়া সাহেব জামায়াতে যোগদানের পর পরই এ পেশা ত্যাগ করেন। উস্তাদ ওমরকে বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। একইভাবে মিয়া সাহেবের সম্মুখেও এ লোভনীয় পদ অলঙ্কৃত করার অনুরোধ আসে। কিন্তু উভয় নেতাই এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃতী জ্ঞাপন করেন।

মুহতারাম ওমর তিলমিসানীও ছিলেন একটা কৃষক অথবা জমিদার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত আর মিয়া সাহেবের আগমন অনুরূপ পারিবারিক পরিবেশ থেকেই। কোমল হৃদবৃত্তি ও উদার মানসিকাতায় দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বই সিক্ত। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়াতের সীমানা মেনে চলা এবং দ্বীনের অনুসরণে তারা কখনো কোন প্রকার আপোষ করেননি। কিংবা নমনীয়তা দেখাননি। উভয়েই কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং অবিচলভাবে সর্বদা জীবনের লক্ষ অর্জনে অগ্রসর হয়েছেন।

জনাব উমর তিলমিসানী ইখওয়ানে যোগদানের কিছুদিন পর থেকেই দ্বিতীয় মুর্শিদে আম মুহতারাম হাসান আল হুদাইবি মারহুম এর প্রতি তার অত্যন্ত ভালবাসা ও ভক্তি গড়ে ওঠে। আবার তিনিও তাকে অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা দানে ধন্য করতে থাকেন। একইভাবে মিয়া সাহেবও জামায়াতে যোগদানের পর অল্প সময়ের ব্যবধানেই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হন এবং আজীবন আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর সাথে থেকে প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর হিদায়াত ও দিকনির্দেশনা লাভ করতে থাকেন। দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে নীরবচ্ছিন্ন বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্যতা ও ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। এর ঈমান প্রবৃদ্ধিকর দৃশ্য গ্রন্থকার বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। মিয়া সাহেব কখনো জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ৫/এ যিলদার পার্কে পৌছতেন কিংবা কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন মুর্শিদ মওদূদী (র) বড়ই দরদী মন ও হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার আবেগে তাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরতেন। দর্শকমন্ডলী এ দৃশ্য অবলোকন ও প্রত্যক্ষ করে মিয়া সাহেবের সৌভাগ্যের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতো।

উস্তাদ ওমর তিলমিসানী সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদের সাথে তার স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সফরসমূহের বিবরণ তুলে ধরেছেন তার স্মৃতিচারণে। কয়েক জায়গায় মুর্শিদে আম-এর স্নেহ বাৎসল্য ও ভালবাসার জীবন্ত চিত্র অংকন করেছেন। এখানে উভয় সংগঠনের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক

www.amarboi.org

মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছি। বস্তুত এ আন্দোলনের রূপায়ণে, সংগঠনে, সম্প্রসারণে এবং ব্যাপ্তিত ও বিস্তৃতি প্রদানে তাঁদের ঘাম-রক্ত জারক রস হিসেবে কাজ করেছে।

এ সকল আবেদন নিবেদনের পরিসমাপ্তি টানতে গিয়ে আমি আরজ করতে চাই যে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশ ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলনের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমাদের সকল অক্ষমতা ও দুর্বলতার উপর তার রহমতের পর্দা অবারিত করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা কিছুতেই এমন যোগ্যতার অধিকারী ছিলাম না। এমন দুর্বহ বোঝা বইতে পারি যা আমাদের ইখওয়ানী ভাইগণ ইতিমধ্যেই বহন করেছেন এবং দৃঢ়পদে টিকে রয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের কথা বাদ দিলে আমরা সকলেই সামষ্টিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। তথাপি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি জামায়াতের একজন অযোগ্য সদস্য ও সাধারণ কর্মীরূপে নিসঙ্কোচে বলতে পারি যে, আমাদের মুর্শিদ মওদূদী এবং তার নিকটতম সাথী সংগীগণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের পাহাড় ছিলেন। কোন বাতিল শক্তিই তাদেরকে তাদের অনুসৃত নীতি থেকে চুল পরিমাণও হটাতে পারতো না। ইখওয়ান সম্পর্কে ইতিহাস এ সাক্ষ্য নীরব সাক্ষী প্রদান করে যে ঃ

"এ ঘরের সবটুকুই উজ্জল আলোর দীপ্তিতে ভরপুর হয়ে রয়েছে।"এসব লোক সব পরীক্ষায়ই সাফল্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়াতে সুনাম সুখ্যাতি দান করেছেন এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনেও আম্বিয়া, সিদ্দিকীন এবং শুহাদাগণের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমরা সাহসহীনেরাও তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের মধ্যে শামিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও তাদের সাথে পরিণতি দান করুন।

"আমি তো সালেহীনদের ভালবাসি যদিও আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকেও সালাহ এবং সফলতা প্রদান করেন।" আমি মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে প্রতিটি পরীক্ষায় নিরাপদ রাখেন। আর যদি কখনো কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তাতে যেন তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের সাহায্যে দৃঢ়তা দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন।

জামায়াত ও ইখওয়ান মূলতঃ একই আত্মার দু'টো দেহবিশেষ। আমাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা বটে কিন্তু আমাদের মানযিলে মাকসুদ প্রথম দিন থেকেই এক ও অভিন্ন। ইসলামকে সুমন্নত করে তুলে ধরা আমাদের মূল লক্ষ্য। আর আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাতিল সর্বদাই আমাদের ওপর রুষ্ট। ইসলামের কোন কোন পতাকাবাহীও আমাদের প্রতি যুদ্ধাংদেহী মনোভাব পোষণ করে থাকেন। আমরা সকল বিষয়ে সঠিক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার উপর সোপর্দ করে দিয়েছি। মুর্শিদে আম তার স্মৃতিকথায়

www.amarboi.org

বারবার এ সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমরা সর্বদা আমাদের ঐ সকল ইসলাম প্রিয় ভাইদের সমীপে—যারা আমাদের উপর বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ আরোপ করে নিজেদেরকে ইসলামের খাঁটি অনুসারী প্রমাণ করতে চান—সর্বদা এ আরজই করতে থাকবো। কবির ভাষায় ঃ

"জগতে তো কোন দেয়ালে গিয়ে আঘাত করিনি!
যাতে করে প্রমাণিত হতে পারে যে তুমি প্রস্তর খন্ড না কাঁচের টুকরো !!

আল্লাহ্ তাআলা তোমার যুবকদের নিরাপদে রাখুন এবং তাদের আত্মঘাতি ও আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিভংগী দ্বারা ধন্য করুন !! আমীন !!!

এম, আমীর হোসাইন আল মাদানী
মদীনা মুনাওয়ারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
আল সুবাই হল, সউদী আরব।
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ সালে।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

আমার পরিচয়

আমি একজন মুসলমান এবং মিসরের নাগরিক জীবনের আশিটি বসন্ত অতিক্রম করতে যাচ্ছি। ১৯০৪ সালে ৪ঠা নভেম্বর কায়রোর গৌরিয়া অঞ্চলের খোশ কদম নামক পল্লীতে আমার জন্ম। এটা একটা প্রাচীন মহল্লা। প্রাচীনতার প্রতিটি সংজ্ঞাই এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পুরাতন ধাঁচের দালান কোঠা, রাস্তাঘাট ও অলি গলিও চাপা ও অন্ধকার। কামরাগুলো খুবই প্রশস্ত ও খোলামেলা কিন্তু নীরব ও কোলাহল মুক্ত। গোসলখানায় ব্যবহার্য পানি বাইরে থেকেই গরম করে নিতে হতো। সেকালের ওয়াটার হিটারগুলো বর্তমান কালের বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটার সমূহের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ ছিল। হাম্মামের বাইরে ছোট একটা কামরা থাকতো যাতে গোসল সমাপনকারী ফ্লাটে যাওয়ার অব্যাহত পূর্বে সেখানে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারে। ঘরগুলোর প্রশস্ততার অনুমান এ থেকে করে নেয়া যেতে পারে, একটা ফ্লাট কমপক্ষে আটশত বর্গমিটার আয়াতন সম্পন্ন হতো। গৃহের আঙিনা ও ছাদসহ প্রায় আটটি হাম্মাম ও টয়লেট থাকতো। কোন কোনটিতে মর্মর পাথরের টালি লাগিয়ে তার শোভা বর্ধন করা হতো আবার কোনগুলোতে সিমেন্টের সাধারণ তৈরী টালি লাগিয়ে নেয়া হতো।

শহর থেকে গ্রাম

এরূপ গৃহেই আমার জীবনের প্রথম তিন বছর অতিক্রান্ত হয়। তারপর আমাদের পরিবার অর্থাৎ আমার পিতা, পিতামহ এবং পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্য এই বাড়ী পরিত্যাগ করে খামারে চলে যায়। শাবীনুল কানাতির কেন্দ্রের নাওয়া নামক গ্রামে ছিল এই খামারের অবস্থান। বর্তমান কালিউবিয়া প্রদেশের তৎকালীন নাম ছিল কমিশনারী। এই গ্রাম ছিল এরই অর্ন্তগত। কায়রো থেকে এই পল্লির দূরত্ব ছিল বাইশ কিলোমিটার। এই গ্রামেই ছিল রেলওয়ে ষ্টেশন, যেখানে গাড়ীগুলো এসে থামতো। তখনকার দিনে তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণী পযর্ন্ত সকল বগীতেই পরিষ্কার পরিচ্ছনতা ও আরাম আয়েশের বেশ ব্যবস্থা ছিল।

মাত্র চার বছর বয়স থেকেই আমি আমার পারিপার্শ্বিকতাকে গভীর উপলব্ধিসহ দেখতে শুরু করেছিলাম। যে ঘরে আমরা থাকতাম লোকজন সেটাকে 'প্রাসাদ' বলে অভিহিত করতো। আমার দাদা মরহুম এই মহলের দু'টি ফ্লাটে তার দুই স্ত্রীর সাথে বসবাস করতেন। আমার মরহুম পিতাও তার দুই স্ত্রীর সাথে অপর ফ্লাটে থাকতেন। আমার মাতা ও বিমাতার ফ্লাট ছিল সামনাসামনি। আমার চাচা তার একমাত্র স্ত্রীর সাথে একটা ফ্লাটে অবস্থান করতেন। তিনি তখনো পযর্ন্ত আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর ছিলেন না।

www.amarboi.org

জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা

এই বিরাট মহলে ছিল মাত্র তিনজন চাকর ও চারজন চাকরানী। চাকরানী হাসিবা, বাবলা, সাঈদা ও বাখতিয়া এবং চাকর সারওয়ার, রায়হান ও তাহসীন। তারা সকলেই ঘরের কাজকর্মে থাকতো সদা ব্যস্ত। মহলের মধ্যে মস্তবড় লংগরখানা ছিল। যেখানে বাবুর্চি ও খানসামারা খানা পাকানো ও খাওয়ানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতো। মহলের মধ্যেই ঘোড়ার গাড়ী থাকতো যা চালাতো কোচম্যান, তাতে মাত্র একটা ঘোড়াই জুড়ে দেয়া হতো। মহলের পশ্চাৎদিক ঘেঁসে ছিল গবাদি পশুর আস্তাবল। যেখানে থাকতো বলদ, গাভী, মহিষ, উট, গাধা প্রভৃতি। একজন রাখাল ও তার একজন সহযোগী এসব গবাদি পশুর দেখাশুনা করতো।

মহলটি ছিল পাঁচ একরের সুসজ্জিত বাগান পরিবেষ্টিত। উহাতে ছিল মালটা, সিংতারা, আম, আঙ্গুর, বিভিন্ন প্রকার খেজুর, রাসবেরী, কলা, আপেল, নাশপাতি, লেবু, কমলালেবু, খুবানী, আলুচা মোদ্দাকথা তখনকার দিনের পরিচিত সব জাতের ফল। বাগানটি প্রায় সত্তর বছর ব্যাপী এই সকল ফলগাছ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

অন্দর মহলে ছিল ফুলের টবের সমাহার। সেগুলোতে শোভা পেতো গোলাপ, সুসেন, একফুল ও দু'ফুল বিশিষ্ট চামেলি, লবঙ্গফুল, আতর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ফুল। একজন মালি এসব ফুলের বাগান দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল।

পিতামহের জায়গীরসমূহ ও তার শাহী মেজাজ

দাদা মরহুমের জমিদারী ছিল তিন শত একর ভূ-সম্পত্তি ও কয়েকটি বাড়ী নিয়ে। তন্মধ্যে নাওয়া নামক গ্রামে ছিল একশ' আশি একর এবং আল মুজাযির শারকিয়ায় ছিল একশ' বিশ একর। কায়রোর বিভিন্ন মহল্লায় ছিল সাতটি বাড়ী। দাদা মরহুমের নাম ছিল আবদুল কাদের পাশা আত তিলমেসানী। তার মেজাজ ছিল সম্পূর্ণ শাহী প্রকৃতির। তিনি মুখে যা উচ্চারণ করতেন তা পুরো হওয়া ছিল জরুরী। অন্যথা হলে ক্রোধে তিনি ফেটে পড়তেন। ফল দাঁড়াতো বেত্রাঘাত ও প্রচন্ড মারপিট।

সুলতান আবদুল হামীদ দাদা মরহুমকে পাশা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দাদা মরহুমের একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল যে, হজ্জের পর ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভাবগ্রস্ত ও সহায় সম্বলহীন হাজীদেরকে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সফরের ব্যবস্থা করে দিতেন এবং যাবতীয় খরচ তিনি নিজে বহন করতেন। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, মরহুম ছিলেন খুবই দাতা ও দয়াদ্র হৃদয়। নাওয়া পল্লিতে প্রতি সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ শনিবারে বড় বাজার বসতো। সে দিন দাদা মরহুম বাজার থেকে গোশত ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে আনতেন এবং নৈশ ভোজে ফার্মের সমস্ত কিষাণ মজুরকে আমন্ত্রণ জানাতেন। তারা সবাই উদর পূর্তি করে খেতো। তিনি নিজেও গিয়ে ঐ সব কৃষকদের মাঝে বসে পড়তেন। তাদের সাথে খোশ গল্প জুড়ে দিতেন এবং সাথে সাথে খাদ্যও খেতে থাকতেন।

www.amarboi.org

পূর্ব পুরুষের জন্মভূমি আলজিরিয়া

একথা বলতে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা মূলতঃ আলজিরিয়ার তিলমেসান এলাকার অধিবাসী ছিলেন। এবং ঐ এলাকার নামানুসারে আজ পযর্ন্ত আমাদের বংশ পরিচয় তিলমেসানী বলে পরিচিত। ফরাসীরা আলজিরিয়া অধিকার করলে একমাত্র তিলমেসানই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মোকবিলা করে। সর্বশেষে তিলমেসানের পতন ঘটে। তিলমেসানের অধিবাসীগণ যে বীরত্ব ও সাহসের সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির মোকাবেলা করে আজও পর্যন্ত ফরাসীরা তা স্বীকার করে থাকে। প্যারিসের লুভার যাদুঘরে একটা বিশেষ উইং রয়েছে যাতে তিলমেসানের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য স্মরণীয় দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষিত রয়েছে। এসব অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ঐ সকল সিংহ হৃদয় মুসলমানগণ শেষ অবধি দুশমনদের মোকাবেলা করেছিল।

যে বছর তিলমেসান ফ্রান্সের অধিকারে চলে যায়। সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৩০ সালে আমার প্রপিতামহ স্বীয় পরিবার পরিজন সহ আলজিরিয়া থেকে হিজরত করে মিসরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি খাদ্য শস্য ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। মিসর, খার্তুম ও সিংগাপুরের মধ্যে তার কারবার পরিচালিত হতো। প্রপিতামহের ইনতিকালের পর যখন আমার পিতামহ কারবারের গুরুদায়িত্ব তার কাধে তুলে নেন তখন তিনি ব্যবসা ত্যাগ করে তার দু'টো জায়গীর এবং কায়রোর সাতটি বাড়ীর আমদানীর ওপর পরিতুষ্ট থাকেন। যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবের সাথে সম্পর্ক

দাদা মরহুম ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব (র)-এর ভক্ত অনুসারীদের একজন। এই আন্দোলনের কয়েকখানা বই তিনি তাঁর নিজস্ব খরচে ছাপার ব্যবস্থা করে দেন। মুদ্রিত এসব গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি অদ্যাবধি সউদি আরবের লাইব্রেরীগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। দাদা নিজেও ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম, তিনি সর্বদা মাথায় পাগড়ী পরিধান করতেন। তার বন্ধু-বান্ধবদের সকলেই আল-আজহারের বড় বড় আলেম ছিলেন। মরহুম শাইখ ইমামুস সাক্কা ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি এসব স্বনাম ধন্য ওলামায়ে কেরামকে প্রায়ই দাওয়াত করে নিয়ে আসতেন যাতে শহরের ব্যস্ত জীবন থেকে এক আধদিনের জন্য সময় বের করে তাদেরকে তাঁর শান্তিময় কোলাহল মুক্ত ফার্মে সাদামাটা গ্রাম্য পরিবেশের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। যে রেলগাড়িতে এই আলেমগণের কায়রো থেকে মুযলিকান রেলওয়ে ষ্টেশনে এসে পৌছার কথা থাকতো তা ষ্টেশনে এসে পৌছার পূর্বেই দাদা মরহুম সম্মানিত মেহমানগণকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত হতেন। দাদা ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং খোশ মেজাজের মানুষ। যখন সকল বন্ধুই (উলামায়ে আযহার) গাড়ী থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তখন দাদা মরহুম আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠতেন, "মাশাআল্লাহ তোমরা সকলেই দেখি তোমাদের

www.amarboi.org

পরিবার পরিজনের সকলকেই সাথে নিয়ে তাশরীফ এনেছো। এভাবে পরিজনদের সাথে আনতে কেউই কখনো অপারগতা প্রকাশ করতেন না।" আবার কখনো বা অন্তত দু'এক জন অক্ষমতা প্রকাশ করে বসতো। সাথে সাথে গোটা পরিবেশ যেন হাসি তামাশায় সুগন্ধি জাফরানের ক্ষেতে পরিণত হতো। এবং প্রত্যেকেই উল্লাসে ফেটে পড়তেন।

যখন তাঁদের সাথে নিয়ে গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হতেন এবং চলার পথে খামারের কোন হাঁস, মুরগী অথবা মোরগ দৃষ্টি গোচর হলে চীৎকার করে বলে উঠতো ঃ "আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করো। নিজেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।" স্বাগতম জানানোর পালা শেষ হলে ইল্‌মী আলোচনা শুরু হতো। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে আলোচনা অব্যাহত থাকতো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামতের উপর অটল থাকতো এবং আপনাপন অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে থাকতো। কখনো কখনো জনসাধারণ এ দৃশ্য দেখে মনে করতো যে, এক্ষুণী বুঝি হাতাহাতি শুরু হয়ে যাবে। দুপুরের খানার সময় হওয়ামাত্র পরিবেশ আবার পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতো। যুক্তি-প্রমাণের ছড়াছড়িতে ভাটা পড়তো এবং হালকা হাসি তামাশা ও চটুলতার পরিবেশ ফিরে আসতো। মনে হতো যেন এখানে কোন বির্তকের মাহফিলই জমেনি। এসব মাহফিলে এ জাতীয় মজলিশের প্রভাবে দ্বীনি ইলমের প্রতি আমার অনুরাগ অনেক বেড়ে যায় এবং এমন সব বিষয়ে আমার জ্ঞান লাভ হয় যে সম্পর্কে আমার সমবয়সী বালকরা থাকতো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি আমার বড় দু'সহোদরও এসব ইলমী কথাবার্তার ব্যাপারে ছিল একেবারেই উদাসীন। অবশ্য এটা ছিল আমার কিশোর বয়সের কথা।

শিক্ষা জীবনের সূচনা

যখন আমি গ্রামের বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করি তখন ঐ বিদ্যালয়ে গ্রামেরই দু'জন আলেম মরহুম শাইখ আবদুল আযীয আল-কালমাভী এবং মরহুম শাইখ আহমদ আল-রিফায়ী-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করি। বিদ্যালয়ের নাম ছিল "মাদ্রাসা সাইয়েদী আলী।"

আমি কুরআন মজীদ হেফয করার জন্য নিয়মিত পরিশ্রম করতে লাগলাম। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের প্রতি আমার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে দ্বীনি ইলমের প্রতি আমি গ্রামেই বেড়ে উঠেছি এবং গ্রামীণ পরিবেশ ও কৃষক মজুরদের সাদামাঠা জীবনকে আমি অতিমাত্রায় ভালবাসতাম। একবার আমি নদীর পানিতে গোসল করি এবং সে কারণে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। ফলে আমাকে খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তার নিদারুণ কষ্ট আজ পর্যন্তও আমি অনুভব করি। আমি নদীতে সাতার কাটতাম। যদিও বর্তমানে সাতারের নিয়ম কানুন ও রহস্য ভুলে গিয়েছি। গম কাটার মওসুমে আমি ষাড়গুলোর পশ্চাতে আটি বাঁধা বোঝার ওপর বসে যেতাম। গমের স্তুপ এবং তার তীক্ষ্ণ শীষের ওপরও কখনো কখনো শুয়ে পড়তাম। কখনো

www.amarboi.org

আবার ঘোড়ার নাংগা পিঠে উঠে বসতাম এবং খামারের পার্শ্ববর্তী বালুকাময় জমিনের ওপর তার লাগাম ঢিলা করে দিয়ে খুব দৌড়াতাম।

কল্পনার জগতে বিচরণ

গ্রামের প্রতিটি জিনিসের সাথে ছিল আমার নিবিড় সম্পর্ক। গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, সহজ-সরল জীবন ধারা, রাতের নিঃসংগ জীবনে আমি আপন মনে আমার কল্পনার সাগরে সাতার কেটে বেড়াতাম। এই পরিবেশের প্রতি কেন আমার এত গাঢ় অনুরাগ ছিল এবং এর শুরু ও শেষ কোথায় তা আমার জানা ছিল না। এর প্রতি আমার এত অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা কেন ছিল ? সেই অজানা জিনিস কি ছিল যার প্রেমের ডোরে আমি বাঁধা পড়েছিলাম। এমন স্বাধীন চিন্তাধারা যার কোন কূল কিনারা ছিল না— কেন ছিল ? ছিলই বা কিভাবে ? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তরই আমার জানা ছিল না। তা সত্ত্বেও ঐ মুহূর্তগুলো খুবই আনন্দের অত্যন্ত উপভোগের। আমি কার প্রেমিক ছিলাম এবং কেন ? তা আমি কখনো জানতে পারিনি। আমি কি কোন কল্পনা প্রবণ লোক ছিলাম ? আমার মধ্যে কি কোন কুসংস্কার দানা বেঁধেছিলো ? আমার মধ্যে কি কোন মানসিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছিলো ? প্রকৃতপক্ষে আমি কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারতাম না। সেই সময় আমার মনে হতো পর-পাখা ছাড়াই আমি মাহাশূন্যের গভীরে উড়ে বেড়াতে পারি। কোন লক্ষ্য স্থির না করেই আমি উড়ে বেড়াই এরূপ আকাংখাই দুর্দমনীয়ভাবে আমাকে তাড়া করে ফিরতো।

আমি উড্ডয়নের ঐকান্তিক আকাংখা পোষণ করতাম। আমার কল্পনার পাখা আমাকে উড়িয়ে কোথায় নিয়ে যাবে ? আমার মনজিল কোথায় ? ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কতদূর উড়ে যাবো ? আমার মনের কোণে এসব প্রশ্ন কখনো উঁকি মারতো না। আমার ছিল শুধু উড্ডয়নের প্রবল নেশা। এই উদগ্র কামনা ও দুর্নিবার আকাংখা স্বপনেও আমাকে উড্ডয়নের অনুশীলন করাতো। হয়তো বা এই শখ আজও আমার মনের মনিকোঠায় জাগরুক। এখন এটা আমার অত্যন্ত বিস্ময়কর সৌভাগ্য যে, আমার দাওয়াতী পরিভ্রমণ সুদূর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার শতশত ফ্লাইটে পরিব্যাপ্ত। অবিশ্রান্তভাবে আমি সুউচ্চ আকাশে এই দীর্ঘ সফর পরিক্রমা সম্পন্ন করে চলছি। অনেক সময় এমনও হয় যে, একটা ফ্লাইট থেকে নেমেই অপর ফ্লাইট ধরতে হয় এবং এক বিমান থেকে অবতরণ করেই আরেকটি বিমানে আরোহণ করি। এই সফরসূচী থাকে ক্রমাগতভাবে ; বয়সের আধিক্য এবং অসংখ্য রোগ ব্যাধি সত্ত্বেও। এই দুর্বল শরীরকে যুগের উত্থান পতন এবং ঝড়ো হাওয়ার প্রচন্ড প্রতিকূলতা প্রবলভাবে তাড়া করেছে তথাপি সফর অব্যাহত রয়েছে আজও। আজও আমার ঐকান্তিক আকাংখা এই যে, আমি গ্রামের নিরিবিলি পরিবেশে গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেই। পল্লীর নিঝুম-নিস্তব্দ রজনী, রাতভর আলোকিত হয়ে উঠা ও নিভে যাওয়া তারার খেলা, খুব ভোরে মোরগের ডাক, অতি প্রত্যুষে পাখির কল-কাকলী, সর্বপ্রথম একটা পাখির একক আওয়াজ তারপর সেই সুমিষ্ট সূর শুনে অন্যদের জেগে উঠা। অতপর একযোগে আল্লাহ্‌র প্রশংসা গীতি, মহান সৃষ্টিকর্তার

www.amarboi.org

ইবাদাত ও স্তুতির এই ঈমান জাগানো দৃশ্য। পাখিদের তাওহীদী গান— সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার তাওহীদ—যিনি সকাল বেলা তাদেরকে খালি পেটে বাসা থেকে বের করে দেন আর সন্ধ্যায় সকলেই ভরা পেটে ফিরে আসে। মানুষ যদি পাখিদের নিকট থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে তা হলে আমাদের এই দুনিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার আবাসে পরিণত হতো। যেহেতু বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক জিনিসকে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে সৃষ্টি করেছেন। তাই পাখিদের সৃষ্টি নৈপুণ্য ও গঠন প্রকৃতিতেই আনুগত্য রয়েছে। মানুষকে তিনি চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। আমরা আমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না যে, কেন তিনি এরূপ করেছেন ? আর এখানেই তাঁর অসীম কুদরাত ও অপার হিকমতের সার্থক পরিচয়। এর পশ্চাতে লুক্কায়িত নিগূঢ় রহস্য তিনিই জানেন। আমরা মানুষ। আমাদের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাকে বুঝে শুনে কাজে লাগাতে হবে। যে আদেশ তিনি দিয়েছেন বিনা বাক্য ব্যয়ে ও সম্পূর্ণ শর্তহীনভাবে তা মেনে নিতে হবে। এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমি আবেগ অনুরাগে ভরা একজন সাধারণ মানুষ । শিল্পকলাকে ভালবাসি এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে ও বিভাগে পুরোপুরি উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করে থাকি। আমি আমার সীমিত যোগ্যতা শক্তি ও সামর্থ বুদ্ধিমত্তা, বিবেক ও বিচক্ষণতা দ্বারা আমার রবের অতুলনীয় হিকমতের রহস্য যৎ সামান্য উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র।

সহজাত প্রবণতা

স্বভাব ও প্রকৃতিগতভাবে তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ বিসম্বাদের প্রতি আমার কোন প্রবণতা ছিল না। আলোচনা পর্যালোচনা যখন বাকযুদ্ধ ও জিদের পর্যায়ে উপনীত হয় তখন আমি ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও তর্ক-বিতর্কের ময়দান থেকে আত্মরক্ষা করে সযত্নে কেটে পড়তাম। প্রত্যেক বিষয়েই আমি সৌন্দর্য প্রিয় বলে সকলের নিকট পরিচিত। মানুষের সৃষ্টি কৌশলই সৌন্দর্যের বিরাট নিদর্শন। পাখিদের আকৃতি ও প্রকৃতি এবং কারুকার্য খচিত পাখা ও পালক, হরিণের ক্ষিপ্রতা, তার পায়ের গোছার মাধুর্য ও কমণীয়তা, হাতীর বিশালায়তন শরীর এবং তার ধৈর্য, বাঘ ও নেকড়ের চোখের তীব্র চাহনী, পানির স্রোত ও তার কুলু কুলু ধ্বনি, পাতার মর্মর শব্দ, রেলগাড়ীর গতি এবং এই অনুভূতি যে রেল নয় বরং পৃথিবী তার পৃষ্ঠের সব কিছু নিয়ে তীব্র গতিতে পশ্চাৎ দিকে ছুটে যাচ্ছে মনে হয় প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে যে নিজস্ব সৌন্দর্য বিরাজমান সেই শোভা ও সৌন্দর্যের প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ।

আমি পৃথিবীতে খুবই সাবধান ও সর্তক জীবন যাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। আপনারা আমাকে দেখতে পান যে, আমি সালাত ও সিয়ামের খুবই নিয়মানুবর্তী। বাল্যকালেই কুরআন মজীদ হিফয করার কাজ শুরু করেছিলাম। কিছু কিছু হাদীস ও দ্বীনি বই পুস্তক জীবনের প্রারম্ভিক স্তরেই পড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও শৌর্য-বীর্য ও নির্ভীকতা এবং প্রেম-প্রীতি ও মহব্বত ভালবাসার কাহিনীর প্রতিও

www.amarboi.org

আমার আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাই আমি প্রথম প্রথম যেসব বই পুস্তক পড়তাম তার মধ্যে আবু যায়েদ আল-হিলালী সালামাহ রচিত বইও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আনতারা বিন শাদ্দাত ও সাঈফ বিন যি নিরানের জীবন কাহিনীও আমি অধ্যয়ন করেছি। অতপর ইসকান্দার দিমাছ বিরচিত সমস্ত গল্প কথা ও কল্পকাহিনী আমি পড়ে শেষ করেছি। ইসকান্দার দিমাছ ও তার পুত্রের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব গাথা খোশ গল্প দ্বারা বেশ প্রভাবিতও হয়েছি। এসব কাহিনীর মধ্যে নায়কের বীরত্ব এবং তার প্রেমিকার নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষা কল্পে বিস্ময়কর ঘটনা প্রবাহ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী মনে হতো। ছুটিকালীন সময় আমার গোটা সময়ই এ ধরনের বই পুস্তক পড়ে কাটতো। আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে এসব বই পুস্তক পড়তাম আর মনে মনে ভাবতাম যে অনুরূপ কোন ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্যই আত্মনিয়োগ করি কিন্তু তাতে আমি সফলকাম হতে পারিনি।

কাব্য ও কবিত্ব এবং সাহিত্য ও সংগীত

আমি নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য সেবীদের সাহিত্যও পড়া শোনা করেছি। মানফালুতির প্রায় সব ক'টি গ্রন্থই আমি পড়েছি। কতিপয় বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক কাহিনী পাঠ করে আমি মর্মভেদী কান্নায় ভেংগে পড়েছি। সাহিত্যের প্রতি এত অনুরাগ ও আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও আমি নিজে কিন্তু সাহিত্যিক হতে পারিনি। বছরের পর বছর আমি বাঁশী বাজিয়েছি কিন্তু বংশীবাদক হতে পারিনি। কবিতা চর্চার শখও আমার মধ্যে দানা বেঁধেছে এবং এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট মাথাও ঘামিয়েছি। নিজে কবিতা লিখেছি এবং শীর্ষস্থানীয় কবিদের সামনে তা উপস্থাপন করেছি। তারা আমার কবিতা পড়ে সবসময় আমাকে এই মন্তব্যই শুনাতেন যে, আমি যা কিছু লিখছি তা ছন্দময় বাক্য বিশেষ অবশ্যই কিন্তু তাকে কবিতা বলে অপবাদ দেয়া যায় না। সর্বশেষ যে কবিতা আমি লিখেছিলাম তা ছিল নিম্নরূপ। আপনি নিজেও পড়ুন এবং আমার জন্য দুঃখ ও করুণা প্রকাশ করুন।

خضعت لوحى قريحتى الاشعار

ورنت اليها الغرد الاطيار

"আমি নিবেদিত করে দিয়েছি ওহীর জ্ঞানের নিমিত্তে আমার কাব্য প্রতিভাকে।
যার জন্য ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে পাখির সকল কল কাকলি।"

এই কবিতা দেখে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, তা কবিতা না কবিতার বিকৃতি। তাই আমি এখানেই ক্ষান্ত হলাম এবং কবিত্বকে চিরবিদায় জানালাম। শিল্পকলার যেসব বিষয়ে আমি প্রচেষ্টা চালিয়ে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি সেসব ক্ষেত্র থেকে আল্লাহ্ কেন আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তা তিনিই ভাল জানেন। এটা ছিল তার সূক্ষ্ম কৌশল যে সেইসব ক্ষেত্রের কোনটাতেই আমি সফলতার মুখ দেখতে পারিনি। আমার এসব প্রচেষ্টা শিল্প কলার সাথে নিষ্ঠুর তামাশা বৈ আর কিছুই ছিল না।

দ্বীনি জ্ঞান চর্চার দিকে প্রত্যাবর্তন

আমি পুনরায় দ্বীনি ইলমের চর্চায় মনোনিবেশ করলাম। এবারে আমি তাফসীরে যামাখশারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে কুরতুবী পড়ে ফেললাম। তা ছাড়া

www.amarboi.org

সিরাতে ইবনে হিশাম এবং সীরাতের ওপর লিখিত অন্যান্য বইও অধ্যয়ন করলাম। উসুদুল গাবা, তাবাকাতে কুবরা, নাহজুল বালাগা, আল-আমালী আল-ইফদুল ফরীদ (ইবনে সাইয়েদিহি), বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদি বহু বিশালায়তন গ্রন্থ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করলাম। তা সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, আমি যা পড়েছি তা সাগরের এক বিন্দু পানির সমান যা মামুলী তৃষ্ণা নিবারণের জন্যেও যথেষ্ট নয়।

এসব চেষ্টা-সাধনা দ্বারা আমি এই একটা শিক্ষাই লাভ করেছি যে, আমি মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছি। তাই আমি কখনো আমার কথা বা কলম দ্বারা কোন মানুষের মর্মে আঘাত করার চেষ্টা করিনি। এমনকি যেসব লোক আমার ওপর আক্রমণ করেছে এবং আমার সাথে মতবিরোধের কারণে আমার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করেছে তাদের ওপর কখনো প্রতি আক্রমণের চিন্তা করিনি।

আল্লাহর সন্তুষ্টি

যেহেতু আমি আমার নিজের মতামত ও ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেহেতু অন্যদের অভিমত ও ব্যক্তিত্বের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। আমি যা কিছু লিখি তা অত্যন্ত দায়িত্বানুভূতির সাথে এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করে লিখি। তাই স্বীয় সিদ্ধান্তের ওপর অটল ও অবিচল হয়ে থাকতে চাই। এজন্য অনেক সময় আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং আজও পযর্ন্ত সহ্য করে যাচ্ছি। আমি শৃংখল বন্দীত্ব এবং কষ্ট-মুসিবতের বহু মনজিলের মখোমুখি হয়েছি। তবুও সত্য পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই আমার এই ভূমিকা। হককথা বলাই আমার আকীদা ও ঈমানের দাবী। আমার প্রতিটি ধমনি ও শিরা উপশিরায় রক্তের মতই তা প্রবহমান। এমন এক পরিবারে আমি সর্বপ্রথম চোখ মেলেছি যেখানে পরিবারের প্রতিটি সদস্য ছিল নিয়মিত নামায-রোযার পাবন্দ; নারী, পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সবাই ছিল দ্বীনের অনুসারী। আমার মনে পড়ে না আমি কখন (কত বছর বয়সে) থেকে সিয়ামের অনুশীলন করতে এবং কখন সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। যা হোক এতটুকু অবশ্যই স্মরণ করতে পারি যে, যখনই আমার মধ্যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে এবং বিচার-বিবেচনার উন্মেষ ঘটেছে তখন থেকেই আমি নিজেকে সালাত ও সওমে অভ্যস্ত দেখতে পেয়েছি। গোটা জীবনে আমার এমন কোন সময়ের কথা মনে পড়ে না যখন আমি ফরয পরিত্যাগ করেছি।

সিনেমা দেখা

আপনি বিস্মিত হবেন এই জেনে যে, যখন আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করে ওকালতীর পেশা গ্রহণ করি তখন শুক্রবার দিন (সাপ্তাহিক ছুটি থাকতো) যোহরের পর আমি ছবি দেখার জন্য সিনেমা হলে চলে যেতাম কিন্তু সেখানেও সালাত আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করতাম না। বিরতির সময় সিনেমা ভবনেরই এক পার্শ্বে গিয়ে সালাতুল আসর ও মাগরিব আদায় করে নিতাম। সেই যুগে আমি দেখতাম কিছু লোক মজলিসে বসতো এবং ছবি দেখতে যাওয়ার সময়

www.amarboi.org

হলে উপস্থিত লোকদের বলতো যে, মেহেরবানী করে আপনারা একটু বসুন। আমাকে অনুমতি দিন বাইরে একটি জরুরী কাজের জন্য আমাকে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমার অবস্থা ছিল এই যে, আমি অকপটে নিঃসংকোচে বন্ধুদের বলতাম যে, আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। অনেক সময় কোন কোন বন্ধু একথা শুনে বিস্মিত হতো এবং চোখ কপালে তুলে নিতো আবার কখনো কখনো বিরক্তি এবং উষ্মাও প্রকাশ করতো (এই জন্য যে, আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি) কিন্তু আমি সবর্দা একই জবাব দিতাম "আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, আমি কোথায় যাচ্ছি। তারপর আমি যদি আল্লাহকেই ভয় না করি তা হলে আবার মানুষকে ভয় করার কি অর্থ থাকতে পারে ? বিশেষত আমার এ কাজ যখন হারাম নয় যদিও মাকরুতো অবশ্যই।"

আদরের দুলাল

আমার বাল্যকাল এমন শান্তিময় আনন্দঘন ও আরামদায়ক ছিল যে, আমি যা আবদার করতাম সহজেই তা পেতাম, আমার দাদার ছিলো সাতটি সন্তান। দু'টি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে। আমার মরহুম পিতা সতেরটি সন্তান রেখে মৃত্যু বরণ করেন। তন্মধ্যে আটজন ছিল পুত্র সন্তান এবং নয়জন কন্যা সন্তান। পিতা মরহুমের নিকট তার সমস্ত সন্তানের মধ্যে আমিই অধিকতর প্রিয় ছিলাম। কারণ আমি কখনো পরীক্ষায় ফেল করতাম না এবং প্রত্যেক বছর ভাল পজিশন নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতাম। আমার বড় দুই ভাই পড়ালেখা ছেড়ে কাজ-কারবারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ব্যবসায়ে তাঁরা ভাল করতে পারেননি। কোন কোন শিক্ষককে আমার পড়ালেখার বিশেষ যত্ন নেয়ার জন্য গৃহশিক্ষক রূপে নিয়োগ করা হতো কিন্তু শিগ্‌গিরই একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমাকে বিশেষ কোচিং দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। যখন আমি মাধ্যমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (নবম শ্রেণী থেকে-দশম শ্রেণীতে) উত্তীর্ণ হই তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আমি আমার সিলেবাস ভুক্ত সমস্ত বই আদ্যপান্ত পড়ে ফেলি। রচনামূলক বিষয় যেমন ইতিহাস, ভূগোল ও ভাষা প্রভৃতি বিষয় আমি প্রায় মুখস্ত করে ফেলি। তাই অবকাশ যাপনের পর শিক্ষকগণ ক্লাসে যখন পাঠ দিতেন তখন সেগুলো ভালভাবে বুঝে নেয়া ও মনে রাখা আমার জন্য কোন ব্যাপার-ই হতো না। ক্লাসে কখনও থার্ড পজিশন অপেক্ষা খারাপ রেজাল্ট করতাম না। তথাপি কোন দিন আমার ফাষ্ট বয় হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। আমাদেরকে ইংরেজী ভাষা পড়াতেন মিষ্টার জ্যাকশন নামক জনৈক শিক্ষক। তিনি ক্লাসে যখনই ছাত্রদেরকে কোন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করতেন তখন সাথে সাথে একথাও বলে দিতেন যে, মুয়াররবা, বুশরা ও তিলমেসান ছাড়া আর কে এর অর্থ বলতে পারবে ? তিনি জানতেন যে, আমরা তিনজন ছাত্র (আমি এবং উল্লেখিত দুই জন ছাত্র) পড়া পুরোপুরি তৈরী করেই ক্লাসে এসে থাকি।

জাতীয় মর্যাদাবোধ

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমি "আল-মুকতিম"পত্রিকা পড়া শুরু করি। প্রথম মহাযুদ্ধের সংবাদ আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়তাম। আমার মনের

www.amarboi.org

একান্ত আকাংখা ছিল এ যুদ্ধে ইংরেজ পরাজয় বরণ করুক যাতে আমার প্রিয় জন্মভূমি মিসর তাদের ছোবল মুক্ত হতে পারে এবং বৃটেনের এজেন্ট (ভাইসরয়)-এর অত্যাচার নির্যাতনের অবসান হয়। বৃটেনের প্রতিনিধিকে হিজহাইনেস বলা হতো, সে বড় অন্যায় ফরমান জারী করতো, সে প্রধান মন্ত্রীর নামে নিদের্শ জারী করতো এবং দেশের সমস্ত যুবককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে "লাম বন্দী" নামকস্থানে পাঠিয়ে দিতো।

যুদ্ধের ঐ সময়টা ছিল বিশেষভাবে জুলুম ও নির্যাতনে ভরা। বৃটিশ রাজের নির্দেশে জোরপূর্বক জনসাধারণের নিকট থেকে উট ও গাধা ছিনিয়ে নেয়া হতো এবং রসদপত্র বহনের জন্য বৃটিশ সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়া হতো। অনুরূপভাবে ধান, যোয়ার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য নামমাত্র মূল্যে জোর করে কিনে নেয়া হতো। করো আর্তনাদ ও আহাজারী শোনার কোন প্রশ্নই উঠতো না। এজন্য আমাদের প্রজন্ম ও আমাদের সমকালীন লোকদের ফিরিঙ্গী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রচন্ড শত্রুতা ছিল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই মিসরীয়রা ১৯১৯ সালে বিপ্লব সংগঠিত করে বসে। তাতে বৃটিশ আধিপত্য খতম হয়নি বটে কিন্তু জাতি কিছু অধিকার আধাস্বায়ত্বশাসন এবং আভ্যন্তরীন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু অধিকার লাভ করে।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের লাভা উদগীরণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জাতি ১৯৫৪ সালে ইংরেজদেরকে দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

আমি মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশুনা শুরু করি মাদ্রাসা আল জমিয়তুল খাইরিয়াতুল ইসলামিয়াতে। কিছুদিন পর আর রাশাদ মাধ্যমিক স্কুলে চলে যাই এবং পরিশেষে ইলহামিয়া মাধ্যমিক স্কুল থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করি।

গ্রাম থেকে শহরে

দাদাজানের মৃত্যুর পর আমার পিতা তাঁর দুই স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সাথে নিয়ে কায়রোস্থ খোশ কাদাম নামক মহল্লার বাসস্থানে চলে আসেন। এ স্থানটির কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাসস্থানটি ছিল অনেক বিস্তৃত ও প্রশস্ত। এই বাড়ীর আয়াতন ছিল আটশত বর্গমিটার। এ বাড়ীর সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল এই যে, এর কোন জানালাই বাইরের দিকে খোলা যেত না বরং সবগুলো জানালাই প্রশস্ত ও বিস্তৃত আঙ্গিনার দিকেই খুলতে হতো।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সময় আমাকে একাধারে তিনটি স্কুল পরিবর্তন বিনা কারণে করতে হয়নি। জমিয়তুল খাইরিয়া স্কুলে যখন আমি প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন একদিন চিত্তবিনোদনের অবকাশে আমাদের ক্লাসে কিছু শোরগোল হলে স্কুলের একজন অফিসার আমাদের শ্রেণী কক্ষে আসেন। তিনি আমাদেরকে ভর্ৎসনা করেন

www.amarboi.org

এবং পূর্ণ নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। তিনি ডেস্কগুলোর মাঝে ইতস্তত পায়চারি করতে থাকেন। এই সময় তিনি মুহাম্মাদ আলী নামক একজন ছাত্রকে নড়াচড়া করতে দেখেন আর যায় কোথায় ? তিনি সেই বেচারাকে তার কোটের কলার ধরে নিয়ে আসেন এবং তার পোশাকে কালী ঢেলে দেন। আমার নিকট এ দৃশ্য ছিল অত্যন্ত অশোভনীয়। আমি ঐ ছাত্রটির আর্থিক সংগতি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এ জুলুম দেখে আমি নীরবে তা মেনে নিতে পারলাম না। আমার মর্যাদা বোধ আমাকে প্রতিবাদ মুখর হতে বাধ্য করলো। আমি চীৎকার করে সেই অফিসারকে লক্ষ্য করে বলে উঠলাম ঃ "এটা কি ধরনের জুলুম ও বর্বরতা ?" আমার কথা শুনে তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি তার নির্দেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করলাম। তিনি আমার কাছে আসলেন এবং আমার কাপড় ধরে টানতে শুরু করলেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে শক্তিশালী। কেননা আমি ছিলাম বাল্য বয়স্ক অথচ তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ যুবক। তিনি আমাকে ক্লাস রুম থেকে টেনে হেচড়ে বের করে আনলেন। দরজার বাইরে আমাকে রেখে আমার ডেস্কের পাশে গেলেন যেখানে আমার ব্যাগ ও বই পুস্তক পড়েছিল। তিনি আমার বই খাতাগুলো আমার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন। আমি ঐ বইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পাল্টা তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করলাম। এক মিনিট অবধি আমরা উভয়ই একে অন্যের দিকে বইগুলো নিক্ষেপ করতে থাকলাম । অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তিনি আমাকে কঠোর হস্তে ধরে ফেললেন এবং টানতে টানতে সোজা হেড মাষ্টার সাহেবের নিকট নিয়ে হাজির করলেন। প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল কিরারাহ্ আফেন্দী। তিনি আমাকে তার স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং পরদিন আমার অভিভাবককে সাথে নিয়ে যেতে বললেন। বাড়ীতে গিয়ে আমি আদ্যপ্রান্ত সমস্ত ঘটনা আমার পিতার নিকট বর্ণনা করলাম এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে, আর কোনদিন এ স্কুলে ফিরে যাব না। (মুহাম্মাদ আলী সালেম পরে পুলিশ একাডেমীতে ভর্তি হয় এবং শেষ পযর্ন্ত পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়।) আমার পিতাও আমাকে বাধ্য করেননি। অগত্যা আমি প্রথম শিক্ষা বৎসরটি আর-রাশাদ মাধ্যমিক স্কুলে সমাপ্ত করি। এটা ছিল দারবুল জামাহীর রোডে অবস্থিত একটা প্রাইভেট স্কুল। অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত এই স্কুলেও ভাল পড়ালেখা হতো না। তখনকার দিনে প্রাইভেট স্কুলগুলোর অবস্থা প্রায়শ এমনই হতো। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভেই আমি ইলহামিয়া স্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। এই স্কুলটি ছিল সরকারী মনজুরী প্রাপ্ত।

বি, এ, ডিগ্রী লাভ

এই স্কুল থেকে বছরের শেষে ভাল নম্বর পেয়ে আমি বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং এই স্কুলেই ওপরের শ্রেণীতে ভর্তি হই। এখানে বি, এ, পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখান থেকেই আমি ১৯২৪ সালে মানবিক বিভাগে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এই বছর সারা দেশে বি, এ, পরীক্ষায় মাত্র সাতশত সত্তর জন (৭৭০) ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। তন্মধ্যে আমি একাত্তর (৭১) নাম্বারে অর্থাৎ ক্রমানুসারে সত্তর জনের পরে সফলতা লাভ করি। আমি আটর্স বিভাগে এজন্য ভর্তি হয়েছিলাম যে, অংকশাস্ত্র ও

www.amarboi.org

হিসাব বিজ্ঞানে আমি ছিলাম বেশ দুর্বল। আজ পর্যন্তও আমি অংক অপেক্ষাকৃত কম বুঝি। কেউ হিসাব বিজ্ঞানে আমার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হউক এমন প্রত্যাশা আমি কখনো করতাম না।

অনুরূপভাবে আমি এমন ইচ্ছাও কখনো পোষণ করতাম না যে, আমার নিকট থেকে প্রত্যেক জিনিসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও চুলচেরা হিসেব গ্রহণ করুক। আমি যা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী । কেউ আমাকে কোন দায়িত্ব অপর্ণ করলে আর আমি তা গ্রহণ করলে আমার পূর্ণ শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা দিয়ে সেই গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করেছি এবং এজন্য নিরন্তর আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছি। ফলাফল কি দাঁড়াবে সেই হিসেব বা সে জন্য কোন পরোয়া করতাম না। ফলাফল তো আল্লাহর হাতে এবং তারই ইখতিয়ারাধীন। আমার ওপর শুধু চেষ্টা করার দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে। পুরোপুরি চেষ্টা করার পর এমন মানসিক প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি আমি লাভ করি যার কোন সীমা নেই। বান্দার প্রতি আল্লাহর অশেষ মহব্বত ও রহমত এই যে, তিনি অনুগ্রহ করে তাকে শুধু কাজ ও চেষ্টার দায়িত্ব দিয়েছেন। সফলতা এবং অনুকুল ফলাফলের দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়নি।

মুষ্টি যুদ্ধ

ইলহামিয়া স্কুলে অধ্যয়নরত থাকাকালেই আমি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করি। এই পর্যায়ে আমি আমার বাহ্যিক জাঁকজমকের প্রতি গুরত্ব দিতে শুরু করি। ইতিপূর্বে আমি শুধু জ্ঞান আহরণ ও অধ্যয়নের প্রতি যত্নবান ছিলাম। সুতরাং আমার জুতা সর্বদা চকচক করতো। প্যান্টের ভাঁজ কখনো নষ্ট হতে দিতাম না। সবসময় মনে হতো যেন এই মাত্র ইস্ত্রী করে আনা হয়েছে। দুপুরের পর আমি যখন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আসতাম তখন আমার নিজের কামরায় বসে জুতায় পালিশ লাগিয়ে খুব করে ব্রাশ করতাম। প্যান্টে কিঞ্চিৎ পানির ছিটা দিয়ে উত্তমরূপে ভাঁজ করে তারপর বিছানার দুই গদির মাঝখানে সাজিয়ে রেখে দিতাম। এভাবে তাতে কড়া ভাজ পড়ে যেতো। মাধ্যমিক স্কুলে আমি এমন কোন সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখিন হইনি সাধারণত যুবকরা যেমনটি হয়ে থাকে। আমি সাধারণ ছেলেদের মত একজনের অপরজনের পশ্চাতে দৌড়ানো এবং সাধারণ বুট পরিধান করে খেলার কসরত করা থেকে সর্বদা দূরে থাকতাম। এই সময় আমি অবশ্য বক্সিং শিখার চেষ্টা করি কিন্তু আমার ক্রীড়া শিক্ষক একদিন এমন বক্সিং (মুক্কা) মারেন যে, আমি চির দিনের জন্য বক্সিং-এর অনুশীলন পরিত্যাগ করি। আমি স্কুল স্কাউটিং টিমেও অংশ গ্রহণ করি কিন্তু শীঘ্রই তা থেকেও কেটে পড়ি। আমার সমস্ত শিক্ষা জীবনে আমি কোন ক্রীড়াতেই সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। যদিও দেশী বিদেশী ক্রীড়া জগতের খবর ও রিপোর্টের প্রতি আমার ঝোঁক ছিল অত্যন্ত বেশী।

কঠোর তত্ত্বাবধান

মাধ্যমিক শিক্ষার পুরোটা সময় আমি আমার মরহুম পিতার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ছিলাম। এই তত্ত্বাবধান ছিল বড় সূক্ষ্ম ও কঠোর। আমার শেষ পিরিয়ড

www.amarboi.org

কখন শেষ হতো এবং হিলমিয়া ও খোশ কাদামের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু তা তিনি ভাল করেই জানতেন। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগতে পারে। এতসব চুলচেরা হিসেব নিকেশের দাবী ছিল এই যে, আমি যেন নির্দিষ্ট সময়ে ঘরের দরজায় পৌঁছে যাই। তিনি দরজার সিঁড়িতে বসে অধীর আগ্রহে আমার জন্য অপেক্ষা করতেন এবং হস্তস্থিত ঘড়ির প্রতি তাকিয়ে থাকতেন। আমি দরজায় পৌঁছেই সালাম আরজ করতাম এবং পিতার হস্ত মুবারক চুম্বন করতাম। অতপর সিঁড়ি ভেংগে সোজা আমার পড়ার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতাম।

যদি কখনো নির্ধারিত সময় থেকে আমার পাঁচ মিনিট বিলম্ব হয়ে যেতো তা হলে আমার রক্ষা ছিল না। দুর্ভাগ্য আমার ওপর আপতিত হতো—এমন সব তিরস্কার ও ভর্ৎসনা শুনতে হতো যা থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। এই তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সন্মুখে আমি একেবারে বাকহীন হয়ে যেতাম। জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলতে কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে একটি মাত্র শব্দই মুখে উচ্চারণ করতে অথবা দুষ্কর্মের বিবরণ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সাহস হতো না। এতসব কড়াকড়ি সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম বড় সৌভাগ্যের অধিকারী। কারণ পিতা মরহুমের এরূপ কঠোরতার পশ্চাতে তার পিতৃসুলভ স্নেহ ও বাৎসল্য চাক্ষুষ দেখতে পেতাম। সেকালে কৌলিণ্যের দাবী ছিল এই যে, পিতা নিজে কখনো পুত্রকে বলবে না যে, বৎস ! আমি তোমাকে ভালবাসি। পিতার স্থানে পিতা এবং পুত্রের জায়গায় পুত্র। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মর্যাদা ও সম্মান আছে। পারস্পরিক স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন যত দৃঢ়ই হোক না কেন প্রত্যেকের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা জরুরী।

বিবাহ বন্ধন

মাধ্যমিক স্কুলে চতুর্থ বর্ষে থাকা কালেই আমার পিতা আমার বিবাহের চিন্তা ভাবনা করেন। তিনি আমার দ্বীনের বাকী অর্ধেকের হেফাজতের ব্যবস্থা করে দিতে চাচ্ছিলেন। অথচ আমার বড় আরো ভাই ছিল এবং তাদের তখনো বিয়ে হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তখন আমার বিবাহের প্রস্তুতি চলছিল। প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, মুহতারাম পিতা আমাকে কিছুটা বেশী ভালবাসতেন। আমার বিয়ের কাহিনীও বড় বিস্ময়কর।

আমি আমার পাঠ্য জীবনে যা কিছু পড়েছিলাম তাতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আমার জীবন সংগিনী বাছাই করার নিরংকুশ অধিকার রয়েছে আমার এবং এতে কারো হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। কিন্তু এটা ছিল আমার মানসিক কল্পনা ও অনুমান মাত্র। বাস্তব অবস্থা ছিল এ থেকে ভিন্নতর। আর এটা সত্য যে, বাস্তব কুসংস্কার ও অলীক কল্পনা অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকর হয়ে থাকে।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে আসার পর আমার মাতা আমাকে বলতে লাগলেন, "তোমার আব্বা আমাকে বলেছেন আমি যেন তোমাকে জানিয়ে রাখি আগামী কাল সালাতে মাগরিবের পর তোমাকে অমুক শাইখের বাড়ীতে যেতে হবে।" আমি

www.amarboi.org

জিজ্ঞেস করলাম "আম্মু, এর কোন কারণ কি আপনার জানা আছে ?" জবাবে তিনি বললেন, "যে শাইখ সাহেবের বাড়ীতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আগামী কাল সালাতে মাগরিবের পর তাঁর কন্যার সাথে তোমার বিয়ে হবে।"

সত্য বলতে কি আমার জন্য এটা ছিল আনন্দ দায়ক খবর। কেননা আমি জীবনের বিশটি বসন্ত তখন পশ্চাতে ফেলে এসেছি। প্রকৃতিগতভাবে আমার বিয়ের প্রয়োজন ছিল। এখন হালাল পন্থায় জৈবিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে। এতো গেলো একদিক। কিন্তু অপর দিকে আমার ভিতরের পৌরুষ এবং জীবন সংগিনী নির্ধারিণের ক্ষেত্রে আমার স্বাধীনতার ধারণা আমাকে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দিতে শুরু করে। তবে এই বিদ্রোহ ও তার প্রকাশ আমি কেবলমাত্র আমার মায়ের নিকটই করতে পারতাম। এ ব্যাপারে আব্বাজানের সামনে মুখ খোলার দুঃসাহস আমার ছিল না।

আমি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে আম্মাজানকে বললাম, "আমি কখনো সেখানে যাবো না এবং বিয়েও করবো না। আমি কেবল একশর্তে বিবাহ করতে রাজী আছি যদি স্ত্রী নির্বাচনের ইখতিয়ার আমার থাকে।"প্রত্যুত্তরে আম্মা বললেন, "তোমার সাথে এই বাজে আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হয়ে মাথা খারাপ করার কোন দরকার আমার নেই। তবে তোমার এরূপ ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহের কথা আমি তোমার পিতার নিকট পৌছে দিচ্ছি যাতে তিনি যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।"

আব্বা ঘরে ফিরে আসলে আম্মাজান তাঁকে আমার বক্তব্য জানালেন। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে বক্তব্য শুনলেন এবং আম্মাজানকে বললেন, ইনশাআল্লাহ সে নারাজ হবে না। সে পালিয়ে যাবে কোথায় ? আমি তাকে এখন মানুষ বানিয়ে দিতে চাই। যাতে সে মানুষের সাথে উঠা বসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি তার বিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী করে দেবো। আমি তার অভিভাবক। ইনশাআল্লাহ আজই বিয়ে সম্পন্ন হবে।

আদর্শ জীবন সংগিনী

মা আমাকে পিতার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। বাবার অনমনীয়তা দেখে আমি হঠকারিতা পরিত্যাগ করলাম। তা না করে আমার কোন গত্যন্তরও ছিল না। বস্তুত মুহতারাম পিতার অন্তরে আল্লাহ যে কথা জাগরুক করে দিয়েছিলেন তাতে বড়ই কল্যাণ নিহিত ছিল। আমার আব্বাজান আমার বিয়ের মাত্র ছয় মাস পর ইনতিকাল করেন। ১৯২৪ সালে জানুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ তায়ালা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে আমার অর্ধেক দ্বীনের হিফাজতের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং আমাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর কায়েম থাকার তাওফীক দিয়েছেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমি আর কোন দিন কোন মহিলার প্রতি চোখ তুলে তাকাইনি এবং নিজের জীবন সংগিনী ছাড়া কখনো কোন রমণীর কল্পনাও আমার মনে জাগতে দেইনি। আমি আমার সারা জীবন নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে এই নেক বখত মহিলার সাথে কাটিয়ে

www.amarboi.org

দেই। সুদীর্ঘ তিপান্ন বছর ব্যাপী চলে আসছে আমাদের এই আনন্দঘন দাম্পত্য জীবন। আমার এই অনুপমা স্ত্রী ১৩৯৯ হিজরী সালের রমজান মাস মোতাবেক ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাসে আমাকে বিচ্ছেদ বেদনার সাগরে ডুবিয়ে পরপারে চলে গেছেন। তিনি একাধারে সাত বছর অবধি শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু তার ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন ভাটা পড়েনি। যেদিন তাঁর ইনতিকাল হয় সেদিন সেহরীর সময় আমরা উভয়েই রোযা রাখি এবং একত্রে সালাত আদায় করি। কিন্তু ইফতারীর সময় হওয়ার পূর্বেই তিনি তার মনজিলে গিয়ে পৌছেন। তাঁর কথা স্মরণ করে আজও আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। কেউ আমার সামনে তাঁর আলোচনা করলে আমার মন উৎফুল্ল হয় এবং চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

মরহুমা ছিলেন একজন আদর্শ স্ত্রী, বিয়ের পর যখন তিনি আমাদের এখানে আসলেন তখন থেকেই নিজ হাতে রান্না করতেন এবং ঘরের সমস্ত কাজকর্ম, কাপড় ধোয়া, গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাচ্চাদের দেখাশোনা ও লালন-পালন ইত্যাদি কাজে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ব্যস্ত থাকতেন। বাড়ীতে পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে কাজ করে আনন্দ পেতেন। আমার সমগ্র জীবনে কখনো তিনি এমন কথা বলেননি যে, "আপনি এই কাজ কেন করেছেন ?" কিংবা অমুক কাজ কেন করেননি ? তিনি জীবনে নিজের জন্য কখনো কোন জিনিসের বায়না ধরেননি। আমিও তাই তাঁর চাওয়ার পূর্বেই প্রতিটি আবশ্যকীয় জিনিসপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে এনে দিয়েছি।

সতী সাধ্বী স্ত্রী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামী

বিয়ের পর তিনি সত্যি সত্যিই একজন গৃহরাণী হয়ে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকলেন। সুদীর্ঘ সতের বছর পর্যন্ত তো তিনি কখনো একাকী ঘর থেকে বাইরে পা রাখেননি। এই পুরো সময় কখনো তিনি কোন ট্রেন কিংবা বাসেও আরোহণ করেননি। যদি কখনো কোন বিবাহ শাদী অথবা কোন শোকানুষ্ঠানে তাঁকে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতে হতো তখন আমি নিজে আমার গাড়ীতে করে নিয়ে যেতাম। আমি আমার গৃহিণীর ব্যাপারে অত্যন্ত মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলাম। সূর্যালোকের ক্ষেত্রেও যেন আমার এই মর্যাদাবোধ ছিল সতর্ক যেন তার কিরণচ্ছটা কোনভাবে আমার স্ত্রীর শরীর দেখে না ফেলতে পারে। অনুরূপভাবে বায়ুর প্রবাহ সম্পর্কেও আমার ছিল প্রবল বিতৃষ্ণা যাতে উহা তার ব্যবহৃত পোশাকের ওপর দিয়ে কখনো প্রবাহিত হয়ে না যায়। আমার এই সূতীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধের পুরোপুরি উপলব্ধি ছিল আমার স্ত্রীর। তাই তিনি কখনো এ কঠোরতার জন্য অসন্তষ প্রকাশ বা আপত্তি উত্থাপন করেননি। তার কারণ ছিল এই যে, এই সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধে তিনিও সন্তুষ্ট চিত্তে আমার অংশীদার ছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এই মহিলার গর্ভে আমাকে বহু সন্তান দান করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে এখন অবশ্য মাত্র দুইপুত্র ও দুই কন্যা জীবিত আছে। আল্লাহ্ তায়ালার

www.amarboi.org

কাছে প্রার্থনা তিনি যেন তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আল্লাহর শোকর আমার সমস্ত সন্তান সৎ শিষ্ট ও অনুগত।

আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমার সূক্ষ্ম মর্যাবোধের অনুভূতির একটা ঘটনা বর্ণনা করছি। ঘটনাটা এই মুহূর্তেই আমার মনে পড়লো। জামাল আবদুন নাসেরের জিন্দানখানায় আমাকে এক নাগাড়ে সতের বছর কাটাতে হয়েছে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭১ সালের জুলাই পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময় মরহুমা একজন আদর্শ স্ত্রীর কৃতিত্ব অত্যন্ত ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সদাচরণের সাথে পেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জেলখানায় একাধারে দশ বছর ছিল আমার সশ্রম কারাদন্ড। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় আমার স্ত্রী একবারও আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেননি। কেননা এটা আমার মোটেও পসন্দনীয় ছিল না। যে জেলখানার লোকজন এবং আমার ইখওয়ানী ভাইয়েরা আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেখতে পাক। ইখওয়ানী ভাইয়েরাও বার বার অনুরোধ করেন যে, এ আচরণ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আচরণ এবং তিরস্কার যোগ্য। তাদের ঐকান্তিক অনুরোধে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আমি আমার স্ত্রীকে কারাগারে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি দেই। তিনি আমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য জেলখানায় আগমন করলে আমি ভাব গম্ভীর পরিবেশে তাকে স্বাগত জানাই। যেন আমরা একে অন্যের নিকট থেকে একদিন কিংবা এক দিনের অংশ বিশেষের জন্য বিচ্ছিন্ন ছিলাম মাত্র। আমার দীর্ঘ কারাবাস ও গৃহ থেকে অনুপস্থিতির এই সময়কালে আল্লাহর এই বান্দী কখনো আমার কাছে কোন প্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করেনি। কিংবা আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য কোন সমস্যারও সৃষ্টি করেনি। যদিও আমার মা এবং ভাইবোনদের পক্ষ থেকে অনেক সময় তার সাথে রূঢ় আচরণও করা হয়েছে।

যুবক যুবতীদের প্রতি উপদেশ

আমি নওজোয়ান ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিতে চাই। এ উপদেশ আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস। যুবক যুবতীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তারা যেন তথাকথিত প্রেমকে তার ভিত্তি না বানায়, বিয়ের পূর্বে যা (পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে) সৃষ্টি হয়। প্রেম ঘটিত বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সফল হয় না। যে ভাবাবেগ তাড়িত অবস্থাকে ভালবাসা ও প্রেম বলে আখ্যায়িত করা হয় তা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দুই তিন বছরের মধ্যেই তা নির্বাপিত হয় এবং আবেগের অপমৃত্যু ঘটে। ভালবাসা ঘৃণায় অথবা অন্তত নিস্পৃহতায় রূপান্তরিত হয়। বিশেষত যখন আগমন ঘটে নবজাতকের তখন এই আবেগ সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যায়। ভাটা পড়ে আসে সেই অনুভূতিতে।

বিয়ের ব্যাপারে আমার উপদেশ হচ্ছে, প্রথমে দেখতে হবে পিতামাতা এই বিয়েতে সম্মত কিনা তারপর দেখা আবশ্যক স্বামী স্ত্রীর সামঞ্জস্য ও সোমঝোতা। যদি এরূপ না করা হয় তাহলে সেই বিয়ে দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না

www.amarboi.org

যে জন্য বিয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক শুধু মাত্র সাময়িক ও আবেগ তাড়িত প্রেম প্রীতির ওপর স্থায়ী হতে পারে না। এর ভিত্তি হওয়া উচিত পবিত্রতা ও অকৃত্রিমতা। উভয়েই উভয়ের জন্য আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার অনুভূতি পোষণ করতে পারলে দাম্পত্য জীবনে জান্নাতী আবেশ ও সুষমা নেমে আসবে। ফলে বিয়ে স্থায়ী কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে আনবে।

ধ্বংস নেমে আসুক এমন স্বামী স্ত্রীর ওপর যারা বিয়ের পর আপন সাথী ছাড়া অন্য করো প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে কিংবা তার জন্য অন্তরে ভালবাসার লালন করতে শুরু করে।

আমার মনে পড়ে আমি ১৯৩৬ সালে দাস পাশা মার্কা ফিলিফস রেডিও গ্রাম ক্রয় করেছিলাম। আমার মরহুমা স্ত্রী সুস্পষ্টভাবে আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে, রেডিওতে যখন তিনি রিয়াদুস সানবাতি মরহুমের গান শুনেন তখন এ গান ও তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর তার খুব ভাল লাগে। আমি তাকে বললাম, "যখনই ঘোষকের মুখে রেডিওতে সানবাতির নাম শুনবে তখনই রেডিও বন্ধ করে দিবে।" মরহুমা কোন প্রকার ইতস্তত না করেই সাগ্রহে ও সানন্দে আমার এই নিদের্শ মেনে নেন। আমি যুবক যুবতীদের বলতে চাই যে, পিতামাতার স্ত্রী নির্বাচনে সন্তুষ্ট থাকবে। কিংবা নিজের পসন্দের মেয়ের ব্যাপারে মাতাপিতাকে সম্মত করতে চেষ্টা করো। পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির ফল অত্যন্ত দুঃখজনক পরিণাম এবং বর্ণানাতীত মুসিবত। আর তাদের সন্তুষ্টির ফল সীমাতিরিক্ত সৌভাগ্য ও সুখ-শান্তি লাভ।

আইনের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা

১৯২৪ সালে ইউনিভারসিটি ল' কলেজে ভর্তি হওয়ার অব্যবহিত পরই আমার মধ্যে যৌবনের উন্মেষ ঘটে। আমি আইন মহাবিদ্যালয়ে এজন্য ভর্তি হয়েছিলাম যে, আইন ব্যবসায়ের প্রতি ছিল আমার প্রবল অনুরাগ। উকিলগণ যখন মজলিশে বসে কথাবার্তা বলতেন তখন আমার কাছে তাদেরকে খুবই সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মনে হতো। মোকদ্দমাসমূহের শুনানি ও বিশ্লেষণে তাদের ধরন ধারণ বিশেষত যখন জজ সাহেবগণ নীরবে বসে তাদের যুক্তিসমূহ শুনতে থাকেন তখন তাদের গুরু গম্ভীর মনে হতো। উকিলদের সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে আমি যেসব বিবরণ পড়তাম তাতে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে, তারা মানুষের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক। তারা দুর্বলদের সহযোগিতা প্রদান করে এবং তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে দেয়। সর্বোপরি যে কথাটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার যোগ্য তা হচ্ছে তারা কারো কর্মচারী নয়। বরং তাদের পেশা স্বাধীনতা ও স্বয়ম্ভরতার গ্যারান্টি।

আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে আমি কখনো কোন ক্লাসে অকৃতকার্য হইনি। কিন্তু আইন কলেজে এসে আমি একাধিকবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছি। অবশ্য আমার অকৃতকার্যতার কতগুলো কারণ ছিল ঃ—

www.amarboi.org

১। **বিয়ে ঃ** আমি কলেজ জীবনে বিয়ে করি এবং পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করি। অতএব স্ত্রী পরিজনের কারণে পড়াশুনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারিনি। এমনকি ক্লাসেও আমি নিয়মিতভাবে হাজির হতে পারতাম না।

২। **জাতির আযাদী আন্দোলনে যোগদান ঃ** আমি অধিকাংশ সময়ই আন্দোলনের কাজে অংশ গ্রহণ করতাম এবং বহুবার সা'দ জগলুল পাশার নিকট বায়তুল উম্মাহ চলে যেতাম। তার কথা বার্তায় ছিল যাদু মন্ত্রের মত আকর্ষণ। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনতাম।

৩। **পিতার ইনতিকাল ও গাড়ী ক্রয় ঃ** ইত্যবসরে আমার পিতা ইনতিকাল করেন। অমনি সেই নিয়ন্ত্রণ যা এত দিন তিনি কঠোরভাবে কার্যকরী করে আসছিলেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এই পর্যায়েই আমি একটা (গাড়ী) রিন্যুকা পরুলিয়া নম্বর ২৭৫১ ক্রয় করি। এখন আমার আনন্দ স্ফূর্তির সুযোগ ও উপকরণ হস্তগত হয়ে যায় যা এতদিন মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। এই পর্যায়ে আমি মদ ও ব্যভিচার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অভ্যাস ও আচরণ রপ্ত করে ফেলি যা আমীর ওমরাহদের সন্তানদের বৈশিষ্ট্য। সিনেমা ও থিয়েটারে গমন করা নৃত্য ও সংগীতের আসরে নর্তন কুর্দন করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে মাদক দ্রব্য ও জ্বেনা থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

আদর্শ শিক্ষক মন্ডলী

আইন কলেজে দেওয়ানী আইনের উস্তাদ ছিলেন ডক্টর আবদুর রাজ্জাক আল সানহুরী মরহুম। তিনি শুধু তার বিষয়েরই সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন না। বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি নৈতিক গুণাবলী ও বৈষয়িক লেন-দেনের ক্ষেত্রেও খুবই উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। এতদ সত্ত্বেও তিনি ছাত্রদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেননি। তার আওয়াজ ছিল অত্যন্ত কর্কশ ও ক্ষীণ এমন কি তাকে "ছাত্রদের জ্বীন" নামে অভিহিত করা হতো। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ফরাসী ভাষাকে আরবী ভংগিতে বলতে শুরু করেন। যখন তিনি দেখেন যে, দেওয়ানী আইনের পত্রে কোন কোন ছাত্র খুবই দুর্বল তখন তিনি আমাদের সকলকে ডেকে পাঠান এবং নির্ধারিত পিরিয়ড ছাড়া আরো অতিরিক্ত পিরিয়ড আমাদের দিয়ে দেন। এই সময় তিনি আইনের অধিকতর জটিল দিকগুলো বিশ্লেষণ করতেন যা নিয়মিত ক্লাসে আমরা শিখে নিতে পারতাম না। আর এই অতিরিক্ত সময় তিনি কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় ব্যতীতই প্রদান করতেন। অথচ আধুনিক কালের কোন কোন ডক্টর এবং প্রফেসরের মত ডক্টর সানহুরী মরহুম ধন্য ব্যক্তি ছিলেন না। এসব ডক্টর তো তাদের গৃহে অনেক বেশী অর্থের বিনিময় ছাত্রদেরকে কোটেশন পড়াতেন। এমনকি এই অন্যায় অবৈধ কর্মতৎপরতার সমালোচনা করার মতও কোন লোক ছিল না। ছাত্রদের অন্তরে সেই শিক্ষকের প্রতি কি সম্মান বোধ জাগবে যার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করার পর ছাত্রদেরকে তার বিল পরিশোধ করতে হয়। শিক্ষকগণ জ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়ে পয়সার জন্য হাত প্রসারিত করলে তা কি মানানসই হয়?

www.amarboi.org

এই কর্মনীতি ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাসই সৃষ্টি করে যে, এই পৃথিবীতে কোন জিনিসই এমনকি জ্ঞানও বস্তুগত বিনিময় ছাড়া লাভ করা যায় না। ফলে ছাত্ররাও শুধু জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞান চর্চা করতে পারে না। বরং তাদের নিকট এই জ্ঞান আর্থিক লাভের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা এই লক্ষ্য পানে পাগলপারা ও হন্যে হয়ে ছুটতে থাকে যাতে বেশী বেশী অর্থ উপার্জন সম্ভব হয়। ধন-সম্পদ অর্জন করা তাদের এক নম্বর লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং যাবতীয় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়। উন্নত দেশসমূহে ছাত্ররা জ্ঞান অর্জন করে এজন্য যাতে বিষয়বস্তু হৃদয়ংগম করতে এবং অর্জিত সেই শিক্ষার সাহায্যে কোন নতুন আবিষ্কার ও মতবাদ উপস্থাপান করতে এবং সৃষ্টি রাজ্যের রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব মানুষের নিকট উদঘাটিত করে দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার এই উদ্দেশ্যই একেবারে বদলে গেছে। এ কারণেই সেসব জাতি দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আর আমরা অনুন্নতই রয়ে গিয়েছি। তারা শক্তিশালী আমরা দুর্বল। আমরা মৌলিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা লাভ করা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছি। জ্ঞান লাভের জন্য ত্যাগ ও পরিশ্রম এখন পুরোনো দিনের কাহিনী। আমরা প্রত্যেকেই নিজের জীবন যাত্রার মান অধিকতর উন্নত সমৃদ্ধ করার চিন্তায় বিভোর । অন্যসব মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করুক তাতে কিছু যায় আসে না। স্বার্থপরতার এই জীবনধারাই আমাদের সর্বনাশ করেছে।

আমি কয়েকবার বলেছি যে, এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে সরকার দ্বীনি সংগঠনগুলোকে এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিয়োগ করুক। মুসলিম ও খৃস্টান নির্বিশেষে ধর্মীয় সংগঠনগুলোই এই সমস্যার সমাধান একযোগে চেষ্টা করে বের করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ ক্লাসের ব্যবস্থা যথাক্রমে মসজিদ ও গীর্জায় করা যেতে পারে। মুসলিমদের নিকট মসজিদ এবং খৃস্টানদের নিকট গীর্জা পবিত্র স্থান। সুতরাং এই সকল স্থানে অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষামূলক ক্লাস থেকে দুর্বল ছাত্রগণও অল্প বিস্তর উপকৃত হতে সক্ষম হবে।

মহিলাদের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভংগী

আমার দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত স্থান ঘর ও গৃহের চার দেয়াল পরিবেষ্টিত স্থান। এর বাইরে তাদের কোন অবস্থান আমি স্বীকার করতে পারি না। বর্তমান যুগের নওযোয়ান ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচলিত আচার আচরণ আমি একেবারেই পসন্দ করি না। নারী ও পুরুষের কোন সহ অনুষ্ঠানে যদি কখনো আমার যোগদানের সুযোগ হয় বিশেষত যেখানে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা বেশী সেখানে লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে আসে। নির্লজ্জের মত বার বার চেয়ে দেখা তো দূরের কথা আমি কখনো কোন পরনারীর চেহারার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। আমি মহিলাদের সমাবেশে বক্তব্য পেশ করা কিংবা মহিলাদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলাও পসন্দ করি না। তথাকথিত সংস্কৃতিবান লোকেরা এই মানসিকতাকে দোষ ও দুর্বলতা বলে মনে করেন এবং কাপুরুষ বলে গালি দিয়ে

www.amarboi.org

থাকেন। এই লোকেরা যা ইচ্ছা তাই বলে বেড়াক কিন্তু আধুনিকতাবাদ ও তার নারী পুরুষের স্বাধীনতার সাথে আমার কি সম্পর্ক ? নারী পুরুষের মধ্যে সাম্যের মতবাদেরও আমার নিকট কোন গুরুত্ব নেই। আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষকে পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই নারীকে নারী প্রকৃতি দ্বারা ধন্য করেছেন। মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি কৌশল এবং তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্তন করতে পারে ? আমাদের সরলমনা যুবক যুবতীদেরকে বাহ্যত সমৃদ্ধি ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার আর্কষণীয় দিকসমূহ দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু তা দ্বারা বাস্তবের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। নারী-পুরুষের এই সাম্যের অর্থ কি ? যে নারী নিজেকে পুরুষের সমান বলে মনে করে সে তার মর্যাদা হারাবার পূর্বেই নারীত্ব থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

যতদিন আমি একজন উকিল হিসেবে প্রাকটিস করেছি ততদিন আমি আমার ব্যক্তিগত সচিবকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম যে, আমার চেম্বারে আমার নিকট যেন কখনো কোন মহিলা একাকী না আসে। যদি কখনো কোন মহিলাকে কোন কাজে আসতে হয় এবং তার সাথে কোন পুরুষ লোক না থাকে তা হলে সেক্রেটারী অবশ্যই তার সাথে যেন আমার অফিসে আসে।

আমাকে একবার আরব আমীরাতে মহিলাদের এক কনফারেন্সে যেতে হয়। সেখানে আমি কোন কোন মহিলার প্রশ্নে নির্ভিকতা ও নির্লজ্জতার বহর দেখে হতবাক হয়ে যাই। আমি ইশারায় ইংগিতে জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। একবার আমি ইটালী গিয়েছিলাম। সেখানকার কুমু শহরের এক হোটেলে অবস্থান করছিলাম। আমার ক্ষৌরকার্য করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই আমি হোটেলের সেলুনে বুকিং করিয়ে পাঠাই। যথা সময়ে আমি সেলুনে গিয়ে উপস্থিত হই এবং দেখতে পাই যে সেখানে ক্ষৌরকার্য সম্পাদনের জন্য মহিলারা কর্মরত। একজনও পুরুষ ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ"আমার ক্ষৌরকার্য কে করবে ?" তখন তারা একটা মেয়ের দিকে ইংগিত করলো। তারপর আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম ঃ "এখানে কোন পুরুষ ক্ষৌরকার নেই ?" তারা বললো ঃ "না"। একথা শুনে আমি ঃ "বললাম তাহলে আমি ক্ষৌরকর্মই করাবো না।" এই বলে আমি আমার রুমে ফিরে গেলাম। এই ঘটনা পুরো হোটেলে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। উপস্থিত সকলেই এটাকে অদ্ভুত ঘটনা মনে করে প্রত্যেকের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করতে থাকে আর আমি সারারাত আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাকি এই জন্য যে, তিনি আমাকে এমন এক দেশে জন্মলাভ করিয়েছেন যেখানে আর যাই হোক অন্তত হালাল হারামের পার্থক্য মানুষ এখনও করে থাকে।

ভুল বুঝাবুঝির অবসান

আমার মতে মহিলাদের ভূমিকা হবে বিশ্বস্ত স্ত্রীরূপে পুরো ঘরকে আনন্দ মনজিল এবং জান্নাতসম বানিয়ে দেয়া। আমার স্ত্রী ছিলেন ঠিক এ ধরনেরই একজন মহিলা। সে আমার সন্তানদের গর্ভে ধারণ করে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাদেরকে উত্তম রূপে

www.amarboi.org

লালন পালন করে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আমার ছেলেমেয়েরা যার সাথেই মিশুক না কেন তার সাথেই সম্মানজনক ব্যবহার করে এবং বিনিময়ে তারাও অনুরূপ সৌজন্যমূলক ও ভদ্রজনোচিত ব্যবহার লাভ করে থাকে। আমি এখানে একটা ভুল বুঝাবুঝিও চিন্তাজগত থেকে দূর করে দিতে চাই। আমার এসব কথাবার্তা থেকে কখনো যেন এরূপ ধারণা না করা হয় যে, নারী জাতির প্রতি আমার রয়েছে বিদ্বেষ ও ঘৃণা। কখ্খনো নয় আল্লাহ্ তায়ালা সাক্ষী এবং তিনি জানেন নারী জাতিকে আমি কত বেশী সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আর আমার এই মনোভাব ও অনুভূতি প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের প্রতি অনেক বেশী সম্মান বোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি তাদেরকে অন্যদের অসৎ উদ্দেশ্যের শিকার ও কুদৃষ্টি থেকে পরিপূর্ণভাবে নিরাপদ দেখতে চাই। আমি নারী শিক্ষার বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক। আমি সবর্দাই এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছি যে, নারীদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে হবে। যাতে তারা তাদের নারীত্বের পূর্ণাংগ বিকাশ ঘটাতে পারে। এবং সতীত্ব ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। আমি চাই নারীদের ব্যাপারে প্রচলিত সমস্ত সন্দেহ সংসয়ের অবসান হোক। ইসলামী বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা নারীদের অধিকার ও কর্তব্য এবং শাস্তি ও পুরস্কারের দিক দিয়ে পুরোপুরি পুরুষের সমকক্ষ বানিয়ে দিয়েছেন। নারীর কাম্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে। মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ পরস্পর সমান। উভয়ের রয়েছে কর্মের আপন গন্ডি। তথাকথিত আধুনিকতা ও প্রগতিবাদীদের সাম্য এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সাম্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাচীন প্রতিনিধিত্ব

ইউনিভারসিটিতে অধ্যয়নরত ছাত্র থাকা কালেই রাজনৈতিক কার্যক্রমে খুব আন্তরিকতার সাথে অংশ গ্রহণ করতে থাকি। এই পর্যায়ে আমি অফদ পার্টির একজন ঐকান্তিক সমর্থক ছিলাম। আমি অধিকাংশ সময় "উম্মাহ্ হাউসে" যাতায়াত করতাম। আমার মনে আছে সা'দ জগলুল পাশা "কাশকুল" পত্রিকা নেয়ার জন্য কোন ছাত্রকে পাঠিয়ে দিতেন। পত্রিকাটি ছাপার সাথে সাথেই তিনি তা চেয়ে পাঠাতেন। এই পত্রিকায় মুদ্রিত কার্টুন সমূহ তিনি খুবই কৌতুহলের সাথে দেখতেন। এই পত্রিকাটি অফ্দ পার্টি এবং তার নেতৃত্বের কট্টর বিরোধী ছিল। এতে সা'দ জগলুল ও তার পার্টির ওপর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নগ্নভাবে হামলা করা হতো। এবং ব্যঙ্গচিত্রও ছাপা হতো। কিন্তু তিনি কখনো এসব লেখা ও কার্টুন দেখে অসন্তোষ কিংবা উত্তেজনা প্রকাশ করতেন না।

আমি যদিও অফ্দ পার্টির লোক ছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসমাঈল সিদকী পাশা মরহুম সম্পর্কে আমি বিশেষ মতামত পোষণ করতাম। অধিকাংশ লোকই আমার এই দৃষ্টিভংগির সাথে দ্বিমত পোষণ করতো। তবে একথা সত্য যে, সিদকী পাশা জনসাধারণের মধ্যে কখনো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। জনগণের ওপর দমননীতি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এসব সত্ত্বেও আমি নিজের পার্টির এই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কিছু মহৎগুণের ভক্ত ছিলাম।

www.amarboi.org

সিদকী পাশা মিসরীয় জাতি সম্পর্কে বলতেন যে, এরা প্রতিটি সরকারের অনুগত এবং উদীয়মান সূর্যের পূজারী। এই দৃষ্টিভংগী পোষণ করার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জনগণের সাথে তার আচরণ অত্যাচার ও উৎপীড়নের ওপর ছিল ভিত্তিশীল। তথাপি নিসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার রাজনীতিবিদ। তিনি তার রাজনীতিকে দেশে বিরাজিত পরিস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল যদি (ইংরেজদের থেকে) পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা সম্ভব না হয় তাহলে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। (পক্ষান্তরে অফ্দ পার্টির নেতা এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা সা'দ জগলুল পাশা জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলতেন বিদেশী আধিপত্যবাদের কবল থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করতে হবে নতুবা শুরু করতে হবে অসহযোগ আন্দোলন।) রাজনৈতিক ময়দানে সিদকী পাশার এই দৃষ্টিভংগী ভ্রান্ত ছিল না। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা লাভের জন্যে লাগাতার সংগ্রাম অব্যাহত রেখে আংশিক অধিকার ও আযাদী আদায় করে নেয়াতে কোন ক্ষতি ছিল না।

ইনসাফের দাবী

সম্ভবত আজও মানুষের মনে আছে যে, সিদকী পাশা তার মন্ত্রীত্বের সময় আলেকজান্দ্রিয়াস্থ আল কুরনীশ রাজপথ নির্মাণের ঠিকাদারী দানতুমার কোম্পানীকে দিলে তখন চার দিক থেকে তার ওপর বিশ্বাস ভঙ্গের অপবাদ আরোপ করা হয়। পরবর্তীকালের ইতিহাস অবশ্য প্রমাণ করে যে, এ অভিযোগ ছিল মিথ্যা। এই কুর্নিশ সড়ক অদ্যাবধি আলেকজান্দ্রিয়াতে বিদ্যমান। এবং এর পরিপাটি রূপ সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করছে। আলেকজান্দ্রিয়ার এই মহাসড়ক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাসমূহের অন্যমত। সড়কটির উপযোগিতা এখন আর কারো অজানা নয়। এই সড়ক আলেকজান্দ্রিয়ার জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে এনেছে। যতদিন আলেকজান্দ্রিয়া থাকবে ততদিন এই সড়কও থাকবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, যেসব লোক এই সৌন্দর্যমন্ডিত ও লাভজনক উপঢৌকন আলেকজান্দ্রিয়াকে দিয়েছে আজ কেউ ভুলেও তাদেরকে স্মরণ করে না।

সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য ছিল খুবই প্রবল। কিন্তু মতবিরোধকারীগণ ছিলেন কাজের মানুষ। জাতীয় ইস্যুগুলোতে মতোভেদ যত তীব্রই হোক তারা পরস্পরে অত্যন্ত সৌহার্দ ও বন্ধু প্রতীম সম্পর্ক বজায় রাখতেন। একজন অন্যজনের কাছে আসা যাওয়াও করতেন। এবং সন্ধ্যায় একই আসরে সমবেত হয়ে সকলে গল্প গুজবে মেতে উঠতেন। আজকাল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক মনোভাব বিদ্যমান এবং দলীয় হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতা ব্যাপক তখনকার দিনে এর নাম নিশানাও ছিল না। রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিসমূহের মধ্যে যে ব্যাপক শত্রুতা ও দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী বিদ্যমান তৎকালে তার কোন নাম গন্ধও ছিল না। কোন ক্ষমতাসীন দলই নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিতে প্রস্তুত হয়

www.amarboi.org

না। বরং বিজয় লাভের জন্য সকল প্রকার বৈধ অবৈধ কূটকৌশল অবলম্বন করে। অথচ মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন নজীরও রয়েছে যে, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ভরাডুবি হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া পাশা ইব্রাহীমের মন্ত্রীত্বের আমলে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভাবনাময় দল পরাজয় বরণ করে এবং অফ্‌দ পার্টি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয় লাভ করে। এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্প্রীতি সৌহার্দ থাকার কারণে কোন প্রকার রাজনৈতিক শত্রুতা কিংবা তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি।

আমাদের মতে মিসরের কোন লোকই নির্বাচনের বিরোধিতা করে না। বিজয়ী ও বিজিত সকলেই নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু দুঃখজনক কথা হলো দলভিত্তিক বর্তমান রাজনীতিতে ক্ষমতার মসনদে প্রতিষ্ঠিত দল নির্বাচন নামক প্রহসন করা সত্ত্বেও কখনও ইনসাফপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে দেয় না। তাদেরকে তো যে কোন মূল্যে নির্বাচনে বিজয় লাভ করতেই হয়। যদিও জনগণ তাদের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থাই প্রকাশ করুক না কেন, তাতে কিছুই যায় আসে না। বিশ্বসভায় আমরা কখনো প্রকৃত সম্মান অর্জন করতে পরবো না যা আমরা কামনা করে থাকি ; যদি আমরা আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে আমূল পরিবর্তন সাধন না করি।

আইন ব্যবসা শুরু

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর আমি কর্ম জীবনের প্রারম্ভে উতবা খাজরা এলাকায় জনৈক উকিল সাহেবের দপ্তরে শিক্ষাণবিশী করি। উকিল সাহেবের নাম ছিল ইব্রাহীম বেগ জকি। তিনি প্রথমে জজ ছিলেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রাকটিস শুরু করেছিলেন। আমি আজীবন মাযহাবের গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে ছিলাম। এবং কখনো এরূপ চিন্তা করিনি যে, কাউকে মুসলিম হতে হলে তাকে অবশ্যই মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করতে হবে, যদি সে মাযহাব ভুলের ওপর থাকে তবুও। আবার কেউ খৃস্টান ধর্মের অনুসারী বলে তার বিরুদ্ধাচরণ করাও জরুরী যদিও সে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। জানি না সাদাতের সময় কোন্ শয়তান মাযহাবের পক্ষপাতিত্বের এই ফিতনা আমদানী করে এবং সাম্প্রদায়িক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অথচ মিসর ভূমিতে এরূপ ফিতনা ও বিপর্যয় কখনো স্থান পায়নি তা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। এখানকার প্রত্যেক শহরেই মিসরীয়রা বাস করতো এবং অন্যদেরকে মিসরীয় বলে মনে করা হতো। দ্বীনের প্রত্যেক অনুসারী কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই এবং কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীতই নিজ নিজ পরিমন্ডলে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন অতিবাহিত করছিলো।

শিক্ষাণবিশীর মেয়াদ শেষ করার পর শাবিনুল কানাতির অঞ্চলে আমি আমার নিজস্ব দপ্তর খুলে বসলাম। সত্য কথা বলতে কি ! আমি আমার পেশায় না ছিলাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর না একেবারেই অখ্যাত ও অজ্ঞাত বরং এ দু' প্রান্তিকের মাঝামাঝি ছিল আমার অবস্থান। কালুবিয়াহ্ কমিশনারীর প্রত্যেক আদালতে আমার হাতে কোন না কোন মোকদ্দমা অবশ্যই থাকতো। তাছাড়াও আল্লাহর মেহেরবানীতে সারা দেশ

www.amarboi.org

থেকে আমার নিকট মামলাসমূহ আসতো। উত্তর দিকে দূরতম স্থান যেখানে আমার মামলার তদবীর করার জন্য যেতে হয় উহার নাম ছিল তানতা। আবার দক্ষিণ দিকে সুদূর এলাকায় অবস্থিত আদালাত যেখানে মামলাসমূহ রুজু করা হতো তার নাম ছিল তাহতার আদালত, এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

সততা ও দ্বীনদারী

আমি আমার পেশা জীবনের প্রারম্ভেই আল্লাহর নামে শপথ করেছিলাম যে, মক্কেলদের কখনো প্রতারণার মধ্যে ফেলে রাখবো না। কোন বাদী কিংবা বিবাদী কোন দেওয়ানী মামলা নিয়ে আমার কাছে আসলে আমি তার কেসটি তার মুখেই বিস্তারিত শুনে নিতাম। প্রয়োজনীয় দস্তাবেজ যেমন কেসের তারিখ, প্রেক্ষাপট, সাক্ষী এবং আনুসংগিক অন্যান্য সকল ব্যাপারে পুরো তথ্য নিয়ে নিতে চেষ্টা করতাম। মোকদ্দমা সত্য হলে তা তদবীর করতে সম্মত হতাম এবং সংগে সংগেই আদি অন্ত ও সাক্ষী ইত্যাদি দেখে যদি মনে হতো যে, এই মোকদ্দমায় জিতে যাবো তাহলে মক্কেলকে বলে দিতাম ঠিক আছে মামলা দায়ের করে দিচ্ছি। আর যদি কেসের প্রকৃতি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারতাম যে, এ কেসে সফলতার কোন সম্ভাবনা নেই। তা হলে অকপটে মক্কেলকে বলে দিতাম, অনর্থক পয়সা খরচ করবেন না। বরং প্রতিপক্ষের সাথে আপোষ-মীমাংসা করে ফেলুন। কেস গ্রহণের অর্থ কখনো এই ছিল না যে, এরূপ কেস শতকরা একশত ভাগই সাফল্য লাভ করতো। বরং এ হতো আমার প্রাথমিক ধারণা ও অনুমান মাত্র। অনেক সময় এমনও হতো যে, যে মামলা আমি হাতে নিয়েছিলাম সে হেরে গেছে আর যার কেস আমি গ্রহণ করিনি সে জিতে গেছে। আমি মূলত আমার উপার্জন হালাল পন্থায় করতে চেয়েছি। এজন্যই মোকদ্দমাসমূহের সত্যতা ও যথার্থতা এমন কি জয়লাভের জন্য উপস্থাপিত ঘটনাপ্রবাহ এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ মূল্যায়ণ করে নিতাম। আমার অনুমান ভুলও হতে পারতো কিন্তু আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস ও আগ্রহ উৎসাহ এই লক্ষ্যে পরিচালিত হতো যে, মোকদ্দমা দায়েরকারীকে তার তদবীরের খরচতো অন্তত বহন করতে হবে। বাকী ফলাফলের নিশ্চিত জ্ঞান তো আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সুস্পষ্ট নয়। অবশ্য ফৌজদারী মামলায় আমি যখনই অনুমান করতে পেরেছি এবং যখনই কোন ফায়সালার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেছি তখন সর্বক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ব্যক্তি হয় মুক্তি লাভ করেছে নয়তো অপরাধীর শাস্তি কিছুটা লাঘব করা হয়েছে। মোকদ্দমার ফাইল ও রেকর্ডপত্র দেখে আমি সেসব বিষয় বুঝে ফেলতাম যার ভিত্তিতে আদালতে দলিল-প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাতে সফলতা আসতো।

নির্বাচনে অংশ গ্রহণ

এমনিতে আমার পেশাগত জীবন অব্যাহত ছিল। আল হামদুলিল্লাহ এতে আমি বেশ সফলও হয়েছি। এই পর্যায়ে আমি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মনোনীতি প্রার্থী হিসেবে বেশ কয়েকবার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করি কিন্তু একবারও সফলকাম হতে

www.amarboi.org

পারিনি। কারণ নির্বাচনের নিয়ম-নীতি এবং তাতে জয়লাভের জন্য প্রকাশ্য ও গোপনীয় কৌশল সম্পর্কে আমি একেবারেই অবহিত ছিলাম না। নির্বাচনে জেতার জন্য সাধারণত এমন সব তদবীর করা হয় যা নৈতিকতা বা শরীয়াত কোনটাই অনুমোদন করে না। যেমন মিথ্যা খবর ও প্রচার-প্রপাগান্ডা, ঘুষ-স্বেচ্ছাচারিতা ও ভয় ভীতি প্রদর্শন। এসব হাতিয়ার আমার ছিল না এবং যে দ্বীনের আমি অনুসরণ করি তার শিক্ষার মধ্যেও এগুলো ছিল না। এসব নোংরা কূটকৌশল থেকে সর্বদা আমি আমার দেহ ও আত্মাকে রক্ষা করে চলি। সাধারণ মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ভাল। মজার ব্যাপার হলো এই যে, কালউবিয়া অঞ্চলে অফ্‌দ পার্টির লোকেরাও আমাকে তাদের দলের সদস্য বলে মনে করতো এমনকি হিযবুল আহ্‌রার এর দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণও আমার নাম তাদের দলের সদস্য তালিকায় লিখে নিতো। সকলের সাথেই বন্ধু প্রতীম সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। লজ্জা শরমের কারণে আমি নীরবে আমার কাজ করে যেতাম। যতদিন পর্যন্ত আমার নিকট ইসলামের সীমানা এবং হালাল হারামের চৌহদ্দি থেকে বাহির হয়ে যাওয়ার দাবী না করা হয় ততদিন তাদের সাথে আমি আমার সম্পর্ক খারাপ করতে পারি না। এ ছিল আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা। সৃষ্টিগতভাবেই আমার স্বভাব প্রকৃতি এরূপ ছিল।

আত্মপ্রচার বিমুখতা

কোন কোন সময় মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমার ছাত্রজীবনে যে সকল ছাত্র বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনে বিজয়ী হতো এবং যাদের নাম সমসাময়িক সংবাদপত্রে ছাপা হতো আমার নাম তাদের সাথে কেন দেখা যায় না।

এর জবাব হলো আমার স্বভাব-প্রকৃতি বড়ই বিস্ময়কর। খ্যাতি নামধাম এবং প্রচার প্রপাগান্ডার প্রতি আমার রয়েছে ঘৃণা। এখনো পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যেসব লোক আমাকে জানে তা একান্ত অনিচ্ছাকৃত ও আমার অপারগতারই ফল মাত্র। যদি আমার সাধ্যাতীত না হতো তা হলে আমি এমন সংগোপনে ও নীরবে থাকতাম যে, কেউ আমার নাম পরিচয় জানার সুযোগও পেতো না। পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে। তাছাড়া দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে আমাকে এসব কিছুই মেনে নিতে হয়েছে। আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার জন্য ইখওয়ানের বাইয়াত বিশেষত নিয়তের বিশুদ্ধতার ওপর ভিত্তিশীল। ইখওয়ানের নেতৃত্বের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সাহিত্য সাময়িকীতে আমার আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এতে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ব্যতীত সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য আমার নেই। আল্লাহ তায়ালা তো অন্তর্যামী। তিনি মানুষের নিয়ত ও মনের অবস্থা খুব ভালভাবেই জানেন। হৃদয়ের গভীরে লুকায়িত গোপনীয় বিষয়টিও তিনি ভালভাবে জানেন।

আপনি দেখছেন যে পারিবারিক পরিবেশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তা ছিল অনাবিল দ্বীনি পরিবেশ। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাও সর্বদা এই ছিল যে, নিষ্কল ও

www.amarboi.org

অনর্থক কাজকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করে চলি। আমার মরহুম পিতার কঠোর তত্ত্বাবধান এবং স্বীয় সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রভাব আমার নীরব প্রকৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। তাছাড়া আমি সবর্দা গুণীজনদের মজলীশে গিয়ে বসা এবং তাদের সাথে চলাফেরা করারও প্রয়াস পেতে থাকি। তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা ছিল আমার দ্বিতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কৃত্রিমতা আমি কখনো পসন্দ করি না। আমি অন্যদের আবেগ অনুভূতির প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার এই ব্যক্তিত্ব গঠন করেছে আজ যা আপনারা আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

আমার মনের একটা দৃঢ় সংকল্প হচ্ছে, আমার কোন কথা ও আচরণ দ্বারা আমি কখনো কোন মানুষের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবো না। কেউ আমাকে কোন কষ্ট দিলে বা ক্ষতি করলেও না। ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শগতভাবে আমি তার বিরোধী হলেও না। এ কারণে আজীবন কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো কোন লোকের সাথে আমার কোন প্রকার বিরোধ ও সংঘাত হয়নি। অবশ্য দাওয়াতে হকের আন্দোলনে কিছু লোক আমার সাথে সীমাহীন দুর্ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের সেই অত্যাচার ও নির্যাতনের মোকাবেলায় আমি এই সান্ত্বনাই পেতে চেষ্টা করতাম যে, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত তাদের জুলুম ও নিপীড়ন আমার ব্যক্তিগত কোন অশোভনীয় আচরণের ফল নয় বরং তাদের ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতা-ই এর মূল কারণ। আমি তাদের সকল অত্যাচার উৎপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে সহ্য করেছি এবং কোন প্রকার অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশ না করেই জালিমদের মোকদ্দমা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে এসেছি। ইবরাহীম আবদুল হাদী মরহুম এবং জামাল আবদুল নাসের মরহুমের হাতে বর্ণনাতীত অত্যাচার সহ্য করেছি। তথাপি আমি কখনো তাদের সম্পর্কে আমার অন্তরে না কোন প্রতিহিংসা লালন করেছি, না কোন অশালীন বাক্য প্রয়োগ করেছি। তা করার প্রয়োজনই বা আমার কি ! যখন পুরো বিষয়টা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাপরাক্রমশালী ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার মালিকের নিকট সোপর্দ করা আছে। তখন তাঁর ফায়সালার প্রতি কৃতজ্ঞ ও পরিতৃপ্ত থাকাই আমার কর্তব্য।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইখওয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক এবং ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের সাথে আমার সাক্ষাতের ঘটনা বড় হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়। এ সাক্ষাতকারের সূচনাপর্ব শুনেই আপনি সমাপ্তি পর্বের বিবরণ উপলব্ধি করতে পারবেন। আমি যখন ওকালতির ব্যবসায় গ্রহণ করি তখন শাব্বিনুল কানাতের এলাকায় দপ্তর খুলে বসি। আমার বাসস্থান ছিল চেম্বার থেকে এগার কিলোমিটার দূরে তিলমেসানী ফার্মে। আমি ঘর থেকে অফিসে যাতায়াতের সময় বাস এবং রেলগাড়িতে ভ্রমণ করতাম। গৃহে আমার কাজ ছিল মুরগী পালন। এই খামারে আমি আমার মানসিক প্রশান্তির জন্য যে মুরগীর খামার খুলেছিলাম তাতে মোরগ-মুরগী ছাড়াও নানা জাতের কবুতর এবং খরগোশও পালতাম। এই ফার্মেই ছিল আমার থাকার ঘর। এবং সেখানেই ছিল মনোলোভা এক পুষ্পোদ্যান।

১৯৩৩ সালের প্রথম দিকের কথা। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি তখন ফুল বাগানে বসে ছিলাম। ফার্মের চৌকিদার এসে আমাকে খবর দিলো যে দু'জন আপ টু ডেট লোক আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। আমি আমার পরিবার পরিজনকে অন্দর মহলে চলে যাওয়ার জন্য ইংগিত করলাম এবং চৌকিদারকে মেহমানদের ভেতরে নিয়ে আসার নিদের্শ দিলাম। দু'জন যুবকই ভিতরে প্রবেশ করলো এবং তাদের পরিচয় প্রদান করলো। তাদের একজন ছিলেন ইজ্জত মুহাম্মাদ হাসান আর অপর জনের নাম ছিল মুহাম্মাদ আবদুল আল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন শাব্বিনুল কানাতের কসাইখানার কর্মচারী এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন ডেল্‌টা রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার। মেহমানদের স্বাগত জানানো ও আতিথেয়তায় কিছু সময় কেটে গেল। চা পান শেষে ইজ্জত মুহাম্মাদ হাসান নীরবতা ভংগ করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এখানে কি করেন ?" এ ধরনের প্রশ্ন আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। আমি তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেলাম এবং কৌতুকের ভংগীত জবাব দিলাম, "আমি এখানে মুরগীর বাচ্চা পুষি।"

আমার কৌতুককর জবাবে মেহমানদের স্নায়ুর ওপর অস্বাভাবিক প্রভাব পড়লো না। বরং জবাব শুনে ইজ্জত মুহাম্মাদ হাসান বললেন, "আপনার ন্যায় নওজোয়ানদের জন্য মুরগীর বাচ্চা পালনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অপেক্ষা করছে।" আমি এখনো পর্যন্ত গাম্ভীর্যের পরিবর্তে রসিকতা পূর্ণ মেজাজেই কথাবার্তা শুনছিলাম। সুতরাং আমি সেই ভংগিতেই পুনরায় প্রশ্ন করলাম, "সেটা কি জিনিস যা মুরগীর বাচ্চা অপেক্ষা অধিক আমার মনোযোগ ও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ?" মেহমান গাম্ভীর্য সহকারে প্রত্যুত্তরে আরজ করলেন, "মুসলিমগণ আপনার মনোযোগ লাভের অধিক উপযুক্ত। তারা তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং এই উদাসীনতা তাদেরকে এতবেশী প্রভাবহীন করে দিয়েছে যে, তাদের নিজের দেশেও তাদের কোন গুরুত্ব এবং বিন্দুমাত্র ইজ্জত ও সম্মান নেই। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থান তো না থাকার সমান।"

www.amarboi.org

"আমি এই জটিল ব্যাপারে কি করতে পারি বলুন। আমার শক্তি সামর্থইই বা এমন কি আছে?"

মেহমানগণ বললেন যে, এ ময়দানে আপনি একা নন। বরং আপনার মত যুবকদের একটা সংগঠন গঠিত হয়েছে। এক মহান ব্যক্তি সাইয়েদ হাসানুল বান্না এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং মুর্শিদে আ'ম। কিছুদিন পর সেই যুবক দু'জন পুনরায় আমার দপ্তরে আগমন করেন এবং আমাকে বলেন যে, সাইয়েদ হাসানুল বান্নার সাথে আমার সাক্ষাতের কর্মসূচী তৈরী হয়ে গেছে। মুর্শিদে আ'ম কায়রোস্থ ইলিকিনিয়া রোডের ছিরামিয়া এলাকায় আবদুল্লাহ বেগ মহল্লায় থাকতেন।

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আমি মুর্শিদে আ'ম-এর বাসার দরজায় গিয়ে পৌছি। দরজার কড়া নাড়তেই বড় দরজা খুলে গেলো। আমি দ্বারদেশে করাঘাত করলাম এবং জবাবে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম "কে"? আমি বললাম ঃ "শাব্বিনুল কানাতির থেকে আগত এডভোকেট ওমর তিলমেসানী"। সংগে সংগে তিনি ওপরের কক্ষ থেকে নীচে নেমে আসেন এবং আমাকে স্বাগত জানান। অনন্তর বাইরের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার সময় ডান পার্শ্বে যে কামরা ছিল তার দরজা খোলেন। আমি মেজবানের পেছনে পেছনে সেই রুমে গিয়ে প্রবেশ করি। কক্ষটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই কামরার মধ্যে কি আছে তা আমি মোটেও অনুমান করতে পারলাম না। মেজবান কক্ষের একমাত্র জানালাটি খুলে দিলে ভেতরে আলো প্রবেশ করলো। তখন আমি লক্ষ করলাম যে কক্ষটি অত্যন্ত সাদাসিদে এবং সাদা গোছের ছোট একটা অফিস। দপ্তরের মধ্যে রাখা ছিল কয়েকখানা চেয়ার যেগুলো গতানুগতিকভাবে কাঠ মিস্ত্রীদের হাতে তৈরী। চেয়ারগুলোর ওপর কিছু ধূলাবালি জমে ছিল। মেজবান একটি চেয়ারে বসলেন এবং আমার বসার জন্যে অপর একটি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। মূল্যবান সুট পরে সেই চেয়ারে বসা আমার কাছে কিছু অপসন্দনীয় মনে হলো। কিন্তু আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে চেয়ারের ওপর বিছিয়ে বসে পড়লাম। মেজাবান কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর ঠোটে স্নেহ দরদভরা হাঁসি যেন নৃত্য করছিল।

আমি লক্ষ্য করলাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, মুর্শিদে আ'ম হয়তো আমার এই কীর্তিকলাপ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। এখানে দু'টি ভিন্ন পথ ছিল। যে ব্যক্তি ফ্যাশন পূজারী এবং উন্নত ও মূল্যবান পোশাকের প্রতি যত্নবান সে দাওয়াতে হকের কঠিন রাস্তায় কিভাবে চলতে পারবে? কোথায় বাহ্যিক কেতাদূরস্ত ঢঙে চলা আর কোথায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দাবী? দাওয়াতে হকের দায়িত্ব তো জীবনে কঠোর পরীক্ষা বিপদাপদ নিয়ে আসে। এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলে আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাস সবকিছুই ত্যাগ করতে হয়। দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত বরদাশ করতে হয়। একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার জ্বালা সইতে হয়।

আমার বাহ্যিক জাঁকালো অবয়ব সত্ত্বেও মুর্শিদে আ'ম এর চেহারায় কোন প্রকার অস্বস্তি বা অস্থিরতা ছিল না। সাধারণ মানুষ হলে আমাকে দেখা মাত্র দাওয়াতে

www.amarboi.org

হকের দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত মনে করে বসতো। কিন্তু মুর্শিদে আ'ম অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার কাছে তার পয়গাম ও কর্মসূচী পেশ করতে শুরু করলেন। কি ছিল তার পয়গাম? তার পয়গামের মূল কথা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ছিল যে, "শরীয়াতের বিধি-বিধানের পরিপূর্ণ বাস্তাবায়ন করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি ও অনুভূতির তীব্রতা সৃষ্টি করতে হবে। সর্বসাধারণের সম্মুকে এই সত্য উদঘাটিত ও সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে হবে যে, কোন প্রকার কল্যাণ ওঁ মঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কারো থেকে লাভ করা সম্ভব নয়। তাঁর দেয়া জীবন বিধান ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করতে হবে ...."

"হাসানুল বান্না শহীদ অত্যন্ত সফল ও কার্যকর ভংগিতে দাওয়াত পেশ করলেন। আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাঁর সমস্ত কথা শুনলাম। তাঁর কথা বলার মাঝে আমি একবারও কোন কথা বলিনি। বক্তব্য শেষ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারছেন?" আমার মুখ খোলার পূর্বেই তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, "দেখুন! এখনই জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। আপনাকে পুরো এক সপ্তাহ্ সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে খুব গুরুত্বের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। হৃদয় দিয়ে অনুভব করুন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মূল্যায়ণ করুন। স্বীয় বিবেকের রায় গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে পিকনিক কিংবা আনন্দ ভ্রমণের দাওয়াত দিচ্ছি না। আমি আপনাকে যে কথার দিকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি তা অত্যন্ত দুঃসাহসী লোকদের কাজ। আপনার মন যদি এতে সাড়া দেয় এবং আল্লাহ্ তায়ালা এ কাজের জন্য আপনার হৃদয় মনকে উদার ও উন্মুক্ত করে দেন তা হলে খুবই ভাল কথা। আগামী সপ্তাহে বাইয়াতের জন্য আসুন। আর যদি এ কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারেন তা হলেও কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আপনি অন্তত ইখওয়ানুল মুসলিমুনের একজন হিতাকাংখী বন্ধু।"

যে ঈমান সঞ্জীবনী মজলিশে বসার এবং অতুলনীয় কথাবার্তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি তারপরও কি কেউ বাইয়াত (আনুগত্য শপথ) গ্রহণ করতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করতে পারে? (কিন্তু যেহেতু মুর্শিদের নিদের্শ ছিল তাই সে দিনের মত) আমি চলে আসলাম এবং আদেশ মোতাবেক এক সপ্তাহ্ পর পুনরায় যথা সময়ে গিয়ে হাজির হলাম। আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ভরসা করে হাসানুল বান্নার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এই বাইয়াত ছিল আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সৌভাগ্যজনক ঘটনা। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দিরও অধিক সময় যাবৎ কাজ করার সম্মান আমি লাভ করেছি। এই বাইয়াতের পর যখন থেকে আমি হকের রাস্তায় চলতে শুরু করলাম তখন থেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিপদ-মুসিবতের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে আমাকে চলতে হয়েছে। এসব ঘটনা এখন ইতিহাসের অংশ। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার পশ্চাতে আমার রবের সমীপে তার যথাযথ পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (আমার বিনম্র প্রার্থনা) এসব ত্যাগ ও কুরবানী শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য গণ্য হোক এবং এর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকটই নির্ধারিত থাকুক।

www.amarboi.org

আমার মনের ঐকান্তিক আকাংখা হলো, আজকের যুবক মুসলিমগণ এই বৃদ্ধ (তিলমেসানী) থেকে যিনি তাঁর জীবনের আশিটি বসন্ত পেরিয়ে এসেছেন এই শিক্ষা গ্রহণ করুক যে, আল্লাহ্ তায়ালা (পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য থেকে) যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তা অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে সহ্য করতে হবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার মর্জির ওপর সবর্দা সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালার কোন ফায়সালা এবং ভাগ্যের ব্যাপারে তিল পরিমাণ আপত্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। আমার আরো কামনা হলো সর্বদা আল্লাহর রহমাত ও সাহায্য আমার ওপর বর্ষিত হতে থাকুক আর যখন আমি এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরদিনের তরে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করবো তখনো যেন আল্লাহর পথের একজন সৈনিক হিসেবে তার নিকট যেতে পারি। আমার আন্তরিক বাসনা হলো আমার সমস্ত আশা ভরসা ও চাওয়া পাওয়া যেন আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত থাকে। তার সত্য প্রতিশ্রুতির ওপর থাকে আমার এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাস যা অনুরণিত হয় আমার প্রতিটি শিরা উপশিরায়। যে পর্যন্ত আমার এমন সৌভাগ্য ও মর্যাদা লাভ না হয়ে যায় যে, আমি আমার নিজ চোখে আমার মাওলা ও মনীব এবং প্রভু ও প্রতিপালককে দেখতে পাই অথবা আপন হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারি। আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই নিরাপত্তা ও সফলতার যোগ্য তাকওয়ার অধিকারীগণকেই বানিয়েছেন। আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এই দোয়া করছি তিনি যেন আমাকে ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সকল সদস্যকে সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করেন এবং আমাদেরকে তার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের উপযুক্ত বানিয়ে দেন......... ।"

ইমাম হাসানুল বান্নার সাথে আমি আমার প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী বর্ণনা করলাম। আমাদের মধ্যে যে কেউ-ই ইমামের সাথে সাক্ষাত করেছেন সে-ই এ ব্যাপারে অবগত যে শহীদ আমাদের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদেরকে কোন মিথ্যা আশ্বাস দেননি। আমাদেরকে তিনি এমন কথা কখনো বলেননি যে, এই পথে পা রাখার সংগে সংগেই সমগ্র পৃথিবী আমাদের স্বাগত জানানো ও বরণ করে নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিংবা আমাদের গলায় ফুলের মালা পরাতে এগিয়ে আসবে অথবা জীবনের ভোগ বিলাস ও আরাম-আয়াসের উপায় উপকরণ অপেক্ষা করতে থাকবে। না কখ্খনো নয়। বরং তিনি আমাদেরকে সর্বদা সাবধান ও সর্তক করে দিয়েছেন যে, দাওয়াতে হকের রাস্তা কন্টকাকীর্ণ কঠিন উপত্যকা পরিক্রমা মাত্র। বড়ই বন্ধুর ও দূরতিক্রম্য এই পথ, যে কেউ-ই এই দাওয়াত কবুল করতে এগিয়ে আসুক না কেন তাকে ভালভাবে বুঝে শুনে অত্যন্ত সাবধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তারপর যখন নির্যাতনের যাতাকলে ঘুরতে আরম্ভ করবে তখন কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয়। বরং বলিষ্ঠ হাতে ধৈর্যের লাগাম ধরে স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মুর্শিদে আ'ম কখনো কাউকে প্রতারিত করেননি। বরং প্রথম থেকেই এই পথের দাবী সম্পর্কে অবহিত করে এসেছেন।

অতপর তারা যখন সাহসের সাথে কোমর বেঁধে এই কাফেলার সংগে চলতে থাকে তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। তাদের

www.amarboi.org

আন্তরিক সম্পর্ক এত গভীর যে, মানুষ তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। এমনকি কেউ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "যদি কোন ইখওয়ানী আলেকজান্দ্রীয়ায় চীৎকার করে উঠে তা হলে আসওয়ানের ইখওয়ানী তা শুনতে পায়।" আর আমি বলে থাকি যে, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত মজবুত ও নিবিড় যে, ইউরোপে অবস্থানকরী কোন ইখওয়ানী যদি কোন জিনিসের আকাংখা করে আর কানাডায় বসবাসরত কোন ইখওয়ানী তা জানতে পারে এবং বুঝেন যে, তিনি তা পূরণ করতে পারেন তা হলে তার চাওয়ার পূর্বেই তিনি তা পূরণ করে দেবেন। এ জন্য শর্ত শুধু একটিই, তা হচ্ছে এরূপ কামনা বাসনা আল্লাহর আনুগত্যের সীমার মধ্যে হতে হবে, এর বাইরে হওয়া চলবে না।

সত্য পথে চলতে গিয়ে আমি কঠিন মসিবত সহ্য করেছি। কিন্তু কখনো কোন অভিযোগ উত্থাপন করিনি। ইবরাহীম আবদুল হাদী মরহুম এবং জামাল আবদুল নাসের মরহুমের হাতে নির্যাতনের যাতাকলে আমার অন্যান্য ইখওয়ানী সাথীদের মত আমিও বছরের পর বছর ধরে পিষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমি এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কখনো কোন অশালীন উক্তি করিনি। কিংবা মনে কোন প্রকার বিদ্বেষও পোষণ করিনি, কেমনা আমরা বিষয়টি আল্লাহ্ তায়লার নিকট সোপর্দ করে দিয়েছি।

ইবরাহীম আবদুল হাদীর নির্যাতন

১৯৪৮ সালে ইবরাহীম আবদুল হাদী আমাকে সর্বপ্রথম গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য কারাগারে বন্দী করে এবং তুর পাহাড়ে নির্বাসিত করে। কিন্তু মানুষ তার সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও খুবই দুর্বল ও অসহায়। ক্ষমতার যে মসনদে বসে গর্বে ও অহংকারে মানুষের বুক ফুলে ওঠে অথচ সেই মসনদ তার শেষ রক্ষা করতে পারে না। অবশেষে ইবরাহীম আবদুল হাদীও মসিবতে পড়ে যায় এবং তার মসনদও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতএব আমাকে ও আমার অপর দুই কয়েদী বন্ধু জনাব মুহাম্মাদ আল বাহী মরহুম ও উস্তাদ মুহাম্মাদ আল খাদরামীকে (আল্লাহ্ তার হায়াত দীর্ঘায়িত করুন) তুর থেকে তার কাছে ডেকে পাঠায়। পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে আমাদেরকে নিয়ে হাজির করা হয়। আমাদেরকে একটা প্রশস্ত কামরায় নিয়ে বসানো হয়। উজীরে আযম ইবরাহীম আবদুল হাদী তার দফতরে উপস্থিত ছিলেন। আমাদেরকে এক এক করে তার চেম্বারে ডেকে পাঠানো হয়। সর্বপ্রথম মরহুম মুহাম্মাদ আলবাহীর ডাক পড়ে, তারপর উস্তাদ আল্ খাদরামীর এবং সর্বশেষে ডাকা হয় আমাকে। আমাদেরকে একে একে প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করানো হয়।

উস্তাদ আল্ খাদরামী যখন প্রধান মন্ত্রীর কক্ষে উপস্থিত ছিলেন তখন করিম সাবিত পাশা মরহুম (অন্যতম মন্ত্রী) দ্রুত গতিতে বাহির থেকে আসেন। দেখে মনে হচ্ছিল যে, কেউ পেছন দিক থেকে তাকে জোরপূর্বক ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুত গতিতে সে প্রধান মন্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করে এবং কয়েক মিনিট পর তড়িৎ গতিতে আবার বাইরে বেরিয়ে আসে। সে অত্যন্ত অস্থির ছিল। বস্তুত উজীরে আযমের রূঢ়তা ও কঠোরতার কারণে ছোট বড় নির্বিশেষে সবাই তটস্থ ছিল।

www.amarboi.org

বর্বরতা ও পাশবিকতার প্রতীক নাসের

অত্যাচার উৎপীড়ন ও জুলুম নিপীড়নে জামাল আবদুল নাসের ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইবরাহীম আবদুল হাদী ছিল কঠোর ও নিষ্ঠুর। কিন্তু নাসেরের ব্যাপারই তো ছিল আলাদা। ইবরাহীমের অত্যাচার-নির্যাতনের যেখানে সমাপ্তি ঘটতো নাসেরের জুলুম-নির্যাতন সেখান থেকে শুরু হতো। অত্যাচার ও নির্যাতনের এমন সব অমানবিক পন্থা নাসের উদ্ভাবন করেছিল তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করি। সে তার পরে আগমনকারী অত্যাচারীদের সর্বজন স্বীকৃত উস্তাদ হিসেবে পরিগণিত।

শিক্ষা লাভের জন্য দর্শন

ইবরাহীম আবদুল হাদীর শাসনকালের সমাপ্তি ছিল নির্মম ও শিক্ষণীয়। যার বিবেক একেবারে মরে যায়নি সে অবশ্যই এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। ঈদের পূর্ব রাতে বাদশাহ্ উজীরে আযমকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এই জালিম ব্যক্তির পদত্যাগের খবর ঈদের দিন পত্র-পত্রিকায় লাল ব্যানার হেডে মুদ্রিত হয়। প্রত্যেক পত্রিকা তাদের উল্লাস প্রকাশ করতে গিয়ে জাতিকে সুসংবাদ পরিবেশন করে যে, শাহ্ ফারুক উজীরে আযমকে বরখাস্ত করে দেশবাসীকে ঈদের শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদান করেছেন। আহ ! তারপর আগমনকারীগণ এই লাঞ্ছনাকর ও শিক্ষণীয় পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো। কিন্তু ক্ষমতার নেশাতো মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে থাকে। তাই দেয়ালের লিখন কে পাঠ করবে এবং সুবিবেচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ?

পিস্তলের নল

যাই হোক এখন উজীরে আযমের সাথে সাক্ষাতের কাহিনী শুনুন। যখন আমার পালা আসল আমি প্রধান মন্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করলাম। আমার আবা ছিল আমার কাঁধের ওপর। আমি সালাম দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। কিন্তু উজীরে আযমের অবজ্ঞাজনক আচরণ ছিল দেখার মত। সে আমার সালামের জবাব পর্যন্ত দিল না। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সেই সময় তিনি বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে আটকে গিয়েছিল। আমি নিজেই আলোচনার সূচনা করে উজীরে আযমের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জটিলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। এই সময় একজন বড় অফিসার ওমর হোসাইন আমার পিঠের ওপর পিস্তলের নল তাক করে দাঁড়িয়েছিল সম্ভবত সে তখন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনচার্জ ছিল। মনে করুন তার পিস্তলের নল আমার কানপট্টি স্পর্শ করছিলো। একবার মনে করলাম পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তা জ্বালাই। কিন্তু বিবেক বাধা দিলো। কারণ পকেটে এই মুহূর্তে হাত দেয়া নিশ্চিত মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া কিছু নয়। যদিও কক্ষে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বেই সিকিউরিটির লোকজন খুব ভাল করে আমার বডি তল্লাসী করেছিলো কিন্তু যে ব্যক্তি পিস্তল উঁচিয়ে দন্ডায়মান ছিল তার ওপর কি ভরসা করা যেতে পারে যে, আমার হাত নাড়ানোকেই সে প্রধান মন্ত্রীর ওপর আক্রমণের উদ্যোগ

www.amarboi.org

মনে করে গুলী করে বসবে না? এমতাবস্থায় যদি আমি জীবন দিয়ে দিতাম তা হলে আল্লাহ তায়ালার কাছে তা অবশ্যই শাহাদাতের মৃত্যু বলে গণ্য হতো। কিন্তু কোন প্রকার মোকাবিলা ছাড়া জীবনটা দিয়ে দেয়াও তেমন ভাল কোন কাজ নয়।

উজীরে আযমের প্রতিক্রিয়া

কিছুক্ষণ পর প্রধান মন্ত্রী আমার সাথে কথা বলতে শুরু করেন এবং কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই আসল মতলব ব্যক্ত করলেন। তথাপি বিদগ্ধ পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য একটা কথা বলে রাখা জরুরী মনে করি। আর তা হচ্ছে, তার কথার ভংগী আনোয়ার সাদাতের ভংগী থেকে ভিন্ন ছিল। আনোয়ার সাদাদের সাথে সাক্ষাতের সময় "ওমর, ওমর"! বলে সম্বোধন করতো। কিন্তু ইবরাহীম আবদুল হাদী "ওস্তাদ ওমর" বলে কথার সূচনা করেন। তিনি বলেন, "ওস্তাদ ওমর" আমি আপনাকে শুধু তিন্‌টা প্রশ্ন করতে চাই। যদি আপনি সঠিক জবাব দেন তাহলে আপনাকে এবং অন্য সমস্ত ইখওয়ানী কয়েদীদেরকে সংগে সংগে মুক্ত করে দেয়া হবে। এর অন্যথা হলে জেনে রাখুন সব কয়েদীর কয়েদ ও নজর বন্দীর সমস্ত দায় দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তাবে। কেননা আপনারা ইখওয়ানের হাই কমান্ডের সদস্য।

১। আপনাদের অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম কোথায়?

২। সেই ষ্টেশনটি কোথায় যেখান থেকে আপনারা অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে থাকেন?

৩। ইখওয়ানের গুপ্ত সংগঠনের নেতা কে কে?

আমি তাকে যথার্থ উত্তর দিলাম যে, "আপনার এসব প্রশ্নের কোন একটির জবাবও আমার কাছে নেই।" অতএব আমাদেরকে তুরের পরিবর্তে পুনরায় আল হাইকসিতার জিন্দানখানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ইমাম হাসানুল বান্নার শাহাদাত

ইবরাহীম আবদুল হাদীর আমলে ইখওয়ানের যে ভূমিকা ছিল, সুধী পাঠক একটু চিন্তা করলেই স্বাভাবিকভাবেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরা ইবরাহীমের ক্রোধ ও রোষাণলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলাম। কারণ আমরা জনসাধারণকে বিরাজমান পরিস্থিত সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে আসছিলাম। আমরা জাতির মন-মগজে একথা বদ্ধমূল করে দিচ্ছিলাম যে, দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হচ্ছে। এবং সরকার জনগণের যাবতীয় অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। এটা ছিল সেই সময়ের কথা যখন "আযাদ অফিসার কিংবা মুক্ত কর্মকর্তাগণের" নামও কেউ শুনেনি। জাতির মধ্যে উপলব্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করুন। অতপর আমাদের সম্পর্কে বিপ্লবী "আযাদ অফিসারগণের" তৎপরতাও নিরীক্ষণ করুন। আবদুন নাসের ও তার সহযোগীরা আমাদেরকে বিপ্লবের শত্রু উপাধিতে ভূষিত করে। সে তো নির্লজ্জতার এমন নিম্নস্তরে পৌছে গিয়েছিল যে, আমাদের ইমাম শহীদ হাসানুল বান্নার শাহাদাতের অভিযোগও আমাদের ওপরই আরোপ করে। আমাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল এই যে, ইমামের শাহাদাতের পর আমরা আনন্দোৎসব করেছিলাম এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলাম। কবির ভাষায় ঃ

www.amarboi.org

বিবেক ও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেলে বিস্ময়ের আর কি থাকে যে তার পর এরূপ কথাবার্তা বলে বেড়ানোই স্বাভাবিক।

বায়ুমান যন্ত্র মোরগগ

আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে কারা ? বিপ্লবের অধিনায়ক এবং তাদের তল্পীবাহক সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ। আজ পর্যন্তও এই গীত গাওয়া অব্যাহত গতিতে চলছে। যে কেউ-ই শাসক গোষ্ঠীর প্রিয়পাত্র হতে চায়—সে-ই এ সস্তা হাতিয়ার ব্যবহার করে ইখওয়ানের ওপর ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করতে শুরু করে। শাহ্ ফারুকের আমলে আমরা তার ভুল ও অন্যায় কার্যক্রম এবং স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপের পুরোপুরি সমালোচনা করতাম। কিন্তু এই সব সুশীল ও সাহসী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ তাদের মর্যাদাবোধের প্রকাশ ঘটাতো এভাবে যে, তারা শাহের স্তব স্তুতি ও প্রশংসা গীতিতে ভরা লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লিখতো এবং তাকে আসমানে পৌঁছিয়ে দিতো। শাহ্ সম্পর্কে তাদের লিখনীও ভাষায় লেখা হতো :

"প্রথম শিক্ষক"
"মিশরের প্রথম প্রকৌশলী"
"জন্মভূমির প্রথম নিষ্ঠাবান কর্মী"

এভাবে তার জন্য সর্বক্ষেত্রে "সর্ব প্রথম" শব্দ প্রয়োগ করতো। এমনকি তারা এমন সব কথা বলতো ও লিখতো যাতে লজ্জা শরমের আর কোন বালাই থাকতো না। তারপর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে এই কলমধারীগণই তাদের কলম ও মুখ দ্বারা এতদিন যে ফারুকের প্রশংসায় অগ্রগণ্য ছিল এখন তাকেই "ঘৃণার পাত্র" ও "হত্যার উপযুক্ত"প্রভৃতি বিশেষণ লাগাতে শুরু করে।

এই মহত্ব ও নীচতা

বিপ্লবের প্রারম্ভে এই শরীফ ও খান্দানী সাহিত্যিকগণের লক্ষ্য বস্তু ছিল ফারুক। কিন্তু যখন জামাল আবদুন নাসের ও ইখওয়ানের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন কামানের নল একেবারে ঘুরে যায়। এখন ইখওয়ানের ইজ্জত ও সম্ভ্রম নিয়ে খেলা এই সাহিত্যিকগণের পেশায় পরিণত হয়। নাসেরের এই ধামাধরা গোষ্ঠী বাতাসের গতি এমনভাবে ফিরিয়ে দেয় যে, তাকে আকাশের উচ্চতারও উপরে নিয়ে যায়। আবার নাসের যখনই চক্ষু মুদিত করেন তখন এই সম্ভ্রান্তরাও তাদের নৃত্যের তাল পরিবর্তন করেন। এখন তাদের কাছে মিসরের ইতিহাসের অন্ধকারময় ও কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। নাসেরের শাসনকাল। এই লোকদের এতটুকুও লজ্জা শরম নেই যে গতকাল পর্যন্ত যার গুণ-কীর্তন করেছে আজই তার কবরের ওপর জুতার আঘাত করছে সবটুকু শক্তি দিয়ে।

সাদাতের ক্ষমতার দন্ড হাতে নেয়ার পর এই চাটুকাররা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তার প্রশংসা বর্ণনায় তাদের কলমের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে। তারা তাকে একেবারে হিরো বানিয়ে দেয় এবং ইতিহাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব ও উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। এই পুরো সময়কালে ইখওয়ান প্রত্যেক শাসকের হাতেই জুলুমের চাকায় পিষ্ট হতে থাকে।

www.amarboi.org

ফেরেশতা থেকে শয়তান

সাদাতের বিবেক ও কান্ডজ্ঞানেরই বা কি হয়েছিলো যে, সে তার পূর্ববর্তীদের আচরণ ও পরিণাম স্বচক্ষে দেখার পরও সেই ধোঁকা ও প্রতারণার জালে জড়িয়ে পড়ে। অথচ তার ভালভাবেই জানা ছিল এই চিত্র শিল্পীগণ যারা প্রতিটি উদীয়মান সূর্যের পূজারী, আবার যখনই কোন তারকার ওপর কোন প্রকার বিপদের পাহাড় ভেংগে পড়ে তখন তাকে কঠোর ভাষায় গালি দিতেও তাদের কোন প্রকার দ্বিধা হয় না। আফসোস ও দুঃখ হয় এ জন্য যে, যদি তারা সর্তকতার সাথে কাজ করতো এবং শিক্ষা গ্রহণ করতো কিন্তু ক্ষমতার লোভ ও গদীর নেশায় বিবেক ও অনুভূতিই লোপ পেয়ে থাকে। অতএব সাদাতও তার পূর্ববর্তী শাসকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাদের ন্যায় পরিণতিই বরণ করতে বাধ্য হয়। এসব সাহিত্যিকদের লিখনী ও মুখ "হাতিয়া"র কলমও মুখের রূপ-পরিগ্রহ করেছে। ফলে সাদাত "ফেরেশতা" থেকে হঠাৎ শয়তানে পরিণত হয়। ('হাতিয়া' আরবী ভাষার এমন এক কুখ্যাত কবি যার চেহারাও ছিল কদাকার ও বিশ্রী। অন্যের সমালোচনা ও দোষ বর্ণনায় সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর অন্যায় সমালোচনার কারণে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) তাকে কিছুদিনের জন্য নজর বন্দীও করেছিলেন। সে যে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনায় সদা প্রস্তুত থাকতো। এমন কি হতভাগা তার নিজেরও সমালোচনা করতো অত্যন্ত কঠোরভাবে। নিজের দোষক্রটি বর্ণনায় সে এমন সব কথাবার্তা বর্ণনা করতো যা আদৌ বর্ণনাযোগ্য নয়।)

বিপ্লবের প্রাথমিক গতি প্রকৃতি

২৫শে জুলাই-এর বিপ্লব দিবসের আগমনে জাতি পরিবর্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। আযাদ ফৌজি অফিসারগণকে জনসাধারণ আনন্দের সাথে স্বাগত জানায়। এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী ছিল। কারণ এটা শুধু একজন মন্ত্রীর পদচ্যুতি ও অন্য একজনের ক্ষমতা গ্রহণ করার একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র ছিল না। বরং একটা পরিবর্তনের প্রত্যাশা প্রতিটি নাগরিকের হৃদয় মনে তরঙ্গায়িত হচ্ছিলো। আবদুন নাসের তার ক্ষমতা গ্রহণের প্রারম্ভেই ইখওয়ান ও মিসরের যুবক কয়েদীদের সকলকেই মুক্তি দিলেন। জনগণ তার এই পদক্ষেপে খুবই উল্লাস প্রকাশ করল। সর্বসাধারণ একে একটা শুভ লক্ষণ বলে মনে করলো এবং সবার মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি হলো যে, এই পরিবর্তন সম্পর্কে আযাদ অফিসারগণ ও ইখওয়ানের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও বুঝাপড়া রয়েছে। সাধারণ মানুষের উল্লাসের মৌলিক কারণ এই ছিল যে, ইখওয়ানের ওপর ছিল তাদের অবিচল আস্থা, যাদের কথা ও কাজের মধ্যে ছিল পুরোপুরি সামঞ্জস্য। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মিসর এবার তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। ইখওয়ান সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতো যে, তারা শুধু মুখে দাবী করার লোক নয় বরং কাজের লোক।

রাজনৈতিক উপলব্ধি

আমার জীবনে ইতিপূর্বেও কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনার উদ্ভব ঘটেছিল। আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পাঠ করতাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান

www.amarboi.org

বাহিনীর হাতে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের পিটুনির খবর আমার জন্য বিশেষ আগ্রহের কারণ ছিল। প্রখ্যাত জার্মান জেনারেল হিন্ডনবার্গ এবং তার সামরিক দক্ষতার প্রশংসায় আমি ছিলাম পঞ্চমুখ। রাশিয়ান ফ্রন্টে তার হাতে প্রায় দশ লক্ষ রুশ সৈন্যের পরাজয় ও বন্দীত্ব বরণ তার রণদক্ষতা ও যোগ্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ। স্বভাবগতভাবে আমার সহানুভূতি ছিল জার্মানদের সাথে। কারণ তাদের দুশমন ইংরেজদের আমি দুই চোখে দেখতে পারতাম না। আমার দেশের ওপর তাদের উপনিবেশবাদী আগ্রাসন এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের নীতি আমি কিভাবে সহ্য করতে পারি। সেই সময় খুবই মজার মজার সংবাদ পর্যালোচনা ও খবরাদি ছাপা হতো। যেমন যেসব দেশ কার্যত বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের সম্পর্কে এই পর্যালোচনা যে, "নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী কিন্তু মিত্রবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল।" আমরা একে অন্যের সাথে রসিকতা করতাম এবং এ ধরনের উক্তি ব্যবহার করে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতাম।

সংবাদপত্র পাঠ

আমি মিসর থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র আল আহ্‌রাম, আস্ সিয়াসাহ, আল জিহাদ এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা যেমন আল মুসাওয়ির, আত্ তায়েফ, আস সিয়াসাহ, আল জিহাদ এবং আত তিজারাহ সবগুলোর নিয়মিত পাঠক ছিলাম। আমি শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত সবগুলো পৃষ্ঠা পড়তাম। স্কুল বন্ধ থাকলে তো বেশ অবকাশ পাওয়া যেতো এবং মন-মস্তিষ্কও চাংগা হয়ে উঠতো। পড়াশুনা ছাড়াও ফুটবল খেলার প্রতি ছিল আমার বিশেষ অনুরাগ। প্রতিযোগিতা দেখার জন্য নিয়মিত ও গুরুত্বের সাথে যেতাম যদিও আমি নিজে খেলোয়াড় হতে পারিনি।

আলো ছায়া

আমার আরো একটা স্থায়ী অভ্যাস হচ্ছে আমি কথা বলি কম এবং শুনি বেশী। যদি আমার সাধ্যে কুলাতো তাহলে শুধু শুনেই যেতাম বলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতাম। আমার মাধ্যমিক ও ইউনিভারসিটি শিক্ষা জীবনে দেশে বড় বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সময় পুরো মন্ত্রী সভার রদবদল এবং উজীর আযমের উত্থান পতন আমি আমার নিজ চোখে দেখেছি। তখনকার সময়ে প্রধান মন্ত্রীকে "নাজেরুন নাজ্জার"(চীপ ট্রাস্টি) বলা হতো। আমি সা'দ জগলুল, ইসমাঈল সিদ্‌কী, মুহাম্মাদ মাহমুদ, (ইস্পাত কঠিন হস্তধারী) তাওফিক নাসীম, ইউসুফ দাহ্‌বা, মুহাম্মাদ সায়ীদ ও আহমদ যিওর প্রমুখকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। পার্লামেন্টে আবদুল হামীদ, আবদুল হক ও সুলাইমান গান্নামের ভূমিকা ও ভাষণ বিশেষ আকর্ষণ ও মনোযোগ সহকারে শুনতাম ও পড়তাম। সেই সময় পুরো এসেমব্লিতে অফ্‌দ পার্টির এই দুইজন মাত্র সদস্য ছিলেন। অনুরূপ সিনেটে অফদের একজন মাত্র সদস্য ছিলেন উস্তাদ আল জুনদী। সিনেটের অধিবেশনে উস্তাদ আল জুনদীর বক্তৃতা বিবৃতি অত্যন্ত জোরালো ও সাবলীল।

www.amarboi.org

জনসাধারণের রেফারেন্ডাম

আমার এই চক্ষুদ্বয় এমন স্মরণীয় দৃশ্যও দেখেছে যখন শাহ্ ফুয়াদ বেলজিয়ামের একজন উপদেষ্টার নিকট তার মতামত চেয়েছিলেন। উদ্ভূত সমস্যা ছিল এই যে, উচ্চ পরিষদের সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে শাহ্ এবং সা'দ জগলুল পাশা (জাতির জনক)-এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো। বাদশার কাছে নতি স্বীকার করার পরিবর্তে সা'দ জগলুল মোকাবিলা করার নীতি গ্রহণ করেন। গোটা জাতি ছিল সা'দ-এর পক্ষে। সুতরাং একটা বিশাল ও জনাকীর্ণ মিছিল শাহী মহল "আবেদীন প্রাসাদ"-এর সম্মুখে সা'দ-এর পক্ষে জোরালো বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আমিও এই মিছিলে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের সাথে শামিল ছিলাম। গগণ বিদারী শ্লোগান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। শ্লোগানের প্রতিধ্বনি শুনে বেলজিয়ান উপেদেষ্টা মহলের একটা জানালা খুলে ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে বাদশাহকে বলতে থাকেন, "আলামপনা! আমার নিকট থেকে আর কি মতামত নেবেন। গোটা জাতি তার রায় প্রকাশ করে দিয়েছে।" প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে একই শ্লোগান "সা'দ জগলুল অথবা বিপ্লব"।

আইন কলেজের শিক্ষা সমাপনী

এসব ঘটনা আমার আবেগ ও আদর্শিক মন-মানসিকতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু আমি ঐসব তৎপরতার সাথে কার্যত অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন সময় পড়া লেখায় কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে দিইনি। আমি নিয়মিত পড়াশোনা করে যেতে থাকি, এমনকি আইন কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তা চালিয়ে যাই। এটা ১৯৩১ সালের কথা। এ বছর আইনের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভকারীদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় সাত শত। আমার খুব ভালভাবে মনে আছে যে, ইসলামী আইন বিষয়ক পত্রে আমি সর্বাধিক নাম্বার পেয়েছিলাম। লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হতো। আমার আজও মনে আছে যে, আমার মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিল আহমদ জায়িদ বেগ ও আহমদ ইবরাহীম বেগ নামের দুইজন শিক্ষক। তারা আমাকে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত দু'টা প্রশ্ন করেন। আমি দু'টি প্রশ্নেরই অত্যন্ত সন্তোষজনক জবাব দেই। তারা সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমি বলি, "আরো জিজ্ঞেস করুন।"

আমি দু'টো কারণে একথা বলেছিলাম। প্রথমত, আমার মহান ওস্তাদ আহমদ বেগ ইবরাহীম এরূপ কথায় খুবই সন্তুষ্ট হতেন। দ্বিতীয়ত, উলুমে শরীয়াতের বিষয়ে আল্লাহর রহমতে আমার জ্ঞানের ব্যপ্তি ছিল ঈর্ষা করার মত। অন্যান্য বিষয়ে খুব কষ্ট করেই পার পেতাম।

যৌবনকাল ও দুরন্তপনা

আমার ছাত্র জীবনের কতিপয় কৌতুকপ্রদ ঘটনা আজও আমার মনে পড়ে। হাসান পাশা সিদকী শিশিনী আইন কলেজে আমাদেরকে রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়

www.amarboi.org

পড়াতেন। রাজনৈতিক অর্থনীতি বিভাগের ক্লাস রুম ছিল এমন স্থানে যেখানে সিকো রেল হাউস অবস্থিত ছিল। এই বৃহদায়তন ইমারতের কোন কোন কামরা এই বিভাগের সম্মুখেই ছিল। একদিন এক পিরিয়ড চলা কালে জনাব উস্তাদ হাসান পাশা দেখেন যে, ক্লাসে সকল ছাত্র জানালা দিয়ে সিকো রেল হাউসের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। অগত্যা তিনিও সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং অদূরে একটি জানালায় দুইজন যুবতী মেয়েকে দন্ডায়মান দেখতে পান। উস্তাদ ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন জেনে সমস্ত ছাত্র অত্যন্ত লজ্জিত হয়। কিন্তু হাসান পাশা সাহেব শুধু এতটুকু বলেন যে, "হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার এসো আমরা পাঠের প্রতি মনোযোগী হই।" কলেজে আমাদের শিক্ষকগণের সবাই ছিলেন সুপন্ডিত ও পি এইচ ডি ডিগ্রিধারী। কোন কোন শিক্ষকের নামতো এখন স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। কিন্তু জনাব আবদুল হামিদ আবু হাইফ, জনাব আহমদ আমীন, জনাব আল আশমাভী, জনাব শিশিনী, জনাব আল খাইয়াল, জনাব আবদুল মুতায়াল, জনাব ওয়াহীদ রাফাত, জনাব আহমদ ইবরাহীম, জনাব কামিল মুরসী, জনাব উস্তাদুন নাহুরী এবং জনাব মুহাম্মাদ সাদেক ফাহমী প্রমুখের নাম আজও আমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত আছে।

আইন কলেজের মর্যাদা

আমাদের সময়ে আইন কলেজ ইউনিভারসিটির অধীনস্থ সমস্ত কলেজ ও বিভাগসমূহের নেতৃত্ব প্রদান করতো। ছাত্রদের সমাবেশ, মিছিল ও প্রদর্শনীতে এই কলেজের ছাত্রগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মেরুদন্ডের হাড় ছিল ছাত্র সমাজ। সেকালে কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সমস্ত মন্ত্রী উকীলদের মধ্য থেকেই নিয়োগ পেতেন। এই কারণে আইন কলেজে শুধুমাত্র প্রবেশাধিকার লাভই ছাত্রদের জন্য গৌরবের কারণ হতো। একথা শুনে আপনি হয়ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সর্ম্পকিত মন্ত্রীগণের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক থাকতো বিরাজমান। অনুরূপভাবে সেইসব সাংবাদিক যারা মন্ত্রীবর্গের কোন কোন পলিসির কঠোর সমালোচনা করতেন। ব্যক্তিগতভাবে সেই মন্ত্রীগণের সাথে তাদের খুবই সৌহার্দ ও বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মন্ত্রী আবদুল হামীদ আবদুল হক তার মন্ত্রীত্বের আমলে সংবাদপত্র সেবীদের সাথে অধিকাংশ সময় সাক্ষাত ও প্রেস কনফারেন্স করতেন। এসব অনুষ্ঠানে তার নিজের পার্টি অফদ-এর পৃষ্ঠপোষক এবং হিযবের বিরোধী শিবিরের সাথে সর্ম্পকিত অন্যান্য সাংবাদিকগণও উপস্থিত থাকতেন। তিনি নির্বিশেষে সকল সাংবাদিকদের সাথে একান্ত ঘনিষ্ট হয়ে সম্প্রীতি সৌহার্দের ভংগীতে মত বিনিময় করতেন।

সাহিত্য রসিকতা

আবদুল হামীদ আবদুল হকের মিসরের উচ্চ এলাকার গ্রামীন বাচনভংগী এবং স্বভাব জাত প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বড় বড় বিস্ময়কর কৌতুকপ্রদ কাহিনী সৃষ্টি করতো। সাংবাদিকগণের সাথে কোন শব্দের অর্থ নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে বলতেন, "ল্যাদাইকুম আজুল" (তোমাদের কাছে কি গাভীর বাছুর আছে?) মূলত

www.amarboi.org

আজুল শব্দ দ্বারা তিনি উকুল বুঝাতেন অর্থাৎ তোমাদের কি বিবেক ও বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ? কিন্তু আঞ্চলিক বাচনভংগীর পার্থক্যের কারণে মাহফিলে যেন আনন্দ ও সুগন্ধির যোয়ার বয়ে যেত, তথাপি শব্দ নিয়ে বির্তক হতো। তিনি শব্দটির অর্থের ওপর অটল থাকতেন। সাংবাদিক জিজ্ঞেসা করতেন, আপনি যে অর্থ প্রকাশ করছেন উহার কোন প্রমাণ ? প্রত্যুত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বলতেন, "আল-জামুছ" (মহিষ) এখানে "আল-কামুস" (লোগাত বা ডিক্সনারী) কে তিনি তার আঞ্চলিক ভাষায় "আল-জামুস" বলে রসিকতা সৃষ্টি করতেন। সেই যুগে আমি কোন দিন মতামতের বিভিন্নতাকে দুশমনি ও শত্রুতার রূপ পরিগ্রহ করতে দেখিনি। বিশেষত সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং পত্রিকার সাংবাদিকগণের মধ্যে তো নয়ই।

অবসর গ্রহণ ও অধ্যয়ন

আমার যৌবনকাল বেশ শান্তি ও নিরাপদের মধ্যে কেটেছে। যৌবনের প্রারম্ভেই আমার বিয়ে হয়েছিলো এটাই হয়তো এর মূল কারণ। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তাতে কল্যাণ আর মংগলই নিহিত ছিল। ছোট শহরগুলোতে আইনজীবিদের দপ্তর রাতের বেলায় খোলা রাখা হতো না। বরং সকাল আটটা থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্তই কাজ হতো এবং তার পরই অবসর। তাই অফিসের সময়ের পর অধ্যয়ন অনুশীলনের জন্য আমি পর্যাপ্ত সময় হাতে পেয়ে যেতাম। আমি খুব পড়াশুনা করতাম। দাবা খেলার প্রতিও এক সময় আমার কিছুটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, তিনি এই বাজে ও অনর্থক খেলা থেকে রক্ষা করেছেন। কেননা শাবিনুল কানাতির থেকে আমি কায়রোতে চলে আসি এবং এমনভাবে কাজের মধ্যে ডুবে যাই যে, এই খেলা প্রায় পুরোপুরি ভুলেই গেছি।

দ্বীনি বই-পুস্তকের প্রতি অনুরাগ

ইত্যবসরে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে এই সময় আমি মৌলিক বই-পুস্তকগুলো পড়ে ফেলি। যেসব লোক আমার মত পরিবেশে জীবন যাপন করে তাদের অধিকাংশেরই এসব বই-পুস্তক পাঠের সময় ও সুযোগ কমই হয়ে থাকে। কিন্তু আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। এসব বই-পুস্তক প্রকৃতই দ্বীন ইসলামের উৎস। এসব গ্রন্থ আমার মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করেছে যা আজ আমার মধ্যে আছে। যে ব্যক্তিই তার দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি লাভ করতে চায় তার জন্য এসব গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি

আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিফলন তার বান্দাদের মধ্যে দেখতে চান। অতএব আমিও আমার চলাফেরা, চাল-চলন, আচার-আচরণ ও বেশ-ভূষায় আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ করতাম। আমার গৃহীত পেশার মাধ্যমে এতটুকু হালাল রিযিক আমার হস্তগত হচ্ছিলো যা দিয়ে সহজেই আমার সকল প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হতো। তাই পরিচ্ছন্নতা ও উন্নত রুচির পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে আমি ছিলাম প্রবাদ বাক্যের মত।

www.amarboi.org

আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একই রংয়ের স্যুট, সার্ট, টাই, রুমাল, মোজা ও বুট জুতা ব্যবহার করতাম। যেন প্রত্যেক স্যুটের সাথে অন্যান্য আনুসংগিক সামগ্রী, সাইজ ও রংয়ের পুরোপুরি ম্যাচিং করে। সবার কাছে একথা সুস্পষ্ট থাকা দরকার যে, মুসলমান কঠোরভাবে হালাল হারামের সীমার মধ্যে অবস্থান করেও তার জাঁকজমক ও পরিচ্ছন্নতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারে। ইখওয়ানী নওজোয়ানগণ কখনো কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর শিকার হয়ে থাকেনি। তারা রাতের বেলায় থাকে তাহাজ্জুদে সিজদাবনত । আর দিনের বেলায় ঘোড়ার পিঠে। আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদাত ও তাঁর নৈকট্যলাভের জন্য তারা নরম ও আরামদায়ক বিছানা ছেড়ে রাতে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকেন। এবং দিনের বেলায় আল্লাহর দ্বীনের পতাকা তুংগে তুলে ধরার ও ইসলামের সামগ্রিক বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন জিহাদে লিপ্ত থাকেন।

আমি কোন জুমআর সমাবেশে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বলতাম এই সুন্দর দুনিয়া অমুসলিমদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, আরাম-আয়েশ ও জীবন যাত্রার ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আমি তা পুরোপুরি ভোগ ও ব্যবহারের প্রবক্তা। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পসন্দ করতেন। সাইয়েদেনা ওমর (রা) বিন খাত্তাব এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, "আমীরুল মু'মিনীন! আমি (সিরিয়াতে) এমন লোকদের পাশে থাকি যাদের ওপর আমার বাহ্যিক জাঁকজমকের সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে। এতসব সত্ত্বেও যদি আপনি নিদের্শ দেন তাহলে আমি এই জীবন পদ্ধতি বাদও দিতে পারি।" মুত্তাকী ও সাধক আমীরুল মু'মিনীন বলেন, "আমি এই ব্যাপারে তোমাকে আযাদী দিচ্ছি।"

চুপ থাকাই কল্যাণকর

আমার যৌবন বড় সৌভাগ্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আমার স্বভাব বড়ই খোলামেলা এবং হৃদয়-মন বড় উদার। আমি হাসি মুখে থাকা ও রসিকতা পসন্দ করি। কিন্তু কখনো নিরর্থক তর্ক, বিতর্কে সময় নষ্ট করি না। কেউ আমার ওপর অত্যাচার করলেও প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে আমি তার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেই। কোন বিষয়ে কখনো আলোচনার সময় মতপার্থক্য হয়ে গেলে আমি একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার পরিবর্তে নিশ্চুপ হয়ে যাই। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আমি-ই সত্যের পক্ষে রয়েছি। যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আমি আমার প্রতিপক্ষকে পরাভূতও করতে পারি। কিন্তু তার অনমনীয়তা ও পক্ষপাত দেখে আমি আলোচনা থেকে সরে দাঁড়ানোকেই শ্রেয় মনে করি। তাছাড়া স্বভাবগতভাবেও আমি বলার চেয়ে অধিক শুনার পক্ষপাতি।

হালাল রিযিক

অধিকাংশ লোক যৌবনের প্রারম্ভেই কিছু একটা লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করে নেয় এবং তা লাভ করার চেষ্টা-সাধনায় মেতে ওঠে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বৈধ-অবৈধ

www.amarboi.org

প্রতিটি উপায় অবলম্বন তাদের কাছে বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে যৌবনেও আমার ক্ষেত্রে এ নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমি দ্বীনি বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলাম যাতে আমি ইবাদাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি এবং তদনুযায়ী আমলী জীবনও গঠন করতে পারি। আমি আমার পেশাগত জীবনেও পুরোপুরি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। যাতে আমার আয়-উপার্জন হালাল হয়। আমি মানুষের সীমালংঘনের বিনিময়ে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তা বিবেচনা করে থাকি যাতে আমার ও অন্যান্য লোকদের মাঝে দূরত্ব ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি না হয়।

সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদের প্রলোভন

সম্ভবত আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে সরকারী উকিল হওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়েছে এবং বিচার বিভাগেও পদ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি দু'টি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছি। এটা ১৯৩৬ সালের কথা, আমার এ দু'টি পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অর্থ এই ছিল না যে, আমি এই দু'টি পদকে ঘৃণা বা গুরুত্বহীন মনে করতাম। বরং এজন্য যে, কোন সরকারী পদ গ্রহণ করতে আমার স্বাধীনতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছিলাম না। আমি দু' দু'বার পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম এবং দু'বারই অকৃতকার্য হয়েছিলাম। এসব নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পশ্চাতে আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, সত্যের পতাকা সুমন্নত করার জন্য আমি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম ব্যবহার করতে পারবো । অন্যথায় মন্ত্রীত্ব ও পদের কোন খেয়াল কখনো আমার অন্তরে স্থান পায়নি।

ওকালতির পেশা একটি প্রশস্ত ময়দান

আমি লোকদের সম্মান করি কিন্তু কাউকে ভয় পাই না। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সমতা ও মানবিক সাম্যের ভিত্তিতে কাজ কারবার করার পক্ষপাতি। আমার প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল বলেই আমি ওকালতির পেশা গ্রহণ করেছি। কেননা এই পেশার সাহায্যে মানুষের কাছে এমন সব বিষয় উন্মোচিত হয়ে থাকে যা অন্য কোন পেশার দ্বারা সম্ভব নয়। ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর একটা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থাকে। অথচ ওকীলদের সামনে থাকে বিশাল জগত। আইনজীবী তার পেশার প্রয়োজনে জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগ সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার সুযোগ পায়। কারণ, আদালতে বিভিন্ন মোকদ্দমা চলাকালে হরেক রকমের শৈল্পিক ও পেশাভিত্তিক রিপোর্ট তাকে দেখতে হয়।

দ্বীনের দাবী

আমি আমার কর্ম জীবনে যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করি তখন থেকে যখন ইখওয়ানের হকের পথের কাফেলার সহযাত্রী হই। এটা ছিল এমন একটি সময় যখন আমার মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, আমার দ্বীন আমার নিকট দাবী করে

www.amarboi.org

যে, তার সাহায্য ও প্রচার প্রসারের জন্য আমার সমস্ত শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা ব্যয় করা দরকার এজন্য যদি অলিগলি ও রাজপথের সর্বত্র হামাগুড়ি দিয়েও চলতে হয়। সেদিন আমার নিকট এই রহস্য উন্মোচিত হয় যে, কুরআন মজীদ কেবল মাত্র তাবীজ তুমার ও সওয়াব এবং বরকত হাসিলের গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থ নাযিল করার উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে, একে বরকতের জন্য পকেটে রেখে দেয়া হবে অথবা সুগন্ধি মেখে ভ্রান্তির তাকের ওপর সাজিয়ে রাখা হবে। কিংবা হিফাজতের জন্য এর কপি মোটর গাড়ীতে রেখে দেয়া হবে। এসব উদ্দেশ্য তো নিসন্দেহে হাসিল হয়েই থাকে। কারণ, তা যাবতীয় কল্যাণের উৎস, এবং নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু তা থেকেও বড় মর্যাদা ও সম্মান যা এ গ্রন্থের অবতীর্ণকারী একে প্রদান করেছেন তা হচ্ছে, একে জীবনদর্শন ও জীবন ব্যবস্থা বানাতে হবে। আকীদা ও রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজ, আখলাক ও আদাব, যুদ্ধ ও সন্ধি, ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি ও বাণিজ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান মোটকথা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক ঢেলে সাজাতে হবে। তাহলেই এই বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে। মুসলিম উম্মাহ্ যতদিন এর হিদায়াত ও নির্দেশনার ওপর আমল করেছেন ততদিনই তারা দুনিয়ার সর্বাধিক শক্তিধর ও সম্মানিত জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমীরুল মু'মীনিনের মুখ নিঃসৃত এক একটি অক্ষরের গুরুত্ব পৃথিবীর প্রতিটি কোণে উপলব্ধি করা হতো। এই জাতিই কুরআনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে এবং তার নির্দেশনার ওপর আমল করার পরিবর্তে তা দ্বারা শুধুমাত্র বরকত হাসিল করার নীতি অবলম্বন করে তখনই তাদের উন্নতি অবনতিতে রূপান্তরিত হলো এবং মর্যদার স্থলে অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের ললাটের লিখন হয়ে গেলে খিলাফতের অবসান ঘটলো এবং তার কল্যাণও তিরোহিত হলো। অতপর আমরা অধপতনের এমন অতল গহ্বরে পৌছে গেলাম যে সম্পর্কে সবাই অবহিত। এখন আমাদের থাকা আর না থাকা সমান। উম্মতের এই অধপতন সম্পর্কে আমি অনবহিত ছিলাম না। কিন্তু ভাবছিলাম এর প্রতিকার করা যাবে কিভাবে ? ইখওয়ানের দাওয়াত কবুল করার পর এই সমস্যার সমাধান আমি খুঁজে পেয়েছি। তখন আমি জানতে পারলাম যে, আমাদের গৌরবোজ্জল অতীত আবারও প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সোনালী রংগে রংগীন হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা কুরআন, সুন্নাহ্ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষার ওপর আমল করতে পারি। এবং সলফে সালেহীন ও ফুকাহায়ে ইসলামের ইজমার অনুসরণ করি। এটাই ইখওয়ানের দাওয়াতের মূল কথা। আর এর মধ্যেই রয়েছে উম্মাতে মুসলিমার দোজাহানের কল্যাণ নিহিত।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাপিত প্রেমাগ্নি আলোহীন

কেউ কেউ প্রথম থেকেই ইখওয়ানের ওপর এই অপবাদ আরোপ করতে থাকে যে, তারা নতুন দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিছুদিন পর ইখওয়ানের শত্রুরা তাদের ওপর ক্ষমতার লোভ এবং রাজনীতি করার অভিযোগও উত্থাপন করে। তারা ইখওয়ানের ঘোষণাপত্র ও কর্মপদ্ধতি না দেখেই এই ফতোয়া জারী করে বসে যে, এরা সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব করতে চায়। অথচ প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, ইখওয়ান অনৈসালামিক আইন-কানুন মেনে নেয় না। বরং তার পরিবর্তে শরীয়াতের আইন-কানুন বাস্তবায়িত করতে চায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাদের কর্মনীতি হচ্ছে প্রচলীত আইনের গন্ডির মধ্যে থেকেই জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করা।

ইখওয়ান একটা ব্যাপক আন্দোলনের নাম। আমাদের এই সংগঠনে যুবকদেরকে শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন ও সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ারও ব্যবস্থা ছিল। কথায় অতিরঞ্জন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিগণ এই প্রোগ্রামকে "গোপন প্রক্রিয়া" নামে অভিহিত করে এবং প্রচার করতে থাকে যে, এটা সরকারকে গদিচ্যুত করার পূর্বপ্রস্তুতি মাত্র। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য গদি পরিবর্তনের এবং মন্ত্রীদের হত্যা করা কখনো ছিল না। আর এখনো নেই। ইমাম হাসানুল বান্নার বিচক্ষণ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখতে পেয়েছিল যে, বিশ্ব-মুসলিম একটি উম্মাত হিসেবে বড় বিপদের সম্মুখীন এবং অসহায়ত্বের শিকার। তাই তিনি তার মু'মীন সুলভ দৃষ্টিভংগীর সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইসলামী ভূখন্ড ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সমগ্র মিল্লাতের জন্য বড় লজ্জাকর ও দুঃখজনক। যা থেকে রক্ষা পাওয়ার শুধু একটা মাত্র উপায়ই রয়েছে। তাহলো আমাদেরকে বাহুবল সঞ্চয় করতে হবে। মিসরের ওপর ছিল ইংরেজ আধিপত্যবাদীদের দখল। সমগ্র ইসলামী জাহানের নেতৃত্ব প্রদান ও পথপ্রদর্শনের জন্য যে দেশ আলোর দিশারীর মর্যাদা রাখে তাকে বিদেশী সামাজ্যবাদের ছোবল মুক্ত করাই ছিল সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী। এসব কারণ সম্মুখে রেখে তিনি যুব সমাজকে তৈরী করার ফায়সালা করেন। কিন্তু আফসোস শত আফসোস ! এই উত্তম কাজটিকেই ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ একাধারে ক্রুশেড, ইহুদী ও কমুনিষ্ট শক্তিত্রয় ঠান্ডা মাথায় কি করে বরদাশত করতে পারে। তারা মুসলিম শাসকদের মস্তিষ্কে এই বিষ ভরে দেয় যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাদের নেতৃত্বের জন্য বিপজ্জনক। এই সরলমনা শাসকরা তাদের ফাঁদে পা দেয় এবং তাদের প্রণীত বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইখওয়ানদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

www.amarboi.org

কালের দুর্যোগ ও সময়ের দুর্বিপাক

অনিষ্টকামীদের প্রজ্জলিত অনল তার লেলিহান শিখা নিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। আমাদের কোন কোন নিবেদিত প্রাণ নওজোয়ানও সেই দাবানলের অসহায় শিকার হয়ে পড়ে। এবং এই শিখা তার বিভৎস রূপ নিয়ে আরো বিস্তার লাভ করে। সরকারের সীমালংঘন তো দিন দিন বেড়েই চলছিলো। তথাপি ইখওয়ান কখনো তাদের সবরের লাগাম হাত থেকে ছেড়ে দেয়নি। কতিপয় সরল প্রাণ যুবক সরকারের উপদেষ্টা খাযেনদারকে হত্যা করে। এই দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়ার পর ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ এ খবর জানতে পারে। ঘটনার বিবরণ ছিল এরূপ যে, কিছু কিছু যুবক ইংরেজ সেনাদের বিরুদ্ধে সদা কর্মচঞ্চল থাকতো। যাতে এভাবে তাদের মনে দেশবাসীর অশ্বস্তি ও অশান্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে। মিসর থেকে চলে যেতে বাধ্য করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে কতিপয় যুবক বন্দী হয়। মিষ্টার খাযেনদার মরহুম (বিচার বিভাগীয় উপদেষ্টা) তাদেরকে দশ বছরের কারাদন্ড প্রদান করেন। এই অন্যায় ও অবিচারমূলক রায়ের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার কৃত নওজোয়ানদের উত্তেজিত সংগীগণ খাযেনদারকে হত্যা করে।

এই সময়েই আরো একটি ঘটনা সংগঠিত হয় যা এই যুবকদের আবেগকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আলেকজান্দ্রিয়ার আনতুনিয়াদিস বাগানে দু'জন যুবকের লাশ পাওয়া যায়। এ দুই লাশের একটু দূরে আহত এবং মৃতপ্রায় অপর এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রথম দিকে পুলিশ ঘোষণা করে যে, হত্যাকারীর কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই আহত যুবক হাসপাতালে নীত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পরে সে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে। তার বর্ণনা মোতাবেক কানাদী নামক এক বিত্তশালী ঠিকাদার অর্ধ রাতের পর তাকে সাথে নিয়ে ঐ বাগানে যায়। কিছুক্ষণ সে তার সাথে কাটায়। তারপরই সে তাকে মারতে আরম্ভ করে। তাকে মৃত মনে করে ঠিকাদার অত্যন্ত সংগোপনে সেখান থেকে কেটে পড়ে। পূর্বোক্ত দু'জন নিহতের হত্যাকান্ডের কোন তথ্য পাওয়া গেল না। কিন্তু তৃতীয় যুবকের মোকদ্দমায় ঠিকাদার কানাদীকে আট বছরের সশ্রম করাদন্ড দেয়া হয়।

ইখওয়ানের তারুণ্যদীপ্ত যুবকগণ উভয় ঘটনার তুলনা করে। এক দিকে ছিল দু'টি হত্যার মোকদ্দমা এবং একটা হত্যার মোটিভ সংক্রান্ত কেস। এতে অপরাধীর আট বছরের সাজা হয় অথচ অপর দিকে কেউ আহত বা নিহত না হলেও খাযেনদার সাহেব যুবকদের প্রত্যেককে দশ বছরের সাজা ফরমান শুনিয়ে দেয়। এতে যুবকদের তাজা রক্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তারা খাজেনদার মরহুমকে হত্যা করে বসে। একদিকে যেমন জনগণ পত্র-পত্রিকায় এই হত্যাকান্ডের খবর পড়ে বিস্ময় বোধ করে অন্যদিকে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দও এই দুঃখজনক ঘটনার খবর সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই জানতে পারেন।

www.amarboi.org

তুমিই বলো এ কেমন কথা

আন্দোলনের দুশমনরা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। এই ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে তারা ইখওয়ানের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রকৃতির যুদ্ধ শুরু করে। হাসানুল বান্না শহীদ তো লোকদের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই দাওয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য সমূহ বর্ণনা করতেন। মুসলিমদের ওপর যেখানেই অত্যাচার-অবিচার চালানো হতো তিনি তাতেই কঁকিয়ে উঠতেন। মুসলিম মিল্লাত খেলাফতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আফসোস করতেন। তার দৃষ্টিভংগী ছিল এই যে, যদিও কোন কোন ওসমানীয় খলিফা বিচ্যুতির পথ অবলম্বন করেছিলো তবুও তার অর্থ এই ছিল না যে, খেলাফত ব্যবস্থাকেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তিনি ছিলেন ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের পতাকাবাহী। এমন ব্যক্তি তার অনুসারীদেরকে হত্যার ও লুণ্ঠনের অনুমতি কিভাবে দিতে পারেন?

প্রবৃত্তির অনুসারীগণ যেসব যুক্তি-তর্ক পেশ করে থাকেন তা যদি মেনে নেয়া যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে ইসলাম নিকৃষ্টতম ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ওসমানীয় খলিফাগণ ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ জন্য খিলাফত ব্যবস্থাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস। ইসলামের দুশমনরা মুসলিমদের অবস্থা দেখে আমাদের অন্যায় অপকর্মগুলোকে ইসলামের খাতায় জমা করেন। কিন্তু মুসলমানরা যা করে তা ইসলাম নয় বরং মুসলমানদের যা করা উচিত সেটাই প্রকৃত ইসলাম। এক ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। তিনি মুসলিমদের দেখেননি। তিনি ইসলামের যথার্থতার স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম হয়ে যান। তিনি যখন মুসলিমদের সাথে এসে মিলিত হন তখন দুঃখ করে বলতে থাকেন ঃ আমি যে ইসলামের কথা বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম তাতো ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। আমি যদি এই মুসলিমদেরকে প্রথমেই দেখতাম তা হলে হয়তো ইসলাম কবুল করতাম না।

ইখওয়ানে যোগদানের পর

আমার মনে পড়ে ইখওয়ানের কাফেলায় শামিল হওয়ার কয়েক বছর পর শহীদ ইমাম আমাকে দলের ওয়াকীল (সহকারী মুর্শিদে আ'ম)-এর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। আমি আল্লাহর নাম করে তাকে বললাম যে, আমি এই গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। তাই তা গ্রহণ করা অবিশ্বস্ততার পরিচায়ক হবে। সেই সময় মুর্শিদে আ'ম আমাকে এ পরামর্শও প্রদান করেন যে, আমি যেন আমার দপ্তর স্থানান্তর করে কায়রোতে নিয়ে আসি। কিন্তু আমি আরজ করলাম যে, আমার প্রাকটিশ আমার ছোট মফস্বল শহরে ভালভাবেই চলছে এবং তা দ্বারা আমি হালাল রিজিক উপার্জন করে আসছি। কোন কোন লোককে একথাও বলতে শুনা গেছে যে, ইখওয়ানের বদৌলতেই আমি আমার পেশায় সফলকাম হয়েছি। আমি এতটুকু বলতে চাই যে, আমার অমনোযোগী স্বভাব প্রকৃতি ও শিক্ষা দীক্ষার কারণে আমি কখনো দুনিয়ার জীবন এবং বস্তুগত সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোন সৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করিনি। আল্লাহর অনুগ্রহ সর্বদা আমাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। মুর্শিদে আ'ম-এর

www.amarboi.org

দৃষ্টিভংগী ও সান্নিধ্য এবং ইখওয়ানের একান্ত মহব্বত ও সাহচর্যের জন্যও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদের সকলকে আমার সাথে উত্তম ব্যবহারের জন্য সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

ঘৃণা ও ভালবাসা সবই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে

ইখওয়ানের সাথে সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার কারণ হাসানুল বান্না কিংবা হাসান আল হুদাইবির সাথে সম্পর্কিত নয়। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে আন্দোলনের ময়দানে এসে সমবেত হয়েছি। হাসানুল বান্না এবং হাসান আল হুদাইবি এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ দ্বারা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা কিংবা ব্যক্তিত্বের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বুঝায় না। বরং তা আল্লাহর হাতে বাইয়াতেরই নামান্তর। নবী আকরাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যেসব লোক বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাও ছিল আল্লাহ্ তায়ালার হাতে বাইয়াত গ্রহণ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم

"নিশ্চয়ই যেসব লোক (হে নবী) আপনার হাতে বাইয়াত নিয়ে থাকে তারা মূলত আল্লাহ্ তায়ালার সাথেই বাইয়াতে আবদ্ধ হয়ে থাকে ; তাঁদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত।" –আল ফাতহ ঃ ১০

যেসব লোক ইখওয়ানের ওপর দোষারোপ করে থাকে যে, আমরা হাসানুল বান্নার পুতঃপবিত্রতার প্রবক্তা তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তারা কি জবাব দিবেন তা ঠিক করে নেয়া উচিত। আমরা আল্লাহ্ আল মালেকুল কুদ্দুস ব্যতীত অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনার পক্ষপাতি নই। হাসানুল বান্না এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হাসান আল হুদাইবি-এর সাথে আমরা গভীর মহব্বত রাখি ও আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করি। কেননা তারা দু'জনই আমাদের চক্ষু খুলে দিয়েছেন এবং ইসলামের আলোর সাথে আমাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। যেসব মহত ব্যক্তিত্ব এই আকিদা-বিশ্বাসের মর্মকথা আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তাঁদের সাথে আমরা ঐকান্তিক সম্পর্ক কেন রাখব না ? তাঁদের সাথে আমাদের মহব্বত তো আল্লাহরই নির্দেশ মোতাবেক এবং তারই সন্তুষ্টিলাভের জন্য। কিন্তু আমরা তাঁদেরকে আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ মনে করে থাকি এবং তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনার পক্ষপাতি নই কখনো।

প্রথম মুর্শিদে আ'ম-এর সাথে একজন মুরীদ ও শাগরেদ হিসেবে আমি সময় কাটিয়েছি এবং তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ইমাম আমাদেরকে আমাদের হাত ধরে মানবতার উন্নত স্তরে উন্নীত করেছেন এবং ইসলামের দস্তরখানের ওপর এনে বসিয়েছেন। এটা ছিল সেই সময়ের কথা যখন মুসলিমগণ ইসলাম ছেড়ে ভিখারীদের মত প্রত্যেক দস্তরখান থেকে উচ্ছিষ্ট আহরণ করে ফিরছিলো। আল্লাহ্ তায়ালা তার দ্বীনের খেদমতের জন্য এমন লোকদের মনোনীত করে থাকেন যারা এ কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন।

www.amarboi.org

ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ

"এটাতো আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।"—আল হাদীদ ঃ ২১

আমার কর্মপন্থা আমীরি নয় ফকীরি

ইমাম শহীদ এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সুকৌশলে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যে, দুনিয়া, এবং এর চাকচিক্য আমাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না। এই পৃথিবী নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী এবং এই জীবন টলটলায়মান—যে কোন মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। এমন দুনিয়ার সাথে কি আর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। আর এই জীবনের আশঙ্কায় ও দুশ্চিন্তায় অযথা হাহুতাশ করে কি লাভ ! আল্লাহ তায়ালার নিকট যা কিছু রয়েছে তাই উত্তম ও চিরস্থায়ী। ইখওয়ান সাধারণত নিম্ন আয়ের লোকদের সমষ্টি ছিল। তথাপি তারা তাদের সংগঠনকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতো। পাঁচ কুরুশ থেকে আরম্ভ করে পাঁচ পাউন্ড পর্যন্ত প্রতি মাসে বিভিন্ন ইখওয়ান সংগঠনকে নিয়মিত এয়ানত দিতো। অবশ্য কিছু সংখ্যক ভাই এমনও ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ পর্যাপ্ত রিজিক দিয়ে ছিলেন। তাঁরা এর চেয়েও অধিক পরিমাণ এয়ানত পেশ করতো।

এক পর্যায়ে ইখওয়ানের বায়তুলমাল সম্পাদকের সম্মানও আমি লাভ করেছি। যদি কখনো বায়তুলমালে একশত পঞ্চাশ কুরুশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হতো তখন আমি মনে করতাম যে, আমাদের সংগঠন খুব সম্পদশালী হয়ে গেছে। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, এই অর্থ দ্বারাই সংগঠনের সমস্ত কাজ চলতো। দ্বীনের সম্পদ যার হাতে এসে যায় সে কি দারিদ্রের কোন পরোয়া করে। অফিসে সংগঠনের যে টেলিফোন ছিল কোন ব্যক্তিগত কাজের জন্য তা ব্যবহার করার কোন অনুমতি ছিল না। যতক্ষণ না তিন তারিফা প্রদান করতো।

কোন সদস্য যখন কোন দাওয়াতী কাজে কোথাও যেতো তখন তার সফর খরচের জন্য তাঁকে আমি তিন তারিফা দিতাম।...........তা থেকে ছয় মিলিমা যাওয়ার জন্য এবং ছয় মিলিমা আসার জন্য কিংবা মিনি বাসের ভাড়া ও তিন মিলিমা ডাল রুটির জন্য। কি স্মরণীয় সময় ছিল সেটা !!

গ্রন্থকীট নয় গ্রন্থকার

ইখওয়ানুল মুসলিমুন আমাদেরকে একটা প্রাণবন্ত জীবন দান করেছিল। এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হওয়ার পর আমরা যেন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে আমরা আমাদেরকে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান মনে করতে থাকি। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ এবং একজনের অন্যজনের হৃদয় জয় করার প্রেরণা সবসময় তুঙ্গে থাকতো। আন্দোলনের কাজ আরো ব্যাপক করা ছাড়া আর কোন চিন্তা আমাদের মনে স্থান পেতো না। আমি ওকালতীর কাজকর্ম শেষ করে সালাতুল আসরের পর ইখওয়ানের অফিসে চলে

www.amarboi.org

আসতাম এবং এশার পর পর্যন্ত আন্দোলনের কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এটা তো বর্ণনা করার কোন অপেক্ষাই রাখে না যে, এই খেদমত হতো নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং এর বিনিময় কোন বস্তুগত সুবিধা লাভ করা কখনো উদ্দেশ্য হতো না।

কোন কোন লোক ধন-সম্পদকেই সবকিছু মনে করে। আমি ধন-সম্পদের গুরুত্ব অস্বীকার করি না। বিশেষত সেই সময় থেকে যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীস পড়ার সুযোগ পাই—

نعم المال الصالح فى يد الرجل الصالح

"হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদই সর্বোত্তম সম্পদ। যা একজন সৎমানুষের হাতে এসে পৌছে।"

এবং তার এই কথা যে—

لئن تترك ورثة اغنياء خيرٌ من ان تتركهم عالتًا يتكففون الناس

"মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতবে নিজের পোষ্যদের এমন অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সচ্ছল রেখে যাওয়া উত্তম।"

এ হাদীসগুলো থেকে হালাল মালের গুরুত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তারপরও আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, কাজের লোক পাওয়া গেলে ধন-সম্পদও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে কর্মঠ লোক খরিদ করা যায় না। মাল নষ্ট হয়ে গেলে তা পুনরায় উর্পাজন করা যায়। কিন্তু কর্মী বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলে সে ক্ষতি পূরণ করা যায় না। আত্মমর্যাদা বিক্রি হয়ে গেলে সবকিছুই হারিয়ে যায়। আমাদের অবস্থা হচ্ছে আমরা আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে ধন-সম্পদ চাই। আবার অনেকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা অর্থবিত্তের পূজারী। অর্থ-সম্পদ হালাল উপায়ে অর্জিত হচ্ছে না হারাম উপায়ে তাদের কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই। তাদের উদ্দেশ্য শুধু সিন্ধুক ভর্তি করা। যেসব লোকের এরূপ মানসিকতা থাকে তারা সব মানুষকে একই পাল্লায় ওজন করে। তারা কল্পনাও করতে পারে না যে, কোন মানুষ কোন বিনিময় ছাড়াও কোন কাজ করতে পারে।

ইখওয়ানের ওপর আল্লাহ তায়ালার বড়ই ইহসান রয়েছে যে, তারা মনের সম্পদকে কখনো শরীরের সম্পদের বিনিময় কুরবানী করে না। তাদের উদ্দেশ্য তাদের আন্দোলনের সফলতা ও আত্মমর্যাদার সংরক্ষণ। যদিও আমি আমার নিজের সম্পর্কেই কথাবার্তা বলে আসছি তথাপি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যই এই মানদন্ডে পুরোপুরি উতরে যাবে। আমাদের দাওয়াত বৈষয়িক উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দাওয়াত আল্লাহর পথের দিকে মানুষকে আহবান করা।

আমীর-উমরাহ ও মন্ত্রীর দরবারেও বে-নিয়াজী

কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর সাদাতের শাসনামলে আমি কোন কাজে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যাই। তিনি মা'শাআল্লাহ এখনো বেঁচে আছেন।

www.amarboi.org

আলোচনা চলাকালে মন্ত্রী প্রবর আর্থিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে লাগলেন, সরকার মিসরের সমস্ত পত্রিকা ও সাময়িকীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে এবং মুজাল্লাতুদ দা'ওয়াহ একটা ইসালামী পত্রিকা হিসেবে এই সহযোগিতা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার। এতেই আমার বুঝতে বাঁকী থাকলো না যে, জনাব কি উদ্দেশ্য হাসিলের মতলব এঁটেছেন। তবুও আমি আমার ধৈর্য শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখলাম এবং সাদামাটা ভাষায় আরজ করলাম "জনাব এসব আলোচনা থাক। এটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।" অবশেষে সাক্ষাতের পালা সমাপ্ত হয় এবং আমি তার দপ্তর থেকে নিরাপদে ফিরে আসি।

সত্য পথের আহবায়ক আল্লাহর দ্বারের ভিক্ষুক

একবার মিসরের একটা দ্বীনি পত্রিকা একটা জলসার ব্যবস্থা করে। এই পত্রিকা এখনো চালু আছে। পত্রিকার অফিসে অনুষ্ঠিতব্য এই অধিবেশনে আমাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিলো। নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে আমি সমাবেশে গিয়ে উপস্থিত হই। বিরতির সময় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ও অযু করার জন্য টয়লেটে যাই। অযু শেষে আমি গোসলখানা থেকে বের হচ্ছিলাম। সেই সময় পত্রিকার একজন কর্মচারীকে বাইরে অপেক্ষমান দেখতে পাই। তিনি আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "জনাব স্বাক্ষর করে দিন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কিসের কাগজ আর দস্তখতই বা কি জন্য।" তিনি বললেন, "এটা আপনার জলসায় তাশরীফ নিয়ে আসার বিনিময়।" আমি বলে উঠলাম, "আমি যদি জানতাম দাওয়াত ইলাল্লাহ-এর কাজের জন্য তোমরা পারিশ্রমিক দিয়ে থাক তা হলে আমি কখনো এখানে আস্তাম না।" তিনি বললেন, "এটা তো শুধু সফর খরচ।" আমি বললাম, "আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। ইখওয়ান এই কাজের জন্যই এ গাড়ি দিয়ে রেখেছে।" তিনি আবারো বললেন, "কিন্তু এই পারিশ্রমিক তো সব লোকই নিয়ে থাকে।" আমি তাকে বিনীতভাবে বললাম, "আমি কিন্তু ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই। বরং আমি তো আল্লাহর দরবারের একজন ভিক্ষুক।" আমি সেই বন্ধুর কাছে আমার অপারগতা ব্যক্ত করলে তিনি বিস্মিত ও হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অতপর আমি ফিরে আসি এবং তিনি বিফলমনোরথ হয়ে কাগজ হাতে তার দপ্তরের দিকে চলে যান।

আমার লিখা হয়ে থাকে খুবই সাদামাঠা ভাষায়। কারণ, আমি কোন সাহিত্যিক বা কলমজীবী নই। তারপরও কেন জানিনা অনেক লোক আমার নিকট কিছুনা কিছু লেখার অনুরোধ জানান। কোন কোন পত্রিকাও উপযুক্ত সম্মানির বিনিময় আমাকে তাদের পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে বলে। আমি তা অস্বীকার করেছি। কেননা প্রথমত, আমি কোন সাংবাদিক নই। দ্বিতীয়ত, আমি একজন দায়ী। একজন দায়ী-ইলাল্লাহর কথা সঠিক বা বে-ঠিক যাই হোক না কেন পারিশ্রমিক গ্রহণ তার পক্ষে মোটেই সমীচীন নয়। যে সমস্ত দায়ী কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় ছাড়া খালেছ আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত থাকে তারা সম্মান লাভ করে এবং তাদের কথাও আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য নিবদ্ধ থাকে। বিনিময় গ্রহণের পর তো আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে পত্রিকার মালিক এবং পাঠকগণ কি প্রত্যাশা করেন? অথচ একজন সত্য পথের আহবায়ক শুধু তার দাওয়াতের দাবী ও চাহিদা কি তাই দেখে থাকেন।

মংগলবারের দারস ও উহার প্রেক্ষিত

মংগলবারের দারসের প্রোগ্রাম ছিল নওজোয়ানদের ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ প্রদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইমাম শহীদ যখন মংগলবারের এই দারস শুরু করেন তখন অল্প সংখ্যক লোক তাতে হাজির হতো। কিন্তু এখন এই দারস ইখওয়ানের কর্মসূচীর অত্যাবশ্যকীয় অংশে পরিণত হয়েছে। ইলমিয়াতুল জাদিদার মারকাজে আ'মে অনুষ্ঠিত এই মজলিশে মুর্শিদে আ'ম প্রতি মংগলবার মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত দারস পেশ করতেন। মাগরিবের পূর্বেই বিপুল সংখ্যক যুবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি মারকাজে এসে সমবেত হতো। শ্রোতাগণ শুধু মাত্র কায়রো থেকেই নয় বরং দূরের ও কাছের অন্যান্য জিলা থেকেও এসে জড়ো হতো। সকলের চেহারাই হাঁসি খুশী এবং দিল ও দিমাগ শান্ত ও পরিতৃপ্ত। ইমাম মাগরিবের জামায়াতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করার পর মারকাজের উন্মুক্ত আঙ্গিনায় বসে দারস শুরু করতেন। এ দারসে শত শত নয় বরং হাজার হাজার লোক অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এসে অংশ গ্রহণ করতো। মারকাজের বারান্দা, ব্যালকনি এবং আশেপাশের বিল্ডিংয়ের ছাদ উপস্থিত শ্রোতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। মনে হতো যেন এই পবিত্র মাহফিলকে ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন, রহমতের ছায়া পড়ছে এবং শান্তির বারিপাত হচ্ছে। কোন প্রকার শোরগোল, হৈ হুল্লোড় ও বিশৃংখলা দেখা যেতো না। প্রতিটি মানুষ মন-মস্তিষ্ক এবং চোখ-কান দিয়ে নসীহতের প্রতি মনোযোগী হতো। ইমামের মুখ থেকে হীরা ও মোতি ঝরে পড়তো যা কুড়িয়ে মানুষ তাদের মনের মনিকোঠায় সঞ্চিত করতো। দেখে মনে হতো যেন প্রত্যেক শ্রোতা হাসানুল বান্নাকে ছোট বেলা থেকেই জানে কিংবা কমপক্ষে বছরের পর বছর তার সাথে থাকার সুযোগ লাভ করেছে।

মাহফিলে অংশগ্রহণকারী শ্রোতা নতুন পুরাতন যাই হোক না কেন সবাই যেন আত্মমগ্ন হয়ে যেতো। মনে হতো যেন তারা তাদের হারানো সম্পদ পেয়ে গেছে যার অন্বেষণে তারা সমগ্র পৃথিবীময় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু পায়নি অথচ এখানে এসে তা পেয়ে গেছে। হাসানুল বান্নার আকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা তার মনের চাহিদা পূরণের যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মুখ থেকে নিঃসৃত কথাবার্তা মানুষের অন্তরে গিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতো। এমতাবস্থায় এশার আযান শুরু হয়ে যেতো। আযান চলাকালে ইমাম শহীদ চুপ করে থাকতেন। তারপর পুনরায় তার ভাষণ চলতে থাকতো যা অল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যেতো। শ্রোতাদের মধ্যে আকাংখা থাকতো যেন বক্তৃতা সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

www.amarboi.org

ইসলামের শত্রুগণ মিসরের ভেতরে বিলম্বে সর্তক হয় কিন্তু মিসরের বাহিরে তাৎক্ষণিক বিপদের ঘন্টাধ্বনি বেজে ওঠে। বাতিল এই আন্দোলনের মধ্যে তাদের জন্য নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলো। তাই তারা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। দুশমনরা এই আন্দোলনকে নির্মূল করতে পারেনি।

সত্য তথাপি তাদের শয়তানী ফন্দি ও কৌশল এবং তাগুতি অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা তার গতি ব্যহত করার ক্ষেত্রে কামিয়াব হয়েছে। ইখওয়ান জেলখানার মধ্যেও মঙ্গলবারের দারস ব্যহত হতে দেয়নি। এই দারস বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তথাপি এই দারস জারী আছে এবং থাকবে। এটা ইখওয়ানের উত্তরাধিকার যা এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। এটা সত্যের এমন এক পতাকা যা একজন মুজাহিদের হাত থেকে অন্য মুজাহিদের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ "সকল কাজের পরিণতি তো আল্লাহ তায়ালার দিকেই প্রর্ত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।"

মঙ্গলবারের দারসে কুরআনের ধারা খুবই নমনীয়ভাবে শুরু করা হয়েছিল। ইমাম শহীদের সাগরেদ ও ভক্তগণ সাবাতিয়ায় তার গৃহে হাজির হতো এবং একটা প্রশস্ত হল রুমে চাটাইয়ের ওপর আসন গ্রহণ করতো। রেল ষ্টেশনের অনতিদূরেই ছিল তাঁর বাসগৃহ। উপস্থিত লোকদের সংখ্যা শুধু কয়েক ডজনেই সীমাবদ্ধ থাকতো। সমাগত মেহমানদের সামনে ছোট ছোট কাপ রেখে দেয়া হতো এবং সকলকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। ইমাম ছিলেন খুবই উদার ও দানশীল অন্তরের অধিকারী। কিন্তু তার আর্থিক উপায় উপকরণ ছিল সীমাবদ্ধ। এটা ছিল মঙ্গলবারের দারসের প্রাথমিক যুগ।

সেই যুগে কতিপয় ব্যক্তি চাটাইয়ের ওপর বসতো এবং ইমাম তাদের সামনে ঈমান সঞ্জীবনী দারস পেশ করতেন। এই দৃশ্যের তুলনা যদি হিলমিয়াস্থ মারকাজে আ'ম-এর সাথে করা হয় তাহলে বিবেক-বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই শতাব্দিরই চল্লিশের দশকে হাসানুল বান্না শহীদকে যারা জানতো তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য কিন্তু পঞ্চাশের দশকে সেই হাসানুল বান্নাই সারা দেশে ছোট বড় সকলের নিকট আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ান। এই সময়েও তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেন। তিনি নম্রতা ও শিষ্টাচারের চাদর তার শরীরে জড়িয়ে রেখেছিলেন। এতে তার সৌন্দর্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। যতই তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ততই তার বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দরবেশের দরবার

ইমাম কয়েকবারই আমাকে তার সফর সঙ্গী হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রেল ভ্রমণের সুযোগ আসলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, সফর আমার পয়সায় করতে হবে নাকি তোমার খরচে? যদি আমার পকেট অনুমতি দিতো তাহলে আমি সবিনয়ে

www.amarboi.org

নিবেদন করতাম, "সফরের যাবতীয় খরচ আমিই বহন করবো।" অতপর আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনে নিয়ে আসতাম এবং যথা সময়ে আমরা সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতাম।

যদি আমার অবস্থা ভাল না হতো তাহলে অকপটে আরজ করতাম, "জনাব সফর আপনার দায়িত্বে করতে হবে।" তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করতেন। সফর কালীন সময়ে আমি মাথা ঝুঁকিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং এই চেষ্টা চলতে থাকতো যেন আমাদের কোন পরিচিত ব্যক্তি আমাদিগকে থার্ড ক্লাশ কমপার্টমেন্টে দেখে না ফেলে। মুর্শিদে আ'ম ঈষৎ হেসে আমার দিকে তাকাতেন কিন্তু মুখে কোন কথা বলতেন না। এটা প্রাথমিক পর্যায়ের কথা। তখনো পর্যন্ত কলিজার খুনের সংমিশ্রণে অশ্রু বহনের পালা আসেনি। প্রেম যখন ভালবাসার রীতিনীতি শিখিয়ে দিল তখন আর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য রইলো না।

আমরা মনে করতাম যে, আমি শহীদ ইমামের মনের খুবই নিকটবর্তী। আমি কখনো তার সম্মুখে কোন অভিযোগ পেশ করিনি। কিংবা কোন ভাইয়ের বিরুদ্ধেও নালিশ করিনি। সত্য কথা বলতে কি আমি কোন দিন কোন ইখওয়ানী ভাইয়ের সাথে মতভেদ করেছি বলেও মনে পড়ে না। সাধারণ ও বিশেষ কোন বিপদ মুসিবতের ব্যাপারেও আমার কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, তা ইমামের সামনে তুলে ধরে তাকে পেরেশান করা সমীচীন নয়। তিনি আমাকে যখনই কোন কাজের নির্দেশ দিতেন আমি তৎক্ষণাত তা সম্পাদন করতাম। কখনো কখনো কোন আদেশ কার্যকর করতে গিয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এবং বস্তুগত উপকরণ ব্যয় করতে হতো। তথাপি নির্দেশ পালনে যে মজা পেতাম তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

আমার পূর্বে ইখওয়ানের সদস্যদের মধ্যে কেউ উকীল ছিল না। আমার ইখওয়ানে যোগদানের পর কায়রো কিংবা কায়রোর বাইরে কোথাও ইখওয়ানের কোন কেস হলে আমিই তা পরিচালনা করতাম। প্রথমে আমার যাতায়াত শাবীনুল কানাতির ও কায়রোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইখওয়ানের সাথে কাজ শুরু করার পর আমি মিসরের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত গিয়েছি। কখনো মুর্শিদে আ'ম-এর সাথে একযোগে সফরের সৌভাগ্য হতো আবার কখনো তার প্রতিনিধি হিসেবে সফরে যেতে হতো। আমি যদিও সহকারী মুর্শিদ ছিলাম না। তথাপি ইমাম তার পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দিতেন যাও অমুক শহরের জলসায় আমার প্রতিনিধিত্ব করে এসো। এটা কেমন ঈমান সঞ্জীবনী এবং সাহস সঞ্চারী পরিবেশ ছিল। আমি হৃদয় মনে যা উপলব্ধি করি তা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাই না। যদি পেতাম তাহলে মনের কথা মনের মত করে ব্যক্ত করতাম।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের সাথে স্মরণীয় সফর

এই ব্যক্তিত্ব (শহীদ হাসানুল বান্না) তার অনুসারীদের অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের খেয়াল রাখতেন যাতে তাদের আরাম-আয়েশের পূর্ণ ব্যবস্থা করা যায়। ইমামের এই মহতী ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর সাথে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্ক ছিল খুবই মজবুত ও নিবিড় । আপনি কোথাও এমন একজন ব্যক্তিরও সন্ধান পাবেন না। যিনি মুর্শিদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন অথচ তিনি মুর্শিদের উত্তম আচরণ ও কোমল হৃদয়বৃত্তির অনুরাগী হয়ে যাননি।

একবার আমি মুর্শিদের সাথে তানতা গিয়েছিলাম। সেখানে একটি মসজিদের উদ্বোধন করার জন্য জনৈক স্থানীয় নেতা দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলেন। মসজিদের উদ্বোধন ও বক্তৃতার পর ইখওয়ান মসজিদে-ই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করতে লাগল। মুর্শিদ মেজবানের কানে কানে কি যেন বললেন। অতপর মেজবান আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাকেও অন্যান্য সংগীগণকে সাথে করে পার্শ্ববর্তী একটা জাঁকালো প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। আমরা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম অত্যন্ত মূল্যবান আসবাবপত্র দ্বারা কক্ষটি সুসজ্জিত। অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম আমার দুই সাথীর একজন এই সুসজ্জিত কক্ষ দেখে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' পড়ছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "ভাই কি হয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন ঃ যে অর্থ এই বাহ্যাড়ম্বর বিলাসিতা ও কক্ষের সাজ-সজ্জায় ব্যয় করা হয়েছে তার উত্তম ব্যয়ের খাত ছিল আল্লাহর পথ। আমি বললাম, আল্লাহ্ আমার ও আপনার ওপর রহম করুন। আমাদেরকে কোন্ জিনিসে এখানে টেনে এনেছে? তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর পথে দাওয়াত—তোমরা কি এটাকে নিজের জন্য আল্লাহর রহমত মনে করো না। তিনিই তো এই সফরে আমাদের জন্য এই আরামদায়ক শয়ন কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন। হয়তো আমাদের কেউই কখনো এরূপ আরামদায়ক রাত্রি যাপনের আনন্দ পায়নি। তাহলে কি অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় আমাদের কর্তব্য নয়?

আমি আরজ করলাম "তুমি কি এটাকে নিজের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার ইহ্সান এবং রহমত মনে কর না? তিনিই তো এই সফরে আমাদের জন্য এই আরামদায়ক কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন। হয়তো আমাদের কেউই কখনো এমন আরামদায়ক শয্যায় রাত্রি যাপনের আরাম উপভোগ করার সুযোগ পায়নি। তারপরও কি আপনি মনে করেন না যে, আমাদেরকে অসন্তোষ প্রকাশ করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

বায়ুর গতি নির্ণায়কযন্ত্র

রাতটি সেখানে অতিবাহিত করার পর পরদিন সকালে আমরা তানৃতা রেলষ্টেশনে গিয়ে পৌছি যাতে কায়রো অভিমুখী গাড়ী ধরতে পারি। আমরা ষ্টেশনের

www.amarboi.org

প্লাটফরমেই ফজরের নামায আদায় করলাম। মৃদুমন্দ প্রাতঃসমীরণ আমাদের চেহারা ও পোশাক নিয়ে যেন খেলা করছিল। আমারা নিরাপদেই কায়রো রেল ষ্টেশনে গিয়ে পৌছি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে রওয়ানা দেই যাতে তৃপ্তি সহকারে আরো একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি। কিন্তু মুর্শিদে আ'ম (রহমাতুল্লাহ আলাইহি) একাই সাবর্তিয়াস্থ মাদ্রাসাতু উম্মে আব্বাসের পথ ধরেন যাতে স্কুলে তার নির্ধারিত প্রথম পিরিয়ড পড়াতে পারেন। এই ঘটনার দ্বারা আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, পরিপূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতা নিয়ে আল্লাহর পথের একজন সৈনিক কাজের চাপ এবং সময়ের স্বল্পতার প্রতিকার সাধন কিভাবে করতে পারেন। প্রকৃতই যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর এমনভাবে ভরসা করে যেভাবে তার ওপর নির্ভর করা উচিত আল্লাহ তার সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে দেন। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং ইহসান অনেক বড়।

সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। কিছুদিন পর আমাদের সেই ভাই যিনি তানতায় আমার সাথে রাত্রিযাপন করেছিলেন—একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। হঠাৎ এক সময় তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তার কুশলাদি কামনা করতে যাই। যেহেতু তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী তাই তার অবস্থা জানার জন্য আমি সোজা গিয়ে তার বিশ্রামের কক্ষে প্রবেশ করি। আমি কক্ষে প্রবেশ করেই দেখতে পাই রুমের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান ও দামী সাজ-সরঞ্জাম এবং কম্বল পড়ে রয়েছে। আমি এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করার পর তার দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং চাপা স্বরে বলতে থাকি "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে সুস্থ্য করে দিন।"

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমার কথার স্বরেই অতীতের সমস্ত ঘটনাবলী বুঝে ফেলেন এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করেই বলে উঠলেন "উস্তাদ ওমর সেই কথা বাদ দিন।" বস্তুত তিনি আমার ইংগিতের যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তানতায় মসজিদের উদ্বোধন সেখানকার মূল্যবান আসবাবপত্র এবং বিশ্রাম কক্ষের সাজ-সজ্জা ও সেই দিনগুলোর অন্যান্য ঘটনাবলী তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠেছিল। আপনি দেখুন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কত পর্যায়ের অতিক্রম করান। এক সময় কোন লোক একটা বিষয়কে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে কিন্তু অন্য সময় সেই একই বিষয় আবার তার কাছে চোখের তৃপ্তি ও মনের প্রশান্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা ফলবতী বানিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধা বানিয়ে ছাড়েন। সেই প্রকৃত মালিক যাকে মনে করেন কালেমায়ে হকের ওপর দৃঢ় থাকার সৌভাগ্য দান করেন, তাকে স্বাধীনচেতা বানিয়ে দেন ও বলিষ্ঠতা দান করেন। যাতে দুনিয়াতেও তিনি হক কথার ওপর স্থির থাকতে পারেন এবং আখেরাতেও তার পদস্খলন না ঘটে। এসব লোক সবর্দা নিজের নীতির ওপর সর্বত্র অটল থাকে। পক্ষান্তরে কিছু কিছু লোককে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বায়ু নির্ণায়ক যন্ত্রের মতো বানিয়ে থাকেন। যারা সবসময় বায়ুর গতি বুঝে নিজেদের লক্ষ পরিবর্তন করে

www.amarboi.org

থাকে। বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ানো এই সুবিধাবাদীদের সাধ্য থাকলে তারা হাওয়াকেও মাত করে দিতো এবং হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার পূর্বেই তার গতিবেগ অনুমান করে নিজের কিবলা করে নিতো।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মত দৃঢ়তা দান করো। তোমার রাস্তায় তোমারই সন্তুষ্টিলাভের জন্য যে বিপদই আসুক না কেন তা হাঁসি মুখে সহ্য করার মত মনোবল প্রদান করো। হে প্রভু! আমরা যখন তোমার শাহী দরবারে উপস্থিত হবো তখন যেন তুমি আমাদের ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট থাকো এ ছাড়া আমাদের আর কোন চাওয়ার নেই।

এখানে হতাশার কোন স্থান নেই

এই মহান ব্যক্তি (মুর্শিদে আ'ম) হতাশাকেও কখনো তাঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিতেন না বরং তাঁর আশা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিশাল ছিল। বাহ্যত হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতেও তিনি আশার আলো দেখতে পেতেন। দুর্দিনে ও সুদিনের দীপ্তি তার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তিনি বিশেষ নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল বিশ্বজাহানের মালিকের সাথে একান্তভাবে সম্পর্কিত। তাঁর সহ্য ক্ষমতা ছিল খাঁটি ইস্পাতের চেয়েও শক্ত ও মজবুত। সর্বশক্তিমান আল্লাহর সত্তাই ছিল তাঁর সাহায্যের উৎস। প্রত্যেক ব্যাপারেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম থাকে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও ক্ষমতা অসীম তাতে ব্যতিক্রমের লেশমাত্র নেই।

নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

একবার আমি মুর্শিদে আ'ম-এর সাথে কালয়ুবিয়া প্রদেশের তুখ শহর সফরে গিয়েছিলাম। শহরে খুবই জাঁক-জমক পূর্ণ ও আজিমুশ্বান জালসা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ প্রতিধ্বনি এবং শ্লোগানের আওয়াজ শুনতে পেলাম যেন প্রতিটি জিনিসই শান-শওকতের প্রদর্শনী করছিলো। জালসা শেষে আমরা সেই রাতেই কায়রো ফিরে আসি। পথিমধ্যে মুর্শিদে মুহতারাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন "এই জালসা সম্পর্কে তোমার মতামত কি?"

আমি আরজ করলাম, "শোরগোল ও গগণ বিদারী শ্লোগানের আওয়াজ আমার জন্য সান্ত্বনাদায়ক নয়। আমার নিকট এগুলো ঢোলের মতই মনে হয়। আপনি যখন ঢোলে হাত মারবেন তখন প্রচন্ড আওয়াজ হবে। কিন্তু যদি তার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে কিছুই নেই। শুধু মাত্র খালি ঢোলই রয়েছে।"

আমার কথা শুনে তিনি বললেন: "দেখুন আমরাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকি। তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, বাজার এবং মেলায় পর্যন্ত গিয়ে তিনি লোকদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পেশ করতেন। প্রত্যুত্তরে জনগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং জুলুম-নিপীড়ন

www.amarboi.org

দ্বারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো। তাহলে কি মানুষের উদাসীনতা ও অনাগ্রহের ভাব প্রদর্শনে আমাদের সবর করা উচিত নয়? প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যদি হাজারো জনতার মধ্যে থেকে একজন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও আমাদের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠে তা হলে এই সফলতা আমাদের জন্য গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।" এভাবে মুর্শিদে আ'ম আমাদের অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়ে দিতেন এবং আল্লাহর পথে আপতিত বিপদে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা প্রদান করতেন।

হাসানুল বান্না রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাদেরকে এসব শিক্ষা তার অফিসে কিংবা ক্লাস রুমে অথবা লেকচার হলে বসিয়ে পড়াতেন না, কিংবা শুধু তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বুলিই শিক্ষা দিতেন না বরং তিনি আমাদেরকে বাস্তব ক্ষেত্রেও সবকিছু শিখিয়েছেন। আমাদের নিজেদেরকে অটলভাবে টিকে থাকতে এবং অন্যদেরকে লৌহদন্ডের ন্যায় মজবুত ও বলিষ্ঠভাবে স্থির থাকতে শিক্ষা দিতে ও উদ্ভূত প্রত্যেক সমস্যা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ তিনি তার বাস্তব অনুশীলন দ্বারা আমাদের শিখিয়েছেন। আমি তাঁর সাথে দূর দূরান্তে অবস্থিত শহরের, পশ্চাতপদ গ্রামের এবং দূরতিক্রম্য কঙ্করময় পথে দীর্ঘ সফর করেছি। আমাদের পদযুগল ধূলাবালিতে একাকার হয়ে যেতো এবং কখনো পিচ্ছিল পথ ধরে একাধারে চলতে থাকতো। কোন কোন সময় কর্দমাক্ত রাস্তায় চলতে হতো, দীর্ঘ সফরে চলতে চলতে আমার শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো এবং বার বার ঘাম মোছার ফলে আমার রুমাল নিংড়ানোর উপযুক্ত হয়ে যেতো। সফরকালীন সময়ে আমি আমার দ্বীনি ভাইদের সাথে মসজিদের বিছানার ওপর শুয়ে পড়তাম কিংবা কখনো কোন সাধারণ হোটেলে রাত্রিযাপন করতাম—যদি মসজিদে অথবা কোন মেজবানের নিকট শোবার জায়গা না হতো। আমাদের খাদ্য হতো পরিমাণে অল্প এবং শুষ্ক নিরস। বাইয়াতের দায়িত্বানুভূতি আমাদেরকে নিজেদের পছন্দনীয় জিনিস ত্যাগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতো। আমি মুর্শিদের নিকট বাইয়াত করে এই শপথ নিয়েছিলাম যে, শরীয়াত অনুমোদিত প্রতিটি কাজে আমি তাঁর শর্তহীন আনুগত্য করে যাবো।

আপনাকে আমি মুর্শিদে আ'ম-এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত তো অনেকই দিতে পারি তথাপি কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট মনে করবো। আপনি দেখতে পাবেন এই দৃষ্টান্তগুলো বাস্তব নমুনা পেশ করে থাকে। একদিন আমি মুর্শিদের সাথে একটা সমাবেশে গিয়েছিলাম। সমাবেশ শেষে আমরা দু'জনই ঘরের অপর অংশে চলে যাই যেখানকার এক কামরায় আমাদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আমরা এসব দাওয়াতি অভিযানে বস্তুগত আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত থাকতাম। কিন্তু মানসিক প্রশান্তিতে হৃদয় ভরে যেতো। আমরা কক্ষের ভেতর প্রবেশ করলাম যাতে কিছু সময়ের জন্য শারীরিক আরাম লাভ করা যায়। কক্ষের মধ্যে দু'টো চৌকি ছিল এবং প্রত্যেক চৌকির ওপর একটা করে মশারি ছিল। কেননা এই অঞ্চলে মশার উপদ্রব ছিল। মশাগুলোও ছিল বড় বেয়াড়া, উদর ভর্তি করে যতক্ষণ

www.amarboi.org

পর্যন্ত মনুষ্য রক্তপান করতে না পারতো ততক্ষণ অবধি তারা শান্ত হতো না। আমি পরবর্তী সময় কোথায় যেন পড়েছিলাম যে মশা যতক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকে ততক্ষণই জীবিত থাকে। কিন্তু পেট ভরে রক্ত পান করলেই মারা যায়।

যাই হোক মুর্শিদ এক চৌকির ওপর শুয়ে পড়লেন, এবং মশারিও খাঁটিয়ে নিলেন। আমিও তাঁর অনুকরণ করে অন্য চৌকিতে মশারির নীচে শয্যা গ্রহণ করলাম। এই সফর কালে ক্লান্তি ও অবসাদ এতবেশী পেয়ে বসেছিলো যে, তা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবো না। আমি সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। পাঁচ মিনিট পর মুর্শিদের আওয়াজ কানে ভেসে আসলো, "ওমর ঘুমিয়ে গেছো?" আমি জবাব দিলাম, "এখনোও ঘুমুতে পারিনি?" এভাবে কিছুক্ষণ পর পর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি আমার নিকট অশ্বস্তিকর বোধ হতে লাগলো। আমি মনে মনে ভাবলাম যতটা ক্লান্তি আমাকে ইতিপূর্বেই অবসন্ন করে ফেলেছে তা কি যথেষ্ট নয় যে, এর ওপর তিনি আরো কিছু যোগ করছেন। তিনি কি আমাকে ঘুমুতে দিবেন না? মনের ভেতরে একটি খেয়াল উদয় হচ্ছিলো এবং নিজে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মুর্শিদ যদি আবারো প্রশ্ন করেন তা হলে নীরব থাকবো। যাতে তিনি মনে করেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। যেই কথা সেই কাজ। আমার চুপ থাকায় তিনি সত্যিই ভাবলেন যে, আমি নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। অতপর তিনি চুপিসারে সন্তর্পনে চৌকি থেকে উঠে পড়লেন এবং দরজার কাছে গিয়ে কাঠের স্লিপার হাতে নিয়ে নগ্ন পায়ে হাম্মামখানায় গিয়ে অজু করলেন এবং বিশ্রাম কক্ষ থেকে একটু দূরে অন্য কামরায় একটা ছোট জায়নামায বিছিয়ে তাহাজ্জুদের নামাযে মনোনিবেশ করলেন। তিনি সেখানে ততক্ষণ পর্যন্ত তার রবের হুজুরে নফল পড়তে থাকেন যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাকে তৌফিক দিয়েছেন। এদিকে তো মাশাআল্লাহ চৌকির ওপর আমার অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিয়ে অঘোরে নিদ্রা সুখ ভোগ করছিলাম। সকালে আমি যখন জেগে উঠি তখন এই নীরব বাস্তব শিক্ষা স্মৃতিপটে পুরোপুরি জাগ্রত ছিল যা গত রাতে আমার নিজ চোখে দেখতে পেয়েছিলাম।

আল্লাহ তায়ালা মুর্শিদকে এমন শক্তিশালী ও সুগঠিত শরীর দান করেছিলেন যে, তিনি দিনভর মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করতেন এবং রাত্রিবেলা যখন লোকজন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নিজ নিজ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তেন তখন নামমাত্র বিশ্রামের পর মুর্শিদ তার মাওলার সমীপে রুকূ' ও সিজদায় অবনত হতেন। তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এই বিশেষ তাওফীক দান করা হয়েছিলো। তাই তিনি দিবা-রাত্রি ইবাদাত ও দাওয়াতের কাজে নিবিষ্ট থাকতে পারতেন।

অনুসারীদের মাঝে তখনো এতটুকু শক্তি সৃষ্টি হয়নি যে, তারা তাদের মুর্শিদের মত কষ্ট সহ্য করতে পারে। আবার মুর্শিদ নিজেও তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। অতএব পূর্ণাংগ স্নেহের সাথে তিনি অনুসারীদের আরামের

www.amarboi.org

প্রতি যত্নবান থাকতেন যেন আতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। মুর্শিদ কখনো চাইতেন না যে, তার অনুসারীগণ তারই কারণে কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হোক। খুবই স্বাভাবিক যে, যদি তিনি আমাকে জানিয়ে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তা হলে আমাকেও আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সান্নিধ্য দিতে হতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সবকিছু সহজ ও সুগম করতে চান, তাদেরকে কোন প্রকার কষ্টে ফেলতে চান না। (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) তাই এই কুরআনী নির্দেশ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আলোকে মুর্শিদ সবর্দা ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। প্রথমে তিনি তাঁর অনুসারীদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতেন তার পর তাঁর রবের ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের চেষ্টায় রত হতেন।

এটাই প্রকৃত প্রশিক্ষণ ও বাস্তব শিক্ষা। যাকেই কোন দল কিংবা কোন দেশ ও জাতির নেতা নির্বাচিত করা হোক না কেন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অনুরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করা। তাকে জাতি ও দলের জনগণের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে হবে সর্ব প্রথম এবং নিজের আরামের চিন্তা করতে হবে সর্ব শেষে।

মুর্শিদে আ'ম (র)-এর অভ্যাস ছিল তাঁর ভাষণ শেষ হলে তিনি অগ্রসর সাথীদের নিয়ে পৃথক বৈঠকে মিলিত হতেন। (যেন তাদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।) এরা হতেন এমন নিষ্ঠাবান লোক যাদেরকে মুর্শিদ ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁর একান্ত সান্নিধ্যের জন্য মনোনিত করতেন এবং যাদের মধ্যে তিনি কল্যাণ ও মংগলের লক্ষণ দেখতে পেতেন। মুর্শিদ নিজেই ছিলেন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন। তিনি না কখনো ক্লান্ত হতেন আর না কখনো অধৈর্যও হতেন। আত্মার জন্য শুধু এটাই জরুরী নয় যে, শুধু মাত্র নিজের দেহকেই জীবিত রাখবে বরং তার জন্য অধিকতর জরুরী হচ্ছে যার সাথেই সে মিলিত হবে তাকেই জীবনের নেয়ামত-রাজি দ্বারা ধন্য করে দেবে।

আদর্শ সমালোচনা

তোয়াহা হোসাইন প্রণীত গ্রন্থ "মুছতাকবিলুস সাকাফাতে ফি মিছর" (মিসরের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যত) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হলে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীসমূহ তার প্রশংসায় আকাশ পাতাল মুখরিত করে তোলে। বইটির প্রচার প্রপাগান্ডা এতবেশী করা হয় যে, এই বিষাক্ত প্রপাগান্ডার ফলে অধিকাংশ যুবকের মন-মস্তিষ্ক বিষিয়ে ওঠে এবং তারা এই গ্রন্থে পরিবেশীত সমস্ত বাতিল ও ভিত্তিহীন তত্ত্ব ও তথ্যকে খাঁটি সত্য বলে মনে করতে থাকে। ইমাম হাসানুল বান্না এই বিপদ উপলব্ধি করতে পারেন এবং তিনি যাতে এই গ্রন্থের ওপর তাঁর সমালোচনা পেশ করতে পারেন সেজন্য ইউনিভারসিটির কর্মকর্তাদের নিকট দাবী করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই দাবী মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করতে থাকেন। কিন্তু দাওয়াতে ইসলামীর নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের চরম অনমনীয়তার ফলে প্রশাসনকে অবশেষে নতি স্বীকার করতে হয়। অনন্তর শাইখ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখে লিখিত অনুমতি প্রদানের দাবী

www.amarboi.org

করেন। পত্রে তিনি তার সুপরিচিত নাম হাসানুল বান্না লিখে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত ধৃষ্ঠতার সাথে এই পত্র প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন কেবলমাত্র এই শর্তে অনুমতি দেয়া যেতে পারে যে, বক্তা তার পুরো নাম হাসান আহমদ আবদুর রহমান লিখবেন। শাইখ কোন পরিচিতির মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাই তিনি এসব ছোট ছোট বিষয় কখনো তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড় করাননি। তিনি এসব খুটিনাটি ব্যাপার থেকে ছিলেন অনেক উর্ধে। মুর্শিদ তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় পত্র পাঠিয়ে ব্যবস্থাপনার দাবী পূরণ করেন। তিনি কখনো চাইতেন না যে, কোন মহৎ ও উন্নত উদ্দেশ্যের সম্মুখে এ ধরনের মামুলী বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াক।

থিয়েটার হল (যেখানে লেকচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল) কানায় কানায় ভরে গেলো। অথচ সমবেত শ্রোতার সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, বিশাল থিয়েটার হলও তা ধারণের জন্য যথেষ্ট হলো না। এই ভরা মজলিশে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হাসানুল বান্না দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন। তিনি আলোচ্য বইয়ের যথোপযুক্ত সমালোচনা করে এক একটি বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। ফলে তোয়াহা হোসাইনের বিপজ্জনক সংকল্প সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়লো। তোয়াহা হোসাইনের বিশ্বাস ছিল এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি রপ্ত করার ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ থাকা উচিত নয়।

পশ্চিমা সভ্যতা যা কিছুই হোক আর যেমনই হোক না কেন তার সমুদয় সৌন্দর্য ও ত্রুটিসহই পুরোপুরি গ্রহণ করা আবশ্যক। তার মতে পশ্চিমা উন্নতি অগ্রগতি এবং উন্নত জীবন যাত্রার মান অর্জন সেই সভ্যতার প্রতি পুরো আনুগত্য প্রকাশ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়।

মুর্শিদে আ'ম-এর ভাষণ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। এই পর্যায়ে তিনি বইয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা করতঃ ঐ সকল গোপন চক্রান্ত ও বিপজ্জনক পরিণতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উপস্থিত জনতার সম্মুখে আলোচনা করে গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। শ্রোতামন্ডলী ও সর্বস্তরের জনগণের ওপর এই বক্তৃতার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। যুবকদের মন-মগজে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের যে ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হয় এবং গ্রন্থের খ্যাতিও উবে যায়। মার্কেটে ও বুকষ্টলে বইটির চাহিদায় দারুণ ভাটা পড়ে। এমনিভাবে প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ব্যক্তির ওপর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। তিনি এমন এক ডক্টর যাকে (তার স্তবকরা) আরবী সাহিত্য এবং প্রাচ্য জগতের নেতা মনে করতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি (তোয়াহা হোসাইন) না ছিলেন নেতা না ছিলেন সত্যিকার মর্যাদা লাভের যোগ্য। (সব রকম প্রচার-প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও) মানুষ তোয়াহা হোসাইনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। তিনি আরবী সাহিত্যের স্তম্ভ কিভাবে হতে পারেন যখন তার রুচিবোধে আরবী এবং ইসলামী নামও কষ্টদায়ক মনে হয়। অতএব (কে না জানে যে) তার সন্তানদের নাম আরবী কিংবা ইসলামী নয় বরং ফরাসী ভাষায় রাখা হয়েছে।

www.amarboi.org

সাহিত্য সমালোচনা

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

"যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য অর্থাৎ তার দ্বীনের সহায়তা কর তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের সাহয্যে এগিয়ে আসবেন এবং তোমাদের পা মজবুত করে দেবেন।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতার সময় ইমাম উক্ত গ্রন্থের বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলোর কঠোর সমালোচনা করেন কিন্তু ব্যক্তি তোয়াহা হোসাইন সম্পর্কে তাঁর মুখ থেকে সমালোচনা মূলক একটি কথাও উচ্চারিত হলো না। অতপর আমি জানতে পেরেছি যে, এরূপ সমালোচনা নীতির কারণে তোয়াহা হোসাইন নিজেও ইমামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যাপারটা শিক্ষালাভের মত সহজ নয়। মানুষ শিক্ষা লাভ করে এবং তারপর সাধারণত সে একটা গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করে। বেশী পড়া-লেখা জানা লোকেরা কিছু সংখ্যক চলমান কিতাব বিশেষ হয়ে থাকে। ঐ সকল বইতে জ্ঞান থাকে কিন্তু সেই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানী সৃষ্টি করেত সক্ষম হয় না। এ ধরনের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইল্ম অনুযায়ী আমল করার তথা জীবন গঠন করার কোন গুরুত্ব থাকে না। একজন শিক্ষার্থীর জন্য এথেকে বড় জুলুম আর কিছুই হতে পারে না যে, তার উস্তাদ বাস্তব জীবনে সে সমস্ত মূলনীতি লংঘন করবেন। যার ওপর তিনি তার পাঠ কিংবা বক্তৃতায় খুবই জোর দিয়ে থাকেন।

আপনি একজন শিক্ষার্থীকে অতি সহজেই নামায শিক্ষা দিতে পারেন। নামাযের আরকান কি কি এবং কি কি কারণে নামায ফাসিদ হয়। নামাযের মধ্যে মুস্তাহাব আমল কোনগুলো আর মাকরুহই বা কোনগুলো। এসব বিষয়ের শিক্ষা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু শিক্ষার্থীর মন-মগজে এবং তার বাস্তব জীবনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়া যে, انَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ("নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।)" অত সহজ কাজ নয়। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : من لم تنهه صلاته لم يزد من الله الاّ بعداً ("যে ব্যক্তির সালাত তাকে পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখলো না সে তার সালাত দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার পরিবর্তে আল্লাহর রহমত থেকে আরো দূরে সরে গেলো।")

আমাদেরকে একথা ভেবে দেখতে হবে যে, যদি সালাতকে (রূহানী প্রেক্ষাপট) কেবল মাত্র যান্ত্রিক নিয়মে এবং গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ অংগ ভংগীর সাহায্যে আদায় করাও হয় তাতে রবের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হয় না। অথচ সালাতের সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ। এ বিষয়টিকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে সাইয়েদ হাসানুল বান্না সালাতকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। ইখওয়ানের প্রশিক্ষণের সময় এই অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মুর্শিদ সর্বদা মন ও মগজে এই নীতি জাগরুক রাখতেন যে, নামাযের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতি শিক্ষা দেয়ার পূর্বেই তার মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা দরকার। তিনি বলতেন : তোমরা যদি নামাযের বাহ্যিক শর্তাবলী পূরণ করো তা হলে বাহ্যত তোমাদের ফরজ আদায় হয়ে যাবে সত্য কিন্তু নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনয়, নম্রতা এবং সততা। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহতে সোপর্দ করে দেয়া হচ্ছে নামাযের মগজ। ইমাম তার অনুসারীদের মনে এসব বিষয় বদ্ধমূল করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি বলতেন এসব গুণাবলী ব্যতীত আমাদের নামায আমাদের প্রকৃত কোন উপকাবে আসবে না। সত্য বলতে কি ইমাম যে এই যুগ ও প্রজন্মের সর্বোত্তম মরুব্বী ছিলেন সে সম্পর্কে কোন মতোবিরোধ হতে পারে না।

www.amarboi.org

আকীদাগত কারণে ইসরাঈলের সাথে শত্রুতা

কমিউনিজম, খৃস্টবাদ ও ইহুদীবাদ যেমন হাসানুল বান্না ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তেমন বৈরিতা তাদের অপর কারো সাথে নেই। এর কারণ হচ্ছে, হাসানুল বান্না ও ইখওয়ান এই অঞ্চলে কমিউনিজমের লুটপাট ও ধ্বংসের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে প্রমাণিত। খৃস্টবাদ ও ইহুদীবাদের জন্যও ইখওয়ান বিপজ্জনক। কারণ তারা তাদের দ্বীনের শিক্ষাসমূহকে শুধু জ্ঞানের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেই অধ্যয়ন করে না। বরং তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও কার্যকরী করার শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। তারা প্রতিটি সামরিক ও মতাদর্শগত আগ্রাসনের বিষাক্ত প্রভাব ও পরিণাম থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে চায়। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে, মুসলিম উম্মার প্রতিটি ব্যক্তি যেন মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে পারে এবং মানবতা সামগ্রিকভাবে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পায়। তারা এটা মোটেও পছন্দ করে না যে, মুসলিম জাতি দান খয়রাতের ও বিদেশী সাহায্যের আশায় বেঁচে থাকবে। অথচ মুসলিম দেশগুলোতে প্রত্যেকটি জিনিস এত অধিক পরিমাণে রয়েছে যে, (যদি ইনসাফভিত্তিক বন্টন করা যায়) তাহলে সমস্ত মানুষের প্রয়োজন খুব ভালভাবে পূরণ হতে পারে। ইখওয়ানের আকাংখা হচ্ছে তাদের এবং তাদের শাসকদের মধ্যে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক সম্প্রীতি সুবিচার সম্মান বোধের ভিত্তিতে।

হাসানুল বান্না শহীদ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, প্রজা সাধারণের ওপর রয়েছে শাসকগোষ্ঠীর অধিকার যেমন তাদের নির্দেশ পালন করা এবং তাদের আনুগত্য করা। (যদি তা আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানীর পর্যায়ে না পড়ে) অনুরূপ তিনি আমাদেরকে আরো বলেছেন যে, শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, তারা আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতন-নিপীড়নের পলিসি বর্জন করবেন।

সাইয়েদেনা ওমর ইবনুল খাত্তাবের (রা) তাঁর ভাই যায়িদ বিন খাত্তাবের হত্যাকারীকে ভাল লাগতো না। হন্তা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি হযরত ওমর (রা)-কে বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! আমার সম্পর্কে আপনার মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি আমাকে আমার কোন অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে না তো ?"

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "কখ্খনো না।"

অতপর সেই ব্যক্তি বলতে লাগলো, "যদি প্রকৃত ব্যাপার তাই হয় তাহলে আপনার আমাকে পছন্দ না করা কোন চিন্তার কারণ হতে পারে না। এমতাবস্থায় মেয়েরা কাঁদতে পারে, পুরুষ কাঁদতে পারে না। অবশ্য পুরুষদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা বসে বসে কাঁদতে থাকবে।

এ ঘটনার আলোকে মুর্শিদ আমাকে বলেছিলেন যে, শাসকদের পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি কখনো কোন ব্যক্তিকে তার শরীয়াত স্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। আমি একটা হাদীস পড়েছি। হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা অবশ্য আমি

www.amarboi.org

যাঁচাই করে দেখিনি। হাদীসটির সারমর্ম হলো, "যে ব্যক্তি কোন ন্যায় পরায়ণ সুলতানকে অপদস্ত করে তার তাওবাও কবুল হয় না।

সাইয়েদ হাসানুল বান্না না ছিলেন সন্ত্রাসী না ছিলেন তথাকথিত বিপ্লবী। বরং তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহবানকারী ও সংস্কারক। তিনি যেখানেই যেতেন এবং যার সাথেই মিলিত হতেন তাকেই ভালবাসা, শান্তি ও সহযোগিতার শিক্ষা দিতেন।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, ইসলামী জাহানের কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে থাকেন এবং ইখওয়ানুল মুসলিমূনের বিরুদ্ধে সংঘাত ও বৈরিতায় অবতীর্ণ হন। তাদের মধ্যে এই কুধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে, দেশ ও সরকারের মধ্যে ইখওয়ান তাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। (এবং যে কোন সময়ে তাদের ক্ষমতার মসনদ উল্টিয়ে তাদের হাত থেকে ক্ষমতার দন্ড ছিনিয়ে নেবে) অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইখওয়ানের মূল উদ্দেশ্য সংস্কার এবং বর্তমান অবস্থার উন্নতি বিধান। একটু লক্ষ করুন যে, ইখওয়ানের প্রকৃতরূপ এবং তার বিরুদ্ধে রটানো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডার মধ্যে কত ব্যবধান। কবির ভাষায়ঃ

ايها المنكح الثريا سهيلا
حسبك الله كيف يلتقيان
هى اذا ما استهلت شامية
وهو اذا ما استهل يمان

(ওগো সুরাইয়া ও সুহাইল নক্ষত্রের মধ্যে মিলন সৃষ্টির অভিলাষী। তোমাকে আল্লাহ্ তায়ালা কিছু বিবেক বুদ্ধিদান করুন। এটা কি করে সম্ভব? সুরাইয়ার উদিত হওয়াকে মানুষ কুলক্ষণ বলে মনে করে আর সুহাইলের উদিত হওয়াকে কল্যাণের প্রতীক হিসেবে বরণ করে নেয়।)

[শেষ পংক্তির অর্থ এও হতে পারে যে, সুরাইয়া সিরিয়ার দিগন্তে উদিত হয় আর সুহাইল ইয়েমেনের আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। তার মানে উভয়ের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব বিদ্যমান।]

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি যদিও ইমামের শাহাদাতের প্রায় তিরিশ বছর পর সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু ইমামের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই চুক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আমি সমীচীন মনে করছি। এটা আমি এ জন্য জরুরী মনে করছি যে, এই সমঝোতা চুক্তির ব্যাপারে ইখওয়ানের ভূমিকা এবং তা রহিত করার নীতি সেই রাজনৈতিক শিক্ষার ফল। যা ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে ইমাম আমাদেরকে দিয়েছেন। কারণ ইসলাম একাধারে দ্বীন ও হুকুমাত দু'টিই।

www.amarboi.org

ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে যারা অবহিত তাদের এটা ভালভাবে জানা থাকা আবশ্যক যে, ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার নীল নক্‌শা বাস্তবায়িত করার জন্যই এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটাই এর মূল উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এ থেকে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আগন্তুককে ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারে না যতক্ষণ না তা তার পোশাক জ্বালিয়ে তার শরীরের অংগ প্রত্যাংগ অবধি গিয়ে পৌঁছে। কারণ যদি শুধু মাত্র ইহুদীদের জন্য একটা পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য হতো তা হলে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় কতিপয় বিস্তৃণ অঞ্চল ছিল এবং এরূপ অস্বাভাবিক রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য ঐসব এলাকায় অনুকূল পরিবেশও পাওয়া যেতো। কিন্তু এ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা ও সর্তকতার সাথে এই অঞ্চলটি বেছে নেয়া হয়েছিলো তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তাইতো তারা এমন এলাকা বেছে নেয় যেখানে ইসলামের অস্তিত্ব বহু পুরাতন। এই রাষ্ট্রের সাহায্যে তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বৃটেন তার অছিগিরির যুগে ইহুদীদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিস্তিনে স্থানান্তর করতে শুরু করে এবং তাদেরকে পুরোপুরি সশস্ত্র অবস্থায় এখানে বসবাস করার সুযোগ করে দেয়। অপর দিকে কঠোর আইন প্রবর্তন করে ফিলিস্তিনীজনগণকে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি সবজি কাটার ছুরি রাখাও ফিলিস্তিনীদের জন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বৃটেনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইহুদীরা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে এবং ফিলিস্তিনীদের (প্রতিরোধ আন্দোলনের) মোকাবিলায় তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রের (বিকেন) সহযোগিতা গ্রহণ করতে থাকে। ফিলিস্তিন আযাদী আন্দোলন ও ইখওয়ান মুজাহিদগণের সাহায্য ও সহায়তায় তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তৎপর থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসবে। আফসোস ! যদি আমরা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারতাম, আরো দুঃখ মুসলিম উম্মাহ এবং আরব জাহানের ক্ষমতাসীনরা যদি তাদের চোখ খুলে দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, খৃষ্টান, কমিউনিষ্ট এবং ইহুদী শক্তি তাদের পায়ের তলায় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে এবং ধ্বংসাত্মক গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। হায় ! যদি তারা সেই ভয়ানক গর্ত দেখতে পেতো যা তাদের এবং তাদের দেশ ও জাতির জন্য দুশমনরা তৈরী করে রেখেছে। অথচ তারা নিজেদের সরলতার কারণে তাদেরকে বন্ধু বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা তাদের জঘন্যতম শত্রু।

আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ইসলামী দুনিয়া এবং আরব জাহানের প্রত্যেক দায়িত্বশীল (শাসক) উপরোল্লিখিত তিক্ত ও ভয়াবহ সত্য সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত রয়েছেন বরং হয়তো বা তারা আমাদের থেকেও অধিক অবহিত আছেন। তা সত্ত্বেও আমি বিস্ময় ও তিক্ততার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাই এই ভেবে যে, এমন জ্বলজ্যান্ত সত্য ব্যাপারেও তারা চোখ বন্ধ করে আছে কেন!

www.amarboi.org

ইহুদী কর্মনীতি হচ্ছে, তারা আমাদের সবাইকে এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করতে চায় যে, এখন এই অঞ্চলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আর এটা একটা জীবন্ত সত্য। এই সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই ; আর এর ধ্বংস সাধনও সম্ভব নয়। তারপরও যতই আমরা মুসলিমগণ এই ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে ইসরাইলের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা মেনে নেব তখনই অশেষ ও চিরস্থায়ী বিপদ ও ধ্বংস আমাদের ভাগ্য লিপি হয়ে যাবে।

ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক

ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক বাজায় রাখা এমন একটা দুরূহ ব্যাপার যাতে সাফল্য অর্জন সম্ভবই নয়। কেননা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতা এর নেতিবাচক দিকটিই প্রমাণ করে। কোন মানুষ কি এটা কল্পনা করতে পারে যে, ইহুদী জাতি কোন অইহুদী জাতির সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করবে ? আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির প্রকৃতিকে কে পরিবর্তন করতে পারে। ইহুদীদের সাথে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ এবং বন্ধু প্রতীম সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা এমন এক নিষ্ফল অপপ্রয়াস যার পরিণতি এতদ্ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না যে, সমস্ত মুসলিম জাহান একযোগে ধ্বংস ও বিনাশের শিকার হয়ে যাবে। আমরা মুসলিম। যে আল্লাহর ওপর আমরা ঈমান পোষণ করি তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"لتجدن اشد الناس عداوةً للّذينَ امنُوا اليهود"

"যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে নিকৃষ্ট শত্রুতা পোষণকারী লোক তুমি ইহুদীদেরকেই দেখতে পাবে।"

এটা তো আল্লাহ তায়ালারই ফায়সালা। এতে কোন প্রকার গোঁজামিল কিংবা গুপ্ত রহস্য নেই। বিদ্বেষের সূচনা হয় তাদের পক্ষ থেকেই আমাদের পক্ষ থেকে নয়। এ ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি সুস্পষ্ট দলীল। তারপরও কি আমরা ইহুদীদের স্বরূপ এবং ইসলামের অনুসারীদের সাথে তাদের দুশমনির ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার চেয়েও বেশী জানি ?

ইখওয়ানুল মুসলিমুন যাদের অন্তর ইসলামের রহমত ও সৌহার্দ সম্প্রীতিতে ভরা—কখনো বলে না যে, ইসরাঈলকে সাগরের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিতে হবে। তারা এই শ্লোগানও দেয় না যে, সর্বশেষ ইহুদীকে সর্বশেষ কমিউনিষ্টের অন্ত্রের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে হবে। রক্তপাত ইসলামের মেজাজের পরিপন্থী। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ইহুদীরা ফিলিস্তিনে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারে। বাকী থাকে এই বিষয়টি যে, আমরা তাদেরকে অত্র অঞ্চলে শাসন দন্ড পরিচালনা এবং ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের সাহায্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেবো তা কখনো হতে পারে না।

সারা বিশ্বে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে থাকে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যে, আহলে ঈমানদের নিকৃষ্টতম দুশমন

www.amarboi.org

মুসলিম প্রজাসাধারণের ওপর ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সরকার পরিচালনা করবে। (তদুপরী সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শাসন কার্য পরিচালনার কি অধিকার তাদের থাকতে পারে।) তাদের নিকট থেকে ইনসাফের প্রত্যাশা অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

ومكان الايام ضد طباعها
متطلب في الماء جذوة نار

(যে ব্যক্তি প্রকৃতির বিধানসমূহকে তার স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে পরিচালনা করতে চায় সে যেন পানির মধ্যে অগ্নিস্ফুলিংগ দেখার চেষ্টা করে।)

অতএব অত্র অঞ্চলের সর্বস্তরের জনসাধারণ ও শাসকগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা হওয়া কর্তব্য এই হিংস্র নেকড়ের হাত থেকে নাজাত হাসিলের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই নেকড়ে ধীরে ধীরে তাদের রক্ত শোষণ করছে (অবশেষে একদিন তাদেরকে সম্পূর্ণ মৃত করে ছাড়বে) এই দূরারোগ্য ক্যানসার থেকে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত জরুরী যা পুরো পরিবেশকে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে। মর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বাধীন মানুষ হয় মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে নয়তো মর্যাদা নিয়ে মৃত্যু বরণ করে।

যে ব্যক্তি সম্মানের সাথে মৃত্যু বরণ করে এবং যাকে অনাগত বংশধরগণ সম্মান এবং বীরত্বের কারণে স্মরণ করে থাকে তার এবং অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে বেঁচে থাকা মানুষের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, একজন অপমানকে পদাঘাত করেছে আর অপরজন সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিয়েছে। এভাবে কি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যে ছিনতাইকারী যে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে তা তারই মালিকানাধীন থাকবে আর মজলুম তার সাথে সমঝোতা করবে? এটা কি ধরনের শান্তি? এ রকম আপোষ থেকে তো ধ্বংসাত্মক বিপদের মোকাবিলা করা অধিক উত্তম এবং সহজ। আমাদের অবস্থা যাই হোক না কেন? এমন শান্তি ও আপোষ-সমঝোতা কিছুতেই আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

আমাদের বীর সৈনিকগণ এমন সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলো যে (যদি আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতাম তাহলে) তার ফলাফল সমগ্র এলাকায় পরিদৃষ্ট হতো। আমরা একাই যখন এতবড় কৃতিত্ব দেখালাম তখন গোটা অঞ্চলের সব মুসলিম শাসক ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার ফলাফল কি হবে তা অনুমান করুন। নিসন্দেহে ফলাফল গৌরবময় ও মর্যাদাকর হবে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে মানুষ দারিদ্রের ভয়ে দারিদ্রের মধ্যে ডুবে আছে। অদৃশ্য ভয় তাদেরকে আতঙ্কে নিমজ্জিত করে রেখেছে। লাঞ্ছনার ভয়ে তারা লাঞ্ছনার অসহায় শিকার হয়ে আছে।

আমাদের যুবশক্তির মধ্যে যোগ্যতা আছে। তাদেরকে যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাহলে তারা তাদের মধ্যেকার সুপ্ত পৌরুষের পরিচয় প্রদান এবং কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জল কর্ম সম্পাদন করতে পারবে। কিন্তু প্রচার প্রপাগান্ডার বর্তমান ব্যবস্থা তা হয়তো ইহুদী আধিপত্যের কারণে—এরূপ প্রজন্ম কস্মিনকালেও সৃষ্টি করতে পারবে না যারা তাদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ পোষণ করতে পারে এবং তাদের দেশ ও তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য গর্ব প্রকাশ

www.amarboi.org

করতে পারে অথবা স্বীয় হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। এটা কত দুঃখজনক যে, নিজেদের ব্যক্তিগত সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে যখনই মুসলিম যুবকেরা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে নিজেদের তৈরী করেছে তখনই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র এই যুবকদেরকে (তাদের শাসকদের হাতে) অত্যাচার নির্যাতন ও জেল জুলুমের শিকার হতে হয়েছে। এরূপ আচরণ শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দূর দূরান্তের দেশগুলোতেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার বিষয়টি অত্যন্ত চড়া মূল্য দাবী করে। এই সন্ধি এবং তাতে নির্ধারিত শর্তাবলী ইসরাঈলকে অত্যন্ত নির্বিঘ্নে তার সংকল্প ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

বর্তমানে প্রতিটি মহাদেশে যেসব ইসলামী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের ইসলামী ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস ও প্রচেষ্টার ফল মাত্র। যদিও তাতে এখনও কিছু দুর্বলতা এবং দোষ-ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু আমি আশা করি এর ফলাফল একদিন অবশ্যই প্রকাশ পাবে। এটাও কল্যাণকর একটা দিক যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা মাঝে মধ্যে এক সাথে মিলিত হয়ে বসে। একে অপরের সাথে পরিচিত হয়। পরস্পর সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করে এবং একজন অন্যজনের শক্তি বর্ধনের কারণ হয়। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। বৃষ্টির সূচনা হয় একটি বিন্দু দিয়েই। কিন্তু তারপর তা মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে রহমতের রূপ পরিগ্রহ করে। অনুরূপ বান্দাহ যখন আল্লাহর পথে কর্মতৎপর হয়ে যায় এবং চেষ্টা-সাধনা শুরু করে তখন আল্লাহ অবশ্যই সেই বান্দাহর সাহায্য করেন। এমন কি বান্দা যখন তার জাগতিক সমস্ত উপায় উপকরণ ও চেষ্টা প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা তার আন্তরিকতা সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে যান, তখন সেই সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী তার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেন। (কে আছে এমন যে বিপন্নের আর্তনাদ শুনতে পায় এবং তার দুঃখ দূর করে দেয় এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করে থাকে?) সর্বজয়ী ও প্রকৃত প্রজ্ঞার অধিকারী মহান সত্তা ছাড়া আর কেউ-ই এমন নেই। আমরা একান্তভাবে তার ওয়াদার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। অবশ্য এটা আলাদা কথা যে, তিনি তার ফায়সালা এত তড়িঘড়ি করে প্রকাশ করেন না—বান্দা যত তাড়াতাড়ি তা প্রত্যাশা করে।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রসংগক্রমে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের জীবনী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা জরুরী মনে করছি। যাতে যেসব কার্যকারণ তাঁর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আর তিনি তাঁর মহান উদ্দেশ্য অর্জনের কাজ শুরু করেছিলেন তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমরা এও দেখতে পাবো যে, এ কাজের শুভ সূচনা কিভাবে হয়েছিল।

হাসানুল বান্না ১৯০৭ সালে মাহ্মুদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এটা ছিল আল্ বুহাইরা প্রদেশের অন্তর্গত একটা শহর। এ শহরটি ছিল কায়রোর তুলনায় আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটবর্তী। ইমাম যেই গৃহে ভূমিষ্ট হন তা ছিল দ্বীনি পরিবেশে ধন্য। তাঁর পিতা মুহ্তারাম শাইখ আহমদ আবদুর রহমান আল বান্না ছিলেন একজন আলেম ও সূফী লোক। তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এবং হাদীসের ওপর তার বেশ কিছু সংকলন গ্রন্থও রয়েছে। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ ছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাসনাদ-এর শরাহ্ যা "আল ফাতহুর রাব্বানী' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নিসন্দেহে এটা একটা মূল্যবান ও বৃহদায়তন গ্রন্থ। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সর্ম্পকিত উলামা ও শিক্ষার্থীদের জন্য এই গ্রন্থখানা খুবই উপকারী ও সহায়ক।

এমন রূহানী ও পবিত্র পরিবেশে আমাদের ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষিত পরিবারের আদরের দুলাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থ রচনার দিকে বেশী মনোযোগ দেননি। বরং তিনি গ্রন্থের পরিবর্তে মানুষ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অগণিত মর্দে মুজাহিদ তৈরীর কঠিন দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েন। ছোট বেলা থেকেই তার দৃষ্টি বাস্তব কাজের দিকে ছিল বেশী। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়েই তিনি তার সহপাঠিদের সাথে নিয়ে একটা সংগঠনের ভিত্তি রচনা করেন এবং তার নাম রাখেন "জমিয়তুল আখলাকিল আদাবিয়া।" এই সংগঠনের নামকরণ ও তার প্রতিষ্ঠা থেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী।

কচিকাঁচাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

তিনি ছিলেন খুবই মার্জিত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। খুব সহজেই সবার সাথে মিশতে এবং তাদের মন জয় করে নিতে পারতেন। আমি তার চেহারায় কখনো বিষণ্ণতার ছাপ দেখিনি। কোন সময় কারো কথার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন না এবং জোরপূর্বক নিজের কথা কারো ওপর চাপিয়ে দিতেন না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিষ্টাচার, শালীনতা ও সৌজন্যবোধের পরিচয় দিতেন। সমস্যা যত বড় কিংবা ছোটই হোক না কেন কিছুতেই তিনি ভেংগে পড়তেন না। আব্বাসীয়া এলাকায় ছিল মুহাম্মাদীয়া

www.amarboi.org

প্রাইমারী স্কুল। একবার আমি ইমামের সাথে সেই স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ইমামের বক্তব্য পেশ করার কথা ছিল। সেখানে পৌঁছে আমাকে বলতে লাগলেন "ছাত্রদের কিছু বলো।" আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতে লাগলাম এবং বললাম, "এই কচি কিশোরদের সম্মুখে বক্তৃতা দেয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। আমি জজ ও উকীলদের সামনে ভাষণ দিয়ে অভ্যস্ত। (বাচ্চাদের উপযোগী বক্তৃতা দানে আমি কি করে সফলতা লাভ করতে পারবো।)"

আমার কথা শুনে অত্যন্ত মিষ্টি হাসি হাসলেন এবং বললেন, "আচ্ছা বাদ দাও।" তারপর ক্লাস রুমের জানালার পার্শ্বে যেখানে উস্তাদের চেয়ার ও টেবিল রাখা ছিল এবং দেয়ালের সাথে ব্লাক বোর্ড লাগানো ছিল সেখান দিয়ে নীচে নামলেন এবং ছাত্রদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। যখন তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন তখন মনে হলো যেন তিনি তাদেরই সমবয়স্ক ও সহপাঠি। বাচ্চাদেরই ভাষায় যা তারা সহজেই বুঝতে পারে এবং একান্তভাবে তাদেরই ভাব-ভংগীতেই—যাতে তারা অভ্যস্ত ছিল তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন। মাশাআল্লাহ কি হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য। যখন তিনি তার ভাষণ সমাপ্ত করলেন আমি তখন বিস্ময়ের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। শিশুরা তার চার পার্শ্বে এসে সমবেত হলো। তার প্রতি কচিকাঁচাদের অনুরাগ ও আসক্তি দেখে মনে হচ্ছিলো যে, তারা তাঁর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। এই সময় ইমামের কণ্ঠস্বর ছিল স্নেহ ভরা। বাচ্চাদের শিশুসুলভ আচরণকে উপেক্ষা করে নিজের উন্নত চরিত্র মাধুর্য এবং শিষ্টাচার শালীনতার পুরোপুরি প্রদর্শনী করছিলেন। (এরূপ আচরণই বাচ্চাদের পোষ মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল।)

(হাঁ আমি ইমামের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম) তিনি জমিয়াতুল আখলাক-এর পর "জমিয়াতুল মানয়িল মুহাররমাত" (হারাম কাজ প্রতিরোধ সংস্থা) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের নামই এর মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে। নেশাকর সামগ্রীর ব্যাপক প্রসার হয়ে গিয়েছিল। গ্রীক এবং ইটালিয়ানরা ব্যাপক হারে মিসরে এসে বসবাস করছিল। তারা মিসরের বস্তিতে বস্তিতে পর্যন্ত শরাবখানা খুলে বসেছিল। তারা অত্যন্ত মামুলিভাবে উম্মুল খাবায়েছ বা মাদক দ্রব্যের কারবার শুরু করতো এবং রাতারাতি ধন কুবেরে পরিণত হতো। এমন কি নেশাতে অভ্যস্ত কৃষকদের অধিকাংশ ভূ-সম্পত্তির ওপর তারা দখল জমিয়ে বসতো। যদি এমনিতেই তাদের কারবার জমে না উঠতো তাহলে তারা তাদের দেশীয় পেশাদার সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীদের ব্যবহার করতো আর এভাবে মিসরের সরলপ্রাণ কৃষককূল তাদের জালে জড়িয়ে পড়তো।

মুর্শিদ মুহতারাম (তার যৌবনকালেই) এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষকগণকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য (যে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অনবহিত কিন্তু যা অত্যন্ত চতুরতার সাথে তাদের প্রতারক শত্রুগণ তৈরী করে রেখেছে) সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হবে ইনসিদাদে মুহাররমাত বা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতিরোধ। এই অপকর্মের মোকাবিলা করার জন্য তিনি তাঁর যৌবনের উন্মেষের সময়ই "তরীকায়ে

www.amarboi.org

হিসাফিয়ার” মাশায়েখগণের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলেন। নিসন্দেহে এই আধ্যাত্মিক অনুরাগ তার আত্মার পবিত্রতার প্রতিই ইংগিত দান করে এবং এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে আল্লাহ এই আত্মা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকওয়ার তাওফিক দিয়েছেন সেই মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক কতইনা গভীর।

আমার মতে প্রকৃত সূফী-সাধকগণ ঈমানের শীর্ষে উন্নীত হয়ে থাকেন। তারা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন না। কিন্তু তার অপবিত্রতা ও কদর্যতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন। আখিরাতের আকাংখায় সদা কর্মমুখর ও প্রাণ চঞ্চল থাকেন আবার দুনিয়া আবাদ করার ব্যাপারেও উদাসীন থাকেন না। কারণ এই দুনিয়াই পরকালের শস্যক্ষেত্র। সেখানে আমরা সেই ফসলই কর্তন করবো যা এখানে বপন করবো।

তাসাউফ আল্লাহ ভীতির নাম। আর সুফী-সাধাকগণ আল্লাহকে ভয় করেন। সৃষ্টির প্রতি ভয় ভীতির কোন আকীদা বিশ্বাস তারা পোষণ করেন না। তারা মনে করেন আমাদের ওপর যেসব বিপদ-মুসিবত আপতিত হওয়ার কোন অবস্থায়ই তার পরিবর্তন হতে পারে না। আবার যে মুসিবত থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন তা কেউ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না। সবকিছু আল্লাহ তায়ালার ওপর সোপর্দ করে দেয়ার নাম তাসাউফ। কোন মানুষকে ভয় করে চলতে হবে কেন সে তো নিজের লাভ-লোকসানের অধিকারীও নয়। যতদিন পর্যন্ত একজন সালেক আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে নিজেকে পাক-পবিত্র রাখে ও আত্মার পবিত্রতার প্রতি সদা সর্তক থাকে। মানুষের কাছে যা কিছু আছে তার প্রতি মুখাপেক্ষী না হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে যা আছে তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে (সে-ই প্রকৃত সুফী)। তাসাউফ একাধারে তাকওয়া, নির্ভিকতা, নেকীর কাজে অগ্রণী হওয়া এবং ইখলাসের বিভিন্ন স্তরে ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ের নাম। ঢাক ঢোল বাজানো, পতাকা উড়নো ও নজর নিয়াজ মানার সাথে তাসাউফের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের মুর্শিদ এমনিভাবে সত্যিকার সুফীবাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়েছেন। যখন ইংরেজ সরকার তাঁকে অর্থ সম্পদের লোভ দেখিয়ে বলে যে, আপনি “গণতন্ত্রের”ওপর ভাষণ দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বলেন, যেটা আমি বুঝি সেটাই গণতন্ত্র, না তোমাদের কাছে যা আছে সেটাই গণতন্ত্র ?

ইংরেজরা বললো ঃ আপনি জানেন যে, আমরা এখন (নাৎসীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত। এ সময় প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের আপনার মত ব্যক্তিত্বের দরকার। একথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং নিজের দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন। এতে মিসরের তৎকালীন শাসক তাকে হুমকি দেন কিন্তু তিনি এই ভয়–ভীতির কোন তোয়াক্কাই করেননি। অধিকন্তু তাদের গাল-মন্দের জবাবে নসীহত ও হিতোপদেশ দান করতে থাকেন। আর যখন তাঁর ওপর বর্বরোচিত হামলা চলতে থাকে তখন তিনি তাঁর অবস্থানে অটল থাকেন। আল্লাহ তাঁর জন্য সফলতা নির্ধারিত করে দেন। হাসানুল বান্না তার তাসাউফের সাহায্যে ১৯৫২ সালে বিপ্লবের পথ সুগম

www.amarboi.org

করেছিলেন। যদিও আজ পর্যন্ত আমাদের প্রতি ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, আমরা বিপ্লবের দুশমন।

পরিবর্তনের সুচনা

সরকার আযাদ সামরিক অফিসারদের (দিবাতে আহ্‌রার) কাউকে হত্যা করেননি। কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেননি বা কাউকে কারাগারেও নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ধরপাকড়ের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তাদেরকে জেলে পুরা হয়েছে এবং তাদের মুর্শিদে আ'মকে প্রতারণার সাহায্যে গুলী করে শহীদ করা হয়েছে। এটা হয়েছিল এ জন্য যে, ইখওয়ান খোলাখুলিভাবে তার কাজ করতো। কিন্তু আযাদ অফিসারগণ গোপনে তাদের তৎপরতা প্রদর্শনে নিয়োজিত ছিল। ইমাম শহীদ তাঁর নিজের নেতৃত্বে সর্বসাধারণের মন-মানসিকতা প্রস্তুত করেছিলেন। দেশবাসীর অন্তরে বিপ্লবের বীজ এমনভাবে বপন করেছিলেন যে, তার ফলে জনগণ একটা আমূল পরিবর্তন ও সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য সদা প্রস্তুত ও প্রতীক্ষমান ছিল। ইত্যবসরে আবার যখন আযাদ সিপাহীগণ ইখওয়ানের সহোযোগিতায় তৎপর হন তখনও তারা জাতিকে তৈরী পেয়ে যান। জনসাধারণ তাদের আন্তরিক অভিবাদন ও নেক প্রত্যাশার সাথে সিপাহীদেরকে স্বাগত জানায়। ইখওয়ান শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালত ও দালান কোঠার হেফাজতের জন্য পাহারা দেন ঃ যাতে বিপ্লবের দুশমনরা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কোন সুযোগ না পায়। এতদসত্ত্বেও (অত্যন্ত দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে যে,) ইখওয়ান বিদ্বেষীরা এই অপবাদ আরোপ থেকে বিরত থাকছেন না যে, ইখওয়ান এই বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। কবির ভাষায় ঃ

وكم ذا بمصرً من المضحكات
ولكنه ضحك كالبكاء

বাহ্যত মিসরে কতই হাস্যাস্পদ কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ হাসির অন্তরালে কান্না ও আর্তনাদ লুকায়িত রয়েছে।

ইমামের জীবনাল্লেখ্যের দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে বলতে চাই যে, ইমাম ১৯২০ সালে মানহুরস্থিত টিচার্চ ট্রেনিং স্কুলে স্থানান্তরিত হয়ে যান যাতে রুটিন মোতাবেক সেখান থেকে একজন (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) সুদক্ষ শিক্ষক রূপে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর অদম্য সাহস মহৎ অনুভূতি এবং অকৃত্রিম উচ্চাকাংখার তুলানায় এই পেশা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। তাই এই স্কুল থেকে ১৯২৩ সালে শিক্ষা সমাপনের সংগে সংগেই তিনি কায়রোর দারুল উলুমে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯২৭ সালে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। এতে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এটা একটা মজার কাহিনী যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ছিলেন মরহুম আবদুল আজিজ আতিয়া যিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ উস্তাদ। স্কুল জীবনে তিনি ছিলেন হাসানুল বান্নার উস্তাদ। কিন্তু পরবর্তী সময় তিনি তার এই ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ন্যায় ও সত্যের আন্দোলনে শরীক হয়ে একজন কর্মতৎপর কর্মীতে পরিণত হন।

www.amarboi.org

ইখওয়ানুল মুসলিমুন অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন এ সংগঠন খুঁটিনাটি মতবিরোধ ও ছোট খাট কলহ-বিবাদের পরিমন্ডল থেকে দূরে থাকে। প্রতিপক্ষের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয় যাতে তারা ইখওয়ান সম্পর্কে যা কিছু বলার বলতে পারে ১৩৪৭ হিজরীর জিলকদ মোতাবেক মার্চ ১৯২৮ সালে নীল নদের উপকণ্ঠে ইসমাঈলিয়া থেকে সূচীত হয়েছিল এই আন্দোলন। সেদিন মাত্র ছয় জন লোক ছিলেন এর উদ্যোক্তা অর্থাৎ ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ, আল আখআস সুলী ও আল আখ হাসবুল্লাহ প্রমুখ। অবশিষ্ট তিনজনের নাম এই মুহূর্তে আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। হয়তো বা পরে আবার মনে হয়েও যেতে পারে। তখন তাদেরকে এই স্মৃতিকথায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

কুরআন ও তলোয়ার

মুর্শিদের সকল প্রয়াস প্রচেষ্টা এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো যেন এমন একটা প্রজন্ম তৈরী করা যায় দ্বীনের ব্যাপারে যাদের থাকবে সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণা। অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে, ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিই রাষ্ট্র ও সরকার সর্বত্র পরিব্যপ্ত এটা কুরআন ও তলোয়ার। ইবাদাত ও মুআমালাত, শিক্ষা ও নৈতিকতা এতে যেমন রয়েছে রাজনীতি তেমনি আছে অর্থনীতি। এটা সমাজের নীতিমালা উপস্থাপন করে আবার আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান করে। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা জীবনের শ্রেষ্ঠতম পর্যায় থেকে শুরু করে অতি সাধারণ বিষয় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা পেশ করে। এমনকি পায়খানা-পেসাবখানায় যাওয়া সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। এই দাওয়াত যুবক, বৃদ্ধ., কৃষক, মজুর ও উম্মাতের সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে রেখাপাত করতে থাকে। শুধু সাধারণ মানুষই নয় বরং আমীর ওমরাহ এবং ধনিক-বনিক ঘরের নওজোয়ানগণও এই আন্দোলনে প্রভাবিত হতে থাকে। যেমন আবদুর রাজ্জাক, আবদুন নবী এবং আদদাল্লা গোত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দাওয়াতের মধ্যে মুসলিমগণ একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করেন যা কোন ঐতিহ্যগত চিন্তাগোষ্ঠীর কাছে বা প্রচলিত জ্ঞানচর্চাকারীদের কাছে তারা কখনো পায়নি। ইমাম শহীদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে দাওয়াত যখন ব্যাপকতা লাভ করে এবং তাতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী ও সমাজের সাধারণ লোক যোগ দেয় তখন ১৯৩২ সালে হাসানুল বান্না কায়রোতে চলে আসেন। তিনি কায়রোর বাইরের প্রদেশ ও জিলাসমূহের ব্যাপারে কখনো উদাসীন ছিলেন না। বরং নিজেই সর্বদা বিভিন্ন বস্তি ও জনপদে একাদিক্রমে পরিদর্শনে যেতেন। এসব সফরে তিনি লোকদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করতেন যে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত শুধু মিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা গোটা বিশ্বমানবতার জন্যই দাওয়াত। তিনি মিসরের বাইরে অপরাপর ইসলামী রাষ্ট্রের সাথেও যোগ সূত্র স্থাপন করতে শুরু করে ছিলেন। তিনি যদি আরো কিছু দিন অবকাশ পেতেন (এবং জালিম রক্ত পিপাসুদের গুলী যৌবনেই তাঁর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত না করতো) তবে

www.amarboi.org

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সংগঠন সমগ্র পৃথিবীতে কায়েম হয়ে যেতো। কেননা ইসলাম বিশ্বজনীন দ্বীন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে কুরআন মজিদের ঘোষণা হলো ঃ

يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعًا

"হে (গোটা দুনিয়ার) মানুষ, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর মনোনীত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

অতএব ইসলাম বিশ্বজনীন দাওয়াতের মর্যাদা রাখে। এটা কোন জাতি, ভাষা, কিংবা বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অতএব যার মধ্যেই অদম্য সাহস আছে তার জন্য এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, সে তার মনজিলে মাকসুদে পৌঁছে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে আবু বকর সিদ্দীক (রা) পতাকা তুলে ধরেন। অতপর যথাক্রমে উমর (রা) উসমান (রা) ও আলী (রা) তাদের সমকালে এই গুরু দায়িত্ব আনজাম দিয়ে ইসলামকে দুনিয়ার আনাচে কানাচে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃথিবী থেকে তিরোধানের পরই দুর্বল ঈমানের অধিকারীগণ মুরতাদ হয়ে যায়। এমন কি কতিপয় পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে বসে। তারা ইসলাম সম্পর্কে বিচিত্র ও অদ্ভূত ধারণা পেশ করতে থাকে। (তথাপি বাতিল নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল হয়ে গেছে এবং ইসলাম বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।)

পুনাত্মা অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আন্দোলনও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে হাসানুল বান্নাকে শহীদ করা হয় এবং হাসান আল হুদাইবি হকের পতাকা ধারণ করেন। যখন তিনিও তার রবের সান্নিধ্যে চলে যান তখন ইখওয়ান এই পতাকা উত্তোলনে সহযোগিতা করেন। (যদিও এখন এই পতাকা সাইয়েদ ওমর তিলমেসানীর পবিত্র হস্তে সমর্পিত কিন্তু তার বিনয় নম্রতার প্রতি লক্ষ্য করুন।—অনুবাদক)

এটা নিরন্তর প্রচেষ্টার কাজ। তাই হাসানুল বান্নার মৃত্যুর সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটেনি। কেননা আমরা হাসানুল বান্নার পবিত্রতার প্রতি ঈমান পোষণ করতাম না। কিংবা তা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও ছিল না। আমাদের মূল লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। হাসানুল বান্না ছিলেন একজন মানুষ। প্রতিটি মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য। অনুরূপ হাসানুল বান্নাও মৃত্যুর এই পেয়ালা পান করেছেন। যে দাওয়াত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করছেন তার হিফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্বও তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত গুরুত্ব হাসানুল বান্না কিংবা কোন মুর্শিদে আ'ম-এর নয় বরং মূল গুরুত্ব হচ্ছে দ্বীনে হকের। যে দ্বীনের ওপর তার শত্রুরা উম্মাদের ন্যায় আক্রমণ করছে। ইখওয়ানের চিন্তা এই বিষয়েই কেন্দ্রীভূত। তারা তাদের জীবন পণ করে এর সহায়তায় নিবেদিত। এ জিহাদ চলতেই থাকবে। কোন মুর্শিদে আ'ম

www.amarboi.org

থাকুক বা না থাকুক যে সমস্ত লোক ইখওয়ানের প্রতি দোষারোপ করে যে, আমরা হাসানুল বান্নার অনুসারী। তাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা ও বিদ্বেষ; তাদের বোধ শক্তি উল্টো এবং তাদের বিবেক ও কান্ডজ্ঞানের হয়েছে অপমৃত্যু।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা দ্বারা একথাই দিবালোকের মত প্রমাণিত হয় যে, তাদের মুর্শিদে আ'ম তাদের সকলকেই জিহাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন যাতে মুসলিম মিল্লাতের জঘন্যতম শত্রুদের কবল থেকে একটা মুসলিম রাষ্ট্রকে উদ্ধার করা যায়। এই দাওয়াতের ওপরই ইখওয়ান তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং ফিলিস্তিন ভূ-খন্ডে সর্বপ্রথম প্রবাহিত গর্বিত খুনের অধিকারী তারাই—তাদের রক্তেই রঞ্জিত হয়েছিল সেখানকার মাটি। (এবং আমি নিসংশয়ে বলতে পারি যে,) যদি এই অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠী দায়িত্ব এড়িয়ে পলায়নি মনোবৃত্তির পরিচয় না দিতো এবং আলস্য ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে না পড়তো তা হলে ইতিহাস ভিন্ন আঙ্গিকে লিখিত হতো। কিন্তু এই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারীদের নিয়ে কি করা যাবে ? তারা বাস্তব জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকে ; অথচ অনলবর্ষী বক্তৃতা-বিবৃতি ও ঘোষণা দ্বারা জাতিকে সবর্দা বিভ্রান্ত করে রাখে। এরা শুধু ফিলিস্তিনের অধিবাসীদেরকে কার্যকর সহায়তা প্রদানে বিরত থাকেনি বরং তারা সর্বত্র ইখওয়ানকেই তাদের যুদ্ধের ও প্রতিশোধ গ্রহণের নিশানা বানিয়ে নিয়েছে। যেন ইহুদীদের বিরোধিতা করা তাদের দৃষ্টিতে ইখওয়ানের মহাঅপরাধ। ইহুদীদের মোকাবিলায় ইখওয়ানের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ এমন মোক্ষম আঘাত ছিল (যদি নিজেদের ঘরের শাসকরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতো তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইহুদীদেরকে ঝেঁটিয়ে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করা যেতো। প্রশংগত এখানে একজন কবির ক্ষেদোক্তির উল্লেখ করছি ঃ

من غص داوى بشرب الماء غصته

فكيف يفعل من قد غص بالماء

"যার কণ্ঠনালীতে গ্রাস আটকা পড়েছে সে পানি পান করে তার প্রতিকার করতে পারে। কিন্তু যার গলদেশে পানিই আটকে যায় সে কি করবে ?"

সব বিষয় পূর্বেও আল্লাহ্ তায়ালার হাতে ছিল পরেও তাঁরই হাতে থাকবে। অচিরেই আল্লাহ্ তায়ালা এসব লোকের নিকট থেকে এমন কঠোরভাবে হিসেব গ্রহণ করবেন যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি কখনো।

আমার ইচ্ছা ছিল, আমি দাওয়াতের সূচনা ও তার পূর্ণতার ব্যাপারে কিছু আরজ করবো। আমি তা ইমাম শহীদের ভাষায়ই পেশ করছি। কেননা আমার অন্তরে তাঁর শিক্ষার বড় মর্যাদা বিদ্যমান। লোকদের সম্মুখে দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা আজও আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

www.amarboi.org

"এ দাওয়াত সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জল, উষাকাল থেকেও বেশী আলোকময় এবং দিবালোকের চেয়ে অনেক দীপ্তিময়। এ দাওয়াত পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং অকপট ও অকৃত্রিম। এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। এ আন্দোলন সকল প্রকার আকাংখা ও স্বার্থান্ধতা থেকে মুক্ত। ইখওয়ান মানুষের নিকট থেকে কোন প্রকার বিনিময় প্রশংসা এবং কোন প্রকার বাহবা পাওয়ার প্রত্যাশা করে না। তাদের মনের আর্তি হলো তারা তাকওয়ার গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করবে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি থেকে তা থাকবে একান্ত সংগোপনে-আড়ালে। তারা এমন বিনয় নম্রতার প্রত্যাশী ও পথিকৃত যে, যখন তারা এসে হাজির হবে তখন কেউ যেন তাঁদের জন্য জায়গা খালি করে না দেয়। আবার যখন অনুপস্থিত থাকবে তখন তাদের সম্পর্কে যেন খোঁজ-খবর নেয়া না হয়। তাদের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের আল্লাহ তাদের অবস্থা জানেন। আল্লাহ তাদেরকে যেন এমন জায়গায় ও এমন কাজে দেখতে পান যাতে তিনি তাদের প্রতি খুশী হতে পারেন ....।"

হাসানুল বান্না চাইতেন তিনি যেন মানুষের সাথে অত্যন্ত অন্তরংগ পরিবেশে এবং সহজ, সরল ও ভালবাসাসিক্ত হৃদয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারেন। তিনি সহজবোধ্য কথা পসন্দ করতেন। দার্শনিক ষ্টাইল থেকে সবর্দা দূরে থাকতেন।

ইমাম আমাদের শিখিয়েছিলেন যেন আমরা এই দাওয়াতে বিলীন ও একাকার হয়ে যাই—আমাদের আপাদমস্তকে দাওয়াতের জীবন্ত নমুনা পরিদৃষ্ট হয় এবং দাওয়াতের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ছবি দেখতে পাওয়া যায়। দাওয়াতের ব্যাপারে যেন আমাদের নিকট তার প্রত্যাশা ছিল ঃ

من تو شدم تو من شدی
من جاں شدم تو تن شدی
تاکس نگوید بعد ازیں
من دیگرم تو دیگری!

"আমি তোমার হয়ে গেলাম আর তুমি হয়ে গেলে আমার
আমি আত্মা হয়ে গেলাম আর তুমি হয়ে গেলে দেহ।
এমনভাবে আমরা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাই যেন
তারপর আর কেউ যেন বলতে না পারে আমি আর তুমি ভিন্ন !

এর অর্থ এটা কখনো নয় যে আমরা দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবো। ইখওয়ান বিস্তৃত জমিনের ওপর চলাফেরা করে কাজ কারবার করে এবং আল্লাহ তায়ালার দেয়া উৎকৃষ্ট রিজিক খেয়ে থাকে। কিন্তু যখন দুনিয়াবী কোন জিনিস আমাদের দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। এবং এমন জীবন ধারা অবলম্বন করি যা আল্লাহ আমাদের নিকট চান। আমি মনে করি না যে, কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিঘোষিত জীবন পদ্ধতির ব্যাপারে আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন রয়েছে।

www.amarboi.org

কোন কোন লোক জেনে বুঝে কিংবা স্থূল বিবেক-বুদ্ধির ফলে বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়ে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে থাকেন যে, তারা অইখওয়ানীদেরকে মুসলমানই মনে করে না।

ইখওয়ানের প্রতি অপবাদ

এটা খুবই নিকৃষ্ট অভিযোগ যা এই জামায়াতের প্রতি আরোপ করা হয়ে থাকে। এরূপ বিকারগ্রস্ত মানসিকতার সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। আমরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে মুসলিম ও তাওহীদের অনুসারী বলে মনে করি। আল্লাহ তায়ালার উপর তাদের সকলেরই অত্যন্ত মজবুত ঈমান রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। যখন ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা মজলিশের কোন কোন সদস্যের বহিষ্কার কার্যকরী করা হয় তখন মুর্শিদে আ'ম জনাব হাসান আল হুদাইবি মরহুম বলেছিলেন ঃ আমরা এই সদস্যদেরকে এ কারণে বহিষ্কার করছি না যে, তাদের দ্বীন ও নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করি। তাদের শুধু এজন্য বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তারা সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলা ও বুনিয়াদী নীতিমালার আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। নিয়ম-শৃংখলার অনুসরণ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এর অবর্তমানে কোন সংগঠন অথবা পার্টি টিকে থাকতে পারে না।

আমরা সব মুসলিমের সাথেই লেন-দেন করে থাকি। অনেক সময় একজন অইখওয়ানী মুসলিম একজন ইখওয়ানী মুসলিম অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী হতে পারে। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, উম্মাতে মুসলিমা সামষ্টিকভাবে তাদের দ্বীনি শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এবং এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ইসলাম থেকে পথনির্দেশনা গ্রহণ করেন। তাই ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত হচ্ছে, মুসলিমদের দ্বীনে হানিফের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। অলসতার মোহ নিদ্রা ভংগ করে তাদেরকে সক্রিয় ও আন্দোলন মুখর হতে হবে। জীবনের সকল কর্মকান্ডে ইসলামের উপস্থাপিত রীতিপদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। এই দাওয়াতের ভিত্তিতেই মানুষের সাথে আমাদের সকল প্রকার লেন-দেন হয়ে থাকে। আমরা নিদ্রিতকে জাগ্রত এবং অলসকে সচেতন করতে চেষ্টা করি যেমন মুয়াজ্জিন মানুষের এই অনুভূতি জাগ্রত করতে চায় যে সালাতের সময় এসে গেছে।

আমরা কস্মিন কালেও এমন দাবী করি নাই যে, আমরা অন্যদের তুলনায় ভাল। আমরা কখনো অন্য কোন দাওয়াতী সংগঠনের প্রতিও দোষারোপ করি না যে, তারা এরূপ বা সেরূপ ইত্যাদি। একান্তই যদি আমরা এসব সংগঠনের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হই তবে তা হয় সাময়িক এবং তা কেবল বুনিয়াদী বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকে।

আমার এই স্মৃতিকথা বিশেষত এর যে অংশ ইখওয়ানের দাওয়াতের সাথে সম্পর্কিত তা সম্পূর্ণরূপে ইমাম শহীদের সেসব শিক্ষার উল্লেখ করেছি—যা আমি তার নিকট থেকে শিখেছি। কিছু কথা আছে এমন যা আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

www.amarboi.org

এগুলো ইমামের বক্তৃতা কিংবা চিঠি-পত্রের সাথে সম্পর্কিত। আমি এই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কোন উৎসের সাহায্য গ্রহণ করিনি। আমি চেয়েছিলাম, এই স্মৃতিকথাগুলো পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে আমার স্মরণ শক্তিরও একটা পরীক্ষা হয়ে যাক যে, এই আন্দোলনের নেতা থেকে আমি যা কিছু শিক্ষা লাভ করেছি তা আজও সংরক্ষিত আছে কি না ? কালের আবর্তন আমার স্মৃতির কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়নি তো ? এই স্মৃতিকথাগুলো রেকর্ড করে নেয়া জরুরী মনে করছি। আমি এগুলোর রেকর্ড করার সময় ক্রমবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিনি। (যা লিপিবদ্ধ করার সময় লিখক সাধারণত করে থাকেন)। উদাহরণ স্বরূপ আমি কোন কথা হয়তো বলতে শুরু করেছি ইত্যবসরে অন্য প্রসংগ এসে পড়েছে। তারপর আবার এমন সূত্র এসে পড়েছে যাতে বক্তব্য পূর্ব প্রসংগের দিকে মোড় নিয়েছে। মানুষ কোন কথা ভুলে যায় না কিংবা কথা বলতে শুরু করলে কোন প্রসংগ বাদ পড়ে না এমন খুব কমই হয়ে থাকে। খুঁটিনাটি বিষয়ে কোথাও না কোথাও কম বেশী হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আদম সন্তানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে ভুল করে বসে। ভুলে যাওয়া লোকদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের ভুল জানতে পারলে অনুতপ্ত হয়। আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঐ ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো যে আমাকে এমন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যা আমার থেকে বাদ পড়েছে কিংবা আমার কোন ভ্রম সংশোধন করে দেবে যা আমার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। আমি তো ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করিনি এবং অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির ওপর অনমনীয়তা প্রদর্শনও করবো না বরং ধন্যবাদের সাথে তা সংশোধন করে নেবো।

দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার

ইমাম দাওয়াতের সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছিলেন এভাবে যে, তিনি চায়ের দোকান ও অন্যান্য যেসব স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে গল্প গুজবে মেতে উঠতো সেখানে গমন করতেন। তিনি একটা ছোট ব্লাক বোর্ড বগল দাবা করে ফিরতেন। কথাবার্তার মাঝে যদি কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিতো তাহলে ব্লাকবোর্ডের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন হৃদয়গ্রাহী বাকপটুতা প্রদান করেছিলেন যে, তার কথা শোনার জন্য লোকজন এসে জড়ো হতো। ফলে সমস্ত চা দোকানের মালিক ও কফিখানার ম্যানেজারগণ সমবেতভাবে তার সমীপে আবেদন করতে লাগলেন যেন তাদের দোকানেও তিনি গমন করেন। এমনিতেই ইসমাঈলিয়ার প্রত্যেক রেস্তোরার মালিকগণ সর্বদা চাইতেন যেন হাসানুল বান্না তাদের দোকানেও যান এবং মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিদিন এই ধারা অব্যাহত থাকতো। শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অবসর হয়েই মুর্শিদ এই কাজে লেগে যেতেন। প্রথম প্রথম মানুষ মনে করেছিলো যে যদিও তাঁর কর্মপদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ ওয়ায়েজীনদের মত একজন দ্বীনি মুবাল্লিগ বৈ নন। অতএব সুয়েজ খাল কোম্পনী—যেখানে বেশ কিছু

চিহ্নিত ইসলামী দাওয়াত বিদ্বেষী লোক ছিল—আত্মপ্রতারিত হয়। তারা মনে করে যে তিনি হয়তো বা কোন তাবলীগ পন্থি মৌলভী হতে পারেন। তাই এই কোম্পানী ইস-মাঈলিয়ায় উম্মুহাতুল মু'মিনীন মাদ্রাসা এবং তৎসংলগ্ন মসজিদ নির্মাণে সংগঠনকে (ইখওয়ানের) সহযোগিতা করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক সংগঠনও প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সহায়তার হাত সম্প্রসারিত করে।

আমার একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেছে। জনৈক ইখওয়ানী ভাই কোন একটা কোম্পানীতে ড্রাইভার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তার নিকট একখানা বাইসাইকেল ছিল। এর সাহায্যে সে তার ডিউটির জন্য প্রত্যহ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তার কর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছতো। কোম্পানীর দায়িত্বশীল কর্তারা তার এই সময়ানুবর্তিতার কারণে তাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতো। তারপর হঠাৎ দেখা গেলো তিনি তার কাজে কিছুটা দেরীতে উপস্থিত হতে লাগলেন। কোম্পানীর চেয়ারম্যান বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে তার দীর্ঘ দিনের সতর্ক অভ্যাস এবং যথা সময়ে উপস্থিতির ব্যাপারে পরিবর্তন আনলো কেন? তিনি তার প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ

আমার একটা বাইসাইকেল ছিল। আমি সেটির সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে এসে পৌঁছে যেতাম। আমাকে বলা হয়েছিল যে, ইখওয়ানের কোন কাজে এয়ানতের প্রয়োজন তাই আমি আমার সাইকেল বিক্রি করে দিয়েছি এবং বিক্রিলব্ধ অর্থ মুর্শিদে আ'ম-এর হাতে তুলে দিয়েছি। এখন আমি পায়ে হেঁটে এসে থাকি তাই পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়।

কোম্পানীর চেয়ারম্যান মনোযোগ সহকারে এই ঘটনা শুনেন এবং ইখওয়ানী ভ্রাতার বদান্যতা ও দানশীলতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। অবশেষে কোম্পানীর তরফ থেকে তিনি তাকে একটা নতুন সাইকেল কিনে দেন। এখন পুনরায় সে ভাই তার সাবেক অভ্যেস অনুযায়ী খুবই সময়ানুগভাবে তার ডিউটিতে সময়ের পূর্বেই গিয়ে পৌঁছতে থাকেন। এই ঘটনা (যদিও নেহায়াত মামুলী) তথাপি এ দ্বারা আমাদের সামনে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, ইখওয়ান তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পথে কত আত্মনিবেদিত এবং মুর্শিদের উপর তাদের কি অপরিসীম আস্থা ও বিশ্বাস। তদুপরী তাদেরকে যখন ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো তখন তারা সাথে সাথে তা কার্যকরী করতো।

অতপর নবনির্মিত মসজিদে ইখওয়ানের সমাবেশ আরম্ভ হয়। প্রতি রাতেই জনসমাগমে মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠতো। তারা মুর্শিদে আ'ম-এর বক্তব্য শোনার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সমবেত হতো। তিনি যখন কায়রো এসে বসবাস শুরু করেন তখন সপ্তাহে প্রতি মংগলবার কেন্দ্রীয় দপ্তরে সমাবেশ হতে থাকে। আমার মনে আছে কেন্দ্রীয় অফিস ও বিভিন্ন সময় কয়েকটি জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে এটা ছিল মুর্শিদের নিজের বাস গৃহে। অতপর সাইয়েদা জয়নাব মহল্লার নীচ তলায়

www.amarboi.org

নিয়ে আসা হয়। তারপর আবার আতাবাতুল খাদায়াস্থ পার্লামেন্ট হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং শেষে হিলমিয়ায় শাদীদায় কেন্দ্রীয় অফিসের স্থান নির্ধারিত হয়।

ইউনিভার্সিটিতে দাওয়াতের কাজ

ইত্যবসরে ইউনিভারসিটির ছাত্ররা বিশেষভাবে এই নবগঠিত সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তাদের বন্ধুদের কাছে এই দাওয়াত প্রচার করতে থাকে। সময় যতই গড়িয়ে যেতে লাগলো ইখওয়ানী ছাত্রের সংখ্যাও ততই বেড়ে চললো। এমনকি শ্রীগ্রই এমন সময় উপস্থিত হলো যখন ছাত্র সংসদের নির্বাচনে কোথাও ইউনিয়নের ওপর ইখওয়ানী ছাত্রদের পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো। আবার কোথাও বা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হলো।

এ বিষয়টি সরকার এবং দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও অস্থির করে তোলে। তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা আকস্মিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, জাতির মধ্যে এমন একটা নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে যা তাদের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ব্যস ! আর যায় কোথায় ! ইখওয়ান ও ইখওয়ানের সুষ্ঠু চিন্তার বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে দাওয়াতের কাজও জোরদার হয়ে ওঠে। শহর বন্দর ও গ্রামে গঞ্জের যেসব লোক দাওয়াত হৃদয়ংগম করতে পেরেছিল ; তারাও তাদের আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবকে এই আলোর সাথে পরিচিত করাতে শুরু করে। জনগণের মধ্যে এমন সাড়া পড়ে যায় যে, বস্তির পর বস্তি এবং জনপদের পর জনপদ এই দাওয়াতের কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে। অতপর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত জিহাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ইসলামের শত্রুরা দাওয়াতকে তাদের জন্য সমূহ বিপদের কারণ বলে ভাবতে থাকে এবং এই পূত-পবিত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে শয়তানী চক্রান্ত শুরু করে দেয়। সকল শয়তানী শক্তি ও বাতিল শক্তি এই উদীয়মান শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য আদা পানি খেয়ে লেগে যায়। কিন্তু তাদের এই অশুভ উদ্দেশ্য অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জের কর্মী ও সদস্যদের কর্মপদ্ধতি ছিল, তারা মানুষের মাঝে তাদের কাজ অব্যাহত রাখতো। যখন তারা উপলব্ধি করতো যে, তাদের টার্গেটভুক্ত কোন লোক নিষ্ঠার সাথে দাওয়াত হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে, তখন তারা তাঁকে মুর্শিদে আ'ম-এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য আহবান জানাতো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বাইয়াত গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতো। এই বাইয়াত হতো শুধু আল্লাহর পথে—তারই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। হাসানুল বান্নার পথে বা তাঁকে খুশী করার জন্য নয়। এর প্রমাণ হলো, বাইয়াতের শপথনামার সর্বশেষ কথাটি ছিল এরূপ ঃ

www.amarboi.org

"মুর্শিদের নির্দেশের আনুগত্য এমতাবস্থায় কখনো করা যাবে না। যখন তা আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করার কারণ হবে।"

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, একথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমরা কোন ব্যক্তির বাইয়াত তার নিজের স্বার্থে করি না। বরং আমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালারই বাইয়াত করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইয়াতকেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাইয়াত বলে আখ্যায়িত করেননি। বরং তাঁর নিজের (আল্লাহর) বাইয়াত বলে ঘোষণা করেছেন ....إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ (নিশ্চয়ই যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন....... ।)

সাংবাদিকতার জগতে ইসলামী আন্দোলন

অতপর ইখওয়ানের ইতিহাসে একটা মহত সাংবাদিকতা অধ্যায়ের সূচনা হয়। দু'টি সাময়িকী—"আল-ইখওয়ান" ও "আন-নাজীর" এবং একটা দৈনিক পত্রিকা "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন" প্রকাশিত হতে থাকে। এসব পত্রিকা ইখওয়ানুল মুস-লিমুনের পয়গামের প্রচার ও প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। ফলে শাসক শ্রেণী, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং অন্যান্য গ্রুপ, খৃস্টান, কমিউনিষ্ট ও ইহুদী শক্তি তথা দল মত নির্বিশেষে সকলেই ইখওয়ানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইখওয়ানের ওপর তাদের আক্রমণ ছিল খুবই কঠোর ও নিষ্ঠুর। এতে কোন প্রকার নৈতিক সীমা এবং মানবতার বিবেচনা করা হয়নি। এই শত্রুতামূলক বর্বরোচিত হামলার ফলে অধিকাংশ লোক আমাদের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আমাদের নিজেদের চেষ্টা-সাধনার তুলনায় আমাদের শত্রুদের প্রচেষ্টায়ই আমাদের নাম ও খ্যাতি অনেক বেশী ছড়ায়। হকের বিরোধিরা তাদের নিজেদের বিরোধিতার দ্বারাই সত্যকে (মানুষের অন্তরে অনুসন্ধানী কৌতূহল ও মনোভাব সৃষ্টি করতঃ) আরো প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। অনুরূপভাবে হকের ব্যাপকতা সৃষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটানোর ব্যাপারে ইমামের অব্যাহত সফর এবং দায়ীদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রভাবও কম গুরুত্ব বহন করে না।

সংগঠনে শামিল হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়

জনসাধারণের সংগঠনে যোগদানের বেশ কয়েকটা পর্যায় ছিল। যেমন একটা স্তর ছিল "সুধী ও হিতাকাংখীদের" যারা সংগঠনকে ভালবাসতো কিন্তু সংগঠনের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের মত মনোবল তাদের মধ্যে ছিল না। সংগঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন "সহযোগী ও সক্রিয় সমর্থকগণ"। এই শ্রেণীর লোকেরা সংগঠনের পুরো নিয়ম শৃংখলার অনুসারী ছিলেন না। কিন্তু সংগঠনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। তৃতীয় পর্যায় ছিল বাইয়াত গ্রহণকারীদের। এই পর্যায়ের ইখওয়ানরা ইমামের হাতে বাইয়াতের মাধ্যমে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতো এবং সংগঠনের কাজে পুরোপুরি অংশ নিতো। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল সম্পূর্ণ

www.amarboi.org

নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী। তারা বাইয়াত গ্রহণের পর তাদের জান-মাল ও সন্তানদেরকেও দাওয়াতে হকে সোপর্দ করে দিতো।

দাওয়াত তাদের কাছে জান-মাল, পরিবার পরিজনের কুরবানী দাবী করলে তারা কোন প্রকার অজুহাত ও যুক্তি উপস্থাপন না করে আল্লাহর পথে তাদের এই প্রাণ প্রিয় সম্পদগুলোও পেশ করে দিতো। ইনশাআল্লাহ শ্রীগ্রই আপনাদের সামনে বিষদ বিবরণ তুলে ধরা হবে যে, "নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনীর" জন্য তাদের মধ্যে কি গুণাবলী সৃষ্টি করা আবশ্যক। এই প্রসংগে আপনার জন্য একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের এক ইখওয়ানী ভাই তার যুবক সন্তানকে ফিলিস্তিন জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য মুজাহিদ বাহিনীর সাথে প্রেরণ করেন। এই নওজোয়ান জিহাদে শহীদ হয়ে যান। ইমাম যখন সমবেদনা প্রকাশের জন্য সেই ভাইয়ের কাছে যান তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এসেছেন ? যদি আমার অনুমান সত্য হয় তবে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনি আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসে থাকেন তাহলে আমি প্রাণভরে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আসুন ! আপনি যখন আমার সামনে আল্লাহর নিকট শহীদগণের মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন তখন থেকেই আমি শাহাদাতের উচ্চ সম্মান সম্পর্কে অবহিত হয়ে গিয়েছি। আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা রেখে আমি আশা করি যে, আমার সন্তান শহীদি কাফেলায় শীর্ষস্থানীয় মর্যাদা লাভ করবে। আমার একান্ত প্রত্যাশা যে আমিও ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করি এবং আল্লাহ আমাকে আমার ছেলের সাথে সেখানে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।

ইখওয়ানের সংগঠনভুক্ত ও দলবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য

ইখওয়ানের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, যেসব বিপদ-মুসিবত মুসলিমদের ঈমান আকীদা ধ্বংস করে দিচ্ছে সেগুলোর যেন প্রতিবিধান করা যায়। এসব বিপদ সম্পর্কে মুসলিমদের অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে বসেছে। অথচ তাদের পায়ের নীচে ভয়ংকর গভীর গর্ত খনন করা হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তারা তার অতল তলে পতিত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং সিনেমা, থিয়েটার, টেলিভিশন ও রেডিও প্রভৃতি গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে উন্নতি-অগ্রগতি, তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতির নামে মুসলিমদেরকে পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের মোহে মোহগ্রস্ত করা। ইসলামের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা নেই। কিন্তু কোন কোন মুসলিমই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইখওয়ানের দাওয়াত ইসলাম বৈরিদের ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাস্তব রূপ লাভ করেছে বলে আমি মনে করি না। বরং এটা একটা ইতিবাচক আন্দোলন যা মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন, দ্বীনের শিক্ষা ও মূলনীতির দিকে ফিরিয়ে আনতে চায়। ইসলামের শিক্ষা ও তার মূলনীতি ন্যায় ও সত্য। কিন্তু মুসলিমদের উদাসীনতার কারণে তাদের গৌরবের দীপ্তি মাঝে মধ্যে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে থাকে।

www.amarboi.org

ইখওয়ানের কর্মনীতি ও কর্মপরিকল্পনা কোন কাজের প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি কখনো নয়। ইমাম শহীদ বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম উম্মাহর শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে নিরীক্ষণ এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। অতপর তিনি একটি মৌলিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন যা কোন কোন বাহ্যিক কার্যকারণের ফসল নয় বরং জীবনের প্রতিটি দিক আলোকিত করার জন্য একটি উর্বর মস্তিষ্কের সর্তকতা ও সাবধানতার ফসল।

(সাধারণত দল ও সংগঠন কোন নির্দিষ্ট দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হতো।) কিন্তু কোন সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে কোন বিশেষ এলাকা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং ইখওয়ানের সামনে তার চেয়েও বড় লক্ষ্য ছিল এবং তাহচ্ছে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের পবিত্র জীবন এবং তার জীবনদায়িনী ঝর্ণার দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করানো ; তাদের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা ও শান্তিপ্রিয়তার বিশ্বাসে অভ্যস্ত করে তোলা। এই উদ্দেশ্য হাসিল হলে এবং এই জীবন্ত সত্য মুসলিম মিল্লাতের মন-মগজের গভীরে স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হলে সকল সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং স্বাধীনতা দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস যা কখনো এক জায়গায় একই সময় অবস্থান করতে পারে না। অনুরূপ আযাদী ও জুলুম, ন্যায় ও সত্যে বিশ্বাস, অর্থনৈতিক সাম্রজ্যবাদ। মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ও আদর্শিক সাম্রজ্যবাদও পরস্পরের বিপরীত। এ দু'টিরও পাশাপাশি অবস্থান অসম্ভব। দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে মানুষ কখনো আরাম ও শান্তির জীবন যাপন করতে পারে না।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত এই বুনিয়াদী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যাতে মুসলমানদেরকে জীবনের ছোট বড় সকল ব্যাপারে সত্য দ্বীনের অকপট অনুসারী বানিয়ে দেয়া যায়। আর এটা একটা পৃথক ও মৌলিক বিশ্বাস। যার ইতিবাচক সত্তা রয়েছে। তাই তা কোন কার্যকারণ বা ঘটনার প্রতিক্রিয়া নয়। অতএব এই আন্দোলন যখন কোন ছড়িয়ে পড়া বিপর্যয়ের সংশোধনী অথবা কোন ব্যাপক গোমরাহীর গতি রোধ করার আহবান জানায় তখন তা ইসলামের সুমহান শিক্ষারই প্রকৃত দাবী।

নামকরণ

পূর্বে যে ছয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন তারা শপথ গ্রহণ করে এবং ইমামও উপলব্ধি করেন যে এখন তারা একটা জামায়াত বা সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করতে যাচ্ছে তখন এই নবগঠিত সংগঠনের নাম কি হবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ইমাম বললেন ঃ "আমরা কি ইখওয়ান (ভাই ভাই) নই ? সকলেই বলে উঠলেন "অবশ্যই" তিনি পুনরায় বললেন ঃ তাহলে আমরা "আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন"। প্রসংগত আমি এখানে একটা কথা আরো যোগ করে দিতে চাই যে, এই নাম কুরআন মজীদেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা কোন মনগড়া "বেদায়াত" নয়। আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালা ইরশাদ করেছেন اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ "(মু'মিনরা পস্পরের ভাই।) তিনি আরো বলেছেন ঃ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ (তিনি তোমাদের মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন।) সুতরাং এটা কোন নতুন জিনিস নয়। সাথে সাথে এই ভুল বুঝাবুঝিরও অপসারণ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন যে আমরা আমাদের এই জামায়াতকে "আল-জামায়াতুল মুসলিমা" বলে দাবী করিনি। কেননা জামায়াতে মুসলিমার মধ্যে সব মুসলিম শামিল রয়েছে। আমরা আমাদেরকে "জামায়াতে মুসলিমীন" কিংবা "জামায়াতুম মিনাল মুসলিমীন" বলে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ উম্মাতে মুসলিমার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মুসলিম দাওয়াতে ইসলামের কাজ সংগঠিত উপায়ে ও সংঘবদ্ধভাবে করার জন্য একটা সংগঠন কায়েম করেছে। ইসলাম শুধু আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এমন লোকদের পরিণাম ও পরিণতি কি হবে যারা আমাদেরকে হত্যার উপযুক্ত বলে মনে করে এবং আমাদের ওপর বিদায়াতের অভিযোগ আরোপ করে। এটা বলা এমন একটা অপরাধের শাস্তি হিসেবে যা করা তো দূরে থাক আমাদের কল্পনাতেও কোনদিন আসেনি।

সাবধান ! অপরের ছিদ্র অন্বেষণ এবং দোষ খুঁজে বেড়ানো লোকদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের নসীহত করছি এবং একটা হাদীস তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

> "যারা বা যে ব্যক্তি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য তৎপর থাকে আল্লাহ হয়তো তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ফাঁস করে দেয়ার জন্য কাজ শুরু করে দেবেন। আর আল্লাহ এরূপ করলে তাঁকে তাঁর গৃহের মধ্যেই অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।"

আমাদের সকল কর্মতৎপরতায় আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট। তিনিই সর্বোত্তম কর্মসম্প্রদানকারী। আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়ুক কিংবা আমাদের কথা সর্বত্র শোনা হোক তা আমাদের উদ্দেশ্য মোটেই নয়। আমরা চাই প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শুধু আল্লাহর জন্য চেষ্টা-সাধনা করে যাই।

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়

দাওয়াতী সফরে যাওয়ার জন্য টীম গঠন ইখওয়ানের আবিষ্কার ছিল না। বরং এটা সারাদেশে ইতিপূর্বেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী স্কুলে, কলেজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ক্লাবে এমনকি অভিনেতা, ভাঁড় ও বিদূষকগণের ইউনিয়নেও এই প্রচলন ছিল। এরূপ ভ্রাম্যমান টীমের ব্যাপারে আমি কখনো কারো বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত করিনি। কিন্তু যখন ইখওয়ানের পুন্যাত্মা এবং পবিত্র ব্যক্তিত্বগণকে দাওয়াতী অভিযানে প্রেরণ করা আরম্ভ হলো তখন সবখান থেকে আপত্তি ও সমালোচনার তীর বর্ষিত হতে লাগলো। উদাহরণ স্বরূপ ইখওয়ানের স্কাউটিং টীমের কথা উল্লেখযোগ্য। এমন টীমের প্রচলন রয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে। কিন্তু কেউই কোন আপত্তি তোলে না। সেখানে শুধু ইখওয়ানের বেলায় সবার মাথা ব্যথা। কবির ভাষায় বলা হয় ঃ

আমরা একটু আহ্ বললেই তাতে বদনাম;
কিন্তু তারা হত্যাযজ্ঞ চালালেও কেউ তা মুখেও আনে না।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো, ইখওয়ান কখনো শক্তি প্রয়োগ করে কোন পরিবর্তন কিংবা বিপ্লব সাধনের চিন্তা করেনি। কেননা ইখওয়ান মূলত সালাফী জামায়াত। আর সালাফীরা উচ্চ শ্রেণী এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অপপ্রচার সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতি নয়। ক্ষমতাসীনরা ফাসেক এবং জালেম হলেও ইখওয়ানদের দাওয়াত সম্প্রসারণের উপায় উপকরণ প্রসংগ যখন আলোচনায় আসবে তখন এ ব্যাপারে বিষদ আলোচনা করা হবে। ইমাম শহীদের দাওয়াত দান প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি থেকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ইখওয়ানের প্রশিক্ষণ শিবিরসমূহ

কোন বহিরাগত যদি কখনো ইখওয়ানের কোন ট্রেনিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে তাহলে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা, প্রোগ্রামসমূহে অংশগ্রহণ এবং তাদের আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখে হতবাক হয়ে যাবেন। শিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সালাতুল ফজরের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করা যাতে তাহাজ্জুদের সৌভাগ্যও লাভ করতে পারে। তারপর মুয়াযযিনের আযান ধ্বনিত হলে সবাই জামায়াতের সাথে ফজরের নামায আদায় করে। অতপর ব্যায়ামের কর্মসূচী শুরু হয়ে যায়। যা সুস্থ সবল দেহের নিশ্চয়তা বিধান করে এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির ফায়সালাসমূহ বাস্তবে রূপদান করতে সক্ষম করে তুলে। ব্যায়াম থেকে অবসর হয়ে নাস্তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং সকাল বেলার জরুরী ঘোষণা দেয়া হয়

www.amarboi.org

যাতে অংশগ্রহণকারীগণ কর্মসূচী সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত থাকতে পারেন। সারা দিনের প্রোগ্রামে খাদ্য তৈরী, ব্যায়ামানুশীলন, সালাত এবং বক্তৃতা ও দারস অর্ন্তভুক্ত থাকে। এভাবে সালাতে এশা পর্যন্ত এসব কর্মকান্ড চলে তারপর অবসর হয়ে অংশগ্রহণকারীগণ গিয়ে নিজ নিজ বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। প্রশিক্ষণের এই দিনগুলো নিসন্দেহে প্রশিক্ষণার্থী জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের কারণ হয়। এতে আরাম ও বিশ্রাম এবং বিনোদনের কাজও হয়ে যায়। এবং সাথে সাথে যুবকেরা তাদের দেশের হিফাজতের জন্য শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের, পরিবারের, সমাজের ও বৃহত্তর ইসলামী উম্মাহর কি কি অধিকার রয়েছে তা জানতে পারে। এসব ব্যাপারে অনুভূতি তখনই চাংগা হয়ে ওঠে যখন মানুষ সর্বপ্রথম আকাশ ও পৃথিবীর রবের ইবাদাত ও আনুগত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

এ দিনগুলো বাস্তব প্রশিক্ষণ তথা হাতে কলমে শিক্ষা লাভ এবং ইসলামী জ্ঞানকে মনোজগতে প্রবিষ্ট করার ও হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল করে নেয়ার উপযুক্ত সময়। এই দিবসগুলোতে আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধান, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, প্রকৃত সম্মানের অনুভূতি লাভ এবং সকল প্রকার অপমানের গতিরোধ করে মোক্ষম সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

والله العزة و لرسوله و للمؤمنين

(প্রকৃত সম্মান আল্লাহ তায়ালার, তাঁর রাসূলের এবং ঈমানদারদের।)

ঈমানদারদের ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপারে তো ফায়সালা কৃত। যে এটা আল্লাহ তায়ালার কিতাবে কারীমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই মর্যাদা লাভের জন্য যেসব পন্থা-পদ্ধতি ও মাধ্যম নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে এই প্রশিক্ষণমূলক ও দাওয়াতী প্রোগ্রামে বের হওয়া তারই অংশবিশেষ।

কুরআন এবং তলোয়ার

ইসলাম বৈরীগণের অনাগ্রহ ও অনীহা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনিত হয়েছিলো। তারা ইমাম শহীদের মতামত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে এই বলে যে, তিনি কুরআন ও তলোয়ারকে যথাক্রমে একত্রে সন্নিবেশীত করে দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য হলো, ইখওয়ান যখন বিশ্বাস করে যে, দ্বীন বলতে যুক্তি, প্রমাণ ও স্বাধীনতাকে বুঝায় তখন তলোয়ারের সাথে কুরআনের সম্পর্ক সৃষ্টি করার অর্থ কি ? এই কুধারণা পোষণ কিংবা নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ উত্থাপন এমন কোন ব্যক্তির জন্য শোভা পায় না, যার মধ্যে ন্যূনতম বিবেক-বুদ্ধি ও সুস্থ চিন্তাধারা রয়েছে। সমগ্র দুনিয়ার পর্যালোচনা করুন। মহাদেশগুলোর প্রতি লক্ষ করুন। এটা কি সত্য নয় যে, সকল দিক থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তার বড় বড় দাবী করা হচ্ছে, বড় বড় সম্মেলন, প্রচার মাধ্যম এবং লেখকদের সবই শান্তি শান্তি জপ করছে।

www.amarboi.org

শান্তির শ্লোগান ও যুদ্ধের প্রস্তুতি

আপনারা কি ইসরাঈল রাষ্ট্রের অবস্থা দেখছেন না। এ রাষ্ট্রটি তার সীমানার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপনের অধিকার কান্নাজড়িত কণ্ঠে দাবী করছে। এমন কোন দিন কি অতিবাহিত হয় যেদিন আমরা বিশ্বশান্তির ব্যাপারে সংবাদ ও গল্প প্রবন্ধ না পড়ে থাকি ? দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা এবং সেজন্য আগ্রহ ও সদিচ্ছা সম্পর্কে শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এমন কি "বিশ্বশান্তি" কথাটিই এখন অন্তসারশূন্য মনে হচ্ছে। প্রত্যেক দেশের নেতৃত্বের অভিলাষীরা দ্বিধাহীন চিত্তে এর জপ করে থাকে।

এতদসত্ত্বেও দুনিয়ায় কি ঘটছে ? সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসাত্মক ও মানবজাতিকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নির্মূলকারী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন এবং লাভ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। ধ্বংসের উপকরণ তৈরীর জন্য অজস্র টাকা পানির মত খরচ করা হচ্ছে। তথাপি প্রত্যেক জাতির শ্লোগান এটাই যে, তারা শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দের পতাকাবাহী। কেন এত প্রয়াস প্রচেষ্টা ? এসব কি এই কাল্পনিক আযাদী ও ঐ শান্তির প্রতিরোধের জন্য নয় যার গীত গাওয়া হয়ে থাকে ? গোলাপ ফুল কাঁটার মুখাপেক্ষী হয় এ জন্য যে, তা তার নিরাপত্তা বিধান করে। ইসলাম শান্তির দ্বীন এবং শান্তির দিকে দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি অবশ্যই দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ......الخ (তুমি তোমার রবের দিকে মানুষকে হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে দাওয়াত দিতে থাকো এবং লোকদের সাথে এমনভাবে বির্তক কর যা সর্বোৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হয়।)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শে উৎসর্গীত আমার পিতা-মাতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম তার দাওয়াতী কাজের সূচনা লগ্নে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। যদিও মুশরিকগণ ঈমানদারদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের নীতি অবলম্বন করেছিলো। এমনকি তাদের হত্যা করতেও ইতস্তত করছিল না। সেই যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার নির্যাতিত সাথীদের পাশ দিয়ে কোথাও যেতেন তখন বলতেন, "হে ইয়াসীরের পরিবারের লোকজন ! সবরের রজ্জু অত্যন্ত কঠোরভাবে ধারণ কর। আমার এমন ক্ষমতা নেই যে, আমি এই অত্যাচার প্রতিহত করতে পারি। নিসন্দেহে তোমাদের এই পরীক্ষার বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।" আবার যখন তায়েফের বাজারগুলোতে সাকীফ গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি পাথর বর্ষণ করেছিলো রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলো তাঁর আপাদমস্তক তখন তিনি তার কোন পরোয়া করেননি। বরং তাঁর ঐকান্তিক কামনা ছিল তিনি যেন তাঁর রবের অসন্তোষের শিকার হয়ে না পড়েন। সকল অত্যাচার নির্যাতনে তিনি সবর অবলম্বন করেছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেই শহরের অধিবাস গ্রহণ করলেন। যার মাটির জন্য এই সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ ছিল যে, তার পবিত্র

www.amarboi.org

দেহ বক্ষে ধারণ করবে। এখানেই শেষ নয়, যে ঘর বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন আর দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। বরং শত্রুগণ এখানেও তাকে নিশ্চিন্তে বসার সুযোগ দেয়নি। এখানেও তারা তাকে হুমকি দিতে থাকে এবং তাঁকে ও তাঁর দাওয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সদা তৎপর হয়। তার হিজরতের স্থানেও তারা আক্রমণ করে বসে এবং তখন দ্বীন এবং দ্বীনের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রহাতে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। ইমাম শহীদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উত্তম আদর্শ ছিল। এই আদর্শের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সত্যকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে واعدوا......الخ "তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করো-----"।

এ ক্ষেত্রে আপনাদের এই বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, এই প্রস্তুতি হকের দুশমনদের সন্ত্রস্ত করা এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করার জন্য মাত্র। এর উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসবো। কিংবা অভিযান পরিচালনা করবো। এই প্রস্তুতির উদ্দেশ্য এও নয় যে এর সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করা কিংবা লোকদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করা হবে।

তরবারী ধারণকারী বাহু

এটা লক্ষ্য করুন যে, আমাদের সরকার ইসরাঈলের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছে এবং এই চুক্তি এখনও বলবৎ আছে। তারপরও আমাদের দেশের কি এমন প্রয়োজন যে সেনাবাহিনীকে ক্রমাগত সশস্ত্র, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে যাচ্ছে। এই সামরিক প্রস্তুতি কি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নেয়া হচ্ছে? কখ্খনো নয়। তা কিভাবে হতে পারে? যে বিপুল অর্থ আমাদের সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে তাকি বাহুল্য ব্যয় কিংবা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক? না সহস্রবার নয়। বরং প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে প্রতিটি দেশের অধিবাসীদের এই অধিকার রয়েছে যে, যদি তারা জীবিত থাকতে চায় তাহলে শক্তি সঞ্চয় করবে যাতে বিরোধী জাতিসমূহ ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং তার প্রতি হাত বাড়াতে কিংবা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস না করে। ইমামও এসব কাজই করেছেন। মিসরের ওপর অন্যদের আধিপত্য ছিল এবং পার্শ্ববর্তী ফিলিস্তিনকে ইহুদীরা পদদলিত করছিলো। তাই তিনি ভাবলেন মুসলিমদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যে দুর্বল বেইজ্জত ও পরাজিত ইসলাম প্রত্যেক নেকড়ের মুখের সহজ গ্রাসে পরিণত হয়েছে এবং প্রত্যেক কোণ থেকে শত্রুরা এর ওপর হামলা করছে। ইসলামের কি এতই অসহায় অবস্থা যে আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারে না? যেদিন ইমাম শহীদ কুরআন মজীদকে দুইখানা তলোয়ারের মাঝে রেখে ইখওয়ানের পার্থক্য সূচক নিশান তৈরী করেন সেদিন তিনি উম্মাতে মুসলিমার সামনে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন যে এই পার্থক্য সূচক পতাকা যা দেখে ইসলামের শত্রুরা অসন্তুষ্ট—আজও আমাদেরকে আমাদের গৌরবোজ্জল সোনালী অতীতের সাথে যুক্ত করে দিতে পারে।

www.amarboi.org

ইহুদীরা গোলান মালভূমির উপর জবরদস্তিমূলক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। তারা গোটা লেবাননে রক্তপাত করে চলেছে। পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চলকে ইহুদীবাদের রঙে রাঙিয়ে তোলা হচ্ছে। মসজিদসমূহের অমর্যাদা করা হচ্ছে এবং মসজিদগুলোর স্থলে ইহুদী ইবাদাতখানা নির্মাণের ষড়যন্ত্র পাকা পোখত করা হয়েছে। সিনাই মরুভূমি সম্পর্কে ছেলে ভুলানো বুঝ দেয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তা আমাদের দখলে আসেনি। আর আমাদের শত্রুরা সেখানে সশস্ত্র একজন মিসরীয়কেও মেনে নেয়নি।

আমাদের শত্রুদের যেহেতু এটা স্থায়ী সংকল্প ও পরিকল্পনা তাই তাদের পরাভূত করাও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাই সম্ভব। এ কারণেই ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ দু'খানা তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের মাঝে কুরআন মজীদ রেখে উম্মাহকে এই চেতনা প্রদান করেন যে, ঈমান-আকীদার হিফাজতের জন্য জিহাদ অত্যাবশ্যক। এই প্রতীকের সাহায্যে তিনি এই অনুভূতিই জাগ্রত করেছেন যে, মুসলমানদের পৃথিবীর সকল মুসলিম অঞ্চলের স্বাধীনতার সংকল্প করতে হবে। যা এখনো অন্যদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এই প্রতীকের সাহায্যে মিল্লাতে ইসলামীয়া, সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সকল প্রকার গোলামীর জোয়াল ছুড়ে ফেলার শক্তি অর্জন করতে পারে। মুসলিমগণ যদি এ বিষয়টি হৃদয়ংগম করতে পারে তাহলে আল্লাহ তায়ালার বাণীর সত্য ও বাস্তবতার জীবন্ত নমুনা হয়ে দেখা দেবে।

وجاهدوا فى الله حق جهاده (আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো এমনভাবে যাতে জিহাদের হক আদায় হয়ে যায়।)

আমাদের শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য তারা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছে এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় ক্ষমতা ইচ্ছামত আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে তবুও আমাদেরকে আল্লাহর শরীয়াত বাস্তবায়ন করা থেকে কোন কিছুই বিরত রাখতে পারবে না। আমাদের সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে এবং তা উত্তোরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

পরাজয় আমাদের ভাগ্যলিপি নয়

আমরা দা'য়ী ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথের আহবায়ক। আর একজন দা'য়ী কখনো পরাজয় বরণ করে না। শত্রুর নির্যাতন ও চক্রান্ত তাকে পরাভূত করতে পারে না। তবে দা'য়ী যদি আল্লাহ তায়ালার সত্য ওয়াদার প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে থাকে কিংবা সেই অংগীকার ভংগ করার মানসিকতা পোষণ করতে থাকে যে, তিনি আল্লাহর দ্বীনের পতাকা উচ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাইয়াতের মাধ্যমে করেছেন তা হলে তার পরাজয় নিশ্চিত। কারণ বাইয়াতের এই ওয়াদা একটা স্থায়ী প্রতিজ্ঞা। মাঝে মধ্যে তার নবায়ন হয় মাত্র। এই চুক্তির উদ্দেশ্য কারো ওপর কোন জুলুম করা নয়। কিংবা তা শুধু তার সংগঠনেরই সুনাম সুখ্যাতির মাধ্যমও নয়। বিরুদ্ধবাদীগণ এরূপ

www.amarboi.org

ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। প্রত্যেক ইখওয়ানী ভাই তার ভাই (মুর্শিদে আ'ম)-এর হাতে এই বিষয়ের বাইয়াত করে থাকে যে, সে আল্লাহর পথে তার আনুগত্য করে চলবে। এই অংগীকার পূরণ করার জন্য কোন ক্ষমতাধর তাকে ধমক দিতে পারে না। আবার কোন অত্যাচারীও তাকে হতোদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারে না। এর কারণ শুধু এই যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথেই অংগীকারাবদ্ধ হয়েছি। তাই পার্থিব শক্তিসমূহ যদি তাদের পুরো শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সফল হয়েও যায় তবে এই কামিয়াবী হবে খুবই সীমিত ও অস্থায়ী। নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক এবং প্রকৃত শাসকদের সম্মুখে কার ক্ষমতা খাটতে পারে ? তাঁর ইচ্ছাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। তিনি যা চান তাই হতে বাধ্য। তার দরকার প্রতিটি বিষয়কে অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে।

কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে

দ্বীন জিহাদের দাবী করে। তাই আমাদের ইমাম কুরআন মজীদকে দু'খানা তলোয়ারের মাঝে সাজিয়ে আমাদের প্রতীক বানিয়েছেন। যতদিন পৃথিবীতে একজন ইখওয়ানীও জীবিত থাকবে ততদিন এই প্রতীক বিদ্যমান থাকবে। ইখওয়ানের এই ঈমান রয়েছে যে, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের হিফাজত করতে হবে এবং এই আকীদার ওপর আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করতে হবে। শক্তির এই প্রর্দশনী শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে কারো ওপর জুলুম ও অত্যাচারের উদ্দেশ্যে নয়। এটা কত অদ্ভূত ব্যাপার যে, সারা দুনিয়াকে আত্মরক্ষার অধিকার দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর কোন ব্যক্তি তার অস্তিত্ব, তার দেশ ও তার ঈমান-আকীদার হিফাজতের ঘোষণা দিলেই তা হয়ে যায় মারাত্মক অপরাধ এবং তাকে সন্ত্রসী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মনে হয় যেন শক্তি প্রয়োগ প্রত্যেক জ্বীন ও মানুষের জন্য বৈধ কিন্তু ইখওয়ানের জন্য নিষিদ্ধ। এখন দেখুন ইখওয়ানের নেতৃত্ব তার সংগঠনের ছাত্রদেরকে ইউনিভারসিটি ও কলেজসমূহে বিরোধী ছাত্রদেরকে মারপিট করার জন্য কখনো উৎসাহিত করেনি। অথচ অন্যদিকে সা'দাত ও তাঁর উত্তরসূরী শাসকগণ খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দিতো যে, ইখওয়ানের সমর্থক ছাত্রদেরকে যে কোন উপায়েই হোক মারপিট করতে হবে। এতদসত্ত্বেও সরকারের তল্পীবাহী ও পেটুয়া ছাত্ররা কখনো ইখওয়ানী ছাত্রদের ওপর হাত তুলতে সাহস করেনি। এর কারণ এই যে, সরকার সমর্থক ছাত্রদের ইখওয়ানের শক্তি সম্পর্কেও ধারণা আছে এবং তারা এও জানে যে তাদের নিজেদের অবস্থা কি ? এরূপ আচরণ যদি তারা কখনো করেও বসে তাহলে তাদের খুব ভালভাবেই জানা আছে যে, তার পরিণাম কি দাঁড়াবে। (ইখওয়ানী ছাত্ররা চুড়ি পরিধান করে বসে নেই।)

www.amarboi.org

ভিত্তিহীন অভিযোগ

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের একটা ঘোষণা খুবই বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেছিলেন ঃ "যেসব রাষ্ট্রপ্রধান, দল ও সংগঠন আমাদের আন্দোলনের বিরোধী আমাদের সংগ্রাম তাদের সবার বিরুদ্ধে। আমাদের এই যুদ্ধ এমন যাতে কোন সন্ধি বা কোন যুদ্ধবন্দী নেই। যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা আ-মাদের ও আমাদের জাতির ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন।"

এই উক্তিটি এবং এরূপ আরো অসংখ্য উক্তি হিসেব নিকেশ না করে এবং প্রসংগ প্রেক্ষিত থেকে আলাদা করে আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। ইমামের কোন ভাষণ আলোচনা কিংবা লেখা বিকৃত করে তার মধ্যে নিজের স্বার্থের কথা বের করে নেয়া তাদের অর্জিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর উদাহরণ হলো, কোন ব্যক্তির কুরআন মজীদ থেকে সালাত পরিত্যাগ করার দলিল প্রমাণ খুঁজে বের করার মত। আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ বাদ দিয়ে শুধু --------

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة

(হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সালাতের ধারে কাছেও যেও না।) এবং তারপর সাদাকাল্লাহুল আজিম বলে।

আমরা জানি যে কুরআন মজীদে কোন প্রকার স্ববিরোধিতা পাওয়া যায় না। বরং কোন কোন আয়াত অপর আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। অতএব কোন ব্যক্তি কুরআনের অংশবিশেষকে সমগ্র কিতাবে মুবীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা থেকে ফলাফল গ্রহণ করতে চেষ্টা করে তাহলে তা হবে তার অজ্ঞতার প্রমাণ। এরূপ কর্মপদ্ধতি দ্বীনের জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

ইখওয়ানের দাওয়াতের মূল উৎস হচ্ছে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এগুলোকে উপস্থাপন করার জন্য ইখওয়ান সহজ ও সুবোধ্য প্রক্রিয়া সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা এবং সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। অতএব বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না যে, এ সংগঠন এবং এর কর্মীরা সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের পথ অবলম্বন করবে। মূলত বিশুদ্ধ ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের নীতিমালা সম্পর্কে অবগত লোকদের জানা আছে যে, লিখনী ও বক্তৃতায় সাদৃশ্য ও সমার্থবোধক শব্দাবলী, রূপক অর্থের ব্যবহার এবং উপমিতির প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু শাব্দিক অর্থ কখনো এর মূল উদ্দেশ্য থাকে না। সুতরাং যখন আমরা বলি যে, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম তখন তার অর্থ এটা করা হয় না যে, আমরা তাদেরকে উদ্যত তলোয়ারের নীচে ফেলে দিতে যাচ্ছি। বরং সোজা কথায় তার অর্থ দাঁড়ায় আমরা আমাদের ভাষা আমাদের লিখনী এবং আমাদের চেষ্টা-সাধনা দ্বারা সর্বদা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। আর এটা একটা যুদ্ধই। কেননা লড়াই কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার দ্বারাই করা হয় না। বরং তার অসংখ্য পন্থা ও পদ্ধতি রয়েছে। যদি উপরোক্ত বাক্য দ্বারা অস্ত্রের লড়াই বুঝে নেয়া হয় তাহলে জেনে রাখুন যে,

www.amarboi.org

আমাদের কাছে প্রথমত গোলাবারুদ, জাহাজ এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ নেই যে, তার সাহায্যে আমরা পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর মোকাবিলায় লড়তে পারি। আর যদি এসব সাজ-সরঞ্জাম আমাদের কাছে থেকেও থাকে তবুও আমরা সেগুলো কোন মুসলিমের দিকে তাক করবো না, তারা আমাদের বিরোধী হলেও। আমরা তা শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো। যদি আপনি কোন পাহাড়ী আরবের কথাবার্তা শুনেন তা হলে হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সাধারণ ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রেও তারা বলে যে, "কাতালানি কাতালতুহু" যার আক্ষরিক অর্থ সে আমাকে হত্যা করেছে আমিও তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু তার এই কথার এরূপ অর্থ কখনো উদ্দেশ্য নয় বরং এর মর্মার্থ হবে কেবল এই যে, সে আমাকে মেরেছে আর আমিও তাকে প্রহার করেছি।

যদি কোন লোক বলে যে, "আমি আমার প্রতিপক্ষকে বোবা বানিয়ে ছাড়বো।" তাহলে আপনি কি তার অর্থ গ্রহণ করবেন এই যে, সে তার জিহবা কেটে দেবে যাতে সে বাকশক্তিহীন হয়ে যায়। এই অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

আমরা যখন আমাদের দাওয়াতের উল্লেখ করি এবং আমাদের দুশমনদের মোকাবিলা করার জন্য শপথ গ্রহণ করি তখন তার অর্থ এই যে, আমরা এই পুতঃপবিত্র পয়গামের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর ইচ্ছা পোষণ করছি এবং বীরত্বপূর্ণ শব্দাবলী ব্যবহার করে ইসলামের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততার প্রকাশ করছি। শব্দের গোলকধাঁধা সৃষ্টিকারী ও অপব্যাখ্যাকারীদের কথা ছেড়ে দিন। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, মানুষ অনেক সময় "ঠিক আছে" কথাটা মুখে উচ্চারণ করে। শব্দ একই হলেও তা বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব অর্থ সুনির্দিষ্ট করার জন্য দেখতে হবে। বক্তা কোন্ পরিবেশ পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন এবং তা বলার ভংগি কি ছিল। এই শব্দ দ্বারা আপনি কাউকে হেয় এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারেন। কারো সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করতে পারেন। আবার হুমকি প্রদানের ভাবও প্রকাশ করতে পারেন।

ইখওয়ানের দাওয়াত শরীয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়াতে ইলাহিয়ার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। এই শরীয়াতের শিক্ষামালা থেকে তিনি বিন্দুমাত্র সরে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। শরীয়াত ডিকটেটরশীপকে আদৌ সমর্থন করে না। বরং তার বিরুদ্ধে লড়াই করার উদাত্ত আহবান জানায়। ইসলামে জোরজবরদস্তি ও বল প্রয়োগের কোন স্থান নেই। আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। "যার ইচ্ছা ঈমান কবুল করুক আবার কেউ চাইলে কফুরীর পথে চলতে থাকুক।"(প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলে মাকবুল (সা)-কেও নির্দেশ দিয়েছিলেন, "আপনি কি মানুষকে ঈমান গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন ? এমন সুস্পষ্ট হিদায়াতের পরও কি হকের পথের কোন

www.amarboi.org

আহবানকারী এক নায়কত্বের স্বপ্ন দেখতে পারে ? হাসানুল বান্না ইসলামী ডিক্টেটরশীপ প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ছিলেন এই জঘন্য অভিযোগের কি কোন মূল্য আছে ? কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুমিন কি দুষ্কর্মশীল জালিমদের একনায়কত্ব ও স্বৈরচারকে নেককার ও পবিত্র ঈমানদারদের শূরার সাথে একাকার করতে পারে ? আমাদের কাছে আছে ইসলামের শূরায়ী ব্যবস্থা একনায়কত্ব যার ধারে কাছেও ভিড়তে পারে না।

এরূপ অসুস্থ মন-মানসিকতার কোন চিকিৎসা সম্ভবই নয় যা দিনের দিবালোকের ন্যায় সত্যকে অস্বীকার করে। ইসলাম বিরোধী শক্তি মিথ্যাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রপাগান্ডা থেকে কখনো ফিরে আসার নয়। তারা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অত্যন্ত কুৎসিত চিত্র অংকন করে থাকে। কেননা এই আন্দোলনই তাদের জন্য পেরেশানী ও অশান্তির কারণ। এই আন্দোলন তাদের আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছে এবং তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। যতদূর পর্যন্ত আমাদের কাজ-কারবার ও কর্মতৎপরতা রয়েছে—সর্বত্রই আমরা আমাদের অবস্থান পুরোপুরি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। তদুপরি আমরা কখনো এমন দাবীও করি না যে, ইসলামী দাওয়াতের ওপর আমাদের ঠিকাদারী রয়েছে বরং আমরা অসংখ্য ইসলামী সংগঠনের মধ্যেকার একটা মাত্র। এই ময়দানে আমরা ছাড়াও বহু ইসলামী জামায়াত কর্মতৎপর রয়েছে। অবশ্য যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা আমাদের মানসিক সান্ত্বনা খুঁজে পাই। তা হচ্ছে এই, আমরা ইসলামের শত্রুদের চোখের কাঁটা হয়ে বিদ্ধ হচ্ছি। আর এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা আল-হামদুলিল্লাহ রাহে হকের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছি। বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডবাদী, সমাজতন্ত্রী ও ইহুদীবাদী শক্তিসমূহ আমাদের সাথে যে পরিমাণ বৈরিতা পোষণ করে তার কোন তুলনা মেলে না।

আমরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করছি যে, আমাদের আহবান ইসলামের সঠিক শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তনের আহবান। দুনিয়ার যে কেউ এই মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সচেষ্ট হোক আমরা তার নগণ্য সিপাহী এবং এই উত্তম কাজে যে কোন ব্যক্তির সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করার জন্য সদাপ্রস্তুত রয়েছি। আমরা এরূপ প্রত্যাশা কখনো করিনি যে, নেতৃত্ব কর্তত্বের দায়িত্ব আমাদেরকে দিতে হবে। বিগত পার্লামেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে যখন প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে সর্বপ্রথম এই অংগীকার ব্যক্ত করে যে, তারা দেশে ইসলামী শরীয়াতের বাস্তাবায়ন চায়। সত্য বলতে কি এই গঠনমূলক পরিবর্তন দেখে আমাদের অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায়। এখন নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন বাস্তবে প্রমাণিত হবে যে, কারা এই ইসলামী অভিব্যক্তির ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক ছিল আর কারা ইসলামকে শুধু নির্বাচনী শ্লোগান রূপে ব্যবহার করছিলো। জনসাধারণ শীঘ্রই এটা জেনে ফেলবে যে, ইসলামের ব্যাপারে একান্ত নিবেদিত প্রাণ ও বিশ্বস্ত কারা আর কারা ইসলামকে ভোট লাভের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। যদি প্রকৃতই এসব রাজনৈতিক দলের অবস্থা এই হয় তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে তাদের পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকী প্রতিদিন ইখওয়ানের প্রতি কেন কাদা নিক্ষেপ করে ?

www.amarboi.org

এই ভদ্রলোকদের সম্পর্কে অনেক কিছুই প্রকাশ করা যায় কিন্তু ইখওয়ানের কর্মনীতি এ নয় যে, এরূপ নিরর্থক কথাবার্তা এবং বেহুদা অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে তারা তাদের মূল্যবান সময় অপচয় করবে। তদুপরি আমরা চাইনা যে, আমাদের মুখের ভাষা কিংবা কলম দ্বারা কখনো এমন কোন কথা প্রকাশিত হোক যা প্রতিশোধ গ্রহণের পর্যায়ে পড়ে এবং এভাবে কারো অন্তরে আঘাত লাগুক। আমরা আত্মরক্ষা করতে গিয়েও কখনো নৈতিকতা বিবর্জিত এবং অশালীন কোন কথা মুখে উচ্চারণ করি না।

আমাদের আকাংখা এই যে, আদম সন্তানের মধ্যে আমরা উত্তম চরিত্র ও শ্রেষ্ঠ কর্মের আদর্শ উপস্থাপন করবো। আদম আলাইহিস সালামের দু'সন্তানের আলোচনা করা হয়েছে কুরআন মজীদে। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার হুকমি দেয়। প্রত্যুত্তরে সে বলে, "যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াও আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার মত কোন কাজ করবো না।" এটাই আমাদের কর্মনীতি। আমরা কারো সাথে অসদাচরণ করি না। আমাদের হাতের ও মুখের অত্যাচার থেকে সকল আদম সন্তান সম্পূর্ণ নিরাপদ। অবশ্য কোন জালিম যখন আমাদের প্রতি অকারণে তার জুলুমের হাত প্রসারিত করতে উদ্যত হয় সেক্ষেত্রে আসমানী ও পার্থিব তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মানব রচিত সকল আইনের দৃষ্টিতেই আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তথাপি আমরা সাধারণ মানুষের ন্যায় কখনো প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করি না। প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুদের অবস্থা দাঁড়ায় এই যে, তারা সীমালংঘন করে বসে। গমের সাথে কীট পতংগকেও পিষে ফেলে। কিন্তু আমরা এরূপ নই। আমাদের অবস্থা হচ্ছে, ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের ভাষায় "نستعين عليهم بسهام القدر ودعاء السحر"। অর্থাৎ আমরা জালেমদের বিরুদ্ধে কাদেরে মতলকের কুদরতে কামেলার তীর ও শেষ রাতের বিনম্র দোয়ার দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করি।

আর আমাদের এই হাতিয়ার কোন তেজ বীর্যহীন ভোঁতা অস্ত্র নয় বরং এর কার্যকারিতা প্রমাণিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না। আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের ওপর ঈমান আনয়নকারী লোক তারাই যাদের সম্মুখে কোন আয়াত পেশ করা হলে তারা একান্ত বিনয়াবনত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং সৃষ্টিকর্তার মহত্ব ও অসীম ক্ষমতার তাসবীহ্ জপ করতে থাকে। অতপর তাঁর মোকাবিলায় কখনো তারা অন্যায় ও অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না।

আমি এতক্ষণ যা বললাম তার কিছু প্রমাণও পেশ করছি। ইখওয়ানের "আন নাজির" সাময়িকী মে ১৯৩৮ সালে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হলে তাতে এই মর্মে দু'টো সুস্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় যে, ইখওয়ান রাজনৈতিক ময়দানে হাজির হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের নিকট এই বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আমরা অন্যান্য দলের মোকাবিলা করবো শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়। কোন প্রকার সন্ত্রাসমূলক কিংবা অপরাধী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হবো না। আমাদের এই রাজনৈতিক কর্মকান্ড দেশের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং আমরা এই তৎপরতাকে দেশের বাইরেও ছড়িয়ে

www.amarboi.org

দিতে চাচ্ছিলাম। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল অনেকটা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলার। এখন কোনই নির্বোধ কেবল এটা মনে করতে পারে যে, আমরা প্রচার প্রপাগান্ডা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের পরিবর্তে পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে কামান ও গোলা-বারুদ নিয়ে লড়াই বাধাতে যাচ্ছি। "আন নাজির"-এর প্রতিটি পৃষ্ঠা সাক্ষী যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মত আমাদের হাতিয়ার অশালীন বক্তব্য ও রক্ত চক্ষু নয় বরং হিকমত ও কৌশল, উত্তম নসিহত, নম্রতা-ভদ্রতা, সবর ও ধৈর্য।

কোন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কি এটা শোভনীয় যে, তিনি ইখওয়ান সম্পর্কে ধারণা পোষণ করবে যে আমরা ইসলামের জঘন্যতম দুশমন রাশিয়া ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছি। লড়াইয়ের জন্য আমাদের কাছে বস্তুগত সরঞ্জাম কোথায় ? মানুষের হয়েছে কি ? তারা কি ধরনের ধারণা পোষণ করে এবং কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাদের বিবেকের অপমৃত্যু ঘটেনি। কিন্তু বিদ্বেষ তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। এই বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব তাদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ দেয় না। বরং তাদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের গভীর পঙ্কে নিক্ষেপ করে। যেখানে তাদের কখনো শান্তি ও স্বস্তি নসীব হবে না। আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের কাছে অন্য কোন প্রকার ছাড় প্রত্যাশা করি না। আমরা শুধু তাদের নিকট ইনসাফ ও সুবিচার প্রত্যাশা করি অবশ্য যদি ইনসাফ ও সুবিচার শব্দের অস্তিত্ব তাদের অভিধানে থেকে থাকে।

আইন আমাদের ও আমাদের বিরুদ্ধবাদীরে মধ্যে ফায়সালা করে সত্য কিন্তু ইনসাফের দাবী পূরণ করতে পারে না। যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় এবং সরকারী কোন চাপ ব্যতীত ইনসাফ এবং ন্যায়বিচারের নীতি গ্রহণ করা হয়। সাথে সাথে অত্যাচার নির্যাতন ও জুলুম নিপীড়নের কূটকৌশল প্রয়োগ না করে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের জন্য বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে অনুসন্ধান চালানো হয় এবং অতপর রায় ঘোষণা করা যায় তাহলে সমালোচকদের অধিকার থাকবে যা ইচ্ছা তা বলে বেড়ানোর অবশ্য তাদের দাবীর স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল থাকতে হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোথায় ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করা হয়েছে ? অতএব আমাদের বিরুদ্ধাচরণের দিশেহারা লোকদের কাল্পনিক অভিযোগ, মনগড়া কাহিনী এবং ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা চালানোর স্বাধীনতা রয়েছে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের মালিকের ফায়সালা হচ্ছে তিনি ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কথা ও কাজের কখনো সফলতা দান করেন না। তাদের চারদিক আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন—পালিয়ে যাবে কোথায় ? আল্লাহ তায়ালাই আমাদের সকল কর্মসম্পাদনকারী এবং তিনিই সাহায্যকারী। তাঁর সাহায্য সহযোগিতার পর আর কারো প্রয়োজনও আমাদের নেই।

সুধী পাঠকমন্ডলী ! পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবেন, ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ গণতন্ত্রের ওপর আস্থাশীল ছিলেন কি না। অনুরূপ এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার জন্য ইমাম কি কর্মপদ্ধতি

www.amarboi.org

অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নিকট ক্ষমতার দন্ড লাভ করা নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনো ছিল না। তিনি সংস্কার ও সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, দুনিয়ার যে কোন ব্যক্তি এবং দলই শরীয়াতে ইসলামীর প্রবর্তনের জন্য প্রাণচঞ্চল ও কর্মতৎপর হয় আমরা তার অনুপম পৃষ্ঠ পোষক ও সাহায্যকারী। সেজন্য বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রয়োজন। পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই তা ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। কেননা তড়িঘড়ি এবং আবেগের কারণে অনেক সময় সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে যায়। যার ফলে শরীয়াতের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজই বুঝে শুনে করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের নিকট থেকে শিখেছি যে, দাওয়াত ও ইরশাদের কাজে এই আধুনিক যুগের দাবীকে বিবেচনায় রাখতে হবে। বর্তমান সময়ে ঐ সকল কর্মপদ্ধতি ও উপকরণ যা বিগত দিনে কার্যকরী ও সুফলদায়ক ছিল—অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই হকের আহবানকারীর কর্তব্য হলো তাঁকে বর্তমান সময়ের সকল উপায় উপকরণকে কাজে লাগাতে হবে। নাটক, সিনেমা, এবং টেলিভিশন আমাদের যুগের অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার। শয়তান এগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। অথচ এসব হাতিয়ারকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের যুগ নতুন নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারার যুগ। জনসংযোগ ও প্রচার প্রপাগান্ডায় এসব মতবাদ ও দর্শনের ব্যপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটানোর ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করে। এই ময়দানে ইসলামের দায়ীগণকে দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। ইসলামী দাওয়াত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। মানুষের নিকট আমাদের এই দাবী যে তারা যেন আল্লাহর কিতাবকে বুঝতে সচেষ্ট হন যাতে বিস্তারিতভাবে ইসলামকে জানতে পারেন।

ইমাম হাসানুল বান্না এবং তাঁর পূর্ববর্তী দায়ীগণ আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, দ্বীন ইসলামের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিত ও সুলাহায়ে উম্মাতের চরিত্র সুকৃতির আনুগত্য ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধের বাস্তব উদাহরণ পেশ করে। অতএব এই মূলনীতির আলোকে বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী অভিযানসমূহের মধ্য থেকে যারা আমাদের ভূমিকার সাথে ঐকমত্য পোষণ করবে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাবো আর যা এই নীতিমালার পরিপন্থী হবে তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়

আমরা প্রাচ্যের অধিবাসীরা সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের প্রভাবাধীন জাতীয়তার খুবই ভুল অর্থ বুঝে থাকি। এই অর্থ ইসলাম থেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশসমূহে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং পাবলিক বক্তারা এর আলোচনায় মুখর থাকেন।

এই বিষয়ে ইমাম শহীদ একটা বিশেষ নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, যদি দেশপ্রেম ও জাতীয়তার অর্থ এই হয় কোন ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যেখানকার আলো বাতাস ও নিয়ামত রাজি ভোগ করে সে বেড়ে উঠেছে সে দেশকে সে ভালবাসবে তাহলে তা কোন শরীফ ব্যক্তি অস্বীকার করবে না। এই মতাদর্শ সাদরে গ্রহণ করার মত। অনুরূপ যদি জাতীয়তা ও দেশ প্রেমের অর্থ করা হয় কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করে তার জনগণকে তাদের অধিকার ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া এবং সে জন্য বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করার আহবান জানানো হয় তাহলে তা হবে এমন আহবান ইসলাম যার শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলিম এ ধরনের আহবানকে স্বাগত জানায়। আবার যদি দেশ প্রেমের আবেগ ব্যবহার করে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা উদ্দেশ্য হয় যেন তারা একটা শক্তিতে পরিণত হয়ে তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনাকারীর পথে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। তবে তার চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠা করার প্রতিটি প্রচেষ্টা এবং এই রাস্তায় অগ্রগামী প্রতিটি পদক্ষেপ শত সহস্র প্রশংসার অধিকারী। এরপর থাকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সেসব প্রপাগান্ডা ও প্রচারণা যার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে এমন কোন দল বা জাতীয়তার ওপর ভিত্তি করে যা অন্যদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তবে জেনে রাখুন এমন জাতীয়তা ও দেশ প্রেমের সাথে ইখওয়ানের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

এ চিন্তাধারা কোন কোন সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে খুব ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। একে অন্যের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা এবং জাতিকে শতধা বিভক্ত করে ফেলা। এ ছাড়া এর আর কোন লাভ নেই। এই বিপজ্জনক প্রবণতা প্রকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে জাতির দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিরর্থক বিষয় নিয়ে পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ির সৃষ্টি করেছে। এটা আমাদের শত্রুদের একটা ষড়যন্ত্র। তারা এভাবে আমাদেরকে দুর্বল করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে। আমাদের সামনে উন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজনৈতিক মতবিরোধ এবং পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তারা কখনো একে অন্যের ওপর দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আরোপ করে না।

www.amarboi.org

তাদের পলিসি পরস্পর থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি সকলের কাছে সমান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

মহান সন্তানের পরাজয়

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, বিশ্বযুদ্ধে চার্চিল বৃটেনকে বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত করেন। দেশবাসী এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে যথাযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাঁকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করে। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে কনজারভেটিভ, লেভার ও লিবারেল সব পার্টিই ছিল একমত, তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা দেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে জাতি এই মহাবীরকে ক্ষমতার মসনদ থেকে বঞ্চিত করে। ভোটদাতারা জানতো যে, যুদ্ধকালীন সময়ের দাবী শান্তিকালীন সময়ের দাবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ জাতি তাদের উপকারীদের যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে থাকে সত্য কিন্তু অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বীর পূজার যূপকাষ্ঠে বলি দেয় না। এটা জাগ্রত বিবেক ও সতর্কতার চমৎকার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি ভুল ও অর্থহীন বিষয়ে। আহ ! আমরা যদি তাদের এই ভাল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারতাম!

মু'মিনগণ একে অপরের ভাই

ইখওয়ানের দৃষ্টিতে ঈমান ও আকীদার ভিত্তিতে দেশ প্রেম এবং জাতীয়তার সীমা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ভৌগলিক সীমারেখার দ্বারা নয়। প্রতিটি মুসলিম দেশকেই আমরা আমাদের নিজেদের দেশ বলে বিশ্বাস করি। আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য জিহাদ এবং তার সীমান্ত রক্ষার ঘোষণা দিয়ে থাকি। কেননা আমাদের ঈমান আকীদার বুনিয়াদ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

"এই মুসলিম জাতি একই জাতি। আর আমি হচ্ছি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় করো।"

আমরা একথা কখনো মেনে নিতে পারি না যে, কোন মুসলিম জাতি অন্য কোন মুসলিম জাতির ভৌগলিক এলাকা দখল করতে পারে। গোলাম বানাতে পারে কিংবা জোরপূর্বক নিজেদের ইচ্ছা তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে। প্রতিটি দেশে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ব্যাপার খুব ভালভাবে বুঝেন। যেমন প্রবাদে বলে ঃ "মক্কার লোকেরাই মক্কার অলি গলি ও পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে অধিক অবহিত।" আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরোধী এবং ইসলামী খেলাফতের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। ইসলামী খেলাফতই পারে মুসলিম উম্মাকে তাদের শতধা বিচ্ছিন্ন অবস্থা দূর করে সবাইকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে এবং এভাবে পৃথিবী নামক গ্রহের ওপর এই কোটি কোটি মুসলিমকে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত করতে।

১০—

www.amarboi.org

মানুষ প্রথমে আমাদেরকে বুঝতেই পারেনি। আবার বুঝে থাকলেও ভুল বুঝেছে। আমরা দেশপ্রেম এবং নিজেদের দেশ ও জাতির মঙ্গল চিন্তায় সমস্ত মানুষ থেকে অধিক নিবেদিত প্রাণ ও অকৃত্রিম। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশী। আর যদি সেই মহান সত্তা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আর কারো অসন্তুষ্টির কোন পরোয়া আমরা করি না। আমাদের সম্পর্কে অমূলক ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে অথচ আমরা সুস্পষ্টভাবে বলে থাকি যে, ইসরাঈলের অস্তিত্ব লাভ কি সম্ভব ছিল যদি উম্মাতে মুসলিমা ঐক্যবদ্ধ হতো এবং একই নেতৃত্ব (খেলাফতে ইসলামীয়া)-এর নেয়ামত সে হাসিল করতে পারতো। তখন কি আর ইসরাঈল ও তার সহযোগী ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং লেবাননে সেসব কিছু করতে পারতো যা তারা বর্তমানে নির্লজ্জের মত করে যাচ্ছে। এখন অপেক্ষা করে দেখতে থাকুন আরো কত কি ঘটে। মুসলিমরা যদি এভাবে শতধা বিভক্ত থাকে তাহলে শত্রুরা আরো এক হাত দেখাতে থাকবে।

রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ররাষ্ট্র এক জনরাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু অমুসলিমদেরকে এতটা সংগঠিত ও প্রসংশনীয় অবস্থায় দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের সামান্য বিবেকবোধও কেন জাগ্রত হয় না? বস্তুত এটা খুবই সাদামাটা কথা কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিকে কাজেই লাগানো হয় না। প্রবৃত্তি ও লালসা বিবেক-বুদ্ধির ওপর পর্দা টেনে দিয়েছে।

তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী

জাতীয়তার ব্যাপারে ইখওয়ানের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ধারণা আমরা ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের শিক্ষা থেকে লাভ করেছি। ইমাম আমাদেরকে কুরআন মজীদ, সুন্নাতে রাসূল (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) ও সালফে সালেহীনদের ইজমার আলোকে প্রদান করেছেন। আমাদের মতে জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। আমরা বলে থাকি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে সামষ্টিক স্বার্থই আমাদের লক্ষ্য। সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার প্রতিরক্ষা এবং তার হেফাজতের জন্য জিহাদ এবং ত্যাগ আমাদের জাতীয় শ্লোগান। জাতীয়তার ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুগত ধারণা আমরা অস্বীকার করি। মানুষকে আর্য, ল্যাটিন অথবা অনুরূপ অন্যান্য কোন জাতি-গোষ্ঠীগত বিভক্তির ওপর ভিত্তিশীল জাতীয়তা আমাদের কাছে চরম অপছন্দনীয়। এই ভিত্তিতেই তো ইসরাঈল ইহুদী জাতিকে "আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় জাতি" বলে মনে করে। আমরা বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একই আদি পিতা আদমের সন্তান আর আদম আলাইহিস সালামকে তৈরী করা হয়েছিল মাটি থেকে। মানুষের মধ্যে তাকওয়া ব্যতীত আর কোন পার্থক্য নেই। যিনি যত বেশী মুত্তাকী তিনি ততবেশী শ্রেষ্ঠ। সুধী পাঠক! আপনি হয়তো এ আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আমাদের এবং বস্তুবাদীদের জাতীয়তার ধারণায় কত বিরাট ফারাক বিদ্যমান।

www.amarboi.org

ইখওয়ানের ফিক্‌হী দৃষ্টিভংগী

এরপর থাকে মুসলমানদের ফিক্‌হী মতপার্থক্যের বিষয়টি। এ ব্যাপারেও আমাদের মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা মনে করি চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম আহম্মদ (র) ইসলামী আইন এবং ফিক্‌হার মূলনীতি ও ভিত্তি সম্পর্কে একে অপরের সাথে একমত এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য.নেই। কোন মতানৈক্য থাকলে তা আছে শুধুমাত্র শাখা-প্রশাখা ও খুঁটি-নাটি বিষয়ে। অনুরূপ বিভিন্ন মাযহাব তথা চিন্তার অনুসারীগণ যদি ফিকাহ্ বিষয়ক এই বিভক্তিকে উম্মাতের মধ্যে মতপার্থক্য ও শত্রুতার ভিত্তি না বানায় তাহলে এই ধরনের ফিকহী মতভেদকে আমরা স্বাগত জানাই। সমস্ত ইসলামী সংগঠন আমাদের কাছে সম্মানের যোগ্য, প্রত্যেকেই নিজ নিজ গন্ডি ও পরিমন্ডলে সুকৃতি কল্যাণের ব্যপ্তি ঘটানোর কাজে নিয়োজিত। যদি কোন বিষয়ে তাদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য হয়েও যায় তবুও তা অপবাদ আরোপ, কুধারণা পোষণ অথবা শত্রুতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। বর্তমান রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। আমরা শুধু তাদের কর্মপন্থার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। তাদের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তারা তাদের সকল কথা ও কাজকে সঠিক মনে করে এবং অন্যদেরকে তা মানানোর জন্য যে কোন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে এবং সাথে সাথে তাদেরকে বিরোধীদের সব কথার অবশ্যই বিরোধিতা করতে হয়। এসব পার্টি যেদিন এই নীতি ত্যাগ করে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে সেদিন আমরাও তাদের সাথে কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য করবো না।

আমরা মুসলিম। তাই আমরা কখনো এরূপ ইচ্ছা করিনি যে, কারো ওপর জুলুম করে বসি। আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ চিন্তা এই যে, সমগ্র উম্মাতে মুসলিমাহ ইসলামী শরীয়াতের অনুসারী হয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হোক।

ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

আমাদের অমুসলিম ভাইয়েরাও আমাদের নিকট সম্মানের পাত্র। তাদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের দ্বীনকেও কুরআনে দ্বীন বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন" কিন্তু অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট একথা এভাবে ঘোষণা করেছেন যে, "اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامَ" ইসলামই একমাত্র দ্বীনে হক হিসেবে আল্লাহর নিকট মনোনীত ও স্বীকৃত। আলোচ্য আয়াত দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গায়রে ইসলামকে দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তা তার পছন্দ নয় বলে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ইসলামকে তার পছন্দনীয় দ্বীন রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। মুসলিম মাত্রই তাদের অমুসলিম ভাইদেরকে এই স্বাধীনতা প্রদান করতে বাধ্য।

www.amarboi.org

ইমাম শহীদ এবং ইখওয়ানগণ তাদের চারদিকে দেখতে পেয়েছিলেন যে, ইস-লাম ও ইসলামের অনুসারীদের ওপর অমানিশার অন্ধকার ছেয়ে আছে। তাই তারা এই বিধ্বংসী ও নিচ্ছিদ্র অন্ধকার রজনী থেকে উম্মাতকে মুক্তিদানের জন্য পথ খুঁজতে থাকেন। তারা ইসলামের ওপর সকল দিক থেকে জাপটে ধরে আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করার ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করেন। সব হামলার লক্ষ ছিল একাধারে মুসলিম শাসক গোষ্ঠী ও জনসাধারণ উভয়ই। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বিস্ময় বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছিলো।

করণীয় কি ?

আমরা ইমামকে জিজ্ঞেস করেছি। এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কি এবং এই ব্যাধির প্রতিকারই বা কি উপায়ে করা যেতে পারে ? আমাদের এ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ভরা প্রশ্ন শুনে তিনি অত্যন্ত ধীর স্থির ও শান্তভাবে মৃদু হাসলেন। কত প্রিয় ছিল সেই হাঁসি ! শুনুন এবং মনে রাখুন, পড়াশুনা করুন এবং প্রকৃত অবস্থা অবগত হোন। শহীদ ইমাম তাঁর ছোট্ট পুস্তিকা আমাদের পড়ে শুনান। তার ভংগী ছিল সহজ হৃদয়গ্রাহী এবং বিশ্বাস ছিল খুবই বলিষ্ঠ ও সান্ত্বনাদায়ক। তিনি বলেন ঃ "আমাদের পূর্বেও এমন বহু জাতি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে যাদের ওপর আমাদের ন্যায় বিপদ-মুসিবতের পাহাড় ভেংগে পড়েছিলো। তারা তখন চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে এবং তা থেকে নাজাত পাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকে। সেগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করে এবং কামিয়াব হয়ে যায়।" মুর্শিদে আ'ম-এর অভিমত ছিল এই যে, আমাদের ওপর যে দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতা জেঁকে বসেছে এবং আমাদেরকে অর্ধমৃত করে ফেলেছে তার প্রতিকার তিন ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে আছে। এই পরীক্ষিত ব্যবস্থাগুলো তার মতে ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ঃ ব্যথা ও রোগের স্থান নির্ধারণ করা। কেননা চিকিৎসার মৌলিক নীতিমালার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রোগের প্রকৃত অবস্থা জেনে নিতে হবে।

দ্বিতীয় ঃ ঔষুধের তিক্ততা এবং চিকিৎসাকালীন কষ্ট ধৈর্যের সাথে সহ্য করতে হবে।

তৃতীয় ঃ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক যিনি রোগ চিহ্নিত ও ঔষধ নির্ধারিণে পুরো যোগ্যতা রাখেন এবং নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা রোগীর দুর্বল শরীরে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারেন।

আমরা বললাম "আপনি কি রোগের স্থান নির্ধারিণ করে আমাদেরকে তা বলবেন না ?

প্রত্যুত্যরে তিনি বললেন। "রোগের অনেক দিক রয়েছে।"

এক ঃ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ।

দুই ঃ ধ্বংসাত্মক দলাদলি যা জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

www.amarboi.org

তিন ঃ সুদের অভিশাপ পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলা।

চার ঃ বিদেশী কোম্পানীসমূহ যা আমাদের আয়ের উৎসসমূহ ও রাজস্বখাত সমূহকে দখল করে আমাদের রক্ত চুষছে। আমদানীর উৎস ও আয়ের ওপর জেঁকে বসে আমাদের রক্ত শোষণ করে চলেছে।

পাচ ঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, ব্যধিগ্রস্ত আকীদা এবং উন্নত নৈতিক দৃষ্টান্তের অভাব।

ছয় ঃ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ যা জাতির দেহ ও আত্মায় প্রাণ সংহারী বিষের মত প্রবাহিত হচ্ছে।

সাত ঃ মানব রচিত আইন যা অপরাধ নির্মূল করে না এবং অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেয় না।

আট ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

নয় ঃ সাহস ও সংকল্পের মূলোৎপাটনকারী হতাশা।

এই তালিকা দেখেই আমরা বুঝতে পারি যেসব বিষ ফোঁড়ার বিষাক্ত পুঁজ গোটা শরীরকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট মুর্শিদে আ'ম তা গুণে গুণে বলে দিয়েছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক, সামাজিক, আইনগত, শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণ মূলক মোদ্দাকথা সকল ব্যধিকেই তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কত গভীর ও সূক্ষ্মদৃষ্টির মূল্যায়ন। প্রকৃত সত্য সঠিকভাবে উদ্ধার করেছেন এবং উত্তম পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। যদি সময়ের সংকীর্ণতা না থাকতো তাহলে আমি প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করতাম।

ইসলামী শিক্ষা ও তার প্রভাব

ইমাম শহীদ তার অনুসারীদের ভালবাসতেন এবং তারাও তাঁর জন্য ছিল নিবেদিত প্রাণ। তিনি অনেক সময় আমাদের মধ্য থেকে পঁচিশ বছর কিংবা তা থেকে কম বা বেশী বয়সের যুবকদেরকে মন্ত্রীদের সাথে তাদের দপ্তরে নয় বরং পার্লামেন্ট হাউজে গিয়ে সাক্ষাত করার জন্য প্রেরণ করতেন। এই অভিযানে আমাদের মধ্য থেকে যাকেই পাঠানো হতো সে অত্যন্ত নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের সাথেই যেতো এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পয়গাম পৌঁছে দিতো এবং উত্তম ফলাফল নিয়ে ফিরে আসতো।

তিনি আমাদের অন্তরকে আশায় ভরে দিয়েছিলেন। আমাদের আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করেছিলেন এবং আমাদের হৃদয়-মনে আত্মমর্যাদাবোধের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যারাই আমাদের সাথে আছে তাদেরকে নিশ্চিত বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই মহান ব্যক্তির [হাসানুল বান্না শহীদ (র)] বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা চিন্তাক্লিষ্টদেরকে নবজীবন দান করেন এবং প্রাচ্যে এমন জোশ সৃষ্টি হয় যার বাষ্পে লোহা ও ইস্পাতের মেশিনগুলোও সচল হয়ে উঠতো

www.amarboi.org

(অর্থাৎ বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতো)। যদি আজ পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই আজকের যুবকগণ এই পূত-পবিত্র দাওয়াতকে এমন অবস্থায় দেখতে পেতো যে দৃশ্য দেখে তাঁর মন সান্ত্বনায় ভরে যেতো। হয়তো আমি পরে কোথাও এসব ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করবো যে, এ দাওয়াত কিভাবে সফলতার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এই দাওয়াতেরই কৃতিত্ব যে, তা এমন সব অন্তরকে যা মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিলো, যাদের হৃদস্পন্দন থেমে গিয়েছিলো এবং জীবনের কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে ছিল না। পুনরায় তাদের মাঝে হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করেছে। অতপর সেই হৃদপিণ্ডগুলোতেই আবার এমনভাবে স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে যে, লোহার ওপর হাতুড়ির আঘাতের ন্যায় প্রচণ্ড আওয়াজ শুনা যেতে লাগলো। এখন এই আওয়াজ শোনা যেতে পারে এবং হৃদস্পন্দনও অনুভব করা যায়। এই ধ্বনি তাদের রাতের ঘুম হারাম করে দেয় যারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন কল্যাণ বরদাশত করতে পারে না। এখানে আমি যে বার বার "ইসলাম" শব্দটি ব্যবহার করছি এটা রূপক অর্থে। এর দ্বারা আমি ইসলামের অনুসারীদেরকেই মুসলিম বুঝাতে চেয়েছি। কেননা ইসলাম কখনো দুর্বল হতে পারে না। কিংবা তার কোন পতনও আসতে পারে না। ইসলাম ততদিন কায়েম থাকবে যতদিন এই আসমান ও জমিন থাকবে। কাদেরে মতলক নিজেই এর স্থায়ীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। انّا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون এটা এমন একটা ওয়াদা যে তাঁর সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আমি মুসলিমদের প্রতি ইংগিত করছি। যখনই তারা শরীয়াতে ইলাহিয়াকে মজবুতভাবে ধারণ করেছে তখনই তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর যখনই তারা তা থেকে দূরে থাকার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ইজ্জত-আবরু ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। এবং তারা লাঞ্ছনা ও অপমানের অসহায় শিকার হয়েছে। আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করছি যেন এই উম্মাত কখনো এমন পর্যায় গিয়ে উপনিত না হয় যে পর্যায় সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, "তুমি যদি কোন জীবন্তকে ডাকো তবে সে তোমার ডাক শুনতে পারে কিন্তু যাকে তুমি আহ্বান জানাচ্ছো তার তো জীবনের অবসান হয়ে গেছে।"

একটা মজার ব্যাপার

মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, এই মহাপ্রাণ দা'য়ী (হাসানুল বান্না) কিসের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন ? প্রত্যুত্তরে ইমাম শহীদ বাস্তব নমুনা পেশ করে থাকেন যে, মানুষ রকমারি স্বভাবের অধিকারী। কেউ উদর পূজা ও ভোগ বিলাস এবং রং রসকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করে আবার কেউ বাহ্যাড়ম্বর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং কৃত্রিম সম্মানানুরাগী হয়ে থাকে। কেউ আবার ফিতনা-ফাসাদ ও পরচর্চা নিয়ে খুশী থাকে। তাই ইমাম এসব বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের সাথে তাদের উপযুক্ত আচরণ করতেন। প্রসংগত একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেলো। সুধী পাঠকদের সামনে তা তুলে ধরছি। মাকতাবে ইরশাদের সদস্যগণ ইমাম শহীদকে বললেন (এবং তখনকার দিনে আমি নিজেও মাকতাবে ইরশাদের সদস্য ছিলাম) যে

www.amarboi.org

ওমর তিলমেসানী বাহ্যিক শান শওকত ও টিপটপ হয়ে থাকতে খুব পছন্দ করেন। বিলাসিতা ও ফিটফাট থাকা তার অভ্যাস এবং ফ্যাশন ও সাজ-সজ্জার প্রতি তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইমাম শুনেও নীরব থাকলেন। কিন্তু একদিন মাকতাবে ইরশাদে সদস্যগণের সমাবেশকালে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলেন, "সমাবেশে ছেঁড়া ফাটা জুতা, ময়লা টুপি এবং সাদাসিদা পোশাকে আসতে চেষ্টা করো।" একথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "দাওয়াতে হকের পথে এটা কি আপনার নির্দেশ ?" উত্তরে বলতে লাগলেন ঃ "তোমার ভাইদের আকাংখা, তারা তোমাকে এই অবস্থায় দেখতে চান। আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাঁর বান্দাদের জন্য সাজসজ্জা ও উত্তম রিযিক হারাম করেছেন সব বান্দাহ্দের আল্লাহ্ যেন চান তিনি তাঁর বান্দাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার কোন প্রকাশ বান্দার জীবনে না ঘটে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যেন তাঁর ঈমানদার বান্দার জন্য দুনিয়ার জীবনে কোন অংশই রাখেনি এবং মানুষের সামনে নিজেকে নোংরা ও কুৎসিতভাবে পেশ করাই যেন মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহ্ তায়ালার এই বাণী কি আমরা ভুলে গিয়েছি। এরশাদ করেছেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ.....

"হে রাসূল (সা) আপনি বলে দিন বান্দার জন্য আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্যের উপকরণ কে হারাম করেছে ------?"

ধূমপান বর্জন

এটা ছিল এমন একটা প্রভাব সৃষ্টিকারী শিক্ষা যা আমরা শুনেছি এবং চিরদিন মনে রেখেছি। আমি সিগারেটও পান করতাম। দফতরে ইরশাদের ইখওয়ানগণ এ ব্যাপারে ইমামের কাছে অভিযোগ করেন। আমি জানতে পেয়ে নিজেই ইমামের কাছে আরজ করি, "আপনি যদি নির্দেশ দেন তাহলে আমি সিগারেট পানের অভ্যাস বর্জন করবো। আর যদি আপনি এ ব্যাপারে কিছু না বলেন তাহলে আমি ধূমপান অব্যাহত রাখবো।"

তিনি বললেন ঃ "আমি আপনাকে আদেশও দিচ্ছি না নিষেধও করছি না।" সাধারণত মুর্শিদ এমন সব জিনিস থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন যেগুলোর অভ্যাস হয়ে গেলে মানুষের জন্য সেগুলো ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি তিনি চা ও কফি থেকেও বিরত থাকতে বলতেন। তবে আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বলেছেন তার কারণ হয়তো এই যে, তিনি আমার দুর্বল স্বভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি হয়তো মনে ধারণা করে থাকবেন যে, এভাবে হঠাৎ করে আমাকে ধূমপান থেকে নিষেধ করলে তা আমার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হবে কিংবা হয়তো এই কড়াকড়ির কারণে আমি সংগঠন থেকেই সরে পড়বো। এটাও কি শিক্ষাদানের একটা পদ্ধতি নয় ? আর আল্লাহর শোকর যে আমি এখন আর মোটেই ধূমপান করি না। এটা এই শিক্ষার প্রভাব ও ফল ছাড়া আর কিছুই।

www.amarboi.org

প্রশংসনীয় নৈতিক চরিত্র

মুর্শিদ যখন খুশী থাকতেন তখন আমাকে সম্বোধন করতেন "হে ওমর"। আর যদি কোন সময় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন তখন বলতেন "উস্তাদ উমর।" অতএব কথার ধরনেই আমি বুঝে ফেলতাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম "মুর্শিদ ? আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে ?"

কিছু কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এমনও আছেন যাদের আল্লাহর সাথে বান্দার সাথে এবং এমনকি নিজের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের ইমাম শহীদ এই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন সহ্য শক্তি ও আত্মসংযোমের ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন যে, অতি কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি উত্তেজিত হতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এমন উন্নত নৈতিক গুণাবলীর মহাসম্পদ দান করেছিলেন যে, তিনি যার সাথেই মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতেন সেই-ই তাঁর ভক্তে পরিণত হতো। সর্বোপরি আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতিব ঘনিষ্ট ও নিবিড়। ছোট বড় সকল ব্যাপারেই তিনি আল্লাহর হক ও তাঁর নির্দেশের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। অতএব মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহও তাঁর এই অনুগত ও নিষ্ঠাবান বান্দার সাহায্য এভাবে করতেন যে, কোন অতিবড় সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তার সাহস অবদমিত হতো না। হতাশা মুহূর্তের জন্যও তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারতো না এবং অতিবড় লক্ষ্য অর্জনেও কখনো নিরাশ হতেন না।

অদম্য সাহস থাকলে পাথরও পানির মত মনে হয়

তাঁর নিকট সকল কাজই ছিল সহজ। আল্লাহ্ তায়ালাও বস্তুত সব কাজ সহজসাধ্য করে দিতেন। কেননা তাঁর ভরসা ছিল আল্লাহ্ তায়ালার প্রভুত্বের ওপর। মানুষের মধ্যে এমন কিছু দুঃসাহসী লোক থাকেন যারা সমগ্র জীবনকে দাওয়াতে হকের জন্য ওয়াকফ্ করে দেন। তাঁদের কাছে দাওয়াতের কাজ সর্বাগ্রে এবং তারপর অন্যান্য কাজ।

মুসলমানদের কাজ হচ্ছে দুনিয়ার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু এই নেতৃত্ব বড়ত্ব ও আধিপত্য জাহির করার জন্য নয়। বরং শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য। এই নেতৃত্ব সম্পর্কে যেসব মুসলমানের ধারণা নেই প্রকৃতপক্ষে তারা সেই বাণীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কেই অবহিত নয়। যার ধারক ও বাহক করে তাকে পাঠানো হয়েছে এবং যার প্রতি আহবান জানানোর জন্য আল্লাহ্ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম শহীদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "আপনি কখন শয্যা গ্রহণ করেন"? তিনি জবাব দিলেন "দাওয়াত ও পয়গামের গুরু দায়িত্ব আমাদের জন্য কি এমন কোন অবকাশ রেখেছে যে, আমরা আরামের জন্য সটান শুয়ে পড়তে পারি ? দায়িত্ব ও কর্তব্য কি সময়ের মোকাবেলায় অনেক বেশী নয়" ?

www.amarboi.org

যে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে চায় সে রাত্রি জাগরণ করে

সত্য কথা বলতে কি ইমাম শহীদের জন্য দিবারাত্রে সর্বাধিক চার থেকে পাঁচ ঘন্টার ঘুমই যথেষ্ট ছিল। তার কাছে লক্ষ্য অর্জনই ছিল মূল বিষয়। সকল কর্মতৎপরতা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র। তাঁর কাছে মু'মীন বান্দার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার পথপ্রর্দশকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়া এবং পুরো মানবতাকে ইসলামের কল্যাণমূলক বিধান ও পূত-পবিত্র শিক্ষার ছায়াতলে স্থান করে দেয়া যা ব্যতীত আদম সন্তানের পক্ষে প্রকৃত সাফল্য লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব নয়।

মু'মিনের আসল সম্পদ ঈমান

যদি মানুষ জিজ্ঞেস করে এবং কার্যত লোকজন সর্বদাই জিজ্ঞেস করে যে, "এই গরীব লোকগুলো তাদের ব্যয় নির্বাহ করে কিভাবে ?"

"এ ক্ষেত্রে ইমাম তার জবাব দেন এই যে, দ্বীনের দাওয়াতের মৌলিক ভিত্তি ঈমান, সম্পদ নয়। যখন একজন ঈমানদার সত্যিকার ঈমানের দৌলত লাভ করেন তখন তার সফলতার জন্য যাবতীয় উপায় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাড় হয়ে যায়।"

এমন অবস্থাও আমাদের ছিল যখন আমরা অতি কষ্টে এক আধটা ফ্লাট ভাড়া করতাম যাতে দাওয়াতের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা যায়। তারপর প্রত্যেক ভাই তার সামান্য উপার্জন থেকে এয়ানত হিসেবে যে কয়েক টাকা নিয়মিতভাবে সংগঠনকে প্রদান করতেন তা দিয়ে আমরা আন্দোলনের জন্য হিলমিয়া জাদিদায় দু'টো সুরম্য অট্টালিকা কিনি। মুহাম্মাদ আলী ষ্ট্রীটে তৃতীয় আরেকটি প্রাসাদও ক্রয় করি। দেখতে দেখতে বহু কোম্পানী আমাদের আন্দোলনের মালিকানাধীন এসে পড়ে-------। ইখওয়ানের এসব সম্পদ জালিম সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেয়। আমাদেরকে যদি এর ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো তাহলে তার পরিমাণ দাঁড়তো কোটি কোটি টাকায়।

কর্মঠ লোক ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন কিন্তু ধন-সম্পদের পাহাড় কর্মঠ ব্যক্তি নিজে সৃষ্টি করতে পারেন না।

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা

ইখওয়ান দাওয়াতের ওপর আস্থাশীল। তাই তারা এর জন্য পকেটের পয়সা অকপটে খরচও করে থাকে। অন্যান্য লোকদের অবস্থা হচ্ছে, তারা কোন দলে গিয়ে যোগদান করে এই উদ্দেশ্যে যে, সেখান থেকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেবে। এই দুই অবস্থার মধ্যে আসমান-জমিনের ফারাক রয়েছে। এরূপ ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতেই ইখওয়ানের দাওয়াত সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। এবং এত অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও ইখওয়ানের ওপর অর্পিত এই দাওয়াত সমগ্র দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে। ইখওয়ানকে যত বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার

www.amarboi.org

সম্মুখীন হতে হয়েছে যদি অন্য কাউকে তা মোকাবেলা করতে হতো তবে তার নাম নিশানাও বাকী থাকতো না। কিন্তু যার একমাত্র লক্ষ্যই মহান আল্লাহর সত্তা সে প্রতিকূল পরিবেশ এবং নিঃসংগ পরিস্থিতিতেও মনযিলে মকসুদে গিয়ে উপনিত হতে পারে।

বাস্তবতা থেকে উদাসীন লোকেরা ইখওয়ানের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার কার্যক্রমকে রাজনৈতিক শ্লোগান বলে আখ্যায়িত করে থাকে। আফসোস এটা আমাদের সম্পর্কে মারাত্মক অমূলক ধারণা।

যদি শরীয়াতের বাস্তবায়নের দাওয়াত রাজনীতি হয় তাহলে জেনে নিন যে, এটাই আমাদের রাজনীতি। আর যেসব লোক তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ করার দাওয়াত দিয়ে থাকে তারা যদি রাজনীতিবিদ হয় তাহলে আমরা রাজনীতির উস্তাদ। আর যদি তোমরা একথার ওপর অটল অবিচল থাকো যে আমাদের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। তবে আমাদের জবাব হচ্ছে তোমরা যা কিছু বলে বেড়াচ্ছো তার জবাব দানের যিম্মাদারী তো তোমাদের ওপরই বর্তাবে। আর যা আমরা বলে যাচ্ছি তার বিনিময় তো আমরাই পেয়ে যাবো। প্রত্যেকে তাই লাভ করবে যা তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

নাহাস পাশা ও ইংরেজদের রক্তচক্ষু

আমাদের ইমাম দু'বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং দু'বারই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদীদের শিবিরে ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা নাহাস পাশা মরহুমের নিকট দাবী করে যেন তিনি ইমামকে ইসমাঈলিয়ার নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত রাখেন। নাহাস পাশা ইমামকে সাক্ষাতকারের জন্য "মিনা হাউসে "ডেকে পাঠান। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। নাহাস পাশা যখন দেখেন যে, ইমাম নির্বাচন থেকে পিছিয়ে যেতে কোন অবস্থায়ই প্রস্তুত নন। তখন তিনি বৃটিশের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হুমকি ও চোখ রাঙানির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এমতাবস্থায় দেশে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। একথা শুনে ইমাম নির্বাচন থেকে বিরত থাকার ঘোষণা প্রদান করেন। কারণ তাঁর নিকট রাষ্ট্র ও দেশের নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবীদার ছিল। তাঁর এই ফায়সালার ফলে ইখওয়ান অবশ্য তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যারা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি আমি নিজেও তাদের দলে ছিলাম। ফলে আমি অফিসে যাওয়াতও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এভাবে দফতরে আমার অনুপস্থিতি সম্পর্কে ইমাম জানতে চান। তখন তাঁকে জানানো হয় যে, আমি তাঁর নির্বাচন থেকে বিরত হওয়ার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছি। তিনি আমার নামে একটা পত্র পাঠান যাতে আমাকে তাঁর সাথে সক্ষাতের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি তাঁকে লিখিত জবাব পাঠাই যার বিষয়বস্তু ছিল। আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের কোন ইচ্ছা পোষণ করি না। তারপর তিনি উস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীন এবং হাজী আবদুহু কাসেম (র)-কে এক সাথে

www.amarboi.org

আমার নিকট প্রেরণ করেন। তারা দু'জনে আমাকে একরকম জোর করে সাবীনুল কানাতিরে ইমামের কাছে নিয়ে যান। তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত খুলে বলেন। সত্য কথা বলতে কি আমি তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হই এবং পূর্বের ন্যায় আবার ইখওয়ানের সাথে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করি।

দ্বিতীয়বার যখন তিনি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন তখন সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সার্বিক প্রয়াস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টাগণকে তাঁর সহযোগিতা থেকে বিরত রাখা যায়নি। এর ফলে প্রশাসন ভোট গণনার সময় এমন কারচুপি করে এবং এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যে তার কোন নজীর পাওয়া যায় না। এভাবে তার নিশ্চিত বিজয়কে ব্যর্থতা ও পরাজয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

মতবিরোধের অধিকার

ইখওয়ানের মুর্শিদের সাথে তাদের আচরণ হতো এমন যে, তারা তাঁর সাথে মত-পার্থক্যও করতেন। আলোচনা পর্যালোচনাও হতো এবং প্রশ্নোত্তর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও। যদি তারা সন্তুষ্ট না হতো কিংবা মুর্শিদ তাঁর রায়ের ওপর অটল থাকতেন তাহলে ইখওয়ান মনে করতো যে, মুর্শিদকে আল্লাহ্ তায়ালা বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার পর্যাপ্ত অংশ দান করছেন এবং তার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের মতামত ত্যাগ করে তাঁর হুকুম মেনে নিতো। এটা হতো পরিপূর্ণ আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে।

হাসানুল বান্না ও হাসান আল হুদাইবি

সম্মানিত পাঠকগণের নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে, আমি যা বলছি তা ইমাম শহীদের পুস্তিকা থেকে হয় অবিকল নকল করছি নয়তো তার মর্মার্থ আমার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করছি। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু স্বয়ং এই পবিত্র দাওয়াতের জন্য যথোপযুক্ত ফায়সালা প্রকাশ করে থাকেন। প্রথমে ছিল শিক্ষা ও সংস্কারের স্তর। ঈমান-আকীদার সাহায্যে আল্লাহ তায়ালার সাথে মু'মিন বান্দার ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় যোগসূত্র সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। সেই সময় ছিল লাইব্রেরীগুলো মোটামোটা বই পুস্তকে ভর্তি করে রাখার পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের সমন্বয় সাধনের মুহূর্ত। আন্দোলন এমন নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনীর মুখাপেক্ষী ছিল যারা দিকে দিকে দাওয়াতের পতাকা উত্তোলন করবে। ঘুমিয়ে পড়া মন ও নেতিয়ে পড়া বিবেকগুলোকে সতর্ক এবং সাবধান করে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল সেটা। হকের বুনিয়াদসমূহের ওপর একটা মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা ছিল সময়ের দাবী। সেটা ছিল উম্মাতে মুসলিমাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা এবং প্রকৃত ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তনের উৎসাহ প্রদানের কাল। আহলে ইসলামকে এই

www.amarboi.org

শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে, জিহাদ ব্যতীত প্রকৃত সম্মান লাভ করা সম্ভব নয়। এই পর্যায় আল্লাহ্ তায়ালা ইখওয়ানের নেতৃত্বের জন্য ইমাম হাসানুল বান্না শহীদকে নির্বাচিত করেন। তিনি আনুসংগিক যাবতীয় প্রয়োজন ও উপায়-উপকরণ কানায় কানায় পুরো করে আন্দোলনকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন।

তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় স্তর যার দাবীও ছিল ভিন্ন। এ পর্যায়ে ধৈর্য স্থৈর্য এবং বীরত্বের প্রয়োজন ছিল। জুলুম ও বাতিলের মোকাবেলা এবং তাতে দৃঢ়পদ থাকার দরকার ছিল। আন্দোলনের মৌলিক শিক্ষামালাকে বাস্তবে কার্যে পরিণত করে দেখানোর পর্যায় এসে গিয়েছিলো। ইসলামের দা'য়ীগণকে পুরোপুরি সাহস ও বীরত্বের সাথে জালেম শাসক ও আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীর সামনে তাদের ইসলামী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটানোর সময় এসে গিয়েছিলো। দাওয়াতে হককে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুজাহিদদের নেতৃত্বে নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণের ভেলা ভাসাতে হয়। আল্লাহ্ তায়ালা হাসানুল বান্নার স্থলে এখন হাসান আল হুদাইবিকে বেছে নেন। আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হোন। তিনি নেতৃত্বের হক এমনভাবে আদায় করেন যেভাবে তার অগ্রজ চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন।

মানুষ হচ্ছে খনি সদৃশ

এখানে আমি বলে দিতে চাই যে, সমগ্র মিসরে জামাল আবদুন নাসেরের পরিচয় ও স্বরূপ শুধু দু'ব্যক্তি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন। তাদের একজন হচ্ছেন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মুর্শিদে 'আম মরহুম হাসান আল হুদাইবি (র) আর অপর জন হচ্ছেন ওয়াফদ পার্টির প্রেসিডেন্ট মাষ্টার ফুয়াদ সিরাজ উদ্দীন।

১৯৫৪ সালে আমরা যখন সামরিক জেলখানায় বন্দী ছিলাম তখন আমাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে উম্মে কুলসুমের স্বরে স্বর মিলিয়ে নাসেরের প্রশংসা গীতি গাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। উম্মে কুলসুমের গানের রেকর্ড বাজানো হতো "ইয়া জামাল ইয়া মিসালুল অতনিয়া" (হে জামাল আবদুন নাসের হে স্বদেশ প্রেমের উত্তম দৃষ্টান্ত) এই নাটকে আবদুল কাদের আওদাহ্ শহীদ (র)-কে ব্যান্ড মাষ্টার রূপে পৃথকভাবে আর আমাদের সকলকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। একদিন আমরা সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং গান গাওয়া হচ্ছিল। ইত্যবসরে এক জেল অফিসার সাইয়েদ হাসান আল হুদাইবি (র)-এর নিকট এসে আদেশ দিল যে, "ঠিকমত দাঁড়ান এবং নির্দেশ মোতাবেক মাটির ওপর সজোরে পা ফেলুন।" জালেমদের জুলুম নির্যাতন এ সময় চরমে পৌঁছেছিল। কিন্তু সাইয়েদ হাসান আল হুদাইবি কখনো তাতে আমল দিতেন না। কারো নিকট অনুকম্পা ভিক্ষা করা কিংবা তোষামোদের ভংগী অবলম্বন করার কোন কৌশল তাঁর জানাই ছিল না। তিনি অকুতোভয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন : "আরে মিয়া চিন্তা করো না আমি মাটির ওপর এমনভাবে পা ফেলবো না যেন পেট্রোল কিংবা তরমুজ বেরিয়ে আসে।" তিনি এমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না যারা জালিমদের সম্মুখে মাথা নত করে এবং বলে, "আল্লাহ যা চান এবং সাহেবে সদর যা ইচ্ছা করেন।"

www.amarboi.org

মানুষও খনির ন্যায় হয়ে থাকে। কোনটির ভেতর থেকে সোনা বেরিয়ে আসে আবার কোনটি থেকে লোহা। এই লোকদের মাহাত্ম কি ছিল ? তাদের ঈমান ছিল মজবুত। আল্লাহ্র ওপর দৃঢ় বিশ্বাস চলমান ঝর্ণার মত তাদের অন্তরকে সিক্ত করে রাখতো। কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তায়ালা এই লোকদের অটল অবিচল থাকার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে দাওয়াতে হকের হেফাজত করেছেন।

দাওয়াতে হকের আলোচনা

আমি আমার এই স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অবশ্যই দাওয়াতে হকের আ-লোচনা করবো। এটা সেই আল্লাহ্র দাওয়াত যিনি আমাকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। এই দাওয়াত আমাকে আমার জীবনের স্বরূপ ও তার প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং এর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য সম্যক রূপে অবহিত করেছেন। আমি এর আলোচনা কেন করবো না। এই দাওয়াতই তো আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, একজন মুসলিমের কাজ শুধু কিছু সংখ্যক আরকান তথা আনুষ্ঠানিক ইবাদাত আদায় করে নেয়াই নয়। বরং মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং প্রতি পদক্ষেপে কল্যাণ ও মংগলকে বিশেষ বিবেচনায় রাখবে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা ব্যাপক, বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গিন করতে চেষ্টা করা। আমাদের নিকট বৈষয়িক ও বস্তুগত কোন শক্তি না থাকলেও আমাদেরকে এই কাজ করে যেতে হবে। আমরা নিজেরা সকল অনিষ্ট থেকে দূরে থাকবো এবং সমগ্র মানবতাকে যাবতীয় মন্দ থেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। এই কাজ দাওয়াতের সাহায্যে করা যাবে যদি মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়। আর যদি তারা অনিহা প্রকাশ করে তথাপি তাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। তারা তো জালেম। তারা যদি জুলুমের হস্ত উত্তোলন করে তবে আমাদেরকে আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। হকের হিফাজত করা অত্যাবশ্যক ; যদিও তা করতে হয় শক্তি প্রয়োগ করে। হকের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য শক্তির ব্যবহার মানবীয় ও আল্লাহ্র সকল আইনেই বৈধ বলে স্বীকৃত। আমরা দাওয়াতে হকের কাজ শুধু মুখের কথা ও শ্লোগান দ্বারা করি না।

দা'য়ী ইলাল্লাহ্ কখনো কাল্পনিক ঘোড়ায় আরোহণ করে না। দা'য়ীর প্রয়োজন হচ্ছে, তাকে হতে হবে মজবুত স্নায়ুর অধিকারী। সে কখনো বেইজ্জতী ও অপমানকে কবুল করবে না। মহৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁর মধ্যে প্রবল ইচ্ছা শক্তি, অটল বিশ্বাস, ত্যাগ ও কুরবানীর অপরাজেয় উদ্দীপনা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং তার যথার্থতার প্রতি ঈমান ও এই পথে জীবন কুরবানী দিয়ে দেয়ার ইস্পাত কঠিন শপথের মত গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে। কোন জাতির প্রতিটা মানুষের মধ্যে যখন এসব উন্নত গুণাবলী থাকে সে জাতি কোন অবস্থায়ই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন বরণ করে না।

কেউ যদি এই মৌলিক নীতিমালার সাথে ঐকমত্য না হয় তাহলে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি যে, হকের বিজয়ের জন্য এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

www.amarboi.org

আমরা যদি একটা শক্তিশালী জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাই তাহলে তার জন্য এটাই একমাত্র পথ। এই পথ সুকঠিন ও দীর্ঘ আর তা অতিক্রম করার সৎ সাহস তার থাকতে পারে যাকে আল্লাহ তায়ালা তৌফিক দান করেন। আবার এই সৌভাগ্যও সেই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যাকে আল্লাহ তায়ালা অফুরন্ত কল্যাণ প্রদানের জন্য বাছাই করে নেন। এবং এই রাস্তায় তাকে কেবল মাত্র সবরের সাথে চলার সাহসই দান করেন না বরং সবরের সাথে পরিপূর্ণ আত্মসর্মপণ ও সন্তোষের গুণাবলীও প্রদান করেন।

চিন্তা ও কাজের সমন্বয়

আমাদের ব্যাপারে কিছু লোক মনে করে যে আমরা শুধু চিন্তা সর্বস্ব ও দার্শনিক সংগঠন বিশেষ। আমাদের কাছে বাস্তব সমাধান নেই। বস্তুত যে সম্পর্কে মানুষের সঠিক ধারণা থাকে না তারা সে জিনিসের দুশমনই হয়ে থাকে। সমগ্র মিসরে আপনি এমন কোন সংগঠনের দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারবেন না যা বাস্তবে ইখওয়ানের ন্যায় কর্মতৎপর। আমার এই দাবীর স্বপক্ষে আমি ইমাম শহীদের পুস্তিকা থেকেই কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ইখওয়ানের বাণিজ্যিক কোম্পানীসমূহের রেকর্ড খুবই প্রশস্ত। ইসমাঈলিয়া, শিবরাখিয়্যাত, মাহমুদিয়া এবং কায়রো প্রভৃতি শহরে আমাদের এসব কোম্পানীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। এসব ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কোম্পানী ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন শিল্প ও পেশাগত কারখানা ছিল প্রচুর। বস্ত্রবয়নের জন্য অসংখ্য তাঁতশিল্প ছিল। বাণিজ্য ও কৃষি ক্ষেত্রেও ছিল বিস্তৃত কাজ কারবার। মিসর সরকার যদি একের পর এক আমাদের এসব প্রতিষ্ঠানকে বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করে না ফেলতো তাহলে আজ ইখওয়ান মধ্য প্রাচ্যে অসংখ্য কোম্পানী ও মিল কারখানার সর্বাপেক্ষা বড় মালিক হতো। বর্তমানে সারা দেশে যেসব বড় প্রতিষ্ঠান যেমন ঃ ব্যাংক, সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা কোম্পানী দেখা যায় তার ইতিহাসের দিকে যদি আপনি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে তার পশ্চাতে ইখওয়ানের লোকদের সযত্ন প্রয়াস, প্রচেষ্টা ও অবদান সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হবে।

ইখওয়ান তাদের দাওয়াতি তৎপরতা, সম্প্রসারণ তৎপরতা, সফর এবং অন্যান্য বিষয়ে যা খরচ করে থাকেন তার যোগান আসে তাদের নিজেদের পকেট থেকেই। ইখওয়ান বহির্ভূত কোন লোকের নিকট থেকে আমরা কখনো কোন পয়সা গ্রহণ করিনি। অবশ্য এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ঐ পাঁচশত পাউন্ডের চাঁদা যা সুয়েজখাল কোম্পানী একটা মসজিদ নির্মাণের জন্য সাহায্য স্বরূপ প্রদান করেছিল। প্রসংগত এটাও জেনে নিন যে, ইখওয়ানের সদস্যগণ যা কিছু এয়ানত দিয়ে থাকেন তা দেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। এটা বাধ্যতামূলক কোন ব্যাপার নয়। ইখওয়ান উম্মাতে মুসলিমাকে জিহাদের দাওয়াত দিয়ে থাকে। আর সর্বাপেক্ষা বড় দলিল এই যে, তারা কাজের লোক, জিহাদ এই দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া এবং তার নিগূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে আমাদের দাওয়াত— দাওয়াতে জিহাদ। যদি তার জন্য আমাদের জান কুরবান করতে হয় তবুও।

www.amarboi.org

এমন জীবনের কি মূল্য যার বুনিয়াদ ভীরুতা ও কাপুরুষতা। এভাবে বেঁচে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করে কি লাভ যদি জীবন লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানিতে ভরপুর হয়ে যায়। এরূপ ছিদ্র অন্বেষণকারী ও সুযোগ সন্ধানীদের কি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া সম্ভব যারা সকল প্রকার জালিমের কাফেলায় গিয়ে শামিল হয়ে থাকে এবং তার রিকাব ধরে বসে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়ারই নামান্তর। কবির ভাষায় ঃ

ليس من مات فاستراح بميت

انما الميت ميت الاحياء

যে সত্যিই মৃত্যু বরণ করলো সে প্রকৃতপক্ষে মৃত নয়।

বরং মৃত সেই যে জীবন্ত সমাধিস্থ হয়েছে।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ কয়েক প্রকার। মুসলিমদের অধপতিত অবস্থার জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপের বহিঃপ্রকাশও এক প্রকার জিহাদ। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর যে নির্যাতন চালোনো হচ্ছে এবং তারা তা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে এ অবস্থার জন্য অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করাও জিহাদের অন্তর্গত। মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং তাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে মুসিবত থেকে তাদের মুক্তি দেয়ার চেষ্টাও জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। সুকৃতির আদেশ এবং দুষ্কৃতির নিষেধও জিহাদ। যারা আমাদের দ্বীনের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের সাথে কোন প্রকার আন্তরিক ও বন্ধুসূলভ সম্পর্ক না রাখার নামও জিহাদ। নিজেকে এমন এক কাতারে শামিল করে নেয়াও জিহাদ যা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও মজবুত। মানুষের যা কিছুই রয়েছে তা আল্লাহ তায়ালারই দান। তাই সবকিছু তাঁরই পথে ব্যয় করাও জিহাদ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যদি জনগণ নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদদের সাথে গিয়ে শামিল হতে না পারে তাহলে তারা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে। এটাও জিহাদ রূপেই পরিগণিত হবে। এটা আল্লাহরই বিশেষ অনুগ্রহ যে প্রত্যেক প্রকারের জিহাদই অন্য প্রকারের জিহাদের পথনির্দেশ করে। অতএব, নিজেকে মুজাহিদদের কোন না কোন কাতারে শামিল করা মুসলমানের জন্য অত্যন্ত সহজ। সকল প্রকার জিহাদকে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাণী وجاهدوا فى الله حق جهاده "তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে জিহাদের পরিপূর্ণ হক আদায় করে" পবিত্র বাণীতে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। অতপর কোন মুসলিমের জন্য আর এমন কথা বলার সুযোগ নেই যে, সে মুজাহিদদের কোন কাতারেই জায়গা পাচ্ছে না।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়

স্মৃতিচারণ ও জীবন কথা লেখক ও পাঠকদের জন্য এ দু'টি বিষয়ই আমার থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভংগী এবং পদ্ধতি থাকাই স্বাভাবিক। পাঠক ও লেখক উভয়েই চায় যেন কাহিনী ও ঘটনাকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুরূপে নির্ধারণ করা হয় এবং তাকে কেন্দ্র করে গোটা লেখা আবর্তিত হতে থাকে। আমার দৃষ্টিভংগী কিন্তু এমন নয়। এরূপ লিখন পদ্ধতি অবশ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি অনুরাগীদের জন্য অবশ্যই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা ইতিহাস শাস্ত্র ও ইতিহাস দর্শনের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না। যদি কাহিনী ও ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করা হয় এবং মানুষ তা অধ্যয়নও করে তাতে লাভ কি? ভুলে যাওয়া তো প্রতিটি মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। ঘটনাবলী পড়লো এবং পরে ভুলে গেল। চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখার পরও তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে না। তবে হাঁ, অবশ্য কাহিনী বর্ণনা করার সাথে সাথে প্রতিটা ঘটনা সম্পর্কে আর্দশগত বিষদ বিবরণ এবং লেখকের ব্যক্তিগত মতামত যদি বর্ণনা করে দেয়া হয় তাহলে আদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাসগত একটা বিশেষ রং এবং চিন্তা-ভাবনার একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। অথচ অধিকাংশ স্মৃতিকথায় এটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। তাই ঘটনা প্রবাহকে একেবারে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এটাই প্রচলিত ও স্বীকৃত প্রক্রিয়া। প্রকাশক, লেখক এবং পাঠক সকলেই এই পদ্ধতির সাথে পরিচিত। কিন্তু আমি এ পদ্ধতি থেকে সরে এসে নিজস্ব পদ্ধতিতে আমার স্মৃতিকথা বিজ্ঞ পাঠকগণের সমীপে তুলে ধরতে চাই।

এই নতুন পন্থায় যদি প্রকাশক ও পাঠকগণের মনে কোন কষ্টও লাগে তাতে আমার কোন অপরাধ নেই। কেননা আমি আমার বাকশক্তি, লিখনী, শরীর ও প্রাণের সমস্ত শক্তি দাওয়াতে হকের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। আমি এই স্মৃতি কথার সাহায্যে এই আন্দোলনের এমন সব দিক পাঠকদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই সাধারণত মানুষ যা জানে না। প্রতিটি মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভংগী থাকে। আর যে যা করতে চায় আল্লাহ তায়ালা তাকে তা করার তাওফিক দান করেন।

দু'টো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

অধিকাংশ জীবন কাহিনী ও স্মৃতিকথা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, আশা-আকাংখা, এবং নাম ও যশের জন্য লিখা হয়ে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত স্মৃতিকথার মূল বিষয়বস্তু আকীদা ও ঈমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তার মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং প্রতিপত্তি ও মর্যাদা লাভের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। এ ধরনের স্মৃতি-কথা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উলামার চৌহদ্দির মধ্যেই বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে।

যার কুরআন মজীদের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সে তা নিয়মিত তেলাওয়াত করে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা মহীয়ান-গরীয়ান রবের ইবাদাতে সুমতি ও সন্তোষ লাভের

www.amarboi.org

জন্য নিয়োজিত থাকে। তার আচরণ এমন ব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী হবে কুরআন এবং কুরআনের মর্যাদার সাথে যার একেবারেই কোন সম্পর্ক নেই কিংবা অন্তসারশূন্য বাহ্যিক কোন সম্পর্কও নেই। দ্বিতীয় প্রকারের লোক আপনাকে অত্যন্ত আর্কষণীয় ও মনোলোভা ঘটনাবলী শুনাতে পারবে কিন্তু আপনাকে কোন মূল্যবান উপদেশ দেবে না। কিংবা মুক্তির কোন সন্ধানও দিতে পারবে না।

স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করণের উদ্দেশ্য

আমার মতে নসীহত ও নাজাতের পথপ্রর্দশনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। যারা আমাকে এই স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে তাদের অবগতির জন্য আমি বলতে চাই যে, ইখওয়ান কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন। যার কারণে কোন কঠোরতা বা নমনীয়তা তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। জেলখানার নির্মম অত্যাচারে যেখানে অতি বড় সাহসী ব্যক্তিদেরও হতোদ্যম হয়ে যেতে হয় সেখানে ইখওয়ান কর্মীরা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইখওয়ানের অসীম সাহস ও অনমনীয়তার মূল কারণ কুরআন মজীদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক ও যোগসূত্রের মধ্যে নিহিত। কয়েদখানার সাধারণ শাস্তি দেখে ছুটির ঘন্টার কথা মানুষের মনে পড়ে যায়। সেখানে আমাদের অবস্থা ছিল এই যে, আমরা জিন্দানখানার অভ্যন্তরেও হাসি-খুশী থাকার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতাম। ইসলামের সীমার মধ্যে থেকেই সন্ধ্যায় আমরা একে অন্যকে গল্প-কাহিনী শুনাতাম। এবং হাস্যরসের মাধ্যমে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হতাম। সাধারণ কোন লোক আমাদেরকে দেখে কল্পনাও করতে পারতো না যে, আমাদের ওপর দিয়ে প্রলয় বয়ে গিয়েছে।

জেলখানার মধ্যে মজার কুস্তি

"আল-ওয়াহাত" জেলখানায় বন্দী জীবন চলাকালে আমরা মজার মজার প্রোগ্রাম করতাম। একদিন ভাই মাহমুদ যাইনহাম বলতে লাগলেন আজ রাতে আমরা শববেদারী পালন করবো এবং প্রশিক্ষণ মূলক কর্মসূচীর সাথে কিছু বিনোদনমূলক প্রোগ্রামও পেশ করা হবে। বিনোদন মূলক কর্মসূচীতে কুস্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আমি এবং আপনি দু'জন মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হবো।

মাহমুদ ভাইয়ের এই প্রস্তাব শুনে আমি তাঁকে বললাম ঃ কুস্তিতে তো আপনি রুস্তমে মিসর উপাধি লাভ করেছেন। অথচ এ বিষয়ে আমার প্রাথমিক ধারণাও নেই। এ ইখওয়ানী ভাই খুব উত্তম পাহলোয়ান ছিলেন এবং সমগ্র মিসরে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।

আমার মন্তব্য শুনে বলতে লাগলেন ঃ আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে কুস্তি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় শিখিয়ে দেবো যাতে আপনি কুস্তির কৌশল রপ্ত করে ফেলতে পারবেন। তারপর প্রোগ্রাম শুরু হলে আমি মিসরের স্বনাম ধন্য বড় বড় পাহলোয়ানের এবং প্রাচীনকালের বীরপুরুষদের কীর্তিগাথা আলোচনা করতে

www.amarboi.org

আরম্ভ করবো এবং কথোপকথোনের মাঝে ঐ সব পাহলোয়ান ও বীর পুরুষগণকে কঠোর সমালোচনার শিকার বানাবো যার ফলে আপনি ক্রোধ ও আত্মমর্যাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কুস্তি ল্যাংগোট পরে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানিয়ে বসবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আমার ঘাড়ের উপর শক্তহাতে ধরবেন আর আমি মোমের ন্যায় আপনার হাতে মাটির ওপর চিৎপটাং হয়ে পড়ে যাবো। আপনি কাল বিলম্ব না করে আমার বুকের ওপর জেঁকে বসবেন এবং হাত উপরে তুলে আপনার বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে লোকদের নিকট থেকে প্রশংসা কুড়িয়ে নেবেন।

অতএব ভাই মাহমুদের পরিকল্পনা মোতাবেক রাতের বেলা কুস্তি হলো এবং আমি তাকে চিৎপটাং করে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর যায় কোথায়। সমস্ত ইখওয়ান এবং আমাদের ব্যারাকের বাইরে প্রহরারত সিপাহীরা পর্যন্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। সিপাহীগণ বড় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তালি বাজাতে থাকে।

পরবর্তী রাতে আমাদের একটা ইসলামী ও সংস্কারমূলক নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ছিল। নাটক শুরু হওয়ার পূর্বে আমি সে সম্পর্কে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করলাম। আমি যখন বক্তৃতা করছিলাম তখন আমাদের এক ইখওয়ানী ভাই যে এতক্ষণ জানালার পাশে বসেছিল একজন সিপাহীকে বলতে শুনেন, সে তার সংগীদেরকে বলছিল ঃ তোমরা এই বুড়োকে দেখছো ; তিনি অতি সুদক্ষ পাহলোয়ান। গতরাতে তিনি মিসরের প্রাক্তন রুস্তুমকে একেবারে চিৎ করে ফেলে দিয়েছিলেন।

কারাগারের দারোগাগণ

এই জেলখানায় অবস্থানকালে জেলখানার দায়িত্বে নিয়োজিত বহু দারোগার সাথে আমাদের পালা পড়ে এবং তাদের প্রত্যেকের চরিত্র ও কাজের ব্যাপারে আমাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তাদের কেউ কেউ তো নির্মমতা ও পাষণ্ডতার এমন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, জিন্দানখানার হতভাগারা শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় তাদের নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে বাইরে যাওয়ার অনুমতিও পেতো না। তদুপরি আমাদেরকে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করা, তাদের এজেন্টদের দিয়ে গালি দেয়া, আমাদের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা এবং নানাভাবে কষ্ট দেয়া তাদের অতি প্রিয় বিষয় ছিল। তাদের সময়ে সরকারী প্রহরীদের মুখে আমাদের নামই ছিল "জাতির বিশ্বাসঘাতক" এবং "সরকারের চোর"। পক্ষান্তরে কোন কোন দারোগা এমনও এসেছেন যারা সাধারণ নিয়ম মোতাবেক আমাদেরকে আইনগত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিতো।

অত্যাচারীদের পরিণাম

যেসব জালিমরা আমাদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করেছিল আমাদের চোখের সামনেই তারা প্রত্যেকে তার চরম পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধাও তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে এবং আখেরাতেও তারা পীড়াদায়ক

www.amarboi.org

আযাবের মজা ভোগ করতে বাধ্য হবে। আমি তাদের নাম উল্লেখ করতে চাই না। কেননা তাদের মোকদ্দমা সেই ন্যায় বিচারক ও চিরবিজয়ী সত্তার আদালতে পৌঁছে গেছে যেখানে হক ও ইনসাফের ফায়সালা হয়ে থাকে। আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে আমাকে কখনো জেলখানার কঠোরতা ভোগ করতে হয়নি। এর কারণ আমি একে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা বলে মেনে নিয়েছিলাম। যা কেউ হটাতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি এই জন্য যে, আমার ওপর তিনি তার অবারিত ও পরিপূর্ণ রহমত ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তিনিই তার দ্বীনে হকের জন্য জেলখানার পুতিগন্ধময় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জীবন যাপনের সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করেছেন। এটা এমন একটা পদক যা আমি সযত্নে আমার বুকে লটকিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমি এমন কোন অপরাধের ফলে জেলখানায় যাইনি যাতে আমার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে পারে।

দৃঢ় সংকল্প অথবা অনুমতি

যে সকল ইখওয়ানী বিপদ-মুসিবত ও কষ্ট সহ্য করতে করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে তাদের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক ও সহানুভূতি ছিল। "আল-ওয়াহাত" মরুপ্রান্তরে অত্যাচারের এক শেষ করা হয়েছে তাদের উপর যা সহ্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোন কোন বন্ধুর মনোবল ভেঙে যায় তারা আমার কাছে আসে। তাদের চেহারায় ছিল লজ্জা ও শরমের সুস্পষ্ট ছাপ। তারা অত্যন্ত অসহায়ভাবে আমাকে বলতো যে, নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন আমরা সরকারকে সহযোগিতা করে জীবন রক্ষা করতে চাই। কিন্তু ইখওয়ানদের দেখেও লজ্জাবোধ হয়। তাই আপনি ইখওয়ানদের বলে দিন যে, আমরা আপনার অনুমতি ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এ পরিস্থিতিতে আমি কখনো এসব বন্ধুদের মনোবাঞ্ছা অপূরণ রাখিনি। তাদের ইজ্জত আবরু রক্ষার খাতিরে আমি একথাই বলে দিতাম যে, আমি তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। আমার এই কর্মপদ্ধতি ও কুরআন মজীদের শিক্ষার ফল মাত্র।[১] আমরা কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করতাম—তা মুখস্ত করতাম—তার শিক্ষা ও মূল বিষয়বস্তু এবং কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা করতাম। জেলখানায় একজন ইখওয়ানীও এমন ছিল না যার বুকে কুরআন মজীদ ঝুলানো থাকতো না।

---

১. জীবন রক্ষার জন্য অনন্যোপায় হয়ে গেলে কুরআন মজীদে কুফরী কালামেরও অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদিও দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা অবলম্বন করাই মহত্ব। যা হোক প্রতিটি মানুষের মনোবল এক রকম হয় না। আমার মত দুর্বল ঈমান ও দুর্বলমনা লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে অফুরন্ত রহমতের নির্দশন স্বরূপ রাব্বুল ইজ্জত এই নমনীয়তার সুযোগ দান করেছেন। সূরা আন নাহলে বলা হয়েছে ঃ " যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করবে (অবশ্য তাকে যদি) বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানের ওপর অটল-অবিচল (তাহলে কোন অসুবিধা নেই) কিন্তু যে সানন্দে কুফর কবুল করে নেয় তার ওপর আল্লাহর গযব আর এসব লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন ও কঠোর আযাব।" – অনুবাদক।

www.amarboi.org

উম্মাতে মুসলিমার অবস্থা এখন এই যে, আমরা কুরআন মজীদকে উপেক্ষণীয় বস্তুতে পরিণত করেছি। ফলে কুরআন মজীদও আমাদেরকে সম্পূর্ণ নির্বান্ধব ও অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করেছে। আমরা মনে করি যে, আমরা কুরআন মজীদের হিফাজতকারী অথচ কুরআনই আমাদের হিফাজত করে থাকে। কুরআন একটা শক্তি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাজেয় ঢাল। আমাদের সরকারগুলো যদি তাদের রাষ্ট্রগদূতগণকে পাশ্চাত্যের বিপর্যস্ত সামাজের বিষাক্ত সমুদ্রে অবতরণের পূর্বে কুরআনের শিক্ষায় সুসজ্জিত করে দেয় তাহলে তাদের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস বিপর্যয়ের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যেতো এবং তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের শিকার হতো না।

এখন অবস্থা এই যে, তারা কুরআন সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফলে আমাদের যেসব ছাত্র এবং দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনসমূহের কর্মী পাশ্চাত্যের ঘুণে ধরা পরিবেশে গিয়ে পৌছে তারা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। তারা যখন দেশে ফিরে আসেন তখন সেই নোংরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক অকল্যাণসমূহ এবং জীবনাচারের নামে ঘৃণিত সব পন্থা-পদ্ধতির মারাত্মক বিষ সাথে করে নিয়ে আসে।

ইখওয়ানের প্রতি দোষারোপকারীদের একটা অভিযোগ হলো ইখওয়ানের কাছে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য সঠিক কোন কর্মসূচী নেই। কুরআন মজীদ সমাজ সংস্কারের জন্য একটা অত্যন্ত ব্যাপক ঘোষণাপত্র পেশ করেছে। ইমাম শহীদ কুরআন মজীদের এই ঘোষণাপত্র ১১টি দফার আকারে সবার সামনে পেশ করেছেন। সমাজ সংস্কারের জন্য এটা ইখওয়ানের সবসময়ের একটা মৌলিক ও স্থায়ী কর্মপদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এরই আলোকে ইমাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

১—আল্লাহ ভীতি।

২—মানুষের জীবনের প্রতি সম্মান প্রর্দশন।

৩—আখেরাতের জবাবদিহির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ।

৪—মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ।

৫—নর-নারী নির্বিশেষে সকলকে সচেতন করে তোলা এবং ইসলামের পয়গাম সকলের নিকট পৌছে দিয়ে তার দাবীসমূহ পূরণ করতে উৎসাহিত করা।

৬—মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক নিরাপত্তা বিধান।

৭—অপরাধ প্রতিরোধে আপ্রাণ সংগ্রাম।

৮—উম্মাতের ঐক্যের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা এবং তার কারণসমূহের মূলোৎপাটন।

৯—মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ জীবনের অধিকার মালিকানা লাভের অধিকার, জীবিকার্জনের অধিকার, শিক্ষার

www.amarboi.org

অধিকার, স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকার, শিখার অধিকার, বক্তৃতা বিবৃতির অধিকার এবং অবাধ গতিবিধির অধিকার। প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা এবং সমাজের সব মানুষের হালাল জীবিকা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

১০–জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য বাধ্যবাধকতা।

১১–মুসলিম রাষ্ট্রকে উপরোক্ত দফাগুলোর পথিকৃত বানানো এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য তার সমস্ত উপায় উপকরণ প্রয়োগ করা। তা ছাড়া সমগ্র মৌলিক মানবীয় অধিকার সকল মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার গ্যারান্টি ও নিশ্চয়তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হাসিল করা। এই দফাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং তারপর আপনি নিজেই এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, ইখওয়ানের ঘোষণাপত্র জীবন সমস্যার সমাধানে এবং সামাজের সংস্কার সাধনে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে কি না?

গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা

আমার চরম আগ্রহ ছিল এই যে, এই স্মৃতিচারণকালে সেই সমস্ত দুর্লভ চিঠিপত্র বিদগ্ধ পাঠকগণের সম্মুখে তুলে ধরবো যেগুলোর বিনিময় হয়েছিল আমার ও মুর্শিদের মাঝে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জামাল আবদুন নাসেরের আমলে যখন তার এজেন্ট আমার খানা তল্লাশী করেন তখন আমার এই মূল্যবান কাগজপত্রগুলোও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপর ব্যক্তিগত এসব কাগজপত্র যার ওপর তাদের কোন আইনগত অধিকার ছিল না আমি আর কখনো ফিরে পাইনি। ঐসব কাগজপত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম। কারণ তা ছিল আন্দোলন সম্পর্কিত কাগজপত্র। এই জালিমগণ আমার ব্যক্তিগত এমন সব ফাইল-পত্র বাজেয়াপ্ত করে যেগুলোতে বিভিন্ন মক্কেলের কেইস ছিল। আর ঐ ফাইলগুলো আমি উচ্চ আদালতে পেশ করার জন্য তৈরী করে রেখেছিলাম। আন্দোলন বিষয়ক কাগজপত্র হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া কোন সাধারণ ক্ষতিকর ব্যাপার ছিল না। যারা এসব কাগজপত্র নিয়ে গেছে এগুলো দ্বারা তাদের কি লাভ হবে। তাদেরকে এমন সব কাকের সাথে তুলনা করা যায় যা সাবানের কেইস তুলে নিয়ে যায় এবং তার ওপর ঠোকর মারতে থাকে। কিন্তু তা খেয়ে উদরপূর্তি করতেও পারে না। আবার তার মালিককেও ফেরত দেয় না যাতে সে উপকৃত হতে পারে। আহমক লোকদের আচরণ এরূপই হয়ে থাকে। তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্যরাও যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেজন্য সদা তৎপর থাকে।

অতীত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

ইসলামী হুকুমাত নবী করিম (সা)-এর আমলে এবং খেলাফতে রাশেদার সময়ে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাকে তখন সমগ্র দুনিয়ায় ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। তার আতঙ্কে দুশমনদের অন্তর সদা কম্পমান থাকতো তারপর আসে পতন যুগ। ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহর ওপর দুর্বলতা ও অলসতা

www.amarboi.org

জেঁকে বসে। কালের আর্বতন আবার জগদ্বাসীকে এমন দিনের মুখোমুখি করে দেয় যখন আমাদের কোন মর্যাদা ও সম্মান এবং কোন মূল্য ও গুরুত্ব বিশ্বের জাতিগুলোর মাঝে আর অবশিষ্ট থাকেনি। আজ আমরা মহান আমানত ও উত্তরাধিকারকে বহন করার ক্ষমতাও রাখি না। আমরা আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। ইহুদী, খৃস্টান ও কমিউনিস্টরা আমাদের মাঝে বুক টান করেছেন। অধপতনের এ যুগে আল্লাহ্ তায়ালা শহীদ হাসানুল বান্নাকে তাওফিক দিয়েছিলেন উম্মাতকে সংগঠিত করতে। ফলে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বুনিয়াদ রচনা করেন এবং সংগঠন অইসলামী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করার জন্য কোমর বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। ইখওয়ান এই ফায়সালা গ্রহণ করে ধ্বংসাত্মক সকল মতবাদের মূলোৎপাটনের এবং উম্মাতে মুসলিমার হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার।

মৌলিক ও সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী

এই আন্দোলনের সাহায্যে ইমাম শহীদ দু'টো মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করেন। তার একটা হচ্ছে, মিল্লাতে ইসলামীয়াকে সকল বিদেশী বিজাতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে প্রকৃত আযাদীর ধারণার সাথে পরিচিত করে দেয়া। আর অপরটা হচ্ছে, স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যা পরিপূর্ণরূপে কুরআনী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দু'টি মৌলিক উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের আরো কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। যেমন ঃ

আমরা নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। অভাব ও দারিদ্র এবং অজ্ঞতা এবং সকল প্রকার রোগ ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে চাই। আমাদের লক্ষ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই যে, আমরা এমন মুসলিম সমাজ সৃষ্টি করতে চাই যেখানে উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তি ইজ্জত ও সম্মানের যোগ্য ও উপযুক্ত বিবেচিত হবে এবং সমাজ সামগ্রিকভাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথিকৃতরূপে গড়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছি তা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিম্ন বর্ণিত তিনটি শিরোনামে উপস্থাপন করছি ঃ

১-বলিষ্ঠ ঈমান।

২-মজবুত সংগঠন।

৩-অবিশ্রান্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টা।

ইখওয়ানের দাওয়াতের কিছু অতিরিক্ত মূলনীতিও রয়েছে। কিন্তু এটা কতই না দুঃখজনক বিষয় যে, যেসব লোকের পক্ষ থেকে ইখওয়ানের সাহায্য-সহযোগিতার প্রত্যাশা ছিল তারাই ইখওয়ানের বৈরিতা ও বিরোধিতায় তৎপর হয়ে ওঠে। ইখওয়ানের দাওয়াত আসলে কি ? এ ছাড়া তো আর কিছুই নয় যে, প্রত্যেক মুসলিম তার হৃত গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাক। এতদসত্ত্বেও কতিপয় মুসলিম ও আহলে ইলম আমাদের পথে কাঁটা বিছাতে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সদা তৎপর। তা সত্ত্বেও কোন বিরোধিতার পরোয়া আমাদের নেই। কোন প্রতিবন্ধকতা আমাদের অগ্রযাত্রাকে

www.amarboi.org

প্রতিহত করতে পারে না। এই দাওয়াতের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট এবং তিনি সকল ব্যাপারে পুরোপুরি ক্ষমতাবান। আমাদের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং প্রবৃত্তিগত লালসা চরিতার্থ করার মনোবৃত্তি এই আন্দোলন ও দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। দ্বীনের মহাজন এবং আল্লাহর আয়াত বিক্রেতার যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াক। আমরা আলহামদুলিল্লাহ তাদের সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

মু'মিনসুলভ বিচক্ষণতা

ইমাম হাসানুল বান্নার মু'মিনসুলভ দূরদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য করুন। ইখওয়ানের দাওয়াত যখন খুব জোরেশোরে প্রসার লাভ করছিলো এবং প্রতিদিন অসংখ্য ব্যক্তি এই সংগঠনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছিল। অত্যাচার-উৎপীড়নের ন্যূনতম কোন লক্ষণও কোন দিকে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না। তখনও তিনি ইখওয়ানকে এই অসীয়ত করেছিলেন যে, কঠিন ও দুরতিক্রম্য বাধাসমূহ তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। এবং পরীক্ষার সময় অবশ্যই আসবে। ইখওয়ান কোন সাধারণ রাজনৈতিক দল কিংবা কল্যাণমূলক সংগঠন নয়। তোমাদের অস্তিত্ব বাতিলের চোখে বিষদৃশ লাগবে। তোমরা একটা নতুন জীবনী শক্তি যারা আল-কুরআনের জীবনদায়ী পয়গামকে উম্মাতের মৃত শরীরে প্রবিষ্ট করাতে চাও। তোমরা এমন এক আলো যার দীপ্তি মা'রেফাত ইলাহী থেকে লব্ধ। অন্ধকারের বক্ষ এই আলোর প্রভাবে বিদীর্ণ হচ্ছে এবং আশার কিরণচ্ছটা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তোমরা নব বসন্তের এমন আহবান যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত পুনরুজ্জীবিত করছে। তোমরা একটা অতিগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছো। যখন অন্য লোকেরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। শীঘ্রই তোমাদের ওপর কঠিন ক্রান্তিকাল এসে পড়বে। যখন জিজ্ঞেস করা হবে। তোমাদের এ দাওয়াত কিসের? তখন জওয়াব দিবে আমরা সেই দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি যা নিয়ে আগমন করেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। সরকার এই দ্বীনেরই অন্যতম অংশ। যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, এটা তো রাজনীতি। তখন তোমরা প্রত্যুত্তরে বলবে যে, এটাই ইসলাম যার মধ্যে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। তোমাদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা বিপ্লবের আহবায়ক। তখন জবাবে বলবে যে, আমরা সততা ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী। এই সততার ওপর রয়েছে আমাদের পরিপূর্ণ ঈমান এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের ইজ্জত ও সম্মান। বাতিলের অনুসারী ও তাগুতের অনুগামীদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে যে, যদি তোমরা আমাদের ওপর হাত তোল এবং আমাদের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তাহলে জেনে রাখ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিজেদের এবং আমাদের দাওয়াতের প্রতিরক্ষার অধিকার প্রদান করেছেন। যদি এরূপ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, তোমরা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকো। তাহলে তোমরা বলে দেবে, "আমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং তার সাথে যাকেই আমরা ভুলক্রমে ও অজ্ঞতাবশত শরীক বানিয়ে নিয়েছিলাম তাকে সুস্পষ্টভাবে

www.amarboi.org

প্রত্যাখ্যান করছি।" জালিম যদি কোন কথায়ই কর্ণপাত না করে এবং অন্ধভাবে শত্রুতা করার জন্য ব্রতী হয় তবে তাদের বলে দাও তোমাদের প্রতি সালাম আমরা মূর্খদের সাথে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতে চাই না।"

এই বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের কঠোর হস্তক্ষেপ রহস্যময়

সুধী পাঠক। আপনি কি এই অসীয়তের শব্দাবলী ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেছেন ? এবার অনুমান করুন যে মর্দে মু'মিনের ভবিষদ্বাণী ও দূরদর্শিতা এবং অনাগত কালে প্রকাশিতব্য ঘটনাবলীর ওপর তার সুচিন্তিত দৃষ্টিভংগী এক একটা শব্দ দ্বারা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের জীবনে এমন সব জিনিস পরিদৃষ্ট হয়েছে যেগুলোর প্রতি ইমাম ইংগিত করে ছিলেন। অত্যাচার নির্যাতনের ষ্টিমরোলারে ইখওয়ান একাধারে ফারুক, জামাল আবদুন নাসের ও সাদাতের আমলে মর্মান্তিকভাবে নিষ্পিষ্ট হয়েছে। ইখওয়ানের ওপর জুলুম-নিপীড়নের এমন পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছে যে, কারো অন্তরে তিল পরিমাণ ঈমান ও আল্লাহভীতি থাকলে সে এই মর্মন্তুদ অত্যাচার কোন প্রাণীর ওপর চালানোর কল্পনাও করতে পারতো না। আমাদেরকে এমন সব কষ্ট দেয়া হয়েছে যার উপযুক্ত হতে পারে এমন লোক যে কারো ধন-সম্পদ লুট করে নিয়েছে। কারো ইজ্জত-আবরুর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে কিংবা কারো বাপ, ভাই ও ছেলেকে হত্যা করেছে। আমরা এ ধরনের কোন্ অপরাধে অপরাধী ? উপরোক্ত অপরাধে অপরাধীদের যে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে আমাদের ওপর তার চেয়েও বেশী অত্যাচার করা হয়েছে। এই জালিমদের অত্যাচার-উৎপীড়নের সম্মুখে অসুরের বর্বরতা, নেকড়ের রক্তপিপাসা, বাঘের হিংস্রতা এবং গভীর অরণ্যে সংঘঠিত কোন হিংস্র প্রাণীর হিংস্রতাও তার তুলনায় তুচ্ছ। এর কারণ কি ? আমি এর কারণ বর্ণনা করতে অক্ষম। এ লোকগুলো কি কাফের ছিল ? যারা আমাদের ওপর উৎপীড়নের একশেষ করেছে তারা কি কাফের। না আমরা তো তাদেরকে কাফের বলি না। তাহলে তারা কি তাদের প্রভুদের খুশী করার জন্য এসব করেছিলো ? মা বিশ্বস্ততা ও বর্বরতা একই অন্তরে কিভাবে একত্রিত হতে পারে ? তবে কি তারা ইস-লাম দুশমনদের ভাতা খোর এজেন্ট ছিল। প্রতিটি অত্যাচার-উৎপীড়নের মহড়া দেয়ার সাথে সাথে তাদের ভাতা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো ? এমন নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত মানবতার রূপ পরিগ্রহ করার অভিযোগ তো আমরা আরোপ করতে পারি না। তবে এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তারা এসব করলো কেন ? এর যথার্থ উত্তর এবং জ্ঞান আমার রবের নিকটই রয়েছে। কালের বিবর্তনে সময়ে সময়ে এ রহস্যের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে দিচ্ছে যা বহুদিন ছিল মানুষের অজ্ঞাত-অজানা।

জুলুমের দানব ও ধৈর্যের পাহাড়

ইমাম শহীদ যেসব আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়। ইখওয়ানদের বন্দী করা হয় এবং ইমাম একাই জেলখানার বাইরে থেকে যান।

www.amarboi.org

ইমামকে তার সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর সরকার তার নিকট থেকে তার লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্র ফেরত নিয়ে নেয়। এর অব্যবহিত পরই তাঁকে প্রতারিত করে গুলী করে শহীদ করা হয়। সর্বস্তরের জনগণকে ইখওয়ানের ওপর পরিচালিত সরকারের নির্যাতনের অবস্থা জেনে নেয়া দরকার। সরকার শুধু মাত্র লাঠি, গুলী, জেল ও ফাঁসির শাস্তিই আমাদের দেয়নি বরং প্রচার ও প্রোপাগান্ডার সমস্ত উপায়-উপকরণের কামান দেগে তা আমাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আরোপ করা হয় এবং তা ফলাও করে প্রচার করা হয়। মিসরে কোন কারণে কারো হাতে কোন মন্ত্রী কিংবা কোন গুরুত্ব পূর্ণ সরকারী আমলা নিহত হলে অপবাদ চাপানো হতো ইখওয়ানের ঘাড়ে। এবং প্রোপাগান্ডার এমন তুফান সৃষ্টি করা হতো যা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কিন্তু ইমাম হাসানুল বান্নার পদাঙ্ক অনুসরণে কিংবা সরকারী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শহীদ আবদুল কাদের আওদা, শহীদ ইবরাহীমুত তীব ও ইউসুফ তালায়াত শহীদের নির্দয় হত্যাকান্ড সরকার যার প্লট তৈরী করেছিল একটা মনগড়া কাহিনী এবং হত্যাকান্ডের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে কিংবা পরবর্তী সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইউসুফ হাওয়াশ শহীদ এবং তাদের অন্যান্য সংগীগণকে বিনা অপরাধে প্রদত্ত ফাঁসির সংবাদ জনগণের নিকট পৌঁছতে দেয়া হয়নি। হাজার হাজার ইখওয়ানকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে জিন্দানখানার অভ্যন্তরে আটক করে রাখা হয় অথচ দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের ব্যাপারে পূর্ণনীরবতা অবলম্বন করে থাকে। এটা কত বড় জুলুম ও নির্বিচার অবস্থা যে নিরপরাধ এবং মূল্যবান জীবনসমূহকে ধ্বংস করা হয়েছে। অথচ সংবাদপত্র ও রেডিও আকারে ইংগিতে কিংবা পরোক্ষভাবেও তার কোন উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। কিন্তু সত্য কি এভাবে চাপা পড়ে থাকে ? না তা কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা এই ফায়সালা দিয়ে রেখেছেন যে, জালিমদের কুৎসিত চেহারার ওপর থেকে অবশ্যই পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এই মানবরূপী হায়েনাদের নৃশংসতা সম্পর্কে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হয়ে যাবে। তাই এখন রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হতে চলেছে।

নিম্নে পতিতদেরও নিম্নতম

মিসরীয় ভূ-খন্ডে আহলে হকের ওপর যে জুলুম করা হয়েছে বিদগ্ধ পাঠকগণের সমীপে কোন ভাষায় সে মহাতান্ডবের আলোচনা করবো। ইখওয়ানের সাথীদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাদের হায়েনাদের নির্দেশ দিয়েছিলো তারা যেন এখন ধীরে সুস্থে জুলুমের পূর্ণতা সাধন করে। অথচ পাষন্ডগণ করেছে কি ? কয়েদীদের হত্যা করেছে ? না, তা নয়। তারা যদি আমাদের শরীরের মাংস খুবলে খেতো এবং আমাদের জীবন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করতো তাহলেও তা হতো আমাদের জন্য খুবই সাধারণ। তারা ইখওয়ানের চোখের সামনে তাদের গৃহের পূত-পবিত্র ও পূর্ণাত্মা পর্দানশীন গৃহিণী, বোন ও মেয়েদের ইজ্জত আবরু ভূলুণ্ঠিত করে !!! এ বর্বর ও নারকীয় অভিযানের সময় আনন্দের আতিশয্যে তালি বাজানো হতো। অট্টহাসিতে

www.amarboi.org

ফেটে পড়তো এবং অত্যন্ত নির্লজ্জ ভংগীতে অশালীন সমালোচনা করতো ও টিপ্পনী কাটতো। আহ ! এ ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পূর্বে যদি জমিন বিদীর্ণ হয়ে যেতো কিংবা আসমান ভেংগে পড়তো।

এই ছিল সেই সময়ের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার। ক্ষমতার মসনদে সমাসীন এসব লোক তাদের পূর্বসূরীদের মত সুযোগ পায় তবে তারাও তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে একই ভংগীতে চলতে থাকবে।

অবশ্যই আখেরাতের আযাব খুবই অপমানকর

ইখওয়ানের ওপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার পরিচালনাকারীরা আমাদের চোখের সামনেই তাদের জঘন্য পরিণামের মুখোমুখি হয় আর এখন তারা শিক্ষণীয় নিদর্শন ও প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। হামজা আল বাসিউনী, আবদুল লতীফ এবং অদের হিংস্র পশুর চরিত্র সাথীরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহাপ্রভুর কঠোর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি। দুনিয়াতেই চরম অপমানজনক আযাব তাদের গ্রাস করে ফেলে। আখেরাতের আযাব তো আরো বেশী ভয়াবহ ও লাঞ্ছনাকর। এরা ক্রমাগতভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতো। ইখওয়ানের ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যদি ইখওয়ান সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তাদের থেকে পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এ কারণে সেই হতভাগাদের আকাংখা ও প্রচেষ্টা ছিল ইখওয়ানের নাম নিশানাও মুছে ফেলা। ইখওয়ান সম্পর্কে তাদের এ ধারণার কারণ হলো, তারা আমাদেরকেও তাদেরই নিক্তিতে পরিমাপ করতো। অথচ আমাদের সুচিন্তিত নীতি ছিল এই যে, কারো সাথে আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। আমাদের ওপর যে জুলুম চালানো হচ্ছে তা মূলত আল্লাহর দ্বীনের সাথে দুশমনী ও শত্রুতার কারণেই। আমরা যদি কারো নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণও করি তা হলে তা এতবেশী কঠিন হতে পারে না। যতটা হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রতিশোধের পরিমাণ। অতএব আমরা সমস্ত জালিমের মোকদ্দমা আল্লাহর আদালতে সোপর্দ করে দিয়েছি। إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও খুবই কঠোর)।

প্রীতি ও সৌহার্দ্যের শাহাদাত গাহ

ইখওয়ানের চিন্তাধারা খাঁটি ইসলামী নীতিমালা ও আকীদা-বিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল। অনৈসলামী আদর্শ ও মতবাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম শহীদ তাঁর দাওয়াতের সংক্ষিপ্তসার এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"ইখওয়ানের দাওয়াত লোকদেরকে ইসলামের ইলম ও আমলের ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করানোর প্রয়াস মাত্র।"

মুসলিমদের অধপতন ও পশ্চাতপদতা এবং শাসিত ও বঞ্চিত হওয়া দেখে ইমাম শুধু একাই বেদনাহত হয়ে পড়েননি বরং এমন প্রতিটি ব্যক্তিরই এ জন্য বেদনাহত হয়ে পড়ার কথা যার অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও

www.amarboi.org

ছিল—সে-ই এ অবস্থা দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেনি। ইমামের মনে যখন এই অবস্থা সংশোধনের চিন্তা জেঁকে বসে তখন আর তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারেননি। তিনি দেশ ও জাতির কর্ণধারদের কাছে গিয়ে তাদেরকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করান। তিনি সমগ্র মিসরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে ও মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। এবং প্রত্যেকের দ্বারে গিয়ে ধর্ণা দেন। এই প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে তিনি সর্বস্তরের জনগণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। কিছু সংখ্যক লোক অত্যন্ত কঠোরভাবে নেতিবাচক সমালোচনা করে তাকে নিরুৎসাহিত করার প্রয়াস পায়। কেউবা এ কাজের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সন্তর্পনে অগ্রসর হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সত্য পথের পথিক কি এতে কখনো হিম্মত হারিয়ে ফেলে কিংবা এ মহতী কাজ থেকে হাত গুটিয়ে বসে যেতে পারে?

প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টির এ ধারণা বড়ই ঈমান প্রবৃদ্ধিকর ও লোভনীয় ছিল। গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আহমদ তৈমুর পাশা মরহুমের সাথে তিনি যখন মিলিত হন এবং তাঁর প্রোগ্রাম পেশ করেন তখন তিনি এই প্রোগ্রামের সফলতার জন্য বড়ই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করতে থাকেন। ইমামের সহপাঠি ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য থেকেও যারা তাৎক্ষণিকভাবে দাওয়াতে হক গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন উস্তাদ আহমদ আস সুকরী, শাইখ হামিদ আসকার মরহুম এবং শাইখ আহমদ আবদুল হামিদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা ইমামের নিকট অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং শপথ করেছিলেন যে তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এবং সমাজের প্রত্যেক মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামের রংগে রাঙ্গিয়ে তুলবেন। তারা সবাই ছিলেন ইসমাঈলিয়ায় ইমামের ঘনিষ্টতম বন্ধু।

মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি

অনন্তর কালের আবর্তন এ চার অকৃত্রিম বন্ধুকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দেয় এবং পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে প্রত্যেকে জীবিকার সন্ধানে ইসমাঈলিয়া ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপন করেন। ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম বীজ বপন করা হয় ইসমাঈলিয়ায় ১৩৪৭ হিজরীর জিলকাদ মাসে। এ শহরেই আন্দোলন তার মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকেরই এটা জেনে নেয়া উচিত যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন—

১–সালফে সালেহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে কাজ করে থাকে।

২–কর্মপদ্ধতি একান্তভাবে সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোতাবেক। এমনকি এ আন্দোলন তার আমল ও হাদীসের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ কখনো গ্রহণ করে না।

www.amarboi.org

৩–এ আন্দোলনের দৃষ্টিতে তাসাউফের অর্থ আত্মার পরিশুদ্ধি ও ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ এবং সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষিতা এবং একনিষ্টভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। কোন সৃষ্টিকে ভয় না করা এবং কারো নিকট থেকে কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করাই আমাদের তাসাউফ।

৪–এটা একটা রাজনৈতিক সংগঠন—যার উদ্দেশ্য সরকার ব্যবস্থার সংশোধন এবং উম্মাতে মুসলিমার ইজ্জত ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা। সাথে সাথে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহভুক্ত অন্যান্য দেশের সাথে আদল ও ইনসাফ এবং সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

৫–আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংগে সংগে শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে।

৬–শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭–অর্থনৈতিক জীবিকাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮–সামাজিক ব্যধিসমূহের প্রতিবিধানের জন্য সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা।

* এগুলো ছাড়াও এ দাওয়াতের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ

(ক) বিতর্কিত বিষয়সমূহ পুরোপুরি এড়িয়ে চলা।

(খ) ব্যক্তিত্ব পূজার ব্যাপারে সকর্ততা।

(গ) দলাদলী ও মতভেদ থেকে বিরত থাকা।

(ঘ) দাওয়াতী কাজের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং পর্যায়ক্রমিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা।

(ঙ) বক্তৃতা বিবৃতি এবং প্রচার প্রসারের ওপর বাস্তব কাজের বেশী গুরুত্ব প্রদান করা।

(চ) যুবক শ্রেণীর মাঝে দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য প্রচন্ড আকাংখা সৃষ্টি করা।

(ছ) শহর ও গ্রামে তীব্র গতিতে দাওয়াতের ব্যাপ্তি ঘটানো।

প্রথম প্রথম ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর পুরোপুরি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। তারপর আসে দাওয়াতের দাবীকে বিবেচনায় রেখে পয়গামকে সাধারণ জনগণের নিকট পৌছানো, দাওয়াতের সহযোগীদের নির্বাচন, দাওয়াতী গ্রুপ তৈরী এবং তার শ্রেণী বিন্যাসের দিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার পর্যায়। এরপর আমরা দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি এবং এই স্তরে নিম্নোক্ত কর্মনীতি অবলম্বন করা হয় ঃ

১–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সেগুলোর মাধ্যমে পারস্পরিক পরিচিতি ও আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা দীক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়।

২–স্কাউট ও ক্রীড়া সংগঠন এবং তার সাহায্যে শারীরিক প্রশিক্ষণ নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং নির্দেশ পালন ব্যবস্থা কার্যত কসরত, নিয়মানুবর্তিতা দৃঢ় করা।

www.amarboi.org

৩–পাঠচক্র ইখওয়ানের স্কুল ও ক্লাবগুলোতে ইসলামী বিষয়াবলীর ওপর নিয়মিত আলোচনা অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

ইমাম শহীদের পয়গাম

আমি এখনো ইমাম শহীদের কণ্ঠ শুনতে পাই। এ কণ্ঠ সর্বদা আমার কানে ধ্বনিত হয় এবং ইমামের ঈমান উদ্দীপক পয়গামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে ইখওয়ানকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে ছিলেন। ইমাম শহীদ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ওপর যেসব মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে এসব দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য সেসব অবান্তর ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার বাতুলতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেছেন ঃ

"হে ইখওয়ানুল মুসলিমুন ! বিশেষ করে সেইসব সাথীগণ ! যারা অধিকতর উৎসাহী এবং ত্বরিৎ ফলাফলের প্রত্যাশী। আপনারা শুনে রাখুন। আমি খুবই কাজের একটা কথা আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি। আজ আপনাদের এই মহতী সমাবেশে আমি সুউচ্চ এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক পরশমণির সন্ধান দিতে চাই। আপনাদের এই পথ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এর সীমানা ও মনযিল সবই বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এই সীমানা যা আমি বুঝে শুনে গ্রহণ করেছি এবং যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আমার মানসিক প্রশান্তি রয়েছে। আমি কখনো তার বিরুদ্ধাচরণ করবো না। এ রাস্তা দীর্ঘ ও কঠিন বটে। কিন্তু সঠিক পথ মাত্র এটাই। মনযিলে মাকসুদে পৌঁছার জন্য এটা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা আর নেই। তাড়াহুড়া এবং অতিমাত্রায় আবেগের নাম পৌরুষ নয় বরং প্রকৃত পৌরুষ হচ্ছে ধৈর্য ও দৃঢ়তা। গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। অতএব আপনাদের মধ্যে যে হাতের তালুতে সরিষা জমানোর শখ রাখে তার জেনে রাখা উচিত যে, এ আন্দোলন তার জন্য নয়। পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই যে ফল ছিঁড়ে নিতে চায় এবং প্রস্ফুটিত না হতেই ফুল নিয়ে খেলতে চায় আমার সাথে তার কোন বনি-বনা হতে পারে না। এমন ব্যক্তির জন্য আমার অকপট নসীহত এই যে, সে যেন এ আন্দোলন ছেড়ে অন্য কোন সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে যায়। হে মহাসম্মানিত দ্বীনি ভাইয়েরা, যে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আমার সংগে নির্দিষ্ট পথে চলতে প্রস্তুত তার জেনে নেয়া উচিত যে, সর্বপ্রথম বীজ বপন করা হয়, তা থেকে অঙ্কুরোদগম হয় এবং ধীরে ধীরে চারা গাছ বেড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট সময় এবং কঠোর পরিশ্রমের পর তাতে ফুল ফোটে এবং ফল ধরে। আরো অপেক্ষার পর ফল পাকে এবং তারপর সেই ফল আহরণ করার সময় আসে। যিনি এ মূলনীতি হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করে নিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর পথ চলা জারি রাখা উচিত। তাঁর প্রতিদান ও প্রতিফল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মুহসীনগণের পুরস্কার কখনো বিনষ্ট করেন না। তাই আমাদেরকেও তিনি পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করবেন না। এ পারিশ্রমিক বিজয় ও সফলতা রূপেও প্রদান করা হতে পারে আবার শাহাদাতের গৌরবদীপ্ত খেলায়া'ত রূপেও দেয়া যেতে পারে।"

www.amarboi.org

এভাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার পরও কি তাদের ভ্রান্ত কথার আর কোন গুরুত্ব থাকে। যারা ইমাম ও তার পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আরোপ করতে কোন প্রকার লজ্জাবোধ করে না ? এরা আমাদের শত্রু নয় বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দাস এবং দাওয়াতে রব্বানীর শত্রু। মোটকথা আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলতে চাই যে, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার সম্পর্কে জনসাধারণ খুব ভালভাবেই অবহিত হয়ে গেছে এবং ইখওয়ানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে সম্যক অবগত হয়েছে। তার প্রমাণ ইখওয়ানের কাজ তীব্রগতিতে প্রসার লাভ করছে এবং প্রতিদিনই নতুন নতুন শাখা উপশাখা খোলার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

হাসানুল বন্না শহীদের শিক্ষা শুধু মাত্র বইয়ের পাতার সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করেনি। বরং তিনি তার চলাফেরায় সবসময় সর্বত্র শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রতি অনুরাগী লক্ষ লক্ষ যুবক এসব শিক্ষার সাহয্যে হাসানুল বান্নার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং দুনিয়ার কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করতে থাকেন। এ শিক্ষা এতই কার্যকর ও মর্মস্পর্শী যে, তার মোকাবিলায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী টিকতে পারে না। তিনি যত বড় বড় ডিগ্রীর অধিকারী হোন না কেন। এসব নাম সর্বস্ব চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও পন্ডিতদের নেতৃত্বের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং দাওয়াতে ইসলামীর কাজ তাদের আকাংখা সত্ত্বেও অত্যন্ত বিদ্যুৎ গতিতে প্রসার লাভ করছে। এখন মুসলিম নওজোয়ানগণ এ পথে আত্মনিয়োগ করেছে। কারণ, এতে নিহিত রয়েছে তাদের ইহকালীন কল্যাণ এবং এটিই তাদের পরকালীন মুক্তির চাবিকাঠি।

ভারসাম্য পূর্ণ ব্যক্তিত্ব

সুধী পাঠক ! আপনারা আল্লাহর সেই অলীর বাণী শুনুন যিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞানের আলোকে বলেছেন ঃ

"হে ইখওয়ানুল মুসলিমুন ! আপনারা আবেগ উচ্ছাসকে বিবেক ও সতর্কতার শৈত্যের সাথে পরিচিত করিয়ে দিন। বুদ্ধি ও দলিল-প্রমাণের বাতিকে আবেগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা আলোকিত করুন। সবর্দা ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করুন। যুক্তিবাদিতার স্রোতে প্রবাহিত হয়ে বরফের বরফখন্ড হয়ে যাবেন না। কিংবা আবেগের ঝঞ্ঝার উড়ন্ত অগ্নিশিখার রূপ পরিগ্রহ করবেন না। কল্পনাকে বাস্তবতা ও যথার্থতার কষ্টিপাথরে পরখ করে নিন। সত্যকে আপনার নবীন চিন্তাধারা উন্নত ধ্যান-ধারণা থেকে সহজবোধ্য ও সাদামাটা ভংগীতে পেশ করুন। কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে অপরদিক থেকে পরিপূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উদাসীনতার নীতি কখনো গ্রহণ করবেন না। প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে সংঘাতের চিন্তা কখনো পোষণ করবেন না। কেননা তা ধ্বংসের কারণ হবে। তবে হাঁ কুদরতের সৃষ্টি রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করুন। সেগুলোর আনুগত্য আদায়ের কুরআনী শিক্ষাকে বাস্তবে রূপদান করুন এবং ঐসব সৃষ্টিকে মানবের খেদমতের জন্য ব্যবহার করুন। পুরোপুরি প্রস্তুতি ও চেষ্টা-সাধনা করার পর গিয়ে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের জন্য প্রত্যাশা করুন। তখন তা বেশী দূরের ব্যাপার হবে না।"

www.amarboi.org

এই সুস্পষ্ট বিবৃতির পরও প্রবৃত্তির পূজারীরা এ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে থাকে। আমরা তাদের কোন পরোয়া করি না। আল্লাহর রহমতে আমরা আমাদের ওপর আরোপিত এসব অভিযোগ থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাদের ব্যাপারে ফায়সালার ভার আমরা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করছি।

শক্তি অর্জন ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন

আমাদের ওপর যদি এ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা গদী দখল ও শাসন ক্ষমতা হাসিলের জন্য লালায়িত তাহলে আমাদের জবাব হচ্ছে প্রথমত এ দাবী আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য নয় বরং তা উম্মাহর কল্যাণ ও সম্মানের জন্যই। দ্বিতীয়ত, ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমতা লাভ করা কোন নিষিদ্ধ বৃক্ষ নয় বরং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ঃ ......واعدّوا অর্থাৎ দুশমনদের মোকাবিলার জন্য তোমরা সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকো --------। আমরা এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি। আমাদের দৃষ্টিভংগী ভাসা ভাসা চিন্তা-ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা কখনো আবেগ তাড়িত হয়ে ফায়সালা গ্রহণ করি না। আমরা খুব ভাল করেই জানি যে, ক্ষমতার কয়েকটা স্তর ও পর্যায় রয়েছে।

ক্ষমতার সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আকীদা ও ঈমানের শক্তি। তারপর ঐক্য এবং একতার শক্তির স্থান। উম্মাতের ঐক্য ব্যতীত ক্ষমতা লাভের কোন কল্পনাই আমরা করি না। কবির ভাষায়ঃ

ব্যক্তি টিকে থাকে জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যমে, একা সে কিছুই নয়।
সাগরে থাকে তরঙ্গমালা, সাগরের বাইরে নয়।

ক্ষমতার চূড়ান্ত স্তর এবং সকল ব্যথার দাওয়াই হচ্ছে, বাহুবল ও অস্ত্রের শক্তি। মনযিল পর্যন্ত পৌছার জন্য প্রথমে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হয়। গৃহের ছাদে আরোহণ করার জন্য সিড়িঁর প্রথম ধাপ থেকেই সূচনা করা হয়ে থাকে। যদি প্রথম ধাপ অতিক্রম না করেই কেউ শেষ ধাপের ওপর পা রাখতে চায় তাহলে তার ফলাফল ব্যর্থতা ও পরাজয় ব্যতীত আর কি হতে পারে? ইসলাম ক্ষমতা হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অন্ধভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের কোন অনুমতি ইসলাম প্রদান করে না।

প্রিয় দেশ অন্ধভাবে ক্ষমতার ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যহীন বিপ্লবের মজা ভাল-ভাবেই ভোগ করেছে। এসব বিপ্লব সমস্যা ও জটিলতা ছাড়া আমাদেরকে কি দিয়েছে? লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইখওয়ান কখনো অন্ধভাবে শক্তি প্রয়োগ করার চিন্তা করেনি। কিংবা এ প্রক্রিয়াকে প্রকৃত পরিবর্তনের উপায়ও মনে করেনি।

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক ব্যাপারেও ইসলাম মানুষকে পুরোপুরি দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে এবং এর কোন দিক ও বিভাগ অন্ধকারে ছেড়ে দেয়নি। ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ইসলামী অর্থনীতির সার সংক্ষেপ নিম্নোক্ত মৌলিক দফাগুলোতে উপস্থাপন করেছেন ঃ

১–সম্মানীত জীবনের জন্য হালাল জীবিকা অত্যাবশ্যক। এ জন্য জীবিকা অর্জনের চেষ্টা এবং হালাল উপার্জনকে পরিকল্পিতভাবে মূলধন গঠনে বিনিয়োগ করা অতিব জরুরী।

২–স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কাজ করা এবং জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া বাধ্যতামূলক।

৩–প্রাকৃতিক উপকরণসমূহ অনুসন্ধান এবং যে সমস্ত খনিজ সম্পদ ও শক্তি বিদ্যমান তা থেকে পুরোপুরি উপকারিতা লাভ করা।

৪–হারাম উপার্জনের সকল ছিদ্রপথ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

৫–ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। ধনীরা যেন কারুণের মত না হয়ে যায় এবং গরীব ভুখা-নাংগা জীবনের অসহায় শিকার না হয়ে পড়ে।

৬–প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান এবং যথোপযুক্ত জীবিকার সাথে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান।

৭–কল্যাণকর ও মংগলজনক কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাকে আবশ্যিক নীতি বানাতে হবে। এবং নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে হবে।

৮–জনস্বার্থের পরিপন্থী না হলে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার এবং তা হিফাজতের গ্যারান্টি দিতে হবে।

৯–আর্থিক বিষয় ও আর্থিক লেন-দেনকে ন্যায়ানুগ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা এবং এ ব্যাপারে সহৃদয়তা ও দূরদর্শিতার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষত নগদ লেন-দেনের ক্ষেত্রে।

১০–সরকারকে এই অর্থনৈতিক বিধান কার্যকরী ও হিফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সব সংশয়ের সমাধান এবং সব জটিলতার চাবিকাঠি

ইমাম এই দফাগুলোকে শুধু টেক্‌নিকেল রূপে ও সীমিত পরিসরেই যে বর্ণনা করেছিলেন তা নয়, বরং প্রত্যেক দফার বিশদ বিবরণও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। যাতে প্রত্যেক সত্যতা যাচাইকারী কিংবা এই আদর্শের বাস্তবায়নকারী কোন প্রকার অস্পষ্টতায় পতিত না হয়। তিনি এগুলোর বাস্তব উদাহরণও পেশ করেছিলেন। যাতে কেউ কথা বলতে না পারে যে, এ নীতিমালা অনুসারে কাজ করা

www.amarboi.org

অসম্ভব। তিনি স্বাধীনভাবে পুঁজি বিনিয়োগ, কোম্পানীসমূহের পরিকল্পনা, শিল্পের কর্মতৎপরতা ও মূলনীতি, মালিকানা নীতি, ট্যাক্স আরোপ ও সংগ্রহ নীতি, সুদী ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, কুটির শিল্পে উৎসাহ প্রদান, বিলাস সামগ্রী নিরুৎসাহিত করণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাপক সহজ লভ্যতা সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এতদসত্ত্বেও প্রায়ই শুনা যায় যে, ইখওয়ানের কাছে সমস্যার কোন সমাধান নেই।

ব্যাপকভিত্তিক ঘোষণাপত্র ও বাস্তবায়ন যোগ্য কর্মসূচী

প্রকৃতপক্ষে মিসরে ইখওয়ান এমন একটি সংগঠন যার নিজস্ব বিস্তারিত কর্মসূচী রয়েছে। অপর কোন দল বা সংগঠনই এ ব্যাপারে ইখওয়ানের সমকক্ষ নয়। যদি থাকে তাহলে কেউ প্রমাণ পেশ করুক। আমাদের নিকট এমন রোগীর কি চিকিৎসা থাকতে পারে যে তার রোগের কারণে মিঠা পানিকে লবণাক্ত বলে মনে করে এবং একথা মানতে রাজি নয় যে, তার মুখের রুচীই বিগড়ে গেছে পানির বৈশিষ্ট্য নয়। দিনের আলোতে চামচিকা ও পেঁচার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। কিন্তু এদ্বারা কি সূর্যের অস্তিত্বহীনতা প্রকাশ পায়? কবির ভাষায়ঃ

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم
چشمۂ آفتاب را چہ گناہ

বাদুর ও চামচিকা দিনের বেলায় যদি চোখে দেখতে না পায়
তজ্জন্য সূর্য্যের দীপ্তির কি ইবা আসে যায়?

আল্লাহর আইন

পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানব রচিত সকল আইন-কানুন অপেক্ষা ইসলামী আইন-কানুন অধিকতর ব্যাপক, কল্যাণ ধর্মী ও বাস্তবসম্মত। এ আইনে কোন প্রকার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। কারণ এটা মানব রচিত নয় বরং সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং সকল কল্যাণের আধার। এ কানুনে কোন প্রকার পশ্চাদপদতা রক্ষণশীলতা ও নির্বুদ্ধিতা নেই। এর মধ্যে জ্ঞান, উন্নতি, অগ্রগতি, গৌরব, আহকামের সূক্ষ্মদর্শিতা সমস্যার সমাধান করার যোগ্যতা, উদার দৃষ্টি এবং চরম ঔদার্য পরিলক্ষিত হয়। সকল যুগে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স, আলেমগণের সমাবেশ এবং মুজতাহিদের ইজতিহাদ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে আইন রচনার স্বাধীনতা প্রদান করেছে সেখানে আমরা এমন সব কানুন থেকে উপকারিতা ও সহযোগিতা লাভ করতে পারি যা সার্বিকভাবে মানবকল্যাণের প্রতিভু। অবশ্য কোন অবস্থায়ই তা কুরআন-হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

www.amarboi.org

আমাদের কানুনের ব্যাপকতার অনুমান এভাবেও হতে পারে যে, আমাদেরকে ইজতিহাদে "মাসালিহি মুরসালাহ" ও "উরফ"-এর ন্যায় ফিকহী উসূল থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমোদনও দেয়া হয়েছে অনুরূপ সমকালীন ইমাম (আমীরুল মু'মিনীন)-এর নির্দেশ ও মতামতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের হুকুমও প্রদান করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হবে। ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের কর্মনীতি ছিল এই যে, তার আমলের রাজনৈতিক ব্যাপারে যদি তিনি কোন অভিমত ব্যক্ত করতেন তাহলে পরিষ্কারভাবে বলে দিতেন যে ইখওয়ানের সদস্যদের জন্য এ মতামত অবলম্বন করা কখনো জরুরী নয়। তিনি বলতেন যে, কারো নিজের রায় অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকার তার নেই। তিনি তাঁর মতামত শুধুমাত্র নসীহতের জন্য প্রকাশ করতেন। যাতে কেহ তাতে কোন ভাল দিক দেখলে এবং আকৃষ্ট হলে তা গ্রহণ করবে অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। এই ব্যক্তিই ছিলেন ইখওয়ানের ইমাম এবং প্রতিষ্ঠাতা যার বিরুদ্ধে তার দুশমনরা গোড়া ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন হওয়ার অপবাদ আরোপ করে থাকে।

মুসলিমদের ইসলাম বিচ্যুতি

বর্তমানে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মুসলিমদের কর্মপদ্ধতি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে ইসলাম কি তা অনুমোদন করে? একটু লক্ষ্য করুন আমাদের শাসন ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পলিসিসমূহ, বিচার ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি পরিবার সংগঠন এবং মানুষের নিজের ও তার ব্যক্তিগত সামগ্রিক ব্যাপারে তাবৎ রীতিনীতি বিন্দুমাত্রও কি ইসলামের চিত্র উদাহরণ পেশ করে? প্রত্যেকটা দিক ও বিভাগে বিশৃংখলা এবং অইসলামী কর্মকান্ডের ব্যাপকতা প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

এ বিশৃংখলা ও ইসলাম বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করে ইখওয়ান ফায়সালা করে যে, লোকদের হিদায়াতের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। হিদায়াতের এ সোনালী নীতি-ই নিসন্দেহে মানুষের সার্বিক দুঃখ যাতনার প্রতিবিধান নিহিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদী লোকেরা মনে করে যে, এতে তাদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা ব্যহত হবে। তারপর আর যায় কোথায় ঐসব প্রবৃত্তি পূজারী ইখওয়ানের পেছনে লেগে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমরা তাদের প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে আছি। এটা বিস্ময়কর ও পরস্পর বিরোধী আচরণ যে, মিসরের সকল রাজনৈতিক দল এখন শরীয়াত বাস্তাবায়নের দাবী করে থাকে অথচ ইখওয়ান সুদীর্ঘকাল থেকে এ দাবীই করে আসছে। ইখওয়ানের এ দাবীই সকল যুগে তাদের ঘাড় মটকানোর কারণ রূপে বিবেচিত হয়েছে। এসব রাজনৈতিক দল যদি তাদের দাবীতে অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ হতো তাহলে আমরা তাদের সাধারণ খাদেম এবং কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গর্ববোধ করতাম। শরীয়াত বাস্তবায়নের এ দাবী ইখওয়ানই তুলেছিল সবার আগে তথাপি এজন্য কোন প্রকার সুনাম সুখ্যাতি এবং কৃতিত্বের প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির রিকাব ধরতে প্রস্তুত যে এ মহৎ কাজটি করে দেখাবে।

www.amarboi.org

আমাদের হাতিয়ার

মানুষ যদি প্রশ্ন করে যে, বস্তুবাদী শক্তির জুলুম ও সীমালংঘনের মোকাবিলা আমরা কোন্ অস্ত্র ও শক্তির বলে করে থাকি ? তাহলে আমাদের জবাব হচ্ছে এই যে, আমাদের অস্ত্রতো তাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অস্ত্রছিল। সে অস্ত্র কি ? আল্লাহর ওপর মজবুত ঈমান, দাওয়াতের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্বের অটল ইয়াকিন, বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়। মুসলিমগণ যদি আল্লাহর কুদরতের উপর ভরসা না করে তাহলে তারা সত্য পথের সমস্যাবলী ধারণক্ষম কখনো হতে পারে না। তার ইয়াকিন হওয়া উচিত যে, সে যুগের পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক। যদি এসব গুণাবলী তার মধ্যে সৃষ্টি না হয় তাহলে সে এ মহোত্তম দাওয়াতের দাবী পূরণে সক্ষমই হতে পারে না। আর যে জীবনের এসব দাবী পূরণের যোগ্যতা নেই তা মৃত্যু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম।

মুসলিম উম্মাহর নিকট আমাদের দাবী

আমরা কখনো মুসলিম জনসাধারণ ও শাসকগোষ্ঠীর নিকট এমন দাবী উত্থাপন করিনি যেন তারা ধ্বংসের গভীর পঙ্কে লাফিয়ে পড়ে। আমরা কেবলমাত্র একথাই বলে থাকি যে, ইসলামী জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করো এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে নিজেদের পথিকৃত রূপে বরণ করে নাও। খুব ভেবে চিন্তে প্রতিটা পদক্ষেপ গ্রহণ করো এবং ইসলামের পতাকা সবার শীর্ষে সংস্থাপনকে নিজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো। কখনো ক্রোধ, আস্ফালন এবং গর্ব ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ করো না। চরম পন্থা অবলম্বন এবং অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকো। ইখওয়ান তার মুসলিম ভ্রাতাগণের নিকট এ ছাড়া আর কিছুই দাবী করে না। উদ্দেশ্য তারা যেন পূর্ণ একনিষ্ট হয়ে দ্বীনের সম্যক ধারণা, অনুপম ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব, সুশৃংখল জিহাদ এবং আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কুরবানীর দুর্নিবার আকাংখা প্রভৃতি মহৎগুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয়। তারপরও কি এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা ও জটিলতা বাকী থেকে যায় যে, ইখওয়ানের দাওয়াত কি ?

আরো লক্ষ্য করুন যে, আমরা মুসলিমদের নিকট যে জিনিসের দাবী করে থাকি তা কি কোন অসম্ভব কিছু ? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কাজ ও কাজের প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ বিষয়ে কুরআনের কতিপয় আয়াতও রয়েছে। কিন্তু কোন একটি আয়াতেও আমাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যাশিত ফলাফল লাভে সক্ষম হতে হবে। আমাদের দায়িত্ব হলো চেষ্টা করা। ফলাফল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর হাতে।

বিপর্যয় ও ষড়যন্ত্র চিহ্নিত করণ

মিসরের সামাজিক ব্যবস্থাকে সীমাহীন বিপর্যয় ঘুণের ন্যায় কুরে কুরে খাচ্ছে। জনসংখ্যা মাত্রারিক্তভাবে ঘন হয়ে গিয়েছে। আবাদযোগ্য ফসলী জমি তার উর্বরা শক্তি দিন দিন হারিয়ে ফেলছে। এ পরিস্থিতিতে বিরাজমান অবস্থায় সংস্কার

www.amarboi.org

সংশোধন ও ভারসাম্যপূর্ণ পলিসি অবলম্বন করার একান্ত প্রয়োজন। যাতে পরিস্থিতিকে আরো বিগড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। অবস্থা সংশোধনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সমাধান নয়। বরং সমস্যার সমাধান হচ্ছে চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনাবাদি ও পতিত জমি পুনরায় চাষবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা যেতে পারে। তারপর যেসব মুনাফা খোর মহাজনদের অন্তর সম্পূর্ণ মরে সারা হয়ে গেছে। অবৈধ পন্থায় আমাদের দেশের সমস্ত আয় কুক্ষিগত করে দেশের বাইরে নিয়ে যায়। এ জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণ কারা? সকলেই তাদেরকে ভাল করেই জানে। বিদেশী কোম্পানীসমূহ আমাদেরকে জোঁকের ন্যায় শোষণ করছে। ভিনদেশী পুঁজির যোগান দেয়ার বাহানা করে আমাদের প্রাচুর্যের ওপর অন্যদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমরাই। বাহ্যত এটা খুবই আকর্ষণীয় ও মনোলোভা শ্লোগান যে আমরা বিদেশী পুঁজির সাহায্যে উন্নতির সোনালী সোপানগুলো অতিক্রম করে চলেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সম্পূর্ণ অন্তসার-শূন্য নিকৃষ্ট জিনিস ও নিশ্চিত ধ্বংসকর ব্যাধি। এ জাতীয় চিন্তাধারা বহু অজ্ঞতার ফলশ্রুতি, বিপজ্জনক চারিত্রিক অধঃপতন, ইসলামী শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি উদাসীনতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সমন্বিত রূপ, নিশ্চিদ্র ও ঘনান্ধকার রজনীতে অগণিত সংখ্যক দুষ্টকৃতির লোক যখন মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করার জন্য অগ্রাভিযানে রওয়ানা দেয়ার সময়ের সাথেই এর তুলনা করা যেতে পারে।

ব্যথার উপশম

এমন বিপজ্জনক ও জঘন্য ব্যাধির চিকিৎসা আমরা কবে করবো? আমরা প্রত্যেকটি ওষুধ পরীক্ষা করে দেখেছি এবং প্রতিটি মতবাদের তিক্ত ফলের আস্বাদ লাভ করেছি। এসব রোগের প্রতিবিধান একটাই আর তা হচ্ছে দ্বীনে হকের দিকে প্রত্যাবর্তন। এখন এর কি কারণ যে, আমরা সব ব্যবস্থাপত্রই পরীক্ষা করে শেষ করেছি। কিন্তু এ ব্যবস্থাপত্রখানা একবার পরীক্ষা করে দেখতে প্রস্তুত হচ্ছি না। প্রতিটি আভ্যন্তরীন ও বিদেশী শক্তি এ পরীক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করছে কেন? তারা আমাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকে যে, শরীয়াত তো প্রথম থেকেই কার্যকরী রয়েছে। মানুষ নামায পড়ে রোজা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্জ করার জন্য পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তাদের। আল আজহারের মত বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান এবং মসজিদের দরজা খোলা আছে। এরপর তোমরা আর কি চাও?

তাদের নিকট দ্বীন বলতে এসবই বুঝায়। এসব কাজ যখন কোন না কোনভাবে হয়ে যাচ্ছে তাহলে দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে কার্যকরী হয়েই আছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অসম্পূর্ণ চিন্তাধারার জন্য তাদের ক্ষমা করে দিন। তাদের দূরদৃষ্টির উজ্জল আলোক বর্তিকা প্রদান করুন। তাদের বক্ষকে সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আর আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি হেদায়াত দান করুন। কবি বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

ভারত বর্ষে মোল্লাদের রয়েছে সিজদার অনুমতি
তাই যে নির্বোধ মনে করে ইসলাম রয়েছে মুক্ত-স্বাধীন।

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ তাঁর দাওয়াত কেবলমাত্র জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং ইসলামী জগতের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই সম্বোধন করেছেন। তিনি মিল্লাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, নিজ নিজ প্রজাসাধারণের ব্যাপারে তাদেরকে জবাবদিহির সম্মুখিন হতে হবে। আজ যদিও তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না কিন্তু আগামীকাল অবশ্যই আল্লাহর আদালাতে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি শাসনকর্তাগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন যেন তাঁরা প্রজাসাধারণের ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া অবৈধ বিধিনিষেধ পরিসমাপ্ত করে তাদেরকে প্রকৃত স্বাধীনতার সাথে পরিচিত করে তোলেন এবং বিদেশী সংস্কৃতির মোকাবিলা করার জন্য তাদের অন্ধানুকরণের পরিবর্তে নতুন করে উম্মাতকে ইসলামের ভিত্তিতে পুণর্গঠিত ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে ব্রতী হন।

'নাহওয়ান নুর' পুস্তিকা

ইমাম তার রচিত পুস্তিকা "নাহওয়ান নুর"(আলোর দিকে)-এর সাহায্যে গোটা ইসলামী বিশ্বকে সম্বোধন করেছেন। এবং তাতে একাধারে ইসলাম, মিল্লাতের সম্মান, বাস্তব ও সামরিক শক্তি, জনস্বাস্থ্য, জ্ঞান, ও চরিত্র , জীবিকা ও সাধারণ শৃংখলা, সংখ্যালঘুদের অধিকারের নিরাপত্তা এবং বিদেশীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সার্বিক দিকনির্দেশনা সন্নিবিষ্ট করেন। তিনি পরিষ্কারভাবে এও বিশ্লেষণ করে দেন যে, দ্বীনি আলেমগণ উম্মাতের সদস্য। তারা নিজেরাই দ্বীনের মাপকাঠি নন। এ পুস্তিকা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বব্যাপী। একে নতুনভাবে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায় পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রতিটি মূলনীতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। দা'য়ীর কাজ হলো বুনিয়াদী উসুল পেশ করা। আর এ পুস্তিকায় সে কাজই করেছেন ইমাম শহীদ। এখন এর ওপর সংশ্লিষ্ট ও উপকারী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংযুক্ত করা অভিজ্ঞ ওলামা ও বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের কাজ।

ইমাম হাসানুল বান্নার দ্বিতীয় পুস্তিকা

ইমামের অপর একটি পুস্তিকা "ইসলামী মূলনীতির আলোকে আমাদের সমস্যার সমাধান"–এতে তিনি বিশদভাবে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেন। কোন কোন সমালোচক ইমামের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, বর্তমান যুগ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর বহু স্বতন্ত্র দাবী ও চাহিদা রয়েছে। তাদের বক্তব্যের সপক্ষে তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, দুনিয়ার শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো দ্বীনের ভিত্তিতে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করে না।

www.amarboi.org

দ্বীন তো এখন পুরনো হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কোন আলো লাভ করতে পারেনি। তার নিকট এ দলিল সঠিকরূপে বিবেচিত হতে পারে। এসব লোক মিসর, অন্যান্য আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছে। এবং মনে করে নিয়েছে যে, দ্বীন আমাদের সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করতে পারে না। অথচ বস্তুগত উন্নতির প্রতিযোগিতায় আমাদের অন্যান্য জাতির মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

দ্বীনের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে জীবন যাপন করার ফলাফল এই যে, সমগ্র মানবতা আজ নিশ্চিত ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়ার নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদগণ আজ সকল প্রকার চারিত্রিক, নৈতিক ও ভদ্রোচিত কর্মপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে। তারা বিশেষত বস্তুগত ও ভোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু চিন্তা করে থাকে। সীমিত ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা সকল প্রকার লজ্জাজনক তৎপরতা প্রদর্শন করার জন্য থাকে সদা প্রস্তুত। তাদের আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনা নেই যে, তাদের এ পদক্ষেপে সমগ্র পৃথিবী অনল কুন্ডে জ্বলে পুড়ে ছাই ভস্মে পরিণত হবে। একথা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান বিশ্বের দু'পরাশক্তি যদি কখনো সামান্য বস্তুগত সুযোগ সুবিধা হাসিল এবং অন্ধভাবে শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে পুরো বিশ্বের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহলে দুনিয়ার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠবে। এসব রাষ্ট্রের কোনটিই সর্বনাশা আনবিক অস্ত্র ব্যবহারে বিরত থাকেবে না। দুশমনদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তারা যা করতে সক্ষম তা সবই করে ছাড়বে। তাদের এ অন্ধ ক্ষমতার লাড়ইয়ে সে সব জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হয়ে যাবে যুদ্ধের সাথে যাদের থাকবে না আদৌ কোন সম্পর্ক। আমার আল্লাহই ভাল জানেন, এ যুদ্ধ পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ বসতিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করবে। বর্তমানে দুনিয়ার প্রথিত যশা চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও পন্ডিতগণের নিকট ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আধিক্য ও সে তুলনায় আবাদযোগ্য ভূমির স্বল্পতা বিবেচনা করতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের মহাব্যবস্থাপত্র খুবই ফলপ্রসু বলে মনে হচ্ছে কিন্তু যুদ্ধ কালীন সময়ে কি খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে ? না থাকবে বাঁশী আর না বাজবে বাঁশরী। সম্ভবত এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু অংশ বেঁচে যাবে এবং ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবী আরো একবার পুনরায় ঐ স্থানে গিয়ে পৌছবে যেখান থেকে তার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। নগদ অর্থের বিনিময় পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার পরিবর্তে হতে পারে যে, জিনিসপত্রের পারস্পরিক বিনিময় প্রথা চালু হয়ে যাবে। যা হোক এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া থেকে ভূ-পৃষ্ঠের কোন এলাকাই সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকতে পারবে না। সমুদ্র ও স্থলভাগ ছাড়াও মহাশূন্য সে অগ্নিশিখার অসহায় শিকারে পরিণত হবে। এর পুরো জ্ঞান শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটই রয়েছে। মানুষ কেবল অনুমানই করতে পারে। আগামী কাল কি হবে এবং মানুষ কি উপার্জন করতে পারবে। এগুলো আল্লাহর গায়েবী ভান্ডারের চাবিকাঠির অন্তর্ভুক্ত। আর এটা নিরংকুশভাবে তারই কর্তৃত্বাধীন। তথাপি বস্তুবাদী এবং দ্বীন

www.amarboi.org

বিমুখতা মানবতাকে আজ যে স্তরে উপনিত করেছে সে সম্পর্কে সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী কোন ব্যক্তি অনবহিত নন।

ইখওয়ানের দৃষ্টিতে সমাধান

ইখওয়ানুল মুসলিমুন কখনো সমালোচনার জন্য সমালোচনা করেনি। বরং তারা অবস্থার সংশোধনের জন্য রোগ চিহ্নিত করে তার যথোপযুক্ত প্রতিকারের প্রস্তাবও করে থাকে। তবে সমস্যা হলো ইখওয়ানের কোন সুপারিশই ক্ষমতাসীন মহল সুস্থ মস্তিষ্কে কখনো মূল্যায়ন করেনি। অথচ তারা সমস্যা নির্ণয় ও তার সমাধানের জন্য সমগ্র পৃথিবীর মাটি চষে ফিরেন। বড় বড় কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। চমকপ্রদ বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করা হয়। প্রস্তাবাবলী পাশ হয় এবং সুপারিশমালা গৃহীত হয় কিন্তু ফলাফল সেই ঢাক ঢোলের নীচেই চাপা পড়ে যায়। বিশ্ব রাজনীতির কলকাঠি যাদের করায়ত্ব সেই ক্ষমতাধরগণ আমাদেরকে নেশা পান করিয়ে শুইয়ে রাখতে চায়। আমাদেরকে আত্মসংযোম অনুশীলনের উপদেশ ভিক্ষে দিয়ে থাকে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হয়। লম্বা চওড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বিংশ শতাব্দির সূচনা লগ্ন থেকেই বিড়াল ইঁদুরের এ খেলা চলছে। কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ হয়েছে? আর এ অবস্থা কতদিন পর্যন্ত আমাদের ওপর চেপে থাকবে। কোন ভবিষ্যত বক্তা এবং রাজনীতিবিশারদও এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারে না। ইখওয়ানের পক্ষ থেকে দু'টো আপত্তিকর শব্দে এর সমাধান শুনে নিন। এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং আপন স্বরূপ উপলব্ধি করা তথা আত্মপরিচয় লাভ করা।

ইসলামী বিশ্ব বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সকল প্রকার মূল্যবান সম্পদের প্রাচুর্য দিয়েছেন। উত্তম উর্বর চাষাবাদযোগ্য ভূমি, খনিজ সম্পদের সীমাহীন ভান্ডার—লবণ থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্যন্ত সব জিনিস এখানে মজুদ রয়েছে। স্বর্ণও এক প্রকারের নয় বরং সাদা সোনা (প্লাটিনাম), হলুদ সোনা (গোল্ড) এবং কালো সোনা (পেট্রোলিয়াম)। মোটকথা সকল সম্ভার এখানে পাওয়া যায়। কোন বস্তুগত জিনিসের ঘাটতি বা অভাব এখানে নেই। কেবলমাত্র আল্লাহ থেকে দূরত্ব এবং আত্মনির্ভরতার অভাব রয়েছে। এ কারণেই আমাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়েছে।

যে প্রতিকারের বিষয়ে আমি ওপরে উল্লেখ করলাম তার শুভ সূচনা করতে পারে মুসলিম শাসকগণই। শাসকগোষ্ঠী যদি সাহসের সাথে কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয় তাহলে আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, উম্মাতে মুসলিমা আজকের এ অধপতিত সময়েও সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম। জনসাধারণ তাদের পেটে পাথর বাঁধতে প্রস্তুত রয়েছে। কেবল শর্ত হচ্ছে, তাদের পরিচালনা সঠিক এবং ইসলামী পদ্ধতিতে করতে হবে। শাসকগণ ও জনসাধারণ মিলে একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং সীসা ঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালে সমগ্র পৃথিবী তার সব ক্ষমতা সত্ত্বেও তাদের সম্মুখে মাথা নত করে দেবে। নৈরাজ্য প্রচারকারীরা পুনরায়

www.amarboi.org

তাদেরই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখবে আমরা কি ভাবে ইজ্জত ও সম্মান লাভ করে থাকি। একবার এ ব্যবস্থাপত্র পরীক্ষা করে দেখুন না।

জাতিসমূহের উত্থান-পতনের রহস্য

কোন জাতিকে তার শত্রুর অস্ত্র ততটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না যতটুকু পারে আভ্যন্তরীন দুর্বলতা, অবসাদ ও ভীরুতা। আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং অপমানে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাধিতে জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে থাকে। অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে পাওয়া যায় এমন জীবিকা শুধু কোন নিষ্প্রাণ জাতির লোকদের জন্য শোভনীয় হতে পারে। কোন জীবন্ত জাতি এমন জীবনের ওপর মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ধিক! শত ধিক !! আজ আমাদের জীবনের কতইনা অধপতন ঘটেছে। আমরা সর্বদা কেবলই বলে বেড়াই "আমার পূর্বপুরুষগণ রাজা-বাদশা ছিলেন।" কিন্তু আমরা নিজেরা কি। শুধু অবিশ্বাসীদের সমারোহ। কবির ভাষায় ঃ

انما الفتى من يقول ها انا ذا

وليس الفتى من يقول كان ابى

প্রকৃত মানুষ তো সেই যে বলতে পারে আমি অমুক। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে কোন সম্মানিত ব্যক্তি নয়। যে বলে আমার পিতা ছিলেন অমুক।

সৌভাগ্যের দিন

সৌভাগ্যের সেই দিনটির জন্য প্রতিক্ষার প্রহর গুণছে হৃদয়বান ও দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ। যেদিন আমাদের হৃত মর্যাদা পুনর্বহাল হবে, যেদিন আমরা আবার আমাদের ফেলে আসা অতীতের সাথে সোনালী ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন রচনা করতে পারবো। সে রক্তিম সূর্য উদিত হবে কবে ? মুসলিম উম্মাহর শাসকগোষ্ঠী যেদিন নিজেরা নিজেদেরকে আল্লাহর সম্মুখে, তাদের বিবেকের নিকট এবং উম্মাতে মুসলিমার নিকট জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে বলে মনে করবে সেটিই সেই সৌভাগ্যের দিন। সেদিনই প্রতিভাত হবে উম্মাতের সারিতে প্রকৃত ঐক্যের বহু প্রত্যাশার ফসল। সেদিনই জনগণ তাদের শাসনকর্তাগণের ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠবে আবার শাসকগণও সকল প্রজাসাধারণের অন্তরে কর্তৃত্ব করতে পারবে। শাসকগণ তখনই জনগণের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র বলে বিবেচিত হবেন যখন তারা জনসাধারণের আশা-আকাংখার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। একথা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, জনগণের মতামত শোনা ও তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রর্দশন করাকে ইসলাম প্রত্যেক দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ কারণেই ইসলাম নির্বাচনে পার্লামেন্ট এবং প্রতিনিধিত্বের নীতির বিরোধিতা করে না। কারণ এভাবে ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে মানুষ তাদের মত প্রকাশের সুযোগ লাভ করতে পারে।

www.amarboi.org

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক ঐক্যের মূল উৎস

আমাদের বিশ্বাস ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের উৎস হচ্ছে ইসলামী খিলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এখন প্রশ্ন হলো, এ প্রশ্ন যে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয় কি ভাবে এর জবাব খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহজ। আহ ! আমাদের শাসকগণ যদি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করতো। উম্মাতের ঐক্য, শক্তি ও পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে তোলার জন্য খেলাফত ব্যবস্থাই একমাত্র মাধ্যম। এ খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে শাসকগোষ্ঠীকে কিছুই খোয়াতে হবে না। বরং সর্বপ্রথম সৌভাগ্য ও কৃতিত্ব পড়বে তাদের ভাগেই। নিজেদের জীবনের ব্যাপারে আজ তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতে হয়। কিন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রকৃত প্রশান্তি ও নিরাপত্তার দৌলত তারাই লাভ করবে।

রাজনৈতিক দলসমূহ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকার ব্যাপারেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। যে ব্যাপারে আমাদের আপত্তি তা হচ্ছে বর্তমান রাজনৈতিক পদ্ধতি। এ রাজনৈতিক পদ্ধতির মূলনীতি সত্যের সহযোগিতা কিংবা সততার পতাকা উড্ডীন করা নয়। বরং নিজের পার্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং তার বিশেষ স্বার্থ ও চিন্তা-চেতনার পৃষ্ঠপোষকতা করা। দলের অবস্থান ও ভূমিকা সঠিক হোক কিংবা বেঠিক সে সম্পর্কে কোন প্রকার মূল্যায়নের প্রয়োজন বোধ হয় না। ফলে এভাবে একদিকে যেমন সত্য ও সততাকে আহত করা হয় অপরদিকে তেমনি উম্মাতের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কারণ ছাড়াই বিভেদ সৃষ্টি হয়।

আমরা কখনো এমন ইচ্ছা পোষণ করি না যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হোক। আমাদের ইতিহাস সাক্ষী যে যখনই কোন রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠী অবস্থার সংস্কারের কর্মসূচী দিয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে তখনই আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করেছি। তারপর যখন তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণের পর মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়েছে এবং কোন ওয়াদা পূরণ হতে দেখা যায়নি। তখন আমরা প্রথমে তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। তারপরও কোন ফল না হলে সমালোচনা করেছি। আমি মনে করি প্রত্যেক নাগরিকের এ অধিকারও রয়েছে যে, সে ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্য সরকারকে সর্তক এবং সমালোচনা করবে আর এটা তার কর্তব্যও। যদি নাগরিককে এ অধিকার না দেয়া হয় তাহলে সরকার অপরাধী বলে পরিগণিত হবে আর যদি নাগরিক এ দায়িত্ব পালন না করে তবে সে জবাবদিহির সম্মুখীন হবে।

বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলন

ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে আপনারা কি মনে করেন ? এটা এমন একটা সংগঠন সমস্ত ইসলামী দেশে যার রয়েছে রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব। এটা শুধু মিসরীয় দল নয়। বরং যদি আরো গভীরে প্রবেশ করে লক্ষ্য করা যায় তাহলে

www.amarboi.org

আমি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে, মিসরের সকল রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপতা মিসরীয় ভৌগোলিক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ, মিসরের বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব এবং নাম নিশানা নেই। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমুনের শুধু ইসলামী দেশসমূহেই নয় বরং অইসলামী দেশেও তাদের সুসংগঠিত শাখা রয়েছে। আমরা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রবক্তা। ভৌগলিক কোন সীমারেখা আমাদের গতিরোধ করতে পারে না। এর অর্থ হলো, আমরা গোটা ইসলামী বিশ্ব এবং উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা)-এর বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির বাণী বাহক।

মিসরীয় যুবসমাজ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন

মিসরুল ফাতাত বা মিসরীয় যুব সংগঠন আমাদের সাথে যে আচরণ নীতি গ্রহণ করেছিল আমরা কিন্তু তাদের সাথে সেরূপ কোন আচরণ কখনো করিনি। আমরা সকলের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহারই করে এসেছি। আমাদের অন্তরে এ সংগঠনের কতিপয় উর্ধতন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের জন্য সম্মান ও ভালবাসা ছিল। যেমন আহমদ হোসাইন মরহুম, উস্তাদ ইবরাহীম শুকরী, উস্তাদ ফাতহী বিদওয়ান প্রমুখ এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণকে আমরা সর্বদা যথোপযুক্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতাম। মিসরীয় যুবসমাজ ও ইখওয়ানের মাঝে কথাবার্তা এবং মত বিনিময়ও হতো, ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ এবং আহমদ হোসাইন মরহুমের পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হতো। আমার এই সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে যে, আমিও তাদের দু'জনের মধ্যে কয়েকবার পয়গাম পৌছানোর দায়িত্ব পালন করেছি। যদি উভয় সংগঠনের মধ্যে ঐক্য হয়ে যেতো এবং ঐক্যবদ্ধভাবে যুগপৎ কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হতো তাহলে মিসরের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো। কিন্তু যে গোপন হাত এবং দুষ্কর্মশীল মগজ যা উম্মাতের ঐক্যের মধ্যে তাদের মৃত্যু দেখতে পায় কখনো নিষ্ক্রিয় বসে থাকতো না। তাদের গোপন চক্রান্ত সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে দেয়নি। যা ছিল আমাদের দীর্ঘ লালিত প্রত্যাশা।

নিশ্চয়ই তোমাদের এ উম্মাত একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত

বিশ্ব রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারেও আমাদের দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এ মনোভাবের মূল ভিত্তি হচ্ছে আমাদের এই আকীদা ও বিশ্বাস যে, ইসলামী জাহান এবং সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রগুলো একই উম্মাতে এবং একটা দেহ রূপে পরিগণিত। কোন ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর অন্য কারো আক্রমণ সরাসরি আমাদেরই ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এমন আক্রমণের মোকাবিলা করা এবং দুশমনকে প্রতিহত করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এর প্রতি আমরা কখনো উদাসীনতা প্রদর্শন করবো না। প্রতিটা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও মর্যাদা মিসর এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা ও স্বাধীনতার সহায়ক হবে। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত যদি মিলেই যায় তাহলে তা হবে আমাদের কামনা-বাসনার হুবহু রূপায়ন। এমন শাহাদাতে আমাদের এবং সমগ্র মিল্লাতে ইসলামীয়ার ইজ্জত, শক্তি, সাহস ও

www.amarboi.org

উদ্যমে আরো প্রাণ চাঞ্চল্য ও গতির সঞ্চার হবে। এ রাস্তায় জান-মাল পরিবার-পরিজন এবং সন্তান-সন্তুতি এমনকি সময় ও স্বাস্থ্য কোন জিনিসই অকাতরে ব্যয় করতে আমরা কার্পণ্য করি না। এসব কিছুই তো আল্লাহরই দান। যদি আমাদের সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় কুরবান হয়ে যায় তবুও আমরা এটাই বলবো, "সত্য বলতে কি যতটুকু করা কর্তব্য ছিল তা করা সম্ভব হয়নি।"

আমাদের দাওয়াত পূর্ববর্তীদের দাওয়াতেরই নতুন সংস্করণ

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত ত্যাগ তিতিক্ষা ও কুরবানীর দাওয়াত। আমি বুঝতে পারি না যে, আমরা কোন নতুন দাওয়াত আবিষ্কার করে নিয়েছি কি না। এটা শুধু আমাদের পূর্ণাত্মা অগ্রজদের কর্মপদ্ধতিরই পুনরুজ্জীবন মাত্র। সালফে সালেহীনগণের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই আপনার নিকট এ বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়ে উঠবে যে, তাঁরা দুনিয়ার সুযোগ সুবিধার কোন পরোয়া করতেন না। বাহ্যিক জাঁকজমকের প্রতি তাদের ছিল এক প্রকার ঘৃণা বোধ। আল্লাহ তায়ালার সাথে আত্মিক সম্পর্ক মজবুত করার ধ্যান তাদের মন-মগজে সদা জাগরুক থাকতো। সাথে সাথে আল্লাহর সেই শার্দুলগণ কালেমায়ে হকের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা মাথায় কাফন বেঁধে রাখতেন। ইতিহাসের পাতা আজও তাদের কৃতিত্ব উজ্জ্বল দীপ্তিমান। তাদের বীরত্ব ও কুরবানী, তাদের উন্মুক্ত তরবারীর চমক, রণক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসের গৌরব বৃদ্ধি করছে। আমরাও সেই মহাপ্রাণ পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করেছি।

শত্রুর সাক্ষ্য

আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, ইসরাঈলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (আনজাহানী) মুশেদায়ান তার মন্ত্রীত্বের আমলে মন্তব্য করেছিলেন যে, তারা সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু নগণ্য সংখ্যক ইখওয়ানী বাহিনীর মোকাবিলা করার সাধ্য তার সেনাবাহিনীর নেই। তার বক্তব্য ছিল এই যে, ইখওয়ানের প্রতিটি সদস্য গুলীর সামনে বুক পেতে দেয়। তারা কখনো পৃষ্ঠ প্রর্দশন করে না।

আর আমি নিজেও এ সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের ইখওয়ানী ভাইদের মধ্য থেকে যতজনই কোন ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকেরই বুকে আঘাত লেগেছিল। কারোরই পিঠে গুলী লাগেনি।

সংগঠনের ঘোষণাপত্রের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে পার্লামেন্টের সকল সদস্য, মন্ত্রীবর্গ এবং দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সকলেই অংগীকার করে যে, তারা গঠনতন্ত্রের আনুগত্য, তার সুষ্ঠু সংরক্ষণ করবে এবং বাস্তবায়িত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এ স্বীকৃত মূলনীতিকেও ইখওয়ান সম্পর্কে সন্দেহ সংশয়ের উপলক্ষ বানিয়ে নেয়া হয়েছে। ইখওয়ান যখন তার

www.amarboi.org

সাংগঠনিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনকে ঢেলে সাজাবার অংগীকার ব্যক্ত করে তখন প্রলয় কান্ড বাধিয়ে দেয়া হয়। সকল দিক থেকে আমাদের ওপর তীর বর্ষিত হতে থাকে। অভিযোগ ও অপবাদের মহা অভিযান চালানো হয়। স্বার্থপর লোকেরা জনসাধারণকে সর্তক করতে গিয়ে বলতে থাকে—দেখো এরা বাইয়াত গ্রহণ করছে ? এ বাইয়াত কি উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে ? ইত্যাদি ইত্যাদি। "বাইয়াত" শব্দটির এমন সব ব্যাখ্যা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হয় যাতে পরিবেশে বিশৃংখলা এবং মনে ভয়-ভীতি ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়।

বাইয়াতের তাৎপর্য

বাইয়াতের অর্থ ঠিক তাই যেমন কেউ কারো অর্পিত কোন গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে শপথ করে তার বিশ্বস্ততার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। আমরা মুর্শিদের হাতে বাইয়াত মুর্শিদের জন্য নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি। আমাদের বাইয়াত হয়ে থাকে আল্লাহর সাথে। আমাদের বাইয়াত হয়ে থাকে এ শর্তে যে, মুর্শিদের নির্দেশ তখন অনুসরণ যোগ্য হবে যখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আহকাম মোতাবেক হবে। আল্লাহর নাফরমানী মূলক কোন হুকুম অনুসরণ যোগ্য নয়। জনসাধারণকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত করার জন্য ইমাম শহীদ এ বাইয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং শর্তাবলীও বর্ণনা করেছিলেন। সেগুলো একবার দেখলে প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন যে, এগুলোর একটিও এমন নয় যা দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্ষতি করা অথবা তার বিরুদ্ধে সীমালংঘন কিংবা অত্যাচার করা উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু দুষ্কর্মশীলদের কথা আর কি বলা যায় ? তাদের না আছে আল্লাহর ভয় না আছে সৃষ্টির সামনে লাজ শরমের কোন বালাই। আমাদের বাইয়াত নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে হয়ে থাকে।

১–মূল বিষয়ের উপলব্ধি এবং দ্বীনের সঠিক ধারণা লাভ।
২–নিয়াতের পবিত্রতা।
৩–আমলে সালেহ।
৪–জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।
৫–ত্যাগ ও কুরবানীর অনুপ্রেরণা।
৬–মা'রুফ কাজে আনুগত্য।
৭–অবিচল দৃঢ়তা।
৮–আন্দোলনের জন্য পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা।
৯–ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধ।
১০–পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

সংস্কারের পর্যায়সমূহ

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুরোপুরি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও পেশ করা হয়ে থাকে এবং তার বাস্তব প্রয়োগ সুস্পষ্টভাবে ইখওয়ানের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে দেয়ার কাজও

www.amarboi.org

চলতে থাকে। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ইখওয়ান তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা ও কৃতিত্ব অর্জন করে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অতপর পরিবারের সকল সদস্যদের সংশোধন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে একটি পরিবারের নৈতিক ভিত্তি, আত্মিক সম্পর্ক, দ্বীনি নীতিমালা, পারস্পরিক পরিচিতি ও ভালবাসার সম্পর্কে উজ্জীবিত হয়ে একটা বৃহৎ পরিবারের রূপ পরিগ্রহ করে। এভাবে একটা অত্যন্ত শান্তিময় সমাজ গঠনের ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতার প্রতি লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে আইন শৃংখলা রক্ষাকারীদের দৃষ্টিতে ইখওয়ানের এই কর্মপদ্ধতি জন নিরাপত্তা ও আইনের জন্য খুবই বিপজ্জনক। আল্লাহ তাদের হিদায়াত করুন। আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করছি যেন এমন পরিবার ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের সৌভাগ্য যেন সকল দলের নসীবে জোটে। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ঈমান প্রবৃদ্ধিকর ফল তার নিজ চক্ষে দেখতে পায়। এ শিক্ষার ফলে কল্যাণকর কাজে যুবকদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং তারা দেশের খেদমতের জন্য কর্মতৎপর হয়ে ওঠে।

জিহাদের সংজ্ঞা

মুহতারাম মুর্শিদ কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে জিহাদ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেছেন যে, মুসলিম জনগণের ঈমান ও আকীদার হেফাজত করাই জিহাদের উদ্দেশ্য। কারো আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কিংবা উপনিবেশবাদ বা দাসত্বের শৃংখলে কাউকে বন্দী করা মোটেই জিহাদের উদ্দেশ্য নয়।

অনুকূল ও প্রতিকূল সর্বাবস্থায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ই উদ্দেশ্য

আমার মনে হয় উপরোল্লিখিত বর্ণনায় আমি ইখওয়ান সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আল্লাহর নিকট দোয়া করছি যেন আমার পেশকৃত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সকল দুর্বলতা মুক্ত থাকে। এ স্মৃতিকথার বিষয়বস্তু যদিও ইখওয়ানের দাওয়াত নয় তথাপি একথা সুস্পষ্ট যে আমি আমার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ দাওয়াত সম্পর্কে উদাসীনও থাকতে পারি না। এ দাওয়াতই আমার বর্তমান ব্যক্তিত্ব গঠন করেছে। তা ছাড়া আমার স্মৃতিকথাগুলো পাঠকগণকে চমকপ্রদ কাহিনী শুনানো কিংবা শুধু সময় কাটানোর জন্য লেখা যোগান দেয়ার লক্ষে রচিত নয়। আমি আমার সাধ্যমত ইখওয়ানের দাওয়াত সকল সম্ভাব্য উপায়ে মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে চাই। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, মানুষ যেন সত্যকে জানতে পারে। আর এ জন্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, আমার বর্ণনাভংগী আলাদা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। রূপকথার ন্যায় কাহিনী বর্ণনা না করে আমি শুধুমাত্র দাওয়াতী কাজের সহায়ক কথাবার্তা বর্ণনা করছি। আমি তো নিছক কোন গল্পকার বা কাহিনীকার নই।

www.amarboi.org

ইতিহাস ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বসমূহ

সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, ইতিহাস-ই বড় বড় ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়ে থাকে না বড় বড় ব্যক্তিত্বই ইতিহাস সৃষ্টি করে ? অন্যভাবে বলা যায় ঘটনাবলীর সাহায্যে বড় বড় ব্যক্তিগণ তাদের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করে না বড় বড় ব্যক্তিত্বই ঘটনার জন্ম দেন ? আমার মতে কোন একটি মতকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করে অপর মতটিকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। কখনো প্রথম মতটি সত্য হয়ে থাকে আবার কখনো বা শেষোক্তো মতটি সত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে ওটে। এক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ নিসন্দেহে ব্যতিক্রম। কেননা তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়ে থাকেন। তাঁদের মর্যাদা ও পদবী জন্মগত অর্জিত নয়।

অনেক সময় পরিবেশ ও ব্যক্তিত্ব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর শুরু ও মাঝামাঝি সময়ে মুসলিম মিল্লাত যে অসহায় অবস্থার শিকার ছিল যদি এরূপ অবস্থা না হতো তাহলে হয়তো ইমাম হাসানুল বান্না এমন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দাওয়াতের সূচনা করতেন না। আর তা না করলে বর্তমান বিশ্বব্যাপী জাগরণ ও রেনেসাঁ সৃষ্টি হতে পারতো না। এভাবে মনে হয়, পরিবেশ ও সময়ের প্রবাহে ব্যক্তিত্ব জন্ম লাভ করে এবং প্রবল পরাক্রান্ত দুঃসাহসী ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন করে দেয়। চলতি শতকের প্রারম্ভে মুসলিম জাতি অবণতি ও অধপতনের যে গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল তার দাবীই ছিল এ অসহায় অবস্থার আশু পরিবর্তন। তাই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাক্রমে এ পরিবর্তনের শুভ সূচনা হয় হাসানুল বান্নার হাতে। হাসানুল বান্না সবরকম চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে একই কাজে আত্মনিয়োগ করেন যাতে মুসলিম সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়া যায়। তিনি ছিলেন একজন সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই অপমান ও হীনতা মেনে নিতে পারেননি।

ফুৎকারে এ প্রদীপ নির্বাপিত করা যাবে না

হাসানুল বান্না যখন কালের গতিধারা পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য প্রবল তুফানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যান তখন ইসলাম বিদ্বেষী সকল শক্তিই তার প্রতিপক্ষের সাথে সমবেত হয়। যারা মনে করতো যে, ইসলাম ও মুসলমান মৃত ঘোড়ার মত। তাঁরা ইমামের সংস্কার ও পুনর্জাগরণের সংকল্প সম্পর্কে উপহাস করতে থাকে এবং বিরোধিতা ও শত্রুতার সব রকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। যখন সত্যের এ বীর সেনানী সম্পূর্ণ একাকী সত্যের শ্লোগান উচ্চারণ করেন তখন কে বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে, নীল আকাশের নীচে মুসলিমগণ পুনরায় তাদের হৃত গৌরব ও শৌর্য বীর্য ফিরে পাবে ? কে তখন মেনে নিতে পেরেছিল যে, এ অসহায় পথিকের করুণ আর্তনাদ অভিযাত্রীদলের সৃষ্টি করবে এবং যুব সমাজ প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দলে দলে শামিল হয়ে মনযিল অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকবে। ইহুদী শকুনরা সেই সময় এই বাজ পাখিকে "হাসানুল আ'মা" (অন্ধ হাসান) বলে অভিহিত করেছিল।

www.amarboi.org

কিন্তু তিনি কবির উক্তি বার বার আবৃত্তি করে নিজের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঃ

زعم الفرزدق ان سيقتل مربعًا
ابشر بطول سلامة يامربع

ফারাজদাকের খামখেয়ালী মনোভাব রয়েছে যে, সে মারবা'কে হত্যা করবে। হে মারবা' তোমার জন্য সুসংবাদ যে, তোমার সামান্য ক্ষতিও হবে না।

ভূপৃষ্ঠে আমাদের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল , হাসানুল বান্না শ্রেষ্ঠত্বের আলোকস্তম্ভ বলে প্রমাণিত হবে। জীবদ্দশায়ও এবং মৃত্যুর পরও। দাওয়াতে ইসলামী আজ বিশাল ইউনিভারসিটির মর্যাদা লাভ করেছে। যে ব্যক্তিই ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ করে তার জন্যই পত্র পল্লবে সুশোভিত এই বৃক্ষ (ইসলামী আন্দোলন) প্রশান্তি ও শান্তনাদায়ক। সা'দ জগলুল পাশার কৃতিত্ব মিসরের স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। রয়ে গেছে শুধু কাহিনী ও কিছু সুন্দর স্মৃতি। ট্রাফলগার বিজয়ের সংগে সংগে নেলশন তার পরিণতি লাভ করেছে। পেছনে পড়ে আছে বীরত্বের নানা উপাখ্যান। ক্রামাভিল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও কায়জার প্রমুখ স্বনাম ধন্য ব্যক্তিগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাপনান্তে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এবং নিজেদের কীর্তিগাথা সাথে করেই নিয়ে গেছেন। কিন্তু হাসানুল বান্না এ ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী আত্মার জগতে তিনিও প্রস্থান করেছেন সত্য কিন্তু পেছনে রেখে গেছেন অনেক কিছু। তাঁর বিদায়ের পর শুধু তাঁর স্মৃতিই রয়ে যায়নি বরং তার দাওয়াতী তৎপরতা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যতদিন এ পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিনই তার এ সাদকায়ে জারীয়া বর্তমান থাকবে। তিনি কোন সীমাবদ্ধ জাতীয় স্বার্থ কিংবা দেশের স্বার্থ লাভ করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেননি। তার মিশন ছিল সমগ্র মানবতা এবং সারা জাহানের জন্য। তিনি তার মালিক ও মনীব, নেতা ও পথপ্রদর্শক প্রিয় নবী রাসূলে করীম (সা)-এর অনুসরণ করেছিলেন। ইমাম খতমে নবুয়াতের সে পয়গামই মানুষের সামনে পেশ করেন যা সর্বশেষ নবী (সা) উম্মাতের নিকট আমানত স্বরূপ রেখে গেছেন। রাসূলুল্লাহর পয়গাম ছিল বিশ্বজনীন। তিনি সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

"হে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ ! আমি নির্বিশেষে তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

হত্যার চক্রান্ত

হাসানুল বান্না তাঁর মালিক ও মনীবের আনুগত্য করার জন্যই মানবতাকে সম্বোধন করেন। তিনি কখনো এমন কথা বলেননি, "হে আরব জাতি কিংবা হে

www.amarboi.org

মুসলিম জাহানের অধিবাসীগণ !” বরং তিনি বলতেন, “হে আদম সন্তানগণ!” হাসানুল বান্না যখন আসন্ন বিপদের ঘনঘটা উম্মাতের মাথার ওপর ঘনীভূত হয়ে আসতে দেখেন তখন তিনি মন্ত্রী প্রবরগণের সাথে তাদের অফিসে ও বাসভবনে দেখা করতে শুরু করেন কিন্তু মন্ত্রী বাহাদুরগণ তাঁর সংগে মিলিত হতে গড়িমসি করতেন। তাঁরা বিপদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, হাসানুল বান্নারই দফা রফা করতে হবে। হাসানুল বান্নাও তাদের দুরভিসন্ধির কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন ইখওয়ানীদের ধরপাকড় শুরু হয় এবং তাদের দ্বারা দেশের সমস্ত জেলখানা ভর্তি করা হয় তখন হাসানুল বান্না সরকারের কাছে তাঁর গ্রেফতারীর দাবী করেন। কিন্তু সরকার তাঁর অনুসারীদের পায়ে শৃংখল পরিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করার নীলনকশা পাকাপোক্ত করেছিল। মিসরে প্রায়শঃই এরূপ হতো যে, কখনো এক অথবা কতিপয় যুবক মিলে কোন মন্ত্রীকে হত্যা করতো। কিন্তু এটা হতো তাদের ব্যক্তিগত ফায়সালার ভিত্তিতে। কারণ ইখওয়ান সাংগঠনিকভাবে কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দেয়নি। কিংবা উৎসাহিতও করেনি। হাসানুল বান্নার হত্যার পরিকল্পনা কোন এক ব্যক্তি কিংবা মন্ত্রীর ছিল না বরং মিসরের গোটা প্রশাসন যন্ত্রই এ কাজের সাথে জড়িত ছিল।

হাসানুল বান্নার মহত্ব ও গুরু গম্ভীর ব্যক্তিত্বের এ থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, মন্ত্রীদেরকে কোন এক ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে কতল করতো কিন্তু এ মহান ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সরকারের সকল মেশিনারী, নির্বাহী বিভাগ, সেনাবাহিনী এবং পুলিশকেও সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করতে হয়। হাসানুল বান্নার জীবনও শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর এবং তার মৃত্যু ও মহত্বের মহিমায় ভাস্বর। আমি এমন দাবী করছি না যে, ইখওয়ানের মধ্যে মুর্শিদের সাথে আমারই সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেননা আমি তাঁর জীবদ্দশায় বেশীর ভাগ সময়ই কায়রোতে ছিলাম না। ইখওয়ানের মধ্যে মুর্শিদের সর্বাধিক নিকটতম সাথী ছিলেন ডাক্তার হোসাইন কামালুদ্দিন, জেনারেল সালাহ শাদী, জনাব সালেহ আবু রাকীক ও উস্তাদ ফরিদ আবদুল খালেক প্রমুখ।

মুর্শিদের সাথে কারো সম্পর্ক খুব বেশী থাকুক বা কম সকল অবস্থায়ই তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমাদের সকলেই সাধ্যানুযায়ী অবশ্যই মেনে নিয়েছে।

নেতার আনুগত্য

প্রত্যেক দলেই নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের মধ্যে কোন না কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হওয়া এবং মতভেদ দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ইখওয়ানের মধ্যেও কোন কোন ভাইয়ের প্রস্তাব ও মতামত কখনো অন্যদের থেকে ভিন্ন হতো। যা হোক আল্লাহর শোকর এসব বিতর্কিত বিষয়ে আমি সর্বদা নিরপেক্ষ ও অনৈক্য থেকে দূরে থাকতাম। মুর্শিদে আ'ম হাসানুল বান্না শহীদের বিচক্ষণতার ওপর আমার ছিল অগাধ বিশ্বাস। আমি তারই চোখে দেখতাম, তার কান দিয়েই শ্রবণ করতাম এবং তাঁর বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করতাম। আমার এ অবস্থানকে অনেকে হয়ত ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু আমি ছিলাম মুর্শিদে আ'ম-এর এমন বিশ্বাস ভাজন ও অনুগত এবং তার বিচক্ষণতার ওপর আমার ছিল এত বেশী বিশ্বাস যে, আমি নিজেকে তাঁর

www.amarboi.org

ওপর পুরোপুরি এমনভাবে সোপর্দ করে দিয়েছিলাম যেন একজন জীবিত ব্যক্তির হাতে একজন মৃত ব্যক্তির লাশ। এমতাবস্থায় আমি ছিলাম খুবই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছিলাম। আবদুর রহমান সিন্দী মরহুম ইমামের জীবদ্দশায়ই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করে বসেছিল। কিন্তু ইমাম এ ব্যাপারে নির্লিপ্ততার পরিচয় দিতে থাকেন। সাথে সাথে প্রতিকারের চেষ্টায়ও আত্মনিয়োগ করেন। চূড়ান্ত ফায়সালা করার পূর্বেই মৃত্যুর হিমশীতল থাবা তাঁকে নশ্বর দুনিয়া থেকে তুলে নিয়ে যায়।

বস্তুত ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দৃষ্টিতে সংগঠনের মধ্যে হাসানুল বান্না শহীদ ও হাসান আল হুদাইবী মরহুম-এর মর্যাদা ছিল অত্যন্ত শীর্ষে। সর্বস্তরের ইখওয়ান যুগপৎ ভাবে এ দু'ব্যক্তিত্বকে এমন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন যে, তাদের বিপক্ষে আওয়াজ উত্তোলনকারী ব্যক্তি মাত্রই তাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতো। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের স্বভাব-প্রকৃতি এবং শিক্ষা-দীক্ষাই ছিল এমন প্রকৃতির যে, তারা তাদের মুর্শিদের অনুরক্ত—ভক্ত হয়ে থাকেন এবং তার নির্দেশ পালনে থাকেন সদা প্রস্তুত যদি তা শরীয়াতের নিষিদ্ধ সীমানার আওতায় গিয়ে না পড়তো।

ইবলীস ও তাঁর পরামর্শ সভা

১৯৪৯ সালে নাকরাশী পাশার মন্ত্রীত্বের আমলে ইখওয়ানের নামকরা সকল সদস্যকে গ্রেফতার করে জিন্দানখানায় পর্দার অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় আমাকেও বন্দীত্বের মনযিল অতিক্রম করতে হয়। ইত্যবসরে নাকরাশী পাশা নিহত হয় এবং তার স্থানে ইবরাহীম আবদুল হাদী প্রধান মন্ত্রীত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন। ইবরাহীম আবদুল হাদী ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার পর পরই সর্বপ্রথম যে কাজটি সম্পন্ন করেন তা ছিল হাসানুল বান্নাকে হত্যার পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবে রূপদান করার গোপন ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন। এটা কিন্তু নিহত প্রধান মন্ত্রী নাকরাশী পাশার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহ ফারুককে সন্তুষ্টি করা ও সান্ত্বনা প্রদান। ফারুকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, ইখওয়ান যেভাবে দিন দিন জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব সৃষ্টি করে চলেছে তাতে যে কোন সময়ই তার ক্ষমতার মসনদ উল্টে যেতে পারে। এ প্রসংগে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি যে, ইখওয়ানের পাশাপাশি মিসরীয় যুব সমাজও (মিসরুল ফাতাত) গণজাগরণ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ফারুক যদি আরো কিছু সময় অবকাশ পেতেন তা হলে ইমাম হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর মিসরীয় যুব সমাজের নেতা আহমদ হোসাইন তার শিকারে পরিণত হতো।

প্রদীপ্ত সূর্য ঢাকা পড়ল অন্ধকারে

১৯৪৯ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জনৈক মন্ত্রী ইমামের সাথে যোগযোগ করে আবেদন জানান যে, তিনি ইমামের সাথে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের

www.amarboi.org

(মুসলিম যুবদলের) দপ্তরে মিলিত হতে চান। এ ইমারত কায়রোর প্রসিদ্ধ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। ইমাম যথানিয়মে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্ধ্যার সময় সে ইমারতে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। সংগে ছিল তারই ভগ্নিপতি জনাব আবদুল করিম মনসুরও। সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হয়ে গেছে। দিগন্ত জুড়ে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে লাগলো অথচ পূর্বোল্লেখিত মন্ত্রী বাহাদুরের সেখানে আগমন ঘটলো না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ইমাম ও আবদুল করিম মনসুর বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। এক টেক্সিচালককে ডাকেন। তিনি তখনো টেক্সিতে আরোহণ করতে পারেননি। ইত্যবসরে সমগ্র এলাকার বিদ্যুৎ চলে যায় এবং গোটা সড়ক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ঠিক সে মুহূর্তেই অত্যন্ত নিকট থেকেই দুই কিংবা তিন জন লোক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এলোপাথাড়ি গুলী বর্ষণ করতে থাকে। ইমামের শরীরে কয়েকটা গুলী বিদ্ধ হয়। তথাপি তিনি সাহস করে পূর্বোক্ত ইমারতে ফিরে যান। আঘাত ছিল অব্যর্থ ও প্রাণ সংহারক। তিনি নিজেই এ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করেন। তাঁর সাথীও আহত হয়ে ছিলেন। জরুরী এ্যাম্বুলেন্স সেখানে গিয়ে পৌছে এবং আহত উভয়কেই কাসরুল আইনী হাসপাতালে নিয়েও যায় কিন্তু হাসপাতালে নির্দেশ এসে পৌছেছিল যে, হাসানুল বান্নার ক্ষতস্থান থেকে যেন রক্ত প্রবাহিত হতে দেয়া হয় এবং তাঁর জীবন রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টা যেন মোটেই চালানো না হয়। এভাবে উম্মাতের এ মহান কৃতি সন্তান এবং আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জুলুমের শিকার হয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে চলে যান।

মযলুমের আর্তনাদ

এভাবে এই ষড়যন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু অত্যাচারিতের আহাজারি এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে কোন পর্দার অন্তরাল থাকে না। আমি আল্লাহ তায়ালার ইজ্জত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করে বলতে পারি যে, মজলুমের সাহায্যে অবধারিতভাবে আল্লাহ তায়ালা এগিয়ে আসেন যদিও অনেক সময় তাতে কিছু সময় লাগে। সত্যিই আল্লাহ তায়ালার নিকট বিলম্ব রয়েছে কিন্তু অন্ধকার নেই। এটা আল্লাহ তায়ালার অটল ওয়াদা এবং ইতিহাসের জানালা দিয়ে উঁকি মারতে অভ্যস্ত ব্যক্তি মাত্রই এর বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারেন। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক ফেরাউন ও শাদ্দাদই এথেকে বেপরোয়া হয়ে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার পরিচালিত করে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে না।

অত্যাচারীকে অবকাশ দেয়ারও তাৎপর্য রয়েছে

জালিমকে অবকাশ পেতে দেখে আমরা অনেক সময় বিস্মিত হই। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রতিটি কাজেই আল্লাহ তায়ালার হিকমত নিহিত থাকে। আমরা আমাদের দুর্বল মস্তিষ্ক ও সংকীর্ণ চিন্তাধারায় তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই না। আমরা সৃষ্টি আমাদের সামর্থ ও যোগ্যতা সীমাবদ্ধ কিন্তু স্রষ্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সকল প্রকার দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত। রাতের আগমন যদি না হতো তাহলে দিনের পরিচয় কিভাবে লাভ করা যেতো ? তেমনিভাবে অত্যাচার উৎপীড়নের অস্তিত্ব না থাকলে ন্যায় ও

www.amarboi.org

সুবিচারের গুরুত্ব বুঝা যেতো কিভাবে ? ক্রোধ ও ঘৃণার দানব বর্তমান না থাকলে স্বাধীনতা লাভের মরণপণ সংগ্রামে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেইবা অগ্রসর হতো।

ইমাম শহীদ তাঁর দায়িত্ব পালন করে আখেরাতের অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তার উত্তম কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত। আর তিনিই বিনিময় দাতা। আমরা আমাদের এ গুনাহগার চক্ষু দ্বারা এটা দেখতে পাচ্ছি যে, ইমাম শহীদের দাওয়াত বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বসন্তের শোভায় শোভিত হচ্ছে। উম্মাতে মুসলিমা ও মুসলিম শাসনকর্তাগণ কতইনা সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। যদি তারা এ দাওয়াতের মূলনীতিসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বুনিয়াদ বানিয়ে নেয়। এ মৌলিক ভিত্তি পাহাড় অপেক্ষা অধিক মজবুত। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ক্রমেই এ পরিবর্তন আসতে পারে আর আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এটা কোন কঠিন কাজও নয়।

আমাদের শাসনকর্তাগণ যেদিন ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা কায়েম করবেন সেদিনই আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসেবে তাদের নির্দেশের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেবো। সেদিন হবে কতইনা কল্যাণময় যেদিন উম্মাতে মুসলিমার প্রতিটি ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি খুশী হয়ে যাবে। ইমাম শহীদের ওপর আল্লাহ্ তায়ালা তার অবারিত রহমত নাযিল করুন। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পূর্বেই তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা-দীক্ষার সাথে যথাযথভাবে পরিচিত করিয়েছেন। এসব শিক্ষা এমন উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট যে, তার একান্ত গোপনীয় বিষয়সমূহও দিবালোকের ন্যায় দীপ্তমান। ইসলামের নীতিমালার শতাব্দীকাল ধরে জমে ওঠা ধূলাবালি ও আবরণ সরিয়ে মানবতাকে পুনরায় এ দ্বীনে হকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এটা এমন কৃতিত্বপূর্ণ সংস্কার কর্ম যা সর্বদা প্রশংসা কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম-এর নির্বাচন

ইমাম শহীদের ইনতিকালের পর ইখওয়ানও এমন এক পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে যে পরিস্থিতিতে যে কোন দল বা সংগঠনে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। প্রত্যেক মানব সন্তানকে নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুর পেয়লা পান করতে হবে। কিন্তু কারো মৃত্যুতেই প্রকৃতির এই কারখানা থেমে যায় না। ইমামকে শহীদ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর আন্দোলন তখনো জীবিত ছিল। এখন প্রশ্ন দেখা দিল যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন কে ? এ মহান দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদে ভূষিত হওয়ার যোগ্য কতিপয় ব্যক্তিত্ব ছিল। সালেহ আস সাদী মরহুম ইমামের জীবদ্দশায় সহকারী মুর্শিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন কমার্স কলেজের গ্রাজুয়েট এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী। তাঁর জন্য বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করার প্রভূত সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি সকল পদমর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে নিজের জীবন ও যোগ্যতা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

www.amarboi.org

ইমাম শহীদের সহোদর ভ্রাতা উস্তাদ আবদুর রহমান আল বান্নাও ইখওয়ানের সারিতে বর্তমান ছিলেন এবং যে কোন গুরুদায়িত্ব পালন করার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। ইখওয়ানের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল হাকীম আবেদীন-এর ওপরও সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি আর্টস এবং আইন বিষয় গ্রাজুয়েট ছিলেন। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ধন্য করেছিলেন। তদুপরী তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তাও। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জনাব ওস্তাদ আল বাকুরী একাধারে যোগ্যতা জ্ঞান ও পান্ডিত্য এবং শিষ্টাচার সৌজন্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তাঁর মধ্যেও ইখওয়ানের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ছিল।

উপরোল্লিখিত মহান ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। নিসন্দেহে এদের প্রত্যেকের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য তাদের মতামতও প্রদান করতো। কিন্তু তাদের কেউ-ই এ পদের জন্য আকাংখী ছিলেন না। সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময়ের সময় তাদের পছন্দনীয় নেতৃত্বের পক্ষে বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন। কখনো কখনো আলোচনায় তিক্ততার প্রকাশ ঘটতো আবার কখনো তা চলতো ধীরলয়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সকলের প্রতিই অত্যন্ত শ্রদ্ধাপোষণ করতাম। কিন্তু কাউকেই অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতে পাচ্ছিলাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের মধ্যে যাকেই বাছাই করে নেয়া হোক না কেন ইখওয়ানের জন্য তাঁর নেতৃত্বই কল্যাণকর হবে। এ ব্যাপারে পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয় কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

এ আলোচনা চলাকালে শেষ পর্যন্ত উস্তাদ মুনীরুদ্দৌলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি তখন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন এক প্রস্তাব পেশ করেন। অপর দু'জন প্রভাবশালী সদস্য উস্তাদ ফরিদ আবদুল খালেক (শিক্ষা বিভাগ) এবং উস্তাদ সালেহ আবু রাকীক (আরব লীগের উপদেষ্টা) তাঁর উপস্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল এই যে, ইখওয়ানের সুপরিচিত ব্যক্তিগণের পরিবর্তে এমন কোন সদস্যকে এ পদের জন্য মনোনিত করা হোক যিনি একদিকে হবেন বিচার বিভাগের লোক অপরদিকে হবেন এমন ব্যক্তিত্ব এখনো পর্যন্ত যিনি খুব একটা সুখ্যাতির অধিকারী ও পরিচিত নন। এ প্রস্তাব ইখওয়ানের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ফলে উস্তাদ সালেহ আসমাদীর বাড়ীতে ১৯৫২ সালে ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে উস্তাদ হাসান আল হুদাইবিকে মুর্শিদে আ'ম হিসেবে বাছাই করেন এবং সকলেই তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

মুর্শিদে আ'ম হাসান আল্ হুদাইবির ব্যক্তিত্ব

মহা সম্মানিত মুর্শিদে আ'ম (দ্বিতীয়) হাসান আল হুদাইবি ছিলেন আপিল কোর্টের জজ। তিনি ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের ব্যাপক পড়াশুনা করেন। আল্লামা ইবনে হাযম-এর ফিকহী মতামত দ্বারা তিনি খুবই প্রভাবিত হন। ইবনে হাযম বিরচিত ও বহুল আলোচিত আল্ মোহাল্লা এবং আল ওয়াসীত গ্রন্থদ্বয় তিনি বহুবার আদ্যোপান্ত

www.amarboi.org

পাঠ করেছিলেন। এমনকি এগুলোর কয়েকটি অংশ তার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। ফিকাহ্ শাস্ত্রের ওপর রচিত যাবতীয় গ্রন্থের ওপর ছিল তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ ও আইনবিদ। তিনি যখনই কোন বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করতেন তখনই সে বিষয়ে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্র ও বুনিয়াদী নীতিমালার আলোকে জ্ঞানগর্ভ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন। এমনিতেই তাঁর ফায়সালা সাধারণ বিচারকদের ন্যায় শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট মামলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো না। বরং তা ভবিষ্যতের জন্য বিচার বিভাগের সদস্য ও উকিলদের জন্য বিচার বিষয়ক দৃষ্টান্ত হয়ে যেতো। তাঁর প্রদত্ত ফায়সালা আজ পর্যন্ত রেফারেন্স ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে।

ইখওয়ানের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও সমাবেশে আমি মরহুম হাসান আল হুদাইবিকে বহুবার দেখেছি। সকল ব্যাপারেই তাঁর আচার-আচরণ হতো সর্তকতামূলক বিজ্ঞজনোচিত এবং হুবহু কুরআন-সুন্নাহ্ মাফিক। আজও আমার খুব ভালভাবেই মনে আছে যে শাবীনুল কানাতিরস্থিত কেন্দ্রীয় সংগঠনে একবার আমাদের সমাবেশ হচ্ছিল। হাসান আল হুদাইবি মরহুম সে সময়ও আদালতের জজ ছিলেন। তিনি সমাবেশে যোগদান করেছিলেন। ষ্টেজ সেক্রেটারী আমাকে বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন। আমি আমার বক্তব্যের সূচনা করি একথা বলে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন অন্যান্য সংগঠন থেকে কতিপয় ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন আমরা কারো ওপর আক্রমণ করি না। কিংবা কারো দোষ-ত্রুটি নিয়ে চর্চা করি না। আমাদের দৃষ্টিতে অন্যান্য সংগঠনের দুর্বলতা আমাদের জন্য কোন কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। বরং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, ইতিবাচকভাবে নিজেদের দাওয়াত ও তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করা। অতপর আমার স্মরণ আছে যে, আমি আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু কথা বলে ফেলি যা আমার প্রারম্ভিক বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি ছিল। তারপর আর যায় কোথায়। মুর্শিদে আ'ম মরহুম ঠিক সে মুর্হূতেই তাঁর স্বভাবসুলভ বিজ্ঞোচিত গুরুগম্ভীর ভংগীতে আমাকে ত্রুটি উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ "যে ভংগীতে অগ্রসর হচ্ছিলে তা ছেড়ে দিলে কেন , তৎক্ষণাৎ আমি আমার ভ্রান্তি উপলব্ধি করলাম এবং সংগে সংগে নিজেকে সামলে নিয়ে পুনরায় সঠিক গতিতে চলতে লাগলাম।

প্রসংগক্রমে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। এটা মূলত প্রকৃত সত্যের প্রকাশ আত্মপ্রচার নয়। লেখা বক্তৃতা ও আলোচনা পর্যালোচনায় আমার নীরব ও আপোষমূলক মনোবৃত্তি রাজনীতি বা কৃত্রিমতা কোনটাই নয়। বরং আমার স্বভাব-প্রকৃতিই এমন যে, মানুষের সাথে সকল ব্যাপারেই নম্রতা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভংগী ছাড়া আমার কোন গত্যন্তরই থাকে না। আমার অবস্থা হলো এই যে, কেউ যদি আমার প্রতি অত্যাচারও করে তবুও আমি তার কাছে ওজর পেশ করি এবং উল্টো তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই। এভাবে প্রতিপক্ষের স্নায়ুবিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

www.amarboi.org

প্রথম ও দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম-এর ব্যক্তিত্বের তুলনা

মুর্শিদে আ'ম হাসানুল বান্না শহীদ ও মর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবি মরহুম-এর স্বভাব প্রকৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার কিছু কিছু ব্যাপারে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক দৃষ্টিভংগী পোষণ করতেন। প্রথম মুর্শিদে আ'ম তাঁর কর্ম ও মর্যাদার ভিত্তিতে পরিস্থিতি অনুসারে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা বলতেন। তিনি সাধারণত কখনো নীরবে বসে থাকতেন না। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান আল হুদাইবি মহুমের ছিল নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও স্বকীয় মর্যাদা। তিনি ছিলেন স্থির চিত্ত ও নীরব প্রকৃতির মানুষ। শিক্ষকগণ বেশী কথা বলে থাকেন। অপরদিকে বিচারক বেশী শুনতে অভ্যস্ত হন। ইমাম আল বান্নার চেহারা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতো। কিন্তু ইমাম আল হুদাইবি বিচারাসনের দাবী মোতাবেক সর্বদা থাকতেন ভাব গম্ভীর ও স্থিরচিত্ত। আল হুদাইবির সম্মুখে কেউ ভণ্ডামি ও হটকারিতা প্রকাশ করতে পারতো না। তাঁর সম্মুখে যদি ইখওয়ানের কোন দু'জন সদস্য পরস্পর কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হতো তাহলে তাঁর তিরস্কার শুনে উভয়ের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেতো। তার বিখ্যাত যে উক্তিটি আমাদের সবার মনে আছে তা হচ্ছে ঃ "যদি তোমরা নিজেদের দু'জনের বিবাদ উত্তমরূপে নিষ্পত্তি করতে না পারো তাহলে অন্যদের মধ্যকার ঝগড়া মিটাবে কিভাবে?" এ দোয়া সর্বদা তাঁর মুখে লেগে থাকতো "হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার আনুগত্য করার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা দান করো।"

দৃঢ়তার পাহাড়

ইখওয়ানের ওপর এটা আল্লাহ তায়ালার বড়ই অনুগ্রহ যে যখন ঝগড়া বিবাদের পরিবর্তে নীরবে নিভৃতে আন্দোলনের ওপর অবিচল থাকা এবং অত্যাচার উৎপীড়নের মোকাবিলায় ধৈর্যের মহড়া দেয়ার প্রয়োজন ছিল ঠিক তখনি আল্লাহ তায়ালা হাসান আল হুদাইবিকে আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি তাঁর স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী ঐ সময়ের জন্য সর্বোত্তম নেতা ও উপযুক্ত কর্ণধার ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের আমলে আন্দোলন জুলুম-নিপীড়নের নিকৃষ্টতম উদাহরণের সম্মুখীন হয়। কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা এ ঘোর অন্ধকারময় সময়েও ইখওয়ানের উদ্যমকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয় এবং প্রতিটি অগ্নিকুন্ড থেকে তিনি বিশুদ্ধ সোনারূপে প্রমাণিত হয়ে বের হন। ১৯৫৪ সালে কঠোর পরীক্ষা থেকেও ইখওয়ান সফলকাম হয়ে যায়। তাঁরা ফাঁসির কাষ্ঠকে জানিয়েছিল স্বাগতম এবং তাদের মুর্শিদের উন্নত নৈতিক চরিত্র ও স্বাধীনচেতা ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইতিহাসকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। কবির ভাষায় ঃ

دستِ جفا سر ہیں یہ ارباب وفا کے
کٹ جائیں تو کٹ جائیں جھکائے نہیں جاتے

"অত্যাচারীর নিষ্ঠুর হস্তে বিশ্বাসীদের মস্তক যদি দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়, যাক তথাপি এ শির অন্যায়ের সম্মুখে নত হবে না কোনদিন।"

www.amarboi.org

জুলুম অত্যাচার এবং ভয়ভীতি দ্বারা আন্দোলনকে প্রতিহত করা গেলো না। বরং শহীদদের রক্ত সফল হয়ে উঠতে থাকলো এবং সত্যের আন্দোলন এমন সবস্থানে পৌঁছে গেল যেখানে আমরা পৌঁছতে পারিনি। ইখওয়ানের নেতা ও কর্মীরা জিন্দানখানার অন্ধকার কুঠরিতে ছিলেন আবদ্ধ। কিন্তু সত্যের আওয়াজ দেশের আনাচে কানাচে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। কবির ভাষায় ঃ

ہم تو قفس میں اسیر تھے مستقل
اور بہار گلشن میں دھومیں مچا گئی

"আমরা তো পিঞ্জিরায় ছিলাম আবদ্ধ
অথচ ঋতুরাজ বসন্ত ফুল বাগিচায় উৎসব করে গেল।"

নূতন ফাঁদে পুরনো শিকারী

ইখওয়ানের ধৈর্য ও স্থৈর্য এবং সাহস, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা সত্য পথের পথিকদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণও এসব দৃষ্টান্ত দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে। তাদের ধারণাও ছিল না যে, এ রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট মানুষ এমন অনমনীয়তা ও দৃঢ়তার প্রদর্শনী করতে পারে। তাদের তথাকথিত বিশেষজ্ঞ, পন্ডিতবর্গ, নতুন করে অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করে এবং ইখওয়ানকে নির্মূল করার জন্য নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব দেয়। পুরাতন শিকারীরা নতুন জাল বিস্তার করে এবং আল্লাহর বাজ পাখীদের ফাঁদে ফেলার জন্য নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। তারা বলেন, সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার কূটকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এখন প্ররোচনা ও নম্রতার ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে।

এটা ছিল বাদশাহ ফারুকের শাসনামলের শেষ দিকের কথা। তখন আল হুদাইবি মরহুম ছিলেন মুর্শিদে আ'ম। ইখওয়ানের ওপর প্রযুক্ত বিষ ক্রিয়া করতে পারেনি। অতএব এখন মিষ্টিভাবে তাদের মারার বন্দোবস্ত করা হয়। ইখওয়ানদের কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। তাদেরকে তাদের সরকারী পদে পুর্নবহাল করার নির্দেশ জারী হয়। অনেককে বন্দীত্বের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। "আদ্ দাওয়াত" পুস্তিকা পুনরায় প্রকাশের অনুমতিও পাওয়া যায়। কেন এসব আয়োজন? বাস্তবিকই কি ইখওয়ানকে স্বাধীনভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের অধিকার প্রদান করা হয়েছিলো? না, বরং সরকারের জন্য তাদের মনে একটু স্থান সৃষ্টি করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য।

এ সংগীত বসন্তের মুখাপেক্ষী নয়

ঐ লোকগুলো আগেও ইখওয়ানকে বুঝতে পারেনি এখনও পারছে না। ইখওয়ানের দাওয়াতি কাজ কখনো বন্ধই হয়নি। তারা জেলখানার মধ্যে থাকুক কিংবা বাইরে। তাদের পুস্তিকা 'আদ-দাওয়াত' বন্ধ হয়ে যাক বা বহাল থাকুক। সকল অবস্থায়ই তাদের প্রাণান্ত প্রয়াস অব্যাহত ছিল। ১৯৪৪ সাল থেকে

www.amarboi.org

'আদ-দাওয়া' পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এর প্রকাশনা কখনো ব্যহত হয়নি। আদ-দাওয়া প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে এর কর্মীরা ভিন্ন নামে তাদের মতামত প্রকাশ অব্যাহত রাখেন।

শকুনী ও বাজ পাখীর জগত এক নয়

সরকারী মহলে এ প্রত্যাশা করা হচ্ছিলো যে, উস্তাদ আল হুদাইবি শাহ ফারুকের সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানাবেন যাতে দেশের উপর ঘনীভূত বিপদ প্রতিহত করার জন্য সরকার ও ইখওয়ান সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সরকারের অনেক মুখপাত্র তার সাথে আলোচনায়ও মিলিত হন। কিন্তু তিনি এরূপ কোন উদ্যোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর দৃষ্টিতে শাহের সাথে দেখা করার আবেদন দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কোথায় মুর্শিদে আ'ম আর কোথায় পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক শাহ্ ফারুক ! কবির ভাষায় ঃ

عطائے شاہ دو جہاں کی نہ پوچھ
سلاطیں کا سلطاں گدائے محمد

"দোজাহানের মহারাজ, শাহেন শাহ্ নিঃসম্বল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের অবদানের কথা জিজ্ঞেস করো না।"

অবশেষে শাহ নিজেই তার সংগে সাক্ষাতের জন্য তাঁকে দাওয়াত দেন। তিনিও তার আহবানে ইতিবাচক সাড়া দেন এবং যথা নিয়মে তার সাথে সাক্ষাত করতে যান। সাক্ষাত হয় কিন্তু মুর্শিদে আ'ম-এর ভূমিকা এবং ইখওয়ানের দাওয়াতের ব্যাপারে তার চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন খুব কমই আসতে পারতো। সাক্ষাতকার শেষে তিনি যখন বাইরে আসেন তখন সাংবাদিকগণ তাঁকে ঘিরে ধরেন। তিনি মাত্র চারটি শব্দে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। "মোকাবালাতুন কারীমাতুন লি মালেকীন কারিম" অর্থাৎ উত্তম বাদশাহর সাথে উত্তম সাক্ষাত হয়েছে। বিদগ্ধ পাঠকগণ যদি এ চারটি শব্দ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলে তাঁদের সম্মুখে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, মুর্শিদে আ'মকে আল্লাহ্ তায়ালা কি পরিমাণ বাগ্মিতা, বাকপটুতা ও কৌশল প্রদান করেছিলেন। তিনি এ চারটি মাত্র শব্দে তা বলে দিয়েছিলেন যা লম্বা চওড়া প্রেস কনফারেন্সেও প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

www.amarboi.org

দশম অধ্যায়

যে সময় আমরা সামরিক জেলখানায় বন্দী ছিলাম তখন আমাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নির্দেশ দেয়া হতো যেন আমরা উম্মে কুলসুমের গান তারই সুরে সমস্বরে গাই। সাধারণত আমাদের সেই জঘন্য গানটি গাইতে বলা হতো যাতে নাসেরের মহত্ব ও কৃতিত্ব এবং ফেরাউনের প্রশংসা করা হয়েছিলো। "হে জামাল! হে মিসরের কৃতিসন্তান"! ওগো দেশ প্রেমের আদর্শ। এ সময় জেলখানার সুউচ্চ ছাদের উপর সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত সৈনিক আমাদের সারির প্রতি তাক করে সদা প্রস্তুত দাঁড়িয়ে থাকতো। যেন আমাদের মধ্য থেকে কেউ নির্দেশ পালন না করার ধৃষ্ঠতা দেখালে তাকে উড়িয়ে দিতে পারে। এসব নাটকের একটিতে একজন অফিসার মুর্শিদে আ'ম আল হুদাইবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট গিয়ে অত্যন্ত ক্রোধ ভরে আদেশ করেন "মাটির ওপর সজোরে পদাঘাত করো"। মুর্শিদে আ'ম এ নির্বোধের ন্যায় নির্দেশের প্রতি অত্যন্ত নির্ভীকতা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে বললেন ঃ "আমি মাটির উপর পদাঘাত করলে তাতে কি পেট্রোল কিংবা তরমুজ খরমুজ বেরিয়ে আসবে।" এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এমন নির্ভীকতাপূর্ণ জবাব দেয়া নিশ্চিত মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানোর সমান। এটা সব মানুষের কাজ নয়। কিন্তু এতটুকু বলে রাখা সুধী পাঠকগণের সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট যে, এরূপ জবাব দাতা ছিলেন হাসান ইসমাঈল আল হুদাইবি।

আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা দাতা

আত্মমর্যাদাবোধ, সাহসিকতা ও দৃঢ়তা বিপদের ঝুঁকিকে অন্তরে স্থান না দেয়া আর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কেউ চাইলে হাসান আল হুদাই-বির নিকট থেকে শিখে নিতে পারে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যে তারই ইচ্ছা ব্যতীত একটা পাতাও নড়তে পারে না। আল্লাহ তায়ালার এ দুনিয়াতে মানুষের জন্য দু'টো দিনই রয়েছে, একটি হচ্ছে সেই দিন যেদিন তার জীবনের শুভ সূচনা হয়। আর অপরটি হচ্ছে সেইদিন যেদিন তার মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। অতএব একজন সত্যনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ মু'মীন ব্যক্তির ভয় কিসের। তার জানা আছে যে, যতদিন তার হায়াত রয়েছে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলেও তাকে মেরে ফেলতে পারে না। আবার যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন কেউ সে মৃত্যুকে হটিয়ে দিতে পারবে না। আর না পাওয়া যাবে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার মতো কোন নিরাপদ জায়গা।

হাসান আল হুদাইবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সাদাতের শাসনামলের প্রথম দিকে যখন মুক্তি দেয়া হয় তখন অগণিত লোক আগমন করেন যারা বিভিন্ন ব্যাপারে এবং তাঁর সংকলন সম্পর্কে মতানৈক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা এসে তাঁর খেদমতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সাক্ষাতকারও স্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী। মুর্শিদে আ'ম মরহুমের মহান ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর এতে পরিদৃষ্ট হয় যে,

www.amarboi.org

তিনি এসব পূর্বতন বিরোধীদেরকে অত্যন্ত হাঁসিমুখে স্বাগত জানান। এখন যেহেতু এসব লোকের নিকট সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে গিয়েছে সে জন্য তিনি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের পূর্বের কোন আচরণের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেননি। কিংবা তাদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করেননি।

সর্বক্ষণ বেগবান

ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু হাসান আল হুদাইবি যথারীতি মুর্শিদে আ'ম হিসেবে পরিচিত রইলেন। এরূপ মনে করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পত্র-পত্রিকায় ইখওয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল ঠিকই কিন্তু কার্যত সকল কর্মতৎপরতা অব্যাহত ছিল। ইখওয়ান ছোট বড় সকল ব্যাপারেই দিক নির্দেশনা গ্রহণের জন্য মুর্শিদে আ'ম-এর নিকট যেতো। এ তথাকথিত আইনগত নিষেধাজ্ঞা কি করে হকের দাওয়াতের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? প্রচার প্রচারণা ছাড়াও তো কাজ হতে পারে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তার জন্য মহব্বত, একজন মুসলিমের অপর মুসলিমের সাথে মিলিত হওয়া, তেলাওয়াত ও দারসে কুরআনের জন্য বসা, নবীর জীবন চরিত, ফিকাহ ও তাফসীরের সমাবেশের ব্যবস্থা করা, দেশ ও দেশবাসীর কুশলাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া ইত্যাকার কর্মকান্ডের মধ্যে কোনটি এমন যেটাকে আপনি বেআইনি ও অবৈধ বলতে পারেন। দেশের শাসনতন্ত্রই এসব কাজের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। শান্তি-শৃংখলা বিধানকারীগণ তাদের নির্বুদ্ধিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর কারণে এ বিষয়গুলোকে বেআইনি এবং জননিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ ঘোষণা করলে তা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

সসম্মানে মুক্তি দান

ইখওয়ানের কোন কর্মসূচী দ্বারা দেশের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোন আশংকা নেই। তথাপি বর্তমান অবস্থা হলো জননিরাপত্তার নামে পুলিশ ইখওয়ানের ডজনে ডজনে কর্মীকে গ্রেফতার করে থাকে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস তাদের আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করে। কত আন্তরিকতাপূর্ণ আতিথেয়তাই না দেখিয়ে থাকেন ইখওয়ানের এসব মেহমানদের! আল্লাহ তাদের হিদায়াত নসীব করুন। কিছুদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন সেইসব গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পেশ করা হয় তখন আদালত চার্জশীট দেখা মাত্রই "অভিযুক্ত"দের মুক্তিদানের নির্দেশ প্রদান করে। যে ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ লোকগুলোকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সরকারী মেহমান হিসেবে রেখে দেয়া হয় তা শুনামাত্রই আদালত মুহূর্তের মধ্যে তাদের মুক্তির ফায়সালা শুনিয়ে দেন।

নাসেরকে কাফের ঘোষণা করার ব্যাপারে হাসান আল হুদাইবির ভূমিকা

জামাল আবদুন নাসেরের কুখ্যাত শাসনামলে কারাগারে আমাদের ওপর যখন নির্যাতন নিপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিলো তখন কোন কোন যুবক বন্দী এ

www.amarboi.org

বর্ণনাতীত জুলুম-নিপীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, নাসেরকে কাফের মনে করতে হবে। তাঁরা বেশ কিছুদিন গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং অবশেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নাসের যে নিকৃষ্টতম শাস্তি ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছে তা এমন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যার অন্তরে তিল পরিমাণ ঈমানও বিদ্যমান আছে। এসব যুবক যাদের রাতও কাটতো নানা প্রকার শাস্তির মধ্যদিয়ে আর দিনও অতিবাহিত হতো বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে। নাসেরের কাফের হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে কনো প্রকার সন্দেহ সংশয় ছিল না। আমাদের উপর পরিচালিত অত্যাচারের যে ষ্টীমরোলারের বিবরণ বিশ্ববাসীর দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা প্রকৃত অবস্থার তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। উপরোক্ত ইখওয়ানীদের অন্তরে এ চিন্তাধারা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, নাসের মুসলিম নয়। লিমান তারার কয়েদখানায় এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারাগারের অভ্যন্তরেই মুর্শিদে আ'ম যখন এ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন তখন তিনি এ মতামতের নেতৃস্থানীয় ইখওয়ানী যুবকদেরকে তাঁর নিকট ডেকে পাঠান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেন। অধিবেশনের সমাপ্তিতে মনে হচ্ছিল যে যুবকগণ তাদের মতামত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং মুর্শিদে আ'ম-এর মতামতের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা ছিল না। তাঁরা মুর্শিদে আ'ম-এর সম্মানে আপাতত নীরবতা অবলম্বন করেছিল সত্য কিন্তু তাদের চিন্তাধারায় কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। বাইরে এসে তারা পুনরায় কঠোরভাবে সে মতামতের সমর্থনেই সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মুর্শিদে আ'ম বুঝতে পারলেন যে, তারা তাদের এ দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করবে না। অতএব তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "দুয়া'ত লা কুজাত"(সত্য পথের আহবানকারী মাত্র ফতোয়া দাতা নয়) লিখেন ও তা প্রকাশ করেন।

মুর্শিদ মরহুমের উপরোল্লিখিত প্রকাশনা দাওয়াতে হকের কর্মী ও সদস্যগণ এবং ইসলামী বিপ্লবের পতাকাবাহী লোকদের জন্য বড়ই উপকারী ও দিক নির্দেশক গ্রন্থ। এ গ্রন্থের সংকলনে তার গুণমুগ্ধ ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র উস্তাদ মামুন আল হুদাইবি (জজ আপিল কোর্ট) এবং উস্তাদ মুস্তফা মাশহুর প্রমুখ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। মুর্শিদে আ'ম কাফের ফতোয়া দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। আর তিনি যা বর্ণনা করেছিলেন তাই ছিল সত্য ও যথার্থ।

কালেমার স্বীকৃতি প্রদানকারী কোন ব্যক্তির উপর কুফরের ফতোয়া দেয়া কিংবা তাকে কাফের মনে করা কোন মা'মুলী কথা নয়। কোন মুসলিম অত্যাচার-উৎপীড়ন, পাশবিকতা-নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার যত চরমেই গিয়ে উপনিত হোক না কেন, তাকে কাফের বলা জায়েজ নেই। এ বিষয়ে রাসূল (সা)-এর কাছ থেকে এত অধিক সংখ্যক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তন্মধ্যে একটি হাদীসের বর্ণনাকারী হচ্ছে মুয়ায বিন জাবাল (রা) তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সওয়ারীতে তাঁর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে তিনি সম্বোধন করলেন ঃ "হে মুয়ায ! আমি আরজ করলাম, "লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক!" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "তোমার কি জানা আছে যে, আল্লাহর বান্দাদের উপর এবং বান্দার আল্লাহর উপর কি কি অধিকার রয়েছে ?" আমি প্রত্যুত্তরে আরজ করলাম, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন।" তিনি বলতে লাগলেন, বান্দাহর ওপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে, তারা একনিষ্ঠভাবে তারই আনুগত্য করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর বান্দার অধিকার হচ্ছে, যারা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না। তিনি তাদেরকে আযাব থেকে নিরাপদ রাখবেন।" আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! লোকদেরকে কি এ সুসংবাদ শুনিয়ে দেবো ?" জবাবে রাসূল (সা) বললেন, "না, তাহলে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।"

জামায়াতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ

কাফের বলে অভিহিত করা কোন মা'মুলী ব্যাপার নয়। পরবর্তী কালে মিসরে এমন দ্বীনি জা'মায়াতও আত্মপ্রকাশ করে যার নামই "জামায়াতুত তাকফীর ও হিজরাহ" রাখা হয়। এ জামায়াত মাযহাবী আবেগ বশত যে ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার যে ফলাফল প্রকাশ পায় তা কারো অজানা নয়। যা হোক এ ব্যাপারে আমি অদ্যাবধি নিশ্চিত নই যে, শেখ যাহাবী (ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রী)-কে হত্যা করেছিল। অভিযোগ তো জামায়াতুত তাকফীরের ওপরই আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কার কারসাজি ছিল তা আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

সা'দাত কর্তৃক আলোচনার আহবান ও তার ফলাফল

১৯৭৩ সালে শেখ সাইয়েদ সাবেক আমার কাছে আসেন এবং বলেন যে, মিষ্টার আহমদ তা'য়িমা (যিনি সা'দাতের ক্যাবিনেটের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন) তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছেন। মন্ত্রী মহোদয় সাইয়েদ সাবেককে এ মর্মে অবহিত করেন যে, প্রেসিডেন্ট সা'দাত ইখওয়ানের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাত করে দেশ ও জাতির সম্মুখে বিরাজমান সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান কল্পে পারস্পরিক সহযোগিতার উপায় খুঁজে বের করতে চান। তখনো রুশ উপদেষ্টাদেরকে মিসর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি। তার অব্যবহিত পরই তাদেরকে মিসর ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালাম এবং মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবির খেদমতে উপস্থিত হয়ে সার্বিক পরিস্থিতি তার নিকট তুলে ধরলাম। তিনি তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, "উদ্যোগ খুবই উত্তম। তবে শর্ত হলো প্রেসিডেন্ট সাহেব ও তাঁর লোকদের নিয়ত সৎ হতে হবে।" এ আলোচনা চালানোর জন্য তিনি আমাকেই ইখওয়ানের প্রতিনিধিত্ব করার আদেশ দিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের তালিকা প্রণয়ন করে যেন তাকে দেয়া হয় এবং সরকারকেও যেন তা অবহিত করা হয়।

www.amarboi.org

আমি সাইয়েদ আহমদ তা'য়ীমাকে টেলিফোনে ইখওয়ানের সেইসব সদস্যদের তালিকা জানিয়ে দেই। যারা প্রেসিডেন্ট সাদাতের সাথে প্রস্তাবিত সাক্ষাতকারে ইখওয়ানের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন। তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু এর পর পরই সরকারের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ নীরবতা পরিদৃষ্ট হতে থাকে। এর পশ্চাতে কি রহস্য লুকায়িত ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন।

সাইয়েদ সাবেকের সাথে আল আজহারে আমার আকস্মিকভাবে সাক্ষাত হয়ে যায়। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলতে লাগলেন যে, মুহতারাম প্রেসিডেন্ট ও তাঁর লোকজনের সিদ্ধান্ত হলো আপাতত কিছুদিনের জন্য এ সাক্ষাতকার মুলতবী রাখতে হবে। একথা শুনে আমি তাঁকে বললাম। যদি তাই হয়ে থাকে তবে এ ব্যাপারে আমাদের অবহিত করলেন না কেন? যেহেতু আপনিই আমাদের কাছে খবর নিয়ে গিয়েছিলেন তাই এর ফলাফল সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করার দায়িত্ব আপনারই ছিল। মনে করুন এখানে হঠাৎ আপনার সাথে যদি আমার এভাবে সাক্ষাত না হতো এবং আমি ঘটনাক্রমে আপনাকে জিজ্ঞেস করে জানতে না চাইতাম তাহলে আপনি আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যেই রাখতেন। যাই হোক, পরে আমি চিন্তা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, বেচারা সাইয়েদ সাবেকও নিশ্চয়ই কোন অসহায় অবস্থার শিকার হয়ে থাকবেন। সম্ভবত তাকে নীরব থাকারই নির্দেশ প্রদান করা হয়ে থাকবে। ঘটনা যাই হোক না কেন আল্লাহই তা ভাল জানেন।

সম্ভাবনাসমূহ

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম আর কল্পনার টানা পোড়নে ভুগতে থাকলাম যে, সা'দাত এটা কি খেলা শুরু করেছে? এক এক করে বেশ কটি সম্ভাবনা মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল। যেমন ঃ

১–সে কি বাস্তবিকই দেখতে চায় যে, ইখওয়ান দেশ ও জাতির কল্যাণে সহযোগিতা করে কি না? হয়তো বা তাই।

২–সে কি এই অভিনয়ের মাধ্যমে জানতে চায় যে, ইখওয়ানের প্রকৃত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কে কে? এও হতে পারে। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ছিল যে, ইখওয়ানের নেতৃত্বের ব্যাপারে তারা যথাযথভাবেই অবহিত রয়েছে। যেমন অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে যথাস্থানে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৩–এরূপ প্রহসনমূলক আচরণ দ্বারা সে কি আমাদের অভ্যন্তরীন সংহতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় অবগত হতে এবং এভাবে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা ও ফাটল সৃষ্টি হয়েছে কি না কিংবা আমরা আল্লাহর যে কালেমার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এখনো তার ওপর অবিচল, দৃঢ়তা ও সংহতি বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছি কি না জানতে চায়? এমনটি হওয়ারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

www.amarboi.org

৪-প্রকৃতই কি সে কোন ফলদায়ক পরিণতিতে উপনীত হতে চাচ্ছিল। কিন্তু পরে সে তার মনোভাব পরিবর্তন করে ফেলেছে কিংবা তার মতামত বদলে দেয়া হয়েছে, তাই বা কে জানে ?

৫-সেকি ইখওয়ানের অবস্থান এবং জনগণের মাঝে তাদের শক্তি ও প্রভাব পরিমাপ করতে চাচ্ছিলো ? হয়তো তাই হবে।

৬-এ পর্যায় সে কি জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করতে চাচ্ছিলো ? কেননা ইখওয়ান ছাড়া জনগণের সহযোগিতা লাভ করা আর কোন উপায়েই সম্ভব নয় ? এমনটি হওয়াও তো একেবারে অসম্ভব নয়।

৭-সে কি ইখওয়ানের ওপর পুনরায় হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার প্রয়াস পাচ্ছিলো ? হয়তো এর কোন একটা অনুমান যথার্থ হবে। আমার তো এমনও মনে হয় যে, সে সকল ক্ষেত্রেই ইখওয়ানকে পেয়েছিল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। এ জন্যই সে তাদের সহযোগিতা লাভ করার জন্য সুচিন্তিতভাবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু পরে তার উপদেষ্টারা এবং সে নিজেও এ সংকল্প বাদ দিয়ে থাকবে যে, ইখওয়ানকে সাথে নেয়ার পর ইসলামী শরীয়াত প্রবর্তন করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকবে না। আর এরা শরীয়াতের ব্যাপারে অতিমাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

আমি আরো ভাবতে থাকলাম যে, হয়তো বা কোন সময় আবেগ বশত অকস্মাৎ সম্মানিত প্রেসিডেন্টের অন্তরে এ ধারণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে থাকবে। তারপর আবার তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে থাকবেন। কি জিনিস তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ? সারকথা হলো, প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ-ই অবগত নন। সে যাই হোক গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ইখওয়ান বিশেষত মুর্শিদে আ'ম আল হুদাইবি (র) তার পক্ষ থেকে এমন সকল প্রস্তাব স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলেন যাতে প্রাণপ্রিয় দেশমাতৃকার মংগল নিহিত রয়েছে। আমরা কল্যাণকর সকল কাজে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য সদা প্রস্তুত এবং এটাকে আমরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে থাকি।

ইখওয়ানের লিখিত ভূমিকা

দ্বিতীয়বার মিষ্টার উসমান আহমদ উসমান গৃহায়ন বিষয়ক মন্ত্রী আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি আমার তিনজন গণ্যমান্য সাথী জনাব ডাক্তার আহমদ আল সালাত, আলহাজ্জ হুসনী আবদুল বাকী এবং আলহাজ্জ সালেহ আবু রাকীককে সংগে নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে দেখা করতে যাই। মন্ত্রী বাহাদুর অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার পর বলতে লাগলেন, "আমার মনে হয়, আপনারা মাননীয় প্রেসিডেন্টের খেদমতে দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে আপনাদের সংস্কার কর্মসূচী লিখিত আকারে পেশ করলে সেটাই ভাল

www.amarboi.org

হয়। মাননীয় প্রেসিডেন্ট মনোযোগ সহকারে আপনাদের দৃষ্টিভংগী হৃদয়ংগম করবেন এবং এভাবে প্রকৃত কল্যাণের কোন পন্থা হয়তো বেরিয়ে আসবে।"

অনন্তর আমরা আমাদের মতামত ফুলস্কেপ কাগজের পূর্ণ নয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে আহ্মদ উসমানের নিকট সোপর্দ করি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই খসড়া কর্মসূচী প্রেসিডেন্টের খেদমতে নিয়ে যান। তার কিছুদিন পরই ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ হুসনী মোবারক (বর্তমান প্রেসিডেন্ট)-এর সাথে দেখা করার জন্য আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মিসরুল জাদিদাস্থ তাঁর বাসভবনে কয়েকবার তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাত হয় এবং কয়েক দফা সাক্ষাতের সময় উস্তাদ মুস্তফা মাশহুরও আমার সাথে ছিলেন। এ সকল সাক্ষাতকারের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলীর কোন কোন দিকের ওপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে থাকেন। এরপর আবার দীর্ঘ নীরবতা দেখা যায় এবং সাক্ষাতকারসমূহের ধারাবাহিকতা কোন ফলাফল ব্যতীতই বন্ধ হয়ে যায়।

ইখওয়ানের গুরুত্ব ও দেশপ্রেম

এরূপ নীরবতা ও অচলাবস্থার কারণ কি ছিল? তা আমি জানতাম না, যা হোক আমার একটা কথা জানা ছিল যা আমি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতে পারি যে, রাজনৈতিক ময়দানে ইখওয়ানের অবস্থান এবং সর্বসাধারণের নিকট তাদের স্বীকৃতি সম্পর্কে আমাদের দেশের কর্ণধারগণ খুব ভালভাবেই অবগত রয়েছেন। তা না হলে এরূপ তামাশা ও অভিনয় করার কি প্রয়োজন তাদের? আজ সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুলতা আবার কাল কোন প্রকার ফলাফল ব্যতীত তা শেষ করা। আরো একটি কথা যা আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, তা হচ্ছে, বিগত দিনগুলোতে বর্তমান সময়ে এবং অনাগতকালেও ইখওয়ান তার প্রিয় দেশমাতৃকার মংগল ও কল্যাণ কামনায় সদা সচেষ্ট থাকবে। ইখওয়ান কখনো কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর শিকার হয়নি। কোথাও কোন দল যদি আমাদের সাথে দেশ ও জাতির উন্নতি সমৃদ্ধির জন্য আলোচনা ও মত বিনিময়ের সদিচ্ছা প্রকাশ করে তা হলে তারা সেজন্য আমাদেরকে সদা প্রস্তুত পাবে। অনমনীয়তা ও হঠকারিতা আমাদের কর্মনীতি নয়। পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও বুঝাপড়া এবং দেশপ্রেম আমাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এসব সংলাপের মাধ্যমে একটা বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইখওয়ানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা ও প্রতারণার যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ অব্যাহতভাবে লাগানো হচ্ছে তাতে সত্যতা ও বাস্তবতার লেশমাত্র ছিল না। আমরা যদি সত্যিই অবিশ্বাসী হতাম তবে আর আমাদেরকে আলাপ-আলোচনার জন্য আহবান জানানোর কি অর্থ? অভিযোগ আরোপকারীগণ যখনই ইখওয়ানের ওপর আক্রমণ চালান তখন নির্ভরযোগ্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীতই তাদেরকে সবরকম "পদবী"তে ভূষিত করতে থাকেন।

তাদের লজ্জা শরমের যেমন বালাই নেই তেমনি আল্লাহ্ ভীতির ব্যাপারেও তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ বেপরোয়া। আমরা মাঝে মধ্যেই তাদের এরূপ বিষাক্ত তীরের

www.amarboi.org

অসহায় শিকার হয়ে থাকি। আমরাও জানি যে, এসব কূটকৌশল আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতেই থাকবে। সাথে সাথে আমরা অত্যাচারীদেরকেও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, শীঘ্রই তাদের পরিণতি তারা ভোগ করতে বাধ্য হবে। আল্লাহর ওয়াদা মূর্ত হয়ে দেখা দেবে। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ
"আর জালেমরা শীগ্রই জানতে পারবে যে, তারা কোন্ পরিণামের সম্মুখীন হচ্ছে।"

—সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২২৭

প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত

মিষ্টার ফুয়াদ মহীউদ্দীন মরহুম ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আমাকে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান। মরহুম তখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তার সে সময়কার ব্যক্তিগত সচিব এখনও বেঁচে আছেন। তিনি এসব ঘটনা প্রবাহের সত্যতা নিরূপন করতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। আমি যথা সময়ে উজীরে আজমের দপ্তরে গিয়ে পৌঁছলাম। আমার ধারণা ছিল, প্রধান মন্ত্রী আমাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য ডেকে থাকবেন। প্রায় আধা ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা চললো। এ দীর্ঘ সময়ে মহামান্য উজীর আমাকে শুধু মাত্র এতটুকু জিজ্ঞেস করলেন যে, আসন্ন নির্বাচনে ইখওয়ান কাকে সমর্থন করবে। তাদের পক্ষ থেকে কে প্রার্থী হবেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমি আরজ করলাম, ইখওয়ান এখনো পর্যন্ত কারো সাথে ঐক্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি। এ ছাড়া তিনিও আর কিছু জানতে চাননি এবং আমিও কিছু বলিনি।

আমি চলে আসতে উদ্যত হলে তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে এরূপ পারস্পরিক সাক্ষাত ও মত বিনিময় হতে থাকবে। আমি তাতে আনন্দই প্রকাশ করলাম। সত্য কথা বলতে কি মরহুমের বেশ কিছু মহৎগুণ ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কোমল হৃদয়, দয়ার্দ্রচিত্ত এবং অন্যদের কথা শান্ত মনে শ্রবণ করার মত গুণের অধিকারী। আমার আকাংখা ছিল যে, এ ধরনের সাক্ষাত ও মত বিনিময়ের সুযোগ অব্যাহত থাকুক। বিশেষ করে যতদিন পর্যন্ত দু'পক্ষই একে অন্যের কথা শুনতে ও বুঝতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস! আকস্মিম মৃত্যুর হিমশীতল হাতছানি মরহুমকে বেশী অবকাশ দেয়নি। আল্লাহ্ তাঁর ওপর রহম করুন এবং আমাদের সকলকেও তার অফুরন্ত অনুকম্পা লাভে ধন্য করুন।

ক্ষমতার মসনদে সমাশীন কর্তৃপক্ষ যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারতেন এবং বুঝতে পারতেন যে, এ ধরনের সমঝোতা পূর্ণ আলাপ আলোচনায় উপকারী ও ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এভাবে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের সহজ সোপান গড়ে উঠছে তাহলে তাদের এক সাথে বসার এবং মতামত বিনিময়ের গুরুত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত। মখোমুখি বসে খোলাখুলি কথাবার্তা দ্বারা অনেক ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যায় এবং বাহ্যিক অনেক কঠিন সমস্যারও সহজ

www.amarboi.org

সমাধান বেরিয়ে আসে। রকমারী মতামত পোষণকারী ব্যক্তি কিংবা দলের পক্ষে এটা অত্যন্ত কল্যাণকরও যে তারা কোন প্রকার মধ্যস্থতা ব্যতীতই একে অন্যের সাথে সত্য সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং নিজ নিজ দৃষ্টিভংগী প্রতিপক্ষকে অবহিত করতে চেষ্টা করবে।

রটানো নির্দেশ

যখনই আমি ইখওয়ানের ইতিহাস আমার স্মৃতির পাতায় রোমন্থন করি তখনই তার পুরো চিত্র আমার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসেই ইখওয়ানকে ধরপাকড় শুরু হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

সকাল আনুমানিক দশটার দিকে আমাদেরকে আমাদের কারাগারের সেল থেকে বের করে আনা হতো যেন আমরা কিছু সময় রোদ পোহাতে পারি। এটা হতো সরকারী প্যারেড এর মতই এবং এর সমস্ত পর্যায়ই ছিল যান্ত্রিক নিয়মের। আজও সেসব শব্দ আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে এবং আমার দৃষ্টির সামনে সেসব দৃশ্য এখনও বার বার ভেসে ওঠে। আমাকে এমনভাবে বসানো হতো যে আমার সম্মুখে পশ্চাতে ও ডানে বামে দু' দু' মিটার ব্যবধানে ইখওয়ানীরা বসা থাকতো। যখন আমরা সকলেই উপবিষ্ট হতাম তখন একজন অফিসার আমাদের সামনে এরূপ আসন গেড়ে বসার ব্যাপারে জেল ম্যানুয়েল-এর বিধি-বিধান পড়তে শুরু করতো। মনে হতো যেন সে "তিলাওয়াত" করছে। কথাবার্তা বলা ছিল নিষিদ্ধ। ফিশ ফিশ ও কানাকানি করা ছিল অপরাধ। চোখ, হাত কিংবা মাথার সাহায্যে কাউকে কোন প্রকার ইশারা করা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনরূপ নড়াচড়ার আদৌ কোন অনুমতি ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে আমাদেরকে রোদ পোহানোর অনুমতি দেয়া হতো। যেহেতু আমাদেরকে জেলখানার পৃথক পৃথক সেলে আবদ্ধ করে রাখা হতো। সেহেতু এই সুযোগে আমাদেরকে পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের সুযোগ গ্রহণ কঠোরভাবে নিষেধ করা হতো। কিন্তু বিবেকের এই অন্ধরা কি বুঝতে পারতো যে হৃদয়ের গভীর কন্দরে জাগ্রত অনুভূতি কোন প্রকার নড়াচড়া ও ইংগিত ইশারা ছাড়াই অন্যের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে। আমরা সাধারণত যে কোন তথ্য একে অন্যকে অবহিত করার ইচ্ছা করতাম অথবা জানার আকাংখা পোষণ করতাম তার সবটাই আমরা এ অবসরে করে ফেলতে পারতাম।

আমীরুল উমারা

সময় কত দ্রুত অতিবাহিত হয়। নাসেরের দুঃশাসন কাল আসলো এবং আমাদের মাথার ওপর দিয়ে অতিবাহিতও হয়ে গেলো। তখন আমরা বার বার আমাদের মাথা দিয়েছি কিন্তু বিপদ সঙ্কুল প্রেমের কঠিন হৃদয় অভিযাত্রীদল

www.amarboi.org

প্রতিবন্ধকতার সকল প্রান্তর অতিক্রম করে সর্বদা লক্ষ্য পানে অগ্রগামী হতে থাকে। নাসেরের পরে শুরু হয় সাদাতের শাসনকাল। আমার চোখের সামনে সাদাতের উসকে দেয়া সাম্প্রদায়িকতার আগুন ঘুরপাক খাচ্ছিল। সাদাত তার নিজের বিশেষ স্বার্থের জন্য মুসলিম ও কিবতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে দিয়েছিল। আমরা সবসময় এ ধরনের ঘৃণা বিদ্বেষের বিরোধিতা করেছি। ইসলামী দলসমূহ একটা ঐক্য জোট গঠন করেছিল। এ সংগঠনের সদস্যদের সহযোগিতায় তৎকালিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল নববী ইসমাঈল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সবরকম সযত্ন প্রয়াসে সাহায্য করেন। নানা প্রকার আবেদন নিবেদন করতে থাকেন। আমি ছিলাম ঐ সংগঠনের প্রধান। অতএব এক বিশেষ অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমাকে "আমীরুল উমারা" উপাধিতে ভূষিত করেন। উক্ত অধিবেশনে উস্তাদ মুহাম্মাদ আল গাযালী, জনাব সালাহ্ আবু ইসমাঈল, উস্তাদ ইবরাহীম শরফ প্রমুখ স্বনাম ধন্য ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত সুচিন্তিত হৃদ্যতা পূর্ণ পরিবেশে আমাকে এ উপাধি প্রদান করেন। কেননা তিনি কার্যত এটা খুব ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, আমরা সাম্প্রদায়িক দাংগার কট্টর বিরোধী এবং তা নির্মূল করার জন্য সর্বাত্মক এবং ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। সরকার প্রথমে এ উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করলো এবং বুঝতে পারলো যে, এ দাবানল প্রশমিত করা এখন তাদের সাধ্যাতীত। যদি এ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা না যেতো তাহলে তা সারা দেশকে জ্বালিয়ে শেষ করে দিতো।

মিথ্যার কোন ভিত্তি থাকে না

এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রথম দিকে এ উত্তেজনার অনল প্রজ্জলিত করে ফলাও করে প্রচার করতে থাকেন যে, এর নটের গুরু আমি (ওমর তিলমেসানী) ১৯৮০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট অধিবেশনে জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "আমি খুব ভাল করেই জানি যে, এই অনাকাংখিত পরিস্থিতি ওমর তিলমেসানীরই সৃষ্টি-------এই অভিনব ধারণা উদ্ভাবনের জন্য পার্লামেন্ট সদস্যগণ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাততালি দিতে থাকেন যেন প্রেসিডেন্ট কোন জটিল বিষয়ের সমাধান হাস্যরসের মধ্যে দিয়েই করে ফেলেছেন। এসব নির্বোধ ও জ্ঞানপাপীদের সামনে এ বক্তৃতা পেশ করার সময় প্রেসিডেন্ট একথাও বললেন যে, "ইসলামী দলগুলোর ঐক্যজোট অবশ্য এ বিপর্যয় রোধ করার জন্য উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। সে জন্য আমরা তাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

এটা ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না যে, প্রেসিডেন্ট তখন সময়ের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ভুলে গিয়েছিলেন নাকি। একথা জেনেও না জানার ভান করছিলেন যে, এ অধমই আলোচ্য সংগঠনটির সভাপতি ছিলেন। হতে পারে যে, তিনি পার্লামেন্ট সদস্যগণকে এমন নির্বোধ ও দুর্বল মস্তিষ্কের অধিকারী মনে করেছিলেন যে, মুহূর্তের মধ্যেই তারা তার

www.amarboi.org

প্রথমোক্ত কথাটি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। খুব বেশী ঢাক-ঢোল পিটাতে যারা অভ্যস্ত, অন্যের পদলেহনও করতে যারা গর্ববোধ করে দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলাই যাদের স্থায়ী অভ্যাস তারা খুব শীগ্রই ভুলে যায়। কথায় বলে ঃ মিথ্যার কোন ভিত্তি থাকে না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাঁর এই দ্বিতীয় উক্তির পরও পার্লামেন্ট সদস্যগণ হাততালি দিতে থাকেন। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন এ জাতির এসব প্রতিনিধির করতালি দেয়ার রোগে পেয়ে বসেছে না তারা মনে করে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পবিত্র মুখ থেকে যা কিছুই নিঃসৃত হয় তার সবটাই ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য।

নিজের দিকে একটু তাকিয়ে আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন

সাদাত সাহেবের হত্যাকান্ডের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্য সমস্ত মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহ দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত এবং সশস্ত্র প্রহরা মোতায়েন করা হয়। ইত্যবসরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল নববী ইসমাঈল আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান। নিরাপত্তা প্রহরীগণ বার কয়েক আমার মত একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করেন যাতে আমার কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র না থাকে। এতখানি সর্তক হওয়া সত্ত্বেও এ লোকদের স্নায়ুতে এমন ভয়ভীতি চেপে বসছিল যে, দু' দু'জন মেশিনগানধারী সশস্ত্র নওজোয়ান পূর্ণ সর্তকতাবস্থায় প্রহরারত ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দপ্তরকে যুদ্ধের ঘাঁটি বলে মনে হচ্ছিল।

আমাদের দুঃসাহসী বীর ও অত্যন্ত মূল্যবান বন্ধু জনাব কামালুদ্দিন সানানিরী ইতিমধ্যেই জিন্দানখানার দুঃসহ অত্যাচার নির্যাতনের অসহায় শিকার হয়ে শাহাদাতের সুধা পান করেছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজেও এ নির্যাতনে অংশীদার ছিলেন। এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায়ও সংবাদ প্রকাশিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমাকে স্বাগত জানান এবং আমাকে অবহিত করেন যে, কামাল সানানিরী জেলখানায় আত্মহত্যা করেছেন।

এর চেয়ে ডাহা মিথ্যা আর কি হতে পারে। ইখওয়ানের একজন সাধারণ কর্মীও কোনদিন আত্মহত্যার কল্পনাকে তার মনে স্থান দেয়নি। কামাল তো ছিলেন একজন অতিবড় আলেম, সাহসী মুজাহিদ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমাকে এও বলেন যে, আমি চাইলে তিনি আমাকে কাসরুল আইনি কারাগারে পাঠিয়ে দিতে পারেন। (মুর্শিদে আ'ম তখনও নজর বন্দী ছিলেন এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর নিকৃষ্ট জেল তুররায় রাখা হয়েছিল। জেলাখানা থেকেই তাঁকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।) আমি তাঁকে বললাম ঃ "আমার জন্য সব জায়গা একই রকম যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দাও।"(কাসরুল আইনি হাসপাতালে কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও নজর বন্দী ছিলেন।)

সেদিন আসরের নামাযের পর জেলখানায় আমার নিকট জনৈক অফিসার আগমন করেন এবং কাসরুল আইনির বন্দীশালায় আমাকে স্থানান্তর করা হয়।

www.amarboi.org

সেখানে বহু সংখ্যক নেতা এবং মিসরের জ্ঞানীগুণী ও পন্ডিতদের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। নববী ইসমাঈলের সীমালংঘনমূলক যে আচরণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তার সমস্ত দায় দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। কিন্তু আমি সর্বদা মানুষের সাথে ইনসাফই করে থাকি। যার মধ্যে যে গুণ রয়েছে তা স্বীকৃতি প্রদানে আমি কখনো কার্পণ্য করি না। আমি যখন বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাই তার কয়েক মাস পর তৎকালীন জনৈক মন্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আজও জীবিত রয়েছেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আমার গ্রেফতারীর বিষয়টি যখন সংসদে আলোচনার জন্য উথাপিত হয় তখন নববী ইসমাঈল তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করেননি। যতক্ষণ স্বয়ং সাদাত অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে চুপ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

আতিথেয়তার পরীক্ষা

লীমানতরা জেলখানা অনেকবারই আমাদের বাসস্থান হয়েছে। এ ধরপাকড়ের সময়ও আমাকে উক্ত কারাগারেই রাখা হয়েছিল। জিন্দানখানার দারোগা অধিকাংশ সময়ই আমার নিকট আগমন করতো। তিনি অত্যন্ত নিরহংকার ও সাদাসিদে মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বদা আমাকে অবহিত করতেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব নববী ইসমাঈ-লের পক্ষ থেকে এ মর্মে বার বার নির্দেশ আসা অব্যাহত রয়েছে যেন আপনার সার্বিক আরাম আয়েশের প্রতি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি। ইতিপূর্বে আমি কখনো এ কয়েদখানায় এত আরাম-আয়েশ উপভোগ করার সুযোগ পাইনি। কিংবা তা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রথম দিকে তো নির্মমতার ষ্টীমরোলার চালানো হতো। আর আমরা সেজন্য মানসিকভাবে তৈরী থাকতাম। এখন আপ্যায়ণ-আতিথেয়তাও মুসিবত হয়ে দেখা দিয়েছে। কর্মকর্তাগণ সদাসর্বদা ছায়ার মত এমনভাবে আমার সাথে সাথে থাকতো যে শেষ পর্যন্ত আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে যখন আমার সাক্ষাত হয় তখন আমি তার নিকট অত্যন্ত কঠোরভাবে অভিযোগ করি যে, জেলগারদে কয়েদীদের সাথে এখনো পর্যন্ত পশুসুলভ বর্বর আচরণ করা হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি তার নিকট বর্ণনা করলাম যে, আমার কামরার নীচের কামরার বন্দীদের উপর মধ্যরাতে অত্যাচার ও মারপিট শুরু হয়ে যায়। একাধারে সকাল পর্যন্ত এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য অব্যাহত রাখা হয়। অত্যাচারিত দুঃখী মানুষদের করুণ আর্তনাদ ও আহাজারী শুনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে চায়। মন্ত্রী বাহাদুর একথা শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এভাবে যে, "শাস্তি প্রদান তো নিষিদ্ধ। তথাপি জেলখানায় দাগী আসামীদেরকে শিক্ষামূলকভাবে ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে।" এ হতভাগা বন্দীদেরকে তাদের হাত পা বেঁধে কারাভ্যন্তরে তাদের কৃত অপরাধের জন্য চাবুক মেরে শাস্তি প্রদান করা হয়। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে আর কিই বা বলতাম। তিনি যা বলছিলেন বাস্তবের সাথে তার লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না। আমি খুব ভাল করেই জানতাম যে, শিক্ষামূলক শাস্তির বিধান জেল ম্যানুয়েল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর যখন তা

www.amarboi.org

রহিত হয়েছিল না তখনো তার নিয়ম ছিল অপরাধিদেরকে দিনের বেলা শাস্তি প্রদান করা দুপুর রাতে নয়।

ইখওয়ানের প্রতি নাসেরের শত্রুতা

আমার আজও মনে আছে যে, জামাল আবদুন নাসের সেই সব সংবাদপত্র সাময়িকী একত্রিত করেছিলেন যাতে ইখওয়ানের লিখকগণ মুসলিম শাসকদের কাছে ইসলামী শরীয়াত কার্যকরী করার দাবী জানিয়েছিলেন। এসব রচনা ও প্রবন্ধ এতদঞ্চলের বিভিন্ন শাসকদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সকলকে এরূপ পদক্ষেপের বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। এমনিতে জামাল আবদুন নাসের শুধু মাত্র মিসরেই ইখওয়ান নিধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বরং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে তিনি ইখওয়ানের হত্যা, এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের ব্যবস্থা পাকা পোক্ত করেছিলেন।

নাসের মস্কোতে গিয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি একরাতে বিশ হাজার ইখওয়ানীকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করেছেন। আমি নাসেরের এ জঘন্য ঘোষণাকে এজন্য রেকর্ড করিয়ে দিতে চাই যাতে ইতিহাসের এই আমানত ইতিহাসের নিকটই সোপর্দ হয়ে যায়।

তাঁর অত্যাচার ও জুলুম নিপীড়নের কাহিনী কারো অজানা নয়। আর আমরা তো এখনো পর্যন্ত তার জুলুম-নির্যাতন ভুলে যেতে পারিনি। এতদসত্ত্বেও আমি আমার মনে কোন প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করি না। আমি সকল গোনাহগার মুসলিমের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে তার রহমতের দোয়া করে থাকি। নাসেরের জন্যও তাই। আমি মহান আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দোয়াই করছি।

আমি সকল নিষ্ঠাবান মুসলিমকে এ মর্মে উপদেশ প্রদান করতে চাই যে, জালেমদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করার পরিবর্তে তাদের কিভাবে জুলুম থেকে বিরত রাখা যায় সেই চিন্তা করুন।

নাসেরের আসল চেহারা কারো কাছে গোপন নেই। প্রচার-প্রপাগান্ডার সাহায্যে তিনি তার যে ইমেজ তৈরী করেছিলেন বাস্তব থেকে তা বহু দূরে।

তিনি শাহ্ ফারুকের বিলাসবহুল জীবন ও ব্যয় বাহুল্যের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তার বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে শাহের বিলাসী প্রমোদ তরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। যা হোক কে না জানে যে, ঐ প্রমোদ তরীই অধিকতর সাজ-সরঞ্জামে সুসজ্জিত করার পর নাসের সাহেবের বিলাসী জিন্দেগীর শোভা বর্ধন করার জন্য অবিরাম ব্যবহৃত হয়েছে। নাসেরের আত্মীয়স্বজন পরিবার পরিজন ও সাথী সংগীদের সকলেই তার সাথে এই জাহাজে আরোহণ করেই মিসর থেকে ইউরোপে যাতায়াত করতো।

নাসেরের শাসনামলের আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, জ্ঞানী গুণী এবং বিদগ্ধ পন্ডিতগণ ও বিভিন্ন বিষয় ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিবর্তে তার অনুগত নির্বোধ অশিক্ষিত লোকদেরকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হতো।

www.amarboi.org

মুহাম্মাদ আলী পাশার বংশধরগণ এবং তাদের অঢেল বিত্ত-বৈভবের বিরুদ্ধে নাসেরের তীব্র সমালোচনা সম্পর্কে কে না জানে ? তিনি তাদের অলংকার ও মণি মুক্তার ব্যাপারে কতকি অশালীন কটূক্তি করেছিলেন এবং মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছিলেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। ভাগ্যের পরিহাস! দেখুন এই বিপ্লবী ক্ষমতার দন্ড নিজ হাতে তুলে নিয়েই এসব সম্পদ ও অলংকারাদি সরকারের অনুকূলে নয় বরং নাসেরের পরিবারের অনুকূলে জব্দ করে নেয়া হয়। অনন্তর এগুলোর যে মারাত্মক অপব্যবহার হয় সে সম্পর্কে মিসরের ইতিহাসের প্রতিটা ছাত্রই সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছে।

শাহ তো রাজতন্ত্রের প্রতীক ছিলেন। কিন্তু নাসের বিপ্লব ও স্যোসালিজমের নামে শাহ অপেক্ষাও অনেক বেশী লুটপাট করেন। আবার সমালোচকদের মুখও তিনি নির্মমভাবে বন্ধ করে দেন।

www.amarboi.org

একাদশ অধ্যায়

সাদাতের শাসনকালের শেষের দিকে আযাদ অফিসার ইখওয়ানের কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ করে এরূপ আকাংখা প্রকাশ করে যে, এমন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করা হোক যাতে দু'দলের (অর্থাৎ আযাদ অফিসার ও ইখওয়ান)-এর লোকজন যুগপৎ অংশ গ্রহণ করতে পারে। যেসব লোক এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তারা আজও জীবিত আছেন এবং তাদের প্রত্যেকের নাম আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আমি কোন প্রকার নামধাম ও খ্যাতির লোভে এ ঘটনা লিখছি না বরং শুধুমাত্র স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই লিখার প্রয়াস পাচ্ছি। কারণ স্মৃতিচারণ দ্বারা মু'মীনদের উপকারই হয়ে থাকে। ইখওয়ানী বন্ধুগণ আলোচনার সময় 'আযাদ অফিসার' প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিলেন যে , এ ভানুমতির খেলা কেবল মাত্র সবার হাসির কারণ হবে। সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী বিষয় বা বস্তুর সমন্বয় একেবারেই অসম্ভব। জামাল আবদুন নাসেরের আমলে আযাদ অফিসার-এর হাতে ইখওয়ানের ওপর যেভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিলো কালের আবর্তন এখনো তা মুছে দিতে পারেনি।

জনৈক অফিসার—যিনি আজও জীবিত আছেন—বলেছিলেন, আবদুন নাসেরের সময় ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা যর্থাথই ছিল। কিন্তু তারপর যা কিছু সংগঠিত হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায়। যদি তিনি এতটুকু কথাও বলতেন যে, নাসেরের আমলে সংগঠিত অত্যাচারের জন্য আমরা লজ্জিত এবং পুরো এই শাসন কালটাই ছিল জুলুম-নিপীড়নে ভরপুর। তথাপি প্রস্তাবিত দল গঠন সম্ভব ছিল না। আর যদি এমন একটা দল গঠন করা হয়েও যেতো তাহলেও জনসাধারণের তার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ থাকতো না। যাই হোক উপরোক্ত জবাব লাভের পর একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরোনো অভ্যাস যেতে সময় লাগে। ইখওয়ানের ওপর পরিচালিত জুলুম-নির্যাতনকে যারা যথার্থ বলে মনে করেন তারা কোন্ মুখে তাদের কাছে সহযোগিতা কামনা করতে পারেন ? আর ইখওয়ানইবা কোন্ যুক্তিতে কিসের ভিত্তিতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে পারে। অতএব এ আলোচনা থেকে আমরা নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেই।

শহীদ আবদুল কাদের আওদার জনপ্রিয়তা

মিসরে আযাদ অফিসার যখন শাহ ফারুককে ক্ষমতা চ্যুত করে সামারিক শাসন জারী করেন তখন সংস্কারের ঘোষণাসমূহ বিবেচনা করে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই। নতুন বিপ্লবী সরকার এবং তার কর্তা ব্যক্তিদের সাথে শহীদ আবদুল কাদের আওদার অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। আযাদ অফিসার ও ইখওয়ানের মাঝে প্রথমেই এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, দেশে সত্যিকার ইসলামী আইন

www.amarboi.org

জারী করা হবে। যখন আযাদ অফিসার নানা প্রকার টাল বাহানা করে ইসলামী অনুশাসন চালুর ব্যবস্থাকে বিলম্বিত করতে শুরু করলো তখন জনসাধারণ তাদের নিয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলো। অতএব ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেই ঐতিহাসিক বিক্ষোভ শুরু হয়। যা সরকারকে প্রকম্পিত করে তোলে। আবেদীন প্রাসাদের সম্মুখের বিশাল ময়দান বিক্ষোভকারীদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়। চারদিকে শুধু মানুষের মাথা আর মাথাই দেখা যাচ্ছিলো। এর ঠিক পূর্বেই হাসান আল হুদাইবি ও ইখওয়ানের অন্যান্য প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। উপস্থিত সকলের মুখেই ছিল ইসলামী বিধান চালু কর এবং হাসান আল হুদাইবি ও তার অন্যান্য সংগীদের মুক্তির স্বতঃস্ফূত দাবীও গগণ বিদারী শ্লোগান মুহূর্মুহ উচ্চারিত হচ্ছিলো। শ্লোগানের আওয়াজে পরিবেশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিলো।

এ সমাবেশকে পন্ড করার সকল সরকারী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ নাজীব শহীদ আবদুল কাদের আওদাকে ডেকে পাঠান এবং তার কাছে জনসভা ছত্রভংগ করে দেয়ার কাজে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের আবেদন জানান। শহীদ আবদুল কাদের আওদা জেনারেল নাজীরের সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনের ব্যালকুনিতে দাঁড়ালেন এবং জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ "আপনারা আপনাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করেছেন এবং নিজেদের দাবীদাওয়াও পেশ করেছেন। এখন আপনারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যান।"

একথা বলার কয়েক মিনিটের মধ্যে আবেদীন ময়দান এমনভাবে জনমানবশূন্য হয়ে গেল যে, সেখানে যেন কোন মানুষের অস্তিত্বই ছিল না। অতপর আবদুন নাসের বুঝতে পারলেন যে, আবদুল কাদের আওদার জনপ্রিয়তা তার সরকারের জন্য যে কোন মুহূর্তে বিপদের কারণ হতে পারে।

জেল-জুলুম ও বন্দিত্ব

এর একদিন বা দুইদিন পরই আবদুল কাদের আওদা শহীদকে গ্রেফতার করে। একটি কাঠপুতুল আদালতে পেশ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। ইখওয়ানের কেন্দ্রয়ী কর্ম পরিষদের সকল সদস্যের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হলো। মুর্শিদে আ'ম জনাব হাসান আল হুদাইবি, আবদুল কাদের আওদা শহীদ এবং উস্তাদ মুহাম্মদ ফারাগলী প্রমুখকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো। ডাক্তার খামীস মরহুম, উস্তাদ সালেহ্ আবু রাকীক, উস্তাদ আবদুল আযীয আতিয়া ও উস্তাদ মুহাম্মাদ হামেদ আবু নসরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হলো এবং শেখ আহমদ শারীত ও এই বইয়ের লেখক ওমর তিলমেসানীকে পনের বছর করে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

শেখ আবদুল মুয়েজ আবদুস সাত্তার, শেখ মুহাম্মাদ বাহী আল খাওলী এবং উস্তাদ আবদুর রাহমান আল বান্নাকে মুক্তি দেয়া হয়।

www.amarboi.org

পরবর্তী সময়ে মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবিকেও মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। অথচ তাঁর অন্যসব সংগীদেরকে নির্দয়ভাবে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

আমাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। তারপর আমাদেরকে বার বার এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তর করার কাজ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। শাস্তির পরোয়াণা জারী করার পর আমাকে মিসর নামক কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অতপর এক এক করে বানী সাভীফ, আল ওয়াহাত, আল মাহারীক, আসইউত, কানা এবং সর্বশেষ লীমান তাররা জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। লীমান তাররা নামক স্থানের কারাগারেই আমার সুদীর্ঘ পনের বছরের শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হয় এবং এরপর সেই জেলের ফার্মেই অতিরিক্ত আরো দু'বছরের জন্য আমাকে নজর বন্দী করে রাখা হয়।

এ দু'বছর ও অতীতের গর্ভে বিলীন হলে আমার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেল ফটকে এসে হাজির হয়। কয়েদের মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি জানতাম যে আমার মুক্তির সময় আরো পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

নাসেরের দয়াদ্রচিত্ততা ও ইনসাফ

আমি আমার প্রিয়জনদেরকে বাড়ীতে ফিরে যেতে বললাম। আপনারা তাদের দুঃখ, মনোকষ্ট ও অনুতাপ অনুমান করতে পারেন। তাদের ধারণা ছিল যে, রামাদান মাসের সেদিনের ইফতার আমি তাদের সাথে বাড়ীতে গিয়ে করবো। কিন্তু তাদের সম্মুখে আবদুন নাসেরের ন্যায় নিষ্ঠতা ইনসাফ দয়াদ্রচিত্ততা এবং বিশ্বস্ততার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ে তখন যখন আমাকে আরো কিছু কালের জন্য জিন্দানখানার মধ্যেই রাখার ফরমান জারী করা হয়।

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণের মধ্য থেকে জনৈক বুজর্গ তাঁর এক নিবন্ধে জামাল আবদুন নাসেরের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তার ইনসাফ কোমলতা ও হৃদ্যতার যথোপযুক্ত বিবরণ তুলে ধরেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাকেও মাফ করুন। আর উক্ত শেখ সাহেবকেও ক্ষমা করুন। তিনি তার কলমের ভাষায় যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা তার জন্য আদৌ মানানসই ও শোভনীয় ছিল না। আমার ধারণা তিনি এসব কথা কোন প্রকার বিনিময় ছাড়াই শুধুমাত্র চাটুকারিতা ও মোসাহেবীর ভংগীতেই লিখেছিলেন। কবির ভাষায়ঃ

"প্রত্যেক কাজের জন্যই যথোপযুক্ত লোক যথাসময়ে পাওয়া যায়!"

আদালতের আচরণ

যে আদালতের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ছিল সামরিক আদালত। একে আদালত নামে অভিহিত করা ন্যায় ও ইনসাফের উপহাস ও বিদ্রূপ করারই

www.amarboi.org

নামান্তর। এই তথাকথিত আদালতের কাজ তো শুধু পূর্বে গৃহিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা মাত্র। আর মামলার শুনানি তো নিছক অভিনয় ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই ট্রি-াইবুনাল ছিল তিনজন সামরিক অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত। যার প্রধান ছিলেন জামাল সালেম এবং সদস্য ছিলেন যথাক্রমে হোসাইন শাফেয়ী ও আনোয়ার সাদাত। ট্রাইবুনালে কোন বক্তব্য শোনা হয়নি কিংবা কোন প্রকার যুক্তিতর্কও হয়নি। উপহাস-বিদ্রূপ এবং হেয় ও অবজ্ঞা করাই ছিল এ ট্রাইবুনালের বৈশিষ্ট্য।

যিনি হন্তা তিনিই সাক্ষী ও বিচারক

ডাক্তার খামীস হামীদাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তিনি সূরা ফাতেহা জানেন কি না ? যদি জানেন তাহলে তিনি যেন তা মুখস্ত পড়ে শুনান। সত্যি করে বলুন তো একথা শুনলে মানুষ হাসবে না কাঁদবে ? আপনি কি কখনো এমন আদালত দেখেছেন, না শুনেছেন ? দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে অপরাধের স্বীকৃতি আদায়ের পর যখন কোন একজন মজলুম আদালতে বললো যে, তার নিকট থেকে জোর পূর্বক এই স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছে তখন আদালত প্রধান তার নেকড়ে সুলভ তদন্ত অফিসারকে বলে দেন যে, "আদালত মুলতবী, ওকে নিয়ে যাও এবং তার জবানবন্দি শুধরিয়ে পুনরায় হাজির করো ------।"

অত্যাচার-উৎপীড়নের এমন চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হতো যে, নির্যাতিত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার যখন আদালতের কাঠগড়ায় এনে হাজির করা হতো তখন তাকে বাধ্য হয়েই তদন্তকারী অফিসারগণের লিখিত প্রতিবেদনকেই তার নিজের মতামত বলে স্বীকৃতি দিতে হতো। সেই হতভাগা তো আর জানতো না যে, ইনসাফ লাভের জন্য তাকে আদালতে নয় বরং কসাইখানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আদালতে তদন্তকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হলে মাজলুমের আহ্বানে সাড়া দেয়া হতো এভাবে যে, সেই হায়েনাদের সামনেই তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবকিছুই স্বীকার করতে হতো যা তারা করেছে বলে তাদের সঙ্গী ফেরেশতারাও জানে না। জামাল সালেমের বিদ্যার বহর ছিল এই যে, কখনো সূরা আলে ইমরান থেকে কোন আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন কিন্তু "আলে ইমরান"কে তিনি "আল ইমরান"(العمران) পড়তেন। তার মতে ইমরানের সাথে যুক্ত আলিফ লাম ছিল নির্দিষ্ট বাচক।

অত্যাচারীরা সাবধান !

আমাদের কেস শুনে তার ফায়সালা করার দায়িত্ব ছিল তাদেরই। কিন্তু তারা নিজেরাই ছিল লুটেরা দস্যু। এই অর্থহীন নাটকের সময় জামাল সালেম একবার আমাকেও তার উপহাসের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে। আমি কোন ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে বললো ঃ "হাঁ মিষ্টার উমর বল"। আমি ভাবলাম যে তার কাজই হলো জনসমক্ষে অপমাণিত করা এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই তার আরেকটি অভ্যাস হচ্ছে, যে বিষয়ের প্রতি সে ইংগীত করতে চায় ঠিক তার বিপরীত শব্দ

www.amarboi.org

প্রয়োগ করে। উদাহরণ স্বরূপ সে কালকে সাদা এবং হলুদকে লাল বলতো। অতএব আমি নীরবতা অবলম্বন করাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম। এ জালেমদের নিকট জিজ্ঞেস করার বা প্রত্যাশা করার কিই বা থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালাই আমাদের সকল দরখাস্ত শ্রবণ এবং আমাদের আকাংখা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট। এই জালেমরা ভেবেছিল যে, তাদের দুরভিসন্ধি ও কূটকৌশল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা একেবারেই উদাসীন। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা দেরীতে আসতে পারে ব্যর্থ হতে পারে না।

মন্ত্রীত্বের প্রলোভন

এ বিপ্লবই আমাদের বিরুদ্ধে তার পুরো শক্তি কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা এসব লোককে সহায়তা করেছিলাম। কারণ তাদের মৌখিক দাবী ছিল ইসলামের অনুশাসন চালু করবে। স্বয়ং মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবিও এ বিপ্লবের ফলে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। এবং অনেক আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন। তারই অনুমোদনক্রমে ইখওয়ান জামাল আবদুন নাসেরের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন করে। জামাল আবদুন নাসের মুর্শিদে আ'ম-এর নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি যেন ইখওয়ানের মধ্য থেকে কয়েকজন লোকের নাম মন্ত্রীত্বের জন্য পেশ করেন। তিনি আবদুল কাদের আওদাহ শহীদের নাম প্রস্তাব করেন। তারপর বলা হলো যে, আওদাহ্ সাহেবের স্বভাব প্রকৃতিই এমন যে, সামরিক সরকারের সাথে তার বনিবনা হবে না। অবশেষে তিনি মুনীর দাল্লা সাহেবের নাম প্রস্তাব করলে নাসের বলেন যে,না, তিনি এখনো মন্ত্রীত্বের গুরু দায়িত্ব সামাল দেয়ার যোগ্যতা রাখেন না। পরিশেষে উস্তাদ সালেহ্ আল আশমাভী মরহুম-এর নাম বলা হলে তিনি সে ক্ষেত্রে আপত্তি করে বলেন যে, তিনি খুবই অল্প বয়স্ক মানুষ। অতপর তিনি এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন এবং বলেন যে, আমি তোমাকেই এখতিয়ার দিচ্ছি তুমি যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারো।

শাইখ আল বাকুরী

সামরিক বাহিনী উস্তাদ বাকুরীকে পছন্দ করলো। বাকুরী সাহেবও মুর্শিদে আ'ম বা কর্মপরিষদের পরামর্শ ব্যতীতই মন্ত্রীত্বের টোপ গিলে ফেললেন। অথচ এটা ছিল তার বড় রকমের ভুল সিদ্ধান্ত। ইখওয়ানেরও বড় রকমের ক্ষতি হলো। মন্ত্রীত্বের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিকে সেজন্য কম মাশুল দিতে হয়নি। সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর সামরিক টোপ বাকুরী সাহেব সম্পর্কে সরকারী মহল থেকেও এমন সব অশালীন কথাবার্তা বলা হলো যা ছিল খুবই পীড়াদায়ক। এ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে মিসর এমনকি মিসরের বাইরের লোকও সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও বাকুরী সাহেব শাসকদের সাথে বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকেন। নাসেরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তিনি তাঁর লিখনী পরিচালনা করেন। এমনকি এক নিবন্ধে তাকে "সকল কল্যাণ ও মংগলের উৎস এবং দয়া ও অনুগ্রহের সাগর" পর্যন্ত লিখে ফেলেন। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার লব্ধ শিক্ষা ও দ্বীনি দূরদৃষ্টির কারণে তার মধ্যে

www.amarboi.org

কমপক্ষে এতটুকু বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অবশ্যই রয়েছে যে, কল্যাণ ও মংগলের এবং দয়া ও অনুগ্রহের উৎস কে হতে পারে? এসব মহৎ গুণ কি সৃষ্টিকর্তার দান না কোন সৃষ্টির দান? আমি কি বলবো? উস্তাদ বাকুরীর সাথে আমার অসংখ্য স্মৃতি জড়িত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এবং আমাদের সকলকেই ক্ষমা করুন।

রাজনৈতিক পরিশুদ্ধি

নাসের তাঁর রাজনীতির সূচনা করেন বিস্ময়কর চালের মাধ্যমে। তিনি প্রথমে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবী করেন যে, তারা যেন তাদের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করেন। তারপর তিনি হাতির ন্যায় নৌকাকে দোলানোর কাজ অব্যাহত রাখেন। তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল বিভিন্ন দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। রাজনৈতিক দলগুলো নাসেরের শুদ্ধি অভিযানের ষড়যন্ত্র বুঝতে বিরাট ভুল করে বসে। তাঁর কথা অনুসারে শুদ্ধি অভিযানের কাজ শুরু করে নীতিগতভাবে তারা স্বীকার করে নিয়েছিল যে, তাদের দলের অভ্যন্তরে খারাপ লোকের সমাবেশ রয়েছে। যাদের বহিষ্কার অত্যন্ত জরুরী। এরূপ ধারণা স্বয়ং পার্টির জন্যও মস্তবড় দুর্নামের শামিল। আমাদের কোন কোন সাথীও শুদ্ধি অভিযানের এ মহতি উদ্যোগকে খুবই ভাল লক্ষণ বলে অভিনন্দন জানালেন। তারা মনে করেছিলেন যে, এ কাজ শরীয়াতের আইন চালু করার প্রথম পদক্ষেপ বিশেষ। কিন্তু মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবির মু'মীনসুলভ দূরদর্শিতা, মেধা ও প্রজ্ঞা এবং ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করুন তিনি ইখওয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন, এতে খুশীর কোন কারণ নেই। আজ হোক, আর কাল হোক আমাদের ওপরও হস্তক্ষেপ করা হবে।

তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি যা দেখেছিলো পরবর্তীতে তার সবটাই হুবহু সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

সেই ওয়াদা করেছে যা পূর্ণতা লাভ

নাসেরের শঠতার প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন কিন্তু ইখওয়ানকে তার আপন গতিতে চলতে দিলেন। প্রত্যেকেই এ ভূমিকার কারণে বিস্মিত হলেন। রাজনৈতিক দলসমূহ এ পরিস্থিতির কারণে ইখওয়ান সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করতে থাকেন যা তারা কখনো ভুলেনি। অন্যসব দলের কিসসা খতম করার পর নাসের এখন শুধুমাত্র ইখওয়ানের সাথে মোকাবিলা করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইখওয়ানীরাও এরূপ ধারণা পোষণ করছিলেন যে, শরীয়াতের বিধি-বিধান চালুর স্বার্থে সরকার যদি ইখওয়ানের সংগঠনকে নির্মূল করে দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতা লাভ করার ইচ্ছা করে থাকেন তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু নাসের অদ্ভুত ধরনের মুখোশ পরিধান করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ইখওয়ানকে একখানা পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি তাদেরকে সুখবর শুনিয়েছিলেন যে, তাদের ওপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। তারা নির্বিঘ্নে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারে। এ চিঠি হাতে হাতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

www.amarboi.org

আমি কেন্দ্রীয় অফিসে উপস্থিত ছিলাম। অতএব আমিই এ চিঠি গ্রহণ করলাম। আমি তৎক্ষণাৎ নায়েবে মুর্শিদে আ'ম ডাক্তার খামীছ হামীদাকে এ চিঠি সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি বললেন যে, আমি যেন চিঠিখানা সর্তকতার সাথে নিজের কাছেই রেখে দেই। আমার বাড়ীতে এ চিঠি আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে ছিল। এ চিঠি প্রাপ্তির কয়েকদিন পরই আমাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। আমার খানা তল্লাশি করা হয় আমার সমস্ত কাগজপত্র, বই-পুস্তক ও ফাইল ইত্যাদি সব কিছুই জব্দ করে নেয়া হয়।

উম্মে কুলসুমের গান ও আমরা

ইখওয়ানের কিছু সংখ্যক সাথী প্রখ্যাত গায়িকা উম্মে কুলসুমের গান অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতো। আমি নিজেও ছিলাম উম্মে কুলসুমের গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তার গাওয়া নাতিয়ার কবিতার সাথে যেন আমার রয়েছে প্রেমের সর্ম্পক যা কবিকুল শিরমণি শওকী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লিখেছিলেন। উম্মে কুলসুম তার বেদনাভরা সুমধুর কণ্ঠে তা গেয়েছিলেন।

আলওয়াহাত জেলখানায় উম্মে কুলসুমের গানের একটি ঘটনার সাথে আমার মজার স্মৃতি জড়িত আছে। তখন আমি আলওয়াহাত জেলখানায় বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলাম। আমরা জেলের ভিতরেই ছিলাম। রেডিওতে উম্মে কুলসুম তার অতুলনীয় সুরেলা কণ্ঠে ঝংকার তুলে গাচ্ছিলো। আমরা কয়েক জন বন্ধু তা শুনছিলাম। আমাদের বন্ধু উস্তাদ আবদুল আযীয আতিয়া মরহুম সকল প্রকার গানকেই মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি আমাদেরকে এজন্য তিরস্কার করতেন। সেদিন উম্মে কুলসুম যে গান গেয়েছিলেন তার একটি কলি হচ্ছে ঃ

اللی شفته قبل ما تشوفك عنيه عمر ضائع

"তোমাকে দেখার পূর্বের জীবন প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই আসেনি। বরং তা ছিল সময়ের অপচয় মাত্র।"

আমি ওস্তাদ আবদুল আযীয মরহুমকে বললাম ঃ ভাই দেখলেন কি মজার গান গাইলো। আপনি তো শুনেননি। অতপর আমি উপরোক্ত কলিটি তাকে শুনালাম। মরহুম আমাকে উপহাস করে বললেন ঃ তুমি এতে কি মজা পাও?

আমি বললাম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, প্রিয় জীবনের সেই অংশ যা ইখওয়ানের আন্দোলনে অংশ গ্রহণের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। তা আমার জীবনের কোন অংশ নয় বরং তা ছিল বৃথা কাল ক্ষেপনেরই নামান্তর। ভাই আবদুল আযীয, এ অর্থ কতই না হৃদয়গ্রাহী !

আবদুল আযীয মরহুম সজোরে চীৎকার করে বলে উঠলেন ভাই ওমর ! হে ভাই ওমর !! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো তো গায়িকাও কি এ গানের এ অর্থ গ্রহণ করছিলো। যা আপনি গ্রহণ করছেন?

www.amarboi.org

আমি জবাবে আরজ করলাম ঃ তার উদ্দেশ্য দিয়ে আমার কি প্রয়োজন ! তিনি তার অর্থ যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করুন ! কণ্ঠ শিল্পিরা গেয়ে থাকেন। কবি ও লেখকরা লিখে থাকেন এবং শ্রোতারা এসব কথা থেকে নিজেদের মনের মত অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। এ জন্যই তো তারা সাগ্রহে শুনে থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ দৃষ্টিভংগীতে কাসিদাসমূহের মমার্থ উদ্ধার করে থাকেন।

শিল্প ও শিল্পী

সত্য কথা বলতে কি উম্মে কুলসুম মরহুমা তার শিল্পকর্মে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু আফসোস যে তিনি অত্যাচার ও অত্যাচারীদের কাফেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শিল্পী যদি তার শিল্পকর্মের প্রতি আন্তরিক হন তাহলে কোন অত্যাচারের সাথে তার একাত্ত হওয়া আদৌ উচিত নয়। শিল্প হচ্ছে, সূক্ষ্ম কলা এবং অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির নাম। শিল্পী মহৎ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। তাকে কোমল হৃদয়, দয়া, উপলব্ধি ও সহানুভূতি-সহমর্মিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা উচিত। নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার মূর্তপ্রতিক হওয়া তার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়।

সিনেমা ও ড্রামার মূল উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণ ও মহৎ চরিত্রের শিক্ষা দেয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু হায় ! এগুলো এখন সম্পূর্ণরূপে শয়তানের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সের সাহিত্যিক যেমন ভিক্টর হুগো প্রমুখের ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠিত করা এবং সকল প্রকার জুলুম নিপীড়ন থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান ছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যিকও তাদের সাহিত্য কর্ম শিল্পী এবং তাদের শিল্পকর্ম, বিনোদনের উপকরণ ও তার উপস্থাপনা সবকিছুই উন্নত নৈতিক চরিত্রকে ভিত্তিমূলক থেকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যুব সমাজকে তাদের দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ করা এবং উশৃংখলতা ও লাম্পট্যের শিক্ষা দেয়াই তাদের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এসব শিল্পী ধন-দৌলতের পিয়াসী হয়ে এমন কিছু করে যাচ্ছেন যা সুষ্ঠু রুচিবোধ সম্পন্ন কোন মানুষ কখনো মেনে নিতে পারে না। অপমাণিত হয়ে এবং স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে খাবার গ্রাস লাভ করার চেয়ে সসম্মানে ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা সহস্র গুণে উত্তম। স্বাধীনতার জন্য যত ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে হোক না কেন সবই অকপটে গ্রহণযোগ্য। আমাদের দেশের কর্তা ব্যক্তিরা আজও সেই ধ্বংসাত্মক পথেই চলছে যে পথে ছোট বড় সবার জন্য করুণ মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

নীল উপত্যকার আধুনিক ফেরাউন

পাঠকগণকে কখনো ভুলে গেলে চলবে না যে, আবদুন নাসেরের শাসনামলের অনন্য বৈশিষ্ট্যই ছিল অত্যাচার-উৎপীড়ন ও মানুষের মৌলিক অধিকার পদদলিত করা। কোন পর্যায়ের মানুষই তার এ অমানবিক আচরণ থেকে নিরাপদ ছিল না।

আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, জাতীয় পরিষদের স্পীকার ডক্টর সানহুরীও প্রতিশোধের টার্গেটে পরিণত হন। নাসের তার পেছনে তার গার্ড বাহিনীকে লেলিয়ে

www.amarboi.org

দেন পরিষদ ভবনের মধ্যেই তাদের হাতে বেচারা স্পীকার নির্মমভাবে প্রহৃত হন। তার অপরাধ ছিল এই যে, তিনি মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ব্যাপারে নাসের সাহেবের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। আইনজীবি সমিতি (Bar Association)-এর ওপরও নাসের তার নিজের লোকদের নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তারা তোতাপাখীর মত শেখানো শ্লোগান দিতো এবং আইনজীবিগণের মুখের ওপর ঘুষি পাকিয়ে মূর্খতার মূর্তপ্রতীক এসব শ্লোগান তুলতো—নির্বোধ আইনজীবিগণ মুর্দাবাদ !

আল্লাহ মাফ করুন ! লক্ষ্য করুন ! আইন বিশারদগণ মূর্খ বলে আখ্যায়িত হলো এবং এ জালেমশাহীর গোমস্তাগণ জ্ঞানী পন্ডিতরূপে স্বীকৃতি পেল।

জামাল আবদুন নাসের কেবল এসব অপকর্মের নির্দেশ জারী করেই ক্ষান্ত থাকতো না। বরং খুবই উৎসাহের সাথে এর টেপ শুনতো এবং ফিল্ম দেখতো এবং অহংকারে মাথা ঝাকুনি দিতো। কুব্বা প্রাসাদের স্বাগতিক হলে নাসের এ সকল টেপ ও ভিডিও ক্যাসেট ফিল্ম সাদরে গ্রহণ করতো। এই ছিল তার প্রিয় মেহমান, অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ মহলেই প্রেসিডেন্টের দপ্তর ও কর্মস্থল ছিল। এই বিলাস বহুল প্রাসাদে তিনি ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতেন। অথচ ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিনিই অপব্যয়, বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ শাহী মহল বালাখানা এবং বড় বড় বাংলো নির্মাণের তীব্র সমালোচনায় মুখর থাকতেন।

খর্বকায় নেতা ও মিসরের ইতিহাস

নাসেরের স্থলাভিষিক্ত সাদাতও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে শুরু করে। এমন কি ভোগ বিলাসিতায় তার চেয়েও আরো দু'কদম অগ্রসর হয়ে যায়। তিনি ময়ূরের ন্যায় সাজগোজ করে অত্যন্ত অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করতেন। ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে প্রতিদিন একখানা প্লেনে ভর্তি ফুলের তোড়া তার জন্য আনা হতো। নাসের ও সাদাত উভয়ের শাসনামলেই একটা দৃশ্য ছিল খুবই সুস্পষ্ট। তাহলো, মিসরের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিলো। যেন ইতিপূর্বে মিসরের ইতিহাস বলতে কিছুই ছিল না। এসব ক্ষণজন্মা নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। মনে হয় যেন ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে মিসর অস্তিত্ব লাভ করেছে। মিসরের জন্য এথেকে বড় লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে যে, তার সমস্ত ইতিহাস ঐতিহ্যকেই অস্বীকার করা হবে ? অথচ পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বার বার এ ভূ-খন্ডের উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা শুধু এ ইংগীত দেয় যে, উক্ত দু'মহাপ্রাণ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ছিল একান্তই দুর্বল আর মন-মস্তিষ্ক অত্যন্ত স্থুল চিন্তায় ভরা। তারা তাদের অকিঞ্চিৎকর অবস্থা সম্বন্ধে খুব ভালভাবেই অবগত ছিল। তাই এসব মহারথীরা ইতিহাস খ্যাত মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের আলোচনা পর্যন্ত মানুষের সামনে আসতে দেয়ার পক্ষপাতি ছিল না। যদি মিসরের ইতিহাস সৃষ্টিকারী অন্যান্য

www.amarboi.org

নেতাদের সম্পর্কে যুব সমাজ অবহিত হতে পারতো এবং তারা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেতো তাহলে এসব স্বকল্পিত মোড়লগণ ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তো।

হোসনী মোবারকের অপূর্ণাঙ্গ সংস্কার

আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা ছিল এই যে, এসব গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল শ্রেণীর নেতাদের হাটে হাঁড়ি ভেঙে যুব সমাজকে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন। অতএব তিনি মিসরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ হোসনী মোবারককে তাওফিক দিলেন যে, তিনি তার পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ পথ অবলম্বন করবেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সস্তা খ্যাতি ও মিথ্যা প্রপাগান্ডার পূর্বতন পদ্ধতি অবলম্বন করেননি যা ছিল তার পূর্ববর্তী দু'জনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। হোসনী মোবারককে আল্লাহ্ তায়ালা উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে সিলেবাস পাঠ্যক্রম, শিক্ষা-দীক্ষা ও পড়ালেখার অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগে সাহিত্যিক ও পন্ডিতগণকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যেন তারা মিসরের ইতিহাসকে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুবকশ্রেণী ও ছাত্রসমাজের সামনে তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে আমরা যেমন তাঁর গৃহীত এ পদক্ষেপকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই তেমনি আমাদের অভিযোগও ইতিহাসের নিকট সোপর্দ করে দিতে চাই যে, অদ্যাবধি ইখওয়ানের দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে বিশেষত আমাদের দু'দুজন মুরশিদে আ'ম—যথাক্রমে সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদ এবং সাইয়েদ হাসান আল হোদাইবি মরহুমের ইতিহাসকে গোপন করে রাখা হচ্ছে। পাঠক্রম থেকেও তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ মিসরের ইতিহাসের রেকর্ড ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হতে পারে না যতক্ষণ উক্ত দু'মহতী ব্যক্তিত্বের উল্লেখ না করা হবে। এরা দু'জন আধুনিক মিসরের ইতিহাসের দু'টি উজ্জ্বল চাঁদ। তাদেরকে যারা পর্দার অন্তরালে রাখতে চায় তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের কৃতিত্ব এমন জীবন্ত ও ধরাপৃষ্ঠে এমন দীপ্তিমান রাজপথের নির্দেশিকা যে তা গোপন করে রাখা সম্ভব নয়।

ইসলামী দুনিয়ার পথিকৃত

আমরা পড়েছি যে, বানাফশা (এক প্রকার বেগুনি) ফুল সচরাচর ঘাস ও লতাগুল্মের ভেতর পরিদৃষ্ট হয় না কিন্তু তার সুগন্ধি দূর থেকেই হৃদয় মন ভরে দেয়। ঠিক এ অবস্থাই ছিল আমাদের দু'জন মুর্শিদে আ'মের। আল্লাহ্ তায়ালার অফুরন্ত রহমত ও সন্তুষ্টি বর্ষিত হউক তাদের ওপর। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীদের অবস্থাও বড় অদ্ভুত। তাঁরা এই দু' মহান ব্যক্তিত্বের কথা ছাত্রদের কানে পৌছতে দেয়াকেই বিপজ্জনক মনে করে থাকেন। তাঁদের দু'জন ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তিত্বের ওপর থেকে ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। অথচ উক্ত দু' মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সম্পর্কে এ থেকেই ধারণা লাভ করা যেতে পারে যে, তাদের প্রভাব শুধুমাত্র মিসরের মাটি ও ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, তাঁরা সমগ্র ইসলামী

www.amarboi.org

দুনিয়াকেই তাঁদের মহত চিন্তাধারার আলোকে আলোকিত করে গেছেন। মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটবর্তী অন্যান্য দেশের কথা না হয় বাদ দিন। দূরপ্রাচ্য অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিফাইন পর্যন্ত তাদের চিন্তার দীপ্তিতে ঝলমল করছে। হাসানুল বান্নার কৃতিত্ব হলো তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও রেঁনেসার পথ সুগম করেছেন। আর হাসান আল হুদাইবি ছিলেন তার নিজের উক্তির মূর্ত প্রতীক। তিনি বলেছিলেন ঃ

> " কুরআনের রাজত্ব নিজেদের অন্তরে কায়েম করে নাও–
> ভূ-পৃষ্ঠে তা আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।"

انفروا خفافا وثقالا —সাজসরঞ্জাম কম থাক আর বেশী থাক বেরিয়ে পড়ো

উস্তাদ আল হুদাইবি (র) ইখওয়ানের দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর হাসানুল বান্না (র)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে থাকেন। তিনি একাধারে গ্রাম, মহল্লা এবং শহরে নিয়মিত দাওয়াতী সফরে যেতেন। শারীরিক দুর্বলতা এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কর্মতৎপর, প্রাণ চঞ্চল ও উৎসাহী নেতা। তিনি ইসলামী দাওয়াত ব্যাপ দেশে সুদূর সিরিয়া ও লেবাননও সফর করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মিসরের জনগণ তাকে উষ্ণ অর্ভ্যথনা জ্ঞাপন করেন। এ জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছিলো যে, মুর্শিদে আ'ম কতটা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সাধারণ জনসমাবেশ ও সভা সমিতিতে মুর্শিদে আ'মকে বড়ই ভাবগম্ভীর এবং মর্যাদাবান বলে মনে হতো। আবার যখন ইখওয়ানের বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতেন তখন মনে হতো তিনি অত্যন্ত কোমল প্রাণ সাথীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণকারী এবং হাসিখুশী ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

আল্লাহ জুলুমকেই জুলুমের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেন

আমার মনে আছে সি, আই, ডি, প্রধান মিষ্টার হাসান তালাত একবার আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে আগমন করেছিলেন। সেখানে তিনি মুর্শিদে আ'ম-এর সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বলেন। যেসব মন্তব্য তিনি সাক্ষাতের পর করেছিলেন আমার স্মৃতিপটে তা আজও সুরক্ষিত আছে। তিনি বলেছিলেন আমি আমার চাহিদা মাফিক প্রত্যেক দলের ভেতর বিশেষ ব্যক্তিদের পেয়েছি। যারা আমাকে সংশ্লিষ্ট দলের অভ্যন্তরীন খবরাদি সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু ইখওয়ানের মধ্যে তেমন একটি লোকও আমি খুঁজে পেলাম না।

হাসান তালাত নামক এই ব্যক্তি ছিলো বড়ই অত্যাচারী ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি ভারসাম্যপূর্ণ করে দেয়ার জন্য অপর এক হিংস্র স্বভাব অফিসারকে তার ওপর চাপিয়ে দেন। এ বিভাগেরই জনৈক কর্মকর্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অর্থাৎ তার নিজের দপ্তরেই সিঁড়ির উপর তাকে পাকড়াও করেন এবং খুব উত্তম মধ্যম দ্বারা ধন্য করেন। এসব অভিনয়ের প্রেক্ষাপট

www.amarboi.org

ছিল এই যে, হাসান তালাতের নিকট কিছু সংখ্যক গোপন টেপ ছিল। যাতে কতিপয় নামীদামী ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন সংরক্ষিত ছিল। অপর একজন অফিসার তার নিকট হতে এ টেপ নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তিনি তা মোটেও দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশেষে এ টেপের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। সাদাতও এর উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, মে মাসের সংস্কার বিপ্লবের সময় তিনি তা জ্বালিয়ে ফেলেছিলেন। আমার মনে হয়, উক্ত টেপ আজও কারো না কারো কাছে বর্তমান থেকে থাকবে এবং প্রয়োজনে সময় মত সে তা ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। ঐ সব টেপের মধ্যে এমন কি আছে যা দিয়ে কারো ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

জেলখানায় বন্দী জীবন যাপনের সময় ইখওয়ানীরা যেসব দোয়া করতেন তার একটি হচ্ছে ঃ

اللّهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين

"হে আল্লাহ্ ! যালেমদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দাও। আর তাদের মধ্য থেকে আমাদেরকে তুমি নিরপাদে রক্ষা করো।"

উস্তাদ হাসান আল হুদাইবি (র)-এ দোয়া শুনে মিষ্টি হেসে বলতেন ঃ

وانتم لا تعلمون شيئًا "আল্লাহ্ তো তাই করে থাকেন। তিনি এক জালেমকে দিয়ে আরেক জালেমকে হত্যাও করিয়ে থাকেন। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।"

উপরোক্ত ঘটনাতো একটা উদাহরণ। অথচ এরূপ হাজারটা দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টির সামনে দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

ইখওয়ানীরা যখন জেলখানায় ছিলেন তখন জামাল আবদুন নাসের এবং তার অর্থে কেনা সংবাদপত্র ইখওয়ান ও মুর্শিদে আ'ম-এর ওপর সকল রকম অপবাদ আরোপ করতে থাকে। কারাবন্দীগণ না পারছিলো আত্মপক্ষ সমর্থন করতে না পারছিলো অন্যে তাদের পক্ষে মুখ খুলতে। অথচ আত্মপক্ষ সমর্থন করা মৌলিক মানবাধিকারের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ অধিকার থেকেও ছিলাম পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত। যাহোক এসব লোকের নির্লজ্জতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হয় তখন মুর্শিদে আ'ম "আলমিসরী" পত্রিকায় একটি পত্র লিখেন। এ পত্রিকা তখনো পর্যন্ত নিসিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। তিনি উক্ত চিঠিতে বিপ্লবের নেতৃবৃন্দকে "মোবাহেলার" জন্য আহবান জানালেন। "মোবাহেলা" শব্দটি শুনে এসব মহারথিরা হতবাক হয়ে যান। কারণ, তারা এ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণভাবে নাওয়াকিফ। তাদের এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে উস্তাদ আল বাকুরী তাদেরকে উদ্ধার করেন এবং "মোবাহেলা" শব্দের ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ "মোবাহেলা" দ্বারা না লড়াই বুঝায় না বাক যুদ্ধ। এটা দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি কিংবা দলের মধ্যে

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালার নিকট এই মর্মে দোয়া করা যে, উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী আল্লাহ তায়ালা যেন তার ওপর তার লানত নাযিল করেন।

যদি সত্যবাদী হও তাহলে আস

জেলখানার ভিতর থেকে কোন কয়েদীর পত্র বাইরে যাওয়া এমনিতেই ছিল বড় রকমের অপরাধ। তার ওপর আলোচ্য চিঠিখানা নাসের ও তার সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গোদের হাটে হাড়ি ভেঙে দেয়। জনসমক্ষে তার মুখোশ পুরোপুরিভাবে খুলে যায়। এখন বেচারা সম্পূর্ণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে না সামনে অগ্রসর হতে পারছিলো না পেছনে সরে আসতে পারছিলো। হাসান আল হুদাইবির মোকাবিলায় মোবাহেলায় অংশ গ্রহণ করার হিম্মত তাঁর কোথায়? কোন্ মায়ের সন্তানের এমন বুকের পাটা ছিল যে, সে ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারে? জেলখানার দারোগার ওপর কঠোরতা নেমে এলো। হতভাগার ওপর শাস্তির নির্দেশ জারী করা হলো এই মর্মে যে, কারাভ্যন্তর থেকে এ পত্র বাইরে আসলো কি করে? আমরা জেলখানার আঙ্গিনায় একটা গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। ইত্যবসরে দারোগা সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মেজাজে আমার কাছে আসলেন। আমাদেরকে সেলের মধ্যে আটকে রাখার জন্য রাগান্বিত মেজাজে হুকুম জারী করলেন। এমনকি কোন প্রকার পায়চারি করার জন্য বাইরে আসতে দেয়া হবে না। এসব বিপ্লবীরা আমাদের মোকাবিলায় সকল হাতিয়ারই পরীক্ষা করেছে। কিন্তু এই নিরস্ত্রদের মোকাবিলায় অসহায় বোধ করছেন।

মর্দে মু'মিন

উস্তাদ আল হুদাইবি এমন মহৎ নৈতিক ও মানবিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, কোন লোক সম্পর্কেই অন্তরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। ইবরাহীম আবদুল হাদীর নির্যাতন-নিপীড়নের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উস্তাদ আল হুদাইবি একবার তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য চলে যান। শরীয়াতের দৃষ্টিতে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুতি পুরো করার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই নিয়মানুবর্তী। ইখওয়ানের সমাবেশেও দেখা যেতো তিনি সর্বদা সকলের আগে এসে পৌঁছতেন। আবার যাওয়ার সময় যেতেন সবার শেষে।

তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি তার দ্বীনি মর্যাদাকে কখনো দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করার উপায় বানাতেন না। এটা ইখওয়ানের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিরাট অনুগ্রহ যে, কোন বিরাট ব্যক্তিত্বও এমন কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবেন না যে, তিনি ইখওয়ানের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে কোন টাকা পয়সা প্রদান করেছেন। যখন যে পরিবেশ পরিস্থিতিই বিদ্যমান থাকুক না কেন? আমরা কখনো আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো অনুগ্রহের দ্বারস্থ হইনি। কোন প্রমাণ ব্যতীত দোষারোপকারীদের বিচারের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। তারা আল্লাহর ভয় না করে দ্বিধাহীনভাবে বলে বেড়ায় যে, ইখওয়ান দ্বীনকে তাদের ব্যবসায়ের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। মনে রেখো, যেসব শরীফরা মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করে একদিন তাদের মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে যাবে।

www.amarboi.org

জামাল আবদুন নাসেরের বিদ্বেষ

মুনীর দাল্লা মরহুমের সাথে এক সাক্ষাতের সময় জামাল আবদুন নাসের বলেছিলেন—আমি এমন একটা বৈদ্যুতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই যে, যখনই বোতাম টিপবো তখনই সমগ্র জাতি বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় উঠে দাঁড়াবে এবং যখন আরেকটি বোতাম টিপবো তখন ততটা দ্রুত গতিতেই সমস্ত দেশবাসী বসে পড়বে।

জবাবে মুনীর দাল্লা মরহুম বলেছিলেন ঃ "কি চমৎকার জামাল"? আপনি চাচ্ছেন সমস্ত জাতিকে পুতুলের মত নাচাতে এবং কেউ যেন আপনার নিদের্শ অমান্য না করে। আপনার এরূপ মহৎ ইচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এমনটা করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

নাসের তাৎক্ষণিকভাবে নীরবতা অবলম্বন করলেও মুনীর মরহুমের এমন নির্ভীক জবাব কিছুতেই ভুলে যেতে পারেননি। তিনি তার অন্তরে প্রতি হিংসার দাবানল প্রজ্জলিত করতে লাগলেন। ইখওয়ানের ওপর যখন বর্বরোচিতভাবে হামলা করা হয় তখন মুনীর দাল্লার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশী নির্যাতন চালানো হয়। মুনীর দাল্লা নাসের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা শুধু ইখওয়ানের মতামতই ছিল না। বরং নাসেরের স্থলাভিষিক্ত সাদাত ও তাঁর রচিত "আপন অস্তিত্বের সন্ধানে" গ্রন্থে যা লিখেছেন তার মর্মার্থও ছিল এই যে, নাসের নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আর কারো কোন উচ্চবাচ্য শুনতে প্রস্তুত ছিল না। তার নিকট সত্য ছিল কেবল তাই যা তার মনে উদয় হতো। তা ছাড়া অন্য কোথাও সত্যের লেশমাত্র ছিল না।

এ ছিল একনায়কতন্ত্রের ব্যাধি যা এই ব্যক্তিটিকে ইখওয়ান এবং মুর্শিদে আ'ম-এর প্রতিও জুলুমের হাত প্রসারিত করতে অনুপ্রাণীত করেছিল। মুর্শিদে আ'ম আল হুদাইবি সঠিক অর্থে ছিলেন ইসলামী নেতা। তিনি ছিলেন ফিকাহ্ বিশারদ এবং আইনবিদও। তাঁর খুব ভালভাবেই জানা ছিল যে, একজন মুসলিম শাসনকর্তার ওপর প্রজাদের কি কি অধিকার রয়েছে। আর প্রজাসাধারণেরই বা কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে শাসনকর্তার ওপরে। তাঁর দৃষ্টি যেমন ছিল ঐশী আইনের ওপর তেমনিভাবে ছিল মানবরচিত আইনের ওপরও। নাসের এজন্য ভীত ছিল যে, তিনি তার একনায়কতন্ত্রের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। মুর্শিদে আ'ম-এর অভ্যাস ছিল, তিনি নসীহত করার হক অবশ্যই আদায় করতেন। নাসেরের একটা অভিযোগ ছিল এই যে, সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ওপর অবশ্য তাঁর মতামত চাপিয়ে দেয়ার জন্য কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না সত্য কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই সমূদয় তথ্য গোপন সূত্রে মুর্শিদে আ'ম অবগত হয়ে যেতেন, যা ছিল ডাহা মিথ্যা।

নাসের শাইখ আল বাকুরীকে ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রী বানিয়েছিল। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুর্শিদে আ'ম তার নাম উল্লেখ করেননি। শাইখ আল বাকুরী মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। অথচ মুর্শিদে আ'ম-এর নিকট থেকে না কোন অনুমতি নিয়েছিলেন না তার সাথে কোন পরামর্শ করেছিলেন। বাইয়াতের

www.amarboi.org

অর্থ হচ্ছে নিজের পছন্দ হোক বা না হোক সকল অবস্থায়ই মুর্শিদে আ'ম-এর আনুগত্য বাধ্যতামূলক। এরূপ আচরণ করার পরও মুর্শিদে আ'ম কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। কিংবা শাইখ আল বাকুরীর নিকট থেকে কোন রূপ ব্যাখ্যাও দাবী করেননি। এসব লোক তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শাইখ আল বাকুরীকে বলি দিয়েছিল এবং অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এই অভিযোগ দাঁড় করিয়েছিল যে, তিনি মুর্শিদে আ'ম ও ইখওয়ানের চর। মূলকথা হচ্ছে, নাসের মনে মনে ইখওয়ান ও তার মুর্শিদে আ'মের ব্যাপারে খুবই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তার জানা ছিল যে, ইখওয়ানের উপস্থিতিতে তার পুতুল নাচ সফলতা লাভ করতে পারে না।

নাসেরের এজেন্টরা সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকদের ওপর যেভাবে অন্যায় অভিযোগের বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা ছিল নজির বিহীন। নাসেরের নির্যাতনের অসহায় শিকার হন এমন সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ফেরেশতাগণও যাদের নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এ ব্যক্তি ছিল এমন পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী যে, তার পাশবিকতার জন্য সে কোনদিন অনুতপ্ত হয়নি। তার অন্তর কখনো প্রকম্পিত হয় না এবং চক্ষু কখনো অশ্রুসিক্ত হয় না। মূলত সে মানুষ ছিল না। ছিল পাথর বরং তা থেকেও বেশী অনুভূতিহীন।

কৃষি সংস্কার না কৃষি বিপর্যয়

আবদুন নাসের তার তথাকথিত ভূমি সংস্কারের ঘোষণা করেন। তিনি আবাদী জমির পরিমাণ ধার্য করেন একশ একর। হাসান আল হুদাইবির অভিমত ছিল, এ সীমা পাঁচশ' একর হওয়া আবশ্যক। তিনি নাসেরের বেঁধে দেয়া সীমার বিরোধিতা করেননি। কিন্তু তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। মিসরের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, উৎপাদনের দৃষ্টিভংগীর দিক থেকে হাসান আল হুদাইবির অভিমতই ছিল বাস্তবসম্মত ও কল্যাণকর। পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ একথার অনস্বীকার্যতা প্রমাণ করেছে। যে মুর্শিদে আ'মের রায়ের প্রতি তোয়াক্কা না করে বিপ্লবী সরকার কৃষি ব্যবস্থারই সর্বনাশ সাধন করেছে। সকল ক্ষেত্রেই লাভের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে লোকসান। সাথে সাথে এ বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইসলাম মানুষের জন্মগত মালিকানা অধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এবং বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতি ও একান্ত জরুরী অবস্থা ব্যতীত কারো ধন-সম্পদ তার সন্তুষ্টি ও যথাযোগ্য বিনিময় ছাড়া হস্তগত করার অনুমতি প্রদান করে না। মুসলিম জনসমাজের একান্ত কল্যাণ ও প্রয়োজনের খাতিরে যদি কারো মালিকানাধীন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতেই হয় তবে তার যথাযোগ্য বিনিময় প্রদান করতে হয়।

অবশেষে নাসের চাষাবাদযোগ্য জমির মালিকানার পরিমাণ নির্ধারণ করলেন সোয়া দুইশ' একর। কিন্তু তার এ ঘোষণার প্রতিও তিনি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন না। কিছুদিন পরই পুনরায় নতুন ফরমান জারী করলেন যে, সংশোধিত মালিকানার পরিমাণ স্থির করা হয়েছে পঞ্চাশ একর। তিনি আরো ঘোষণা করলেন

www.amarboi.org

যে, হুকুম দখল কৃত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদেয় মূল্য প্রাক্তন মালিকদের প্রদান করা হবে। তিনি তার এ অংগীকার রক্ষা করা থেকে পিছিয়ে যান। এমনকি কাউকে এক কানা কড়িও মূল্য প্রদান করা হয়নি। নাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, যেসব লোকের জমি হুকুম দখল করা হয়েছে তাদেরকে প্রতি মাসে মিসরীয় পাঁচ পডিও করে প্রদান করা হবে যাতে পর্যায়ক্রমে তাদের মূল্য আদায় হয়ে যায়। এ ভাগ্য বিড়ম্বিত হতভাগার দল এ নগণ্য পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তির আশায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অফিসে ধর্ণা দিতে থাকে। কিন্তু অর্ধচন্দ্র ব্যতীত তাদের ভাগ্যে কোন দিন কিছুই জোটেনি। এ থেকেই আপনি সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমূলক সংস্কার কার্যাবলীর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন।

যে ভূমি থেকে কৃষক তার খাদ্য পায় না

ইতিহাস তার রায় দিয়ে দিয়েছে আর আমিও আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সম্পূর্ণ স্থিরচিত্তে এ ঘোষণা দিচ্ছি যে, নাসেরের ভূমি সংস্কার প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল ভূমি বিপর্যয়েরই নামান্তর। আমি নিজে ভূমি সংস্কারের বিরোধী নই। তথাপি ভূমির বিপর্যয়কে তো মেনে নিতে পারি না। আমি কৃষকদের সাথে মিশে তাদের জীবনধারাকে অত্যন্ত নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি—আমি তাদের মাঝেই জন্ম লাভ করেছি। তাদের অভাব অভিযোগ ও সমস্যাবলী আমার ভালভাবেই জানা আছে। আমি বক্তিগতভাবে কখনো এটা সমর্থন করতে পারি না যে, একজন জায়গীরদার (জোতদার ও জমিদার) হাজার হাজার একর জমির মালিকানা কুক্ষিগত করে বসে থাকবে অথচ সে হাত পা পর্যন্ত নাড়াতে চেষ্টা করবে না। কিন্তু বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে থাকবে। অথচ তার খামারে কর্মরত মজুররা ভূখা-নাঙ্গা থাকবে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অসহায় শিকার হয়ে থাকবে। তারা সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও রাতে অনাহারে অর্ধাহারে তাদের ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন দেহ বিছানায় এলিয়ে দেয়। তাদের মাথা গোঁজার একটু ঠাঁইও নেই। একই স্থানে তারা ও তাদের গরু বাছুরগুলো রাত কাটায়। শীতকালে প্রচন্ড হিমেল হাওয়া তাদের শরীরের ওপর দিয়েই বয়ে যায় অথচ তাদের গায়ে কোন গরম কাপড় থাকে না। এ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। এর সমাধান অত্যাবশ্যক আর এ জন্য আমাদের শরীয়াতই আমাদেরকে সর্বোত্তম ব্যবস্থা বাতলে দিয়েছে। শরীয়াতকে বাদ দিয়ে আপনারা যতই বিদেশী মতবাদ আমদানী করে অবস্থা সংস্কারের চেষ্টা করবেন তাতে কখনো সুফল পাবেন না। শরীয়াতের বিরোধিতা করে আপনারা সমস্যায় আরো ঘৃতাহুতি দিতে থাকবেন। কিন্তু সমস্যা থেকে উত্তরণের কোন পথ খুঁজে পাবেন না।

প্রাচীন যে সমস্ত নিয়ম-নীতি দীর্ঘ দিন থেকে মিসরে প্রচলিত রয়েছে তার সংস্কার প্রয়োজন। জোতদার ভূস্বামীদের আচরণ কৃষকদের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং জুলুমমূলক। চাষীদের বেগার খাটানো হতো কিন্তু তাদেরকে কোন পারিশ্রমিক দেয়া হতো না। নাসের যদি সংস্কারের সঠিক পন্থা অবলম্বন করতো তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। ভূমির মালিকদেরকে কৃষকদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবার করার নির্দেশ কার্যকরী করা যেতো। যেমন ভূমি মালিকের এবং শ্রম

www.amarboi.org

কৃষকের উৎপাদিত ফসলে উভয়ের অংশ সমান। এতে উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেতো তেমনি চাষীদের অবস্থারও উন্নিত হতো। জমি ইজারা দেয়ার ব্যাপারে কোন কোন ফকীহগণের মতানৈক্য রয়েছে বটে, তবে ভাগ চাষের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরিকৃত হয়ে গেছে। কৃষকদের নিকট সরকারী খাস জমিও সহজ কিস্তিতে বন্টন করা যেতে পারতো। সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পর কৃষকদের মালিকানায় চলে যেতো। যদি এ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হতো তাহলে ভূমিহীন কৃষক গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে আসতো না। অথচ এখন তাদের জমি ছেড়ে চলে আসার ফলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব পড়ে অপর দিকে শহুরে পরিবেশে আশ্রয়হীন ছিন্নমূল ও ভাসমান মানুষের আর্থ সামাজিক সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

অনুরূপভাবে কৃষি উপকরণ, যন্ত্রপাতি, গরু-মহিষ ও হাঁস-মুরগী চাষ ইত্যাদিও যদি মালিক ও কৃষকের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রম ও আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী উৎপাদনে অংশীদার হতো। তাহলে খাদ্য শস্য, দুধ, ঘি, গোশত ও ডিম তথা প্রয়োজনীয় সব উপকরণই সস্তায় পাওয়া যেতো এবং চাষীদের অবস্থার উন্নতি হতো। যখন একজন শ্রমজীবিকে কারবারে অংশীদার করা হয় তখন তার জন্য কাজ করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আগ্রহ ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। তার আত্মসম্মান বোধও ক্ষুণ্ন হয় না এবং তাকে অনাহারেও থাকতে হয় না।

নাসের সাহেব আবাদযোগ্য জমি সরকারীভাবে হুকুম দখল করে চাষী ও কৃষককূলের যেমন কোন কল্যাণ সাধন করেননি তেমনি সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির কোন কল্যাণও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সরকারী আমলা ও কর্তাব্যক্তিদের উৎপাদনের প্রতি কোন আন্তরিকতা থাকাতো দূরের কথা অসহায় ও অনন্যোপায় চাষী যারা ইতিপূর্বে জমিদারদের গোলাম ছিল এখন নব্য প্রভুদের দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র হয়ে পড়েছে। মিসর মূলত কৃষি প্রধান দেশ। অথচ সেখানে খাদ্য দ্রব্য ও গবাদি পশুর মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। যথাযথ পরিকল্পনা এবং ন্যায়নুগ ব্যবস্থা চালু করা হলে মুরগীর ডিমের দাম দশ কিরশের বেশী এবং গরু মহিষের দাম কখনো মিসরীয় এক হাজার পাউন্ডের অধিক হতো না। কিন্তু এখন দ্রব্য মূল্যের যে অবস্থা তা কোন মিসরবাসীরই অজানা নয়।

নাসের বড় অহংকারের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি গরীবদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবেন। হাঁ, অবশ্য তিনি তাদের ভাগ্য বদলে দিয়েছেন। তাদের অবস্থা আগে খারাপ ছিল এখন শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। জনসাধারণ যারা আগে কোন ঈদ বা উৎসব উপলক্ষে মাঝে মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত খাবার খেতো এখন তা থেকেও বঞ্চিত। ডিম, বকরীর গোশত, মুরগী ইত্যাদি এখন মিসরের ধনিক শ্রেণী ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জুটে না। নাসেরের সমাজতন্ত্র ও কৃষি সংস্কারের এই হলো পরিণতি।

www.amarboi.org

দ্বাদশ অধ্যায়

ইখওয়ান যখনই কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে তা খুব ভালভাবে অগ্র পশ্চাৎ ভেবে চিন্তে ও যাচাই-বাছাই করেই গ্রহণ করে থাকে। ১৯৫৪ সালে বৃটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তির জন্য মিসর ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তার ওপরও ইখওয়ান তার সুচিন্তিত দৃষ্টিভংগী জামাল আবদুন নাসেরের গোচরীভূত করেছিলো। পরে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। তন্মধ্যে একটা অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা বৃটিশ শাসনের গ্রাস থেকে মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছি। অতএব আমরা বিদেশীদের এজেন্ট, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক।

প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ উদঘাটন

আসুন এখন আমরা এ অপ্রকাশিত রহস্যের পর্দা উন্মোচিত করে তার অন্তরালে একটু তাকিয়ে দেখি। কারা আসলে দেশের বন্ধু আর কারা দেশের শত্রু। দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে বৃটেনকে অধিকার প্রদান করা হয়েছিল যে, মিসর ভূ-খণ্ডে তারা তাদের সামরিক ঘাঁটি বহাল রাখতে পারবে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রদেশগুলোর সহায়তার জন্য এসব সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা ছিল এই যে, যে যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ থাকবে না এমন কোন যুদ্ধেই যেন আমাদের দেশের মাটি থেকে একটা বিদেশী শক্তিকে তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয়া না হয়। চুক্তির অন্যান্য শর্তের কথা বাদ দিলেও এই একটা ধারাই ছিল এমন যার বর্তমানে সংশ্লিষ্ট চুক্তি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া যায় না। এ ঘটনার পর প্রায় ত্রিশ বছর অতিতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু তার খুঁটিনাটি আজও আমার মনে আছে। কেননা আমি ছিলাম সেসব ইখওয়ানের একজন যারা তা বাতিল করার জন্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছিলেন।

উস্তাদ সালেহ্ আবু রাকীক সরকারের এ ভিত্তিহীন অভিযোগের—যে আমরা বৃটিশের হাত থেকে মুক্তির বিরোধিতা করেছিলাম—জবাবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "এসব লোকের ওপর হামলা করা হয়েছিল। কারণ, তারা বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। বৃটিশ দূতাবাসে গিয়ে বৃটিশ কর্মকর্তাদের সাথে গোপনে মিটিং করেছিল এবং বৃটেনের নিকট আবেদন জানিয়েছিল যে, তারা যেন মিসর ত্যাগের চিন্তা মন-মগজ থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলেন, কেননা জাতি বিপ্লবী সরকারের পক্ষে নেই----------!"

বৃটিশ দূতাবাসের সাথে আলোচনা

এ সাক্ষাতকারের বিষদ বিবরণও শুনুন। মিসর সরকার এবং বৃটিশ শাসকদের মাঝে এ মর্মে পর্যাপ্ত আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কোন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছা তখনও সম্ভব হয়নি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব

www.amarboi.org

জেনারেল মুহাম্মাদ সালেম মরহুম আমাদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং আমাদেরকে অবহিত করেন যে, বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আমাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হতে চান। আমি মুর্শিদে আ'ম আল হুদাইবির খেদমতে এ পয়গাম পেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ

"বৃটেন কূটনৈতিকভাবে আমাদের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে। অতএব সাক্ষাত করায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু নাসের এবং তার সংগীদেরকে এ বিষয় অবহিত করতে হবে। যদি তারা সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে সাক্ষাত করা যেতে পারে। অন্যথায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে হবে।"

মুর্শিদে আ'ম নাসেরের সাথে দেখা করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। তৎকালে নাসেরও মুর্শিদে আ'ম পরস্পর টেলিফোনে প্রত্যহ কথাবার্তা বলতেন এবং কুশলাদি বিনিময় করতেন। জামাল আবদুল নাসের যদিও বিপ্লবের হোতা ও নায়ক ছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। তিনি তখন পর্যন্তও সাদাসিধে আচরণের অভিনয় করছিলেন। সে সময় কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারতো না যে, এ ব্যক্তিটিই বিলাসিতার এমন চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কার্যত তিনি তা করে দেখিয়েছেন। মোদ্দাকথা হলো, আল রাওদা মহলাস্থ মুর্শিদে আ'মের বাসগৃহে পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক জামাল আবদুন নাসের, আবদুল হাকীম আমের, সালাহ্ সালেম, এবং কামালুদ্দীন হোসাইন প্রমুখ যথা সময় এসে পৌঁছেন। মুর্শিদে আ'ম দূতাবাসের বিষয়টি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। মুর্শিদে আ'ম তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ তিনি তাদেরকে জানাতে থাকবেন।

ইখওয়ানের পক্ষ থেকে আমি এবং উস্তাদ মুনীর দাল্লা বৃটিশ কূটনৈতিক মিশনের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উপদেষ্টা মিষ্টার ইভান্সের সাথে আল মায়াদী মহল্লায় অবস্থিত ডাক্তার মুহাম্মাদ সালেমের বাসভবনে মিলিত হই। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর আমরা উপদেষ্টাকে দু'টো কথা মেনে নেয়ার ব্যাপারে সম্মত করতে সক্ষম হই। যা ইতিপূর্বে সরকারী প্রতিনিধিগণ পারেননি। সরকারী প্রতিনিধিগণের মাথায় একটা ভূতই জেঁকে বসেছিল যে, বৃটিশ চলে যেতে সম্মত হোক। তজ্জন্য তারা কি কি শর্ত আরোপ করছে সে ব্যাপারে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। পক্ষান্তরে আমরা চাচ্ছিলাম যে, বৃটিশরা সরে যেতে রাজি হলে পুরোপুরিই সরে যেতে হবে। কোন প্রকার বিধি-নিষেধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া চলবে না। আমি আদ্যোপান্ত পুরো ঘটনা মুর্শিদে আ'ম-এর সম্মুখে তুলে ধরি এবং তার সংগীদেরও অবহিত করি।

দুশ্চরিত্রদের বাহানার অন্ত থাকে না

নাসের ও তার সাথীরা পুনরায় আবার মুর্শিদে আ'মের খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনিও তাদের সামনে আলোচনার বিষয় বিষদভাবে তুলে ধরেন। তারা সবাই এ প্রতিবেদন শুনে যারপর নেই সন্তোষ প্রকাশ এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

www.amarboi.org

এমনিতেই আমাদের মধ্যে যেসব সাক্ষাত হতো তার খুঁটিনাটি সকল দিক সম্পর্কেই এ লোকদের ওয়াকিফহাল করা হতো। কিন্তু আপনারা জানেন যে, দুশ্চরিত্রদের বাহানার অন্ত থাকে না। আমাদের ওপর নির্যাতনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে এ বিষয়টিই "গোপন ষড়যন্ত্র" এবং বিপ্লবের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা বলে রটানো হলো।

আমাদের আলোচনার প্রায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো, ইত্যবসরেই বিপ্লবী সরকার পট পরিবর্তন করে। প্রথম দিকে ইংরেজরা ধারণা করেছিলো যে, আমরা এবং তারা (নাসের) যে দুই শরীর এক প্রাণ বিশেষ অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য ও অভিন্ন। তারা ভাবছিল যে, গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ। তাই আলোচনা চলাকালে তাদের আচরণ ছিল সমঝোতামূলক এবং ভূমিকা বেশ নমনীয়। জামাল আবদুন নাসের আকস্মিকভাবে খোলস বদলালে ইংরেজরা সর্তক হয়ে যায়। জামাল আবদুল নাসের প্রকাশ্য দিবালোকে হাওয়ামেদীয়া সফরের সময় জনসমক্ষে ইখওয়ানকে আক্রমণ করে কথা বলেন। আল বুহাইরায় পৌছে আরও একটু অগ্রসর হন এবং জনসভায় মানুষের সামনে আমাদের ভাই ওয়াহীদ রামাদানের তীব্র সমালোচনা করেন এবং সেই সময় তাঁর হাতে যে, কলম ছিল তাই তার মুখের উপর ছুড়ে মারেন। ইংরেজরা এই পরিবর্তনে অত্যন্ত সজাগ হয়ে যায় এবং মিষ্টার ইভান্স আমাকে বলেন যে, এখন তো সুস্পষ্ট বিভেদ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম—এতো খুবই মামুলি ব্যাপার। এতে আমাদের ও সরকারের মধ্যে কোন মতানৈক সৃষ্টি হবে না। মিসরীয় জনগণ সরকারের সাথেই রয়েছে ---------।

জামাল আবদুন নাসেরও তার সাংগপাংগরা যখনই উপলব্ধি করলো যে, ফল পেকে তৈরী হয়ে গেছে তখনই তারা ইখওয়ানকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। যাতে সমস্ত সফলতা এবং তার সুফল নিজেরাই কুড়িয়ে নিতে পারে। এ কাজের জন্য তারা ওপরে বর্ণিত নাসেরের আক্রমণ ছাড়াও আরো একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ঘটনাক্রমে ইখওয়ান সমর্থিত ছাত্ররা কায়রো ইউনিভারসিটিতে নওয়াব সাফাভী (ইরানের ফিদায়ানে ইসলামের প্রধান)-এর স্মরণে একটা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল। সরকার জীপ যোগে একদল লোক প্রেরণ করে। জীপের ওপর লাউড স্পীকার লাগানো ছিল। জীপে সামরিক বাহিনীর কিছু লোক এবং কিছু সংখ্যক বিপ্লবী যুবক ছিল। সমাবেশ স্থলে পৌছে তারা শ্লোগান দিতে শুরু করে এবং গন্ডগোল আরম্ভ করে। ইখওয়ানী ছাত্রগণ প্রথমে তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করে। তারা তা মানতে অস্বীকার করলে তারা তাদের আচ্ছামত শায়েস্তা করে। মার খেয়ে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং যাওয়ার সময় নিজেরাই গাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে। আমরা এ পরিস্থিতি সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ না-ওয়াকিফ। হঠাৎ জামাল আবদুন নাসেরের সেনাবাহিনী আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তল্লাশির অজুহাতে সবকিছু তছনছ করে ফেলে। পরিবারের সব লোকের সাথে অত্যন্ত অপমানজনক আচরণ করে। এ

www.amarboi.org

অশালীনতাপূর্ণ আচরণ ছিল এমন যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। ইখওয়ানের সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে হাতকড়া লাগিয়ে সামরিক কারাগারে এবং আমেরিয়ার জেলখানায় বন্দী করা হয়।

বিশৃংখল রাজ্য অযোগ্য রাজা

এবার দেখুন এসব লোকদের সততা ও বিশ্বস্ততা! দু'দিন পর্যন্ত আমাদেরকে জেলখানায় এমনভাবে বন্দী করে রাখা হলো যে, বাইরের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই থাকলো না। যমকালো কুঠুরী থেকে তৃতীয় দিবসে আমাদের বের করে একগাদা সংবাদপত্র আমাদের সম্মুখে রাখা হলো। সংবাদ পত্রসমূহে লাল ব্যানার হেডে খবর মুদ্রিত হয়েছে যে, সরকার মস্তবড় এক ষড়যন্ত্র উদঘাটন করেছেন। কতিপয় ব্যানার হেডের ভাষা আজও আমার মনে আছে ঃ

"ইখওয়ান বৃটিশ সরকারের সাথে আঁতাত করে বিপ্লব সংগঠিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এটেছিলো—গাদ্দারদের হাড়ি চৌরাস্তার মাঝে ভেঙ্গেছে।"

"ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা।"

"বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।"

"জনসাধারণের ভেবে দেখার সময়।"

"জামাল আবদুন নাসেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী কাউন্সিলের জরুরী অধিবেশন।"

এটাই ছিল সেই ষড়যন্ত্র যা ক্ষমতাশীন শাসকগোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে সাজিয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে চক্রান্ত ও গাদ্দারীর অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষের কূটকৌশল চলতে পারে না। সবাই জানতে পেরেছে, ষড়যন্ত্রের জাল কারা বিস্তার করেছিল আর কারা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে

আমাদের সকলকে কারাগারে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। কিছুদিন পরই হাঙ্গামা শুরু হয়। এই হাঙ্গামাই ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবী সরকারকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তারপর বিপ্লবী কাউন্সিলের মধ্যেই কিছু টানা-পোড়ন এবং ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়। জেলখানায় অন্তরীণ থাকার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ সমস্ত গোলমাল ও বিশৃংখলা থেকে নিরাপদে রাখেন। হঠাৎ আমরা জানতে পারলাম যে, জামাল আবদুন নাসের জেলখানায় আমাদের কাছে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন মুহাম্মদ আহমাদ, মুহাম্মাদ ফুয়াদ জালাল (সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী), মহীউদ্দীন আবুল ইজ্জ (কায়রোর স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান) প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তারা মুর্শিদে আ'মের সাথে তার কারাগারের সেলের মধ্যেই সাক্ষাত করেন। আমরাও মুর্শিদে আ'মের সাথে ছিলাম। তারা মুর্শিদে আ'মকে নাসেরের সালাম ও শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং বলেন ঃ নাসের সাহেব

www.amarboi.org

বলেছেন যে, এখন একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আপনারা প্রকৃত অর্থেই দেশ প্রেমিক। আপনারা জেল থেকে বের হয়ে দেশ ও জাতির স্বার্থে সরকারের সাথে সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন।

মু'মিনের দূরদৃষ্টি ও শয়তানী চক্রান্ত

কারাগারের এই সংকীর্ণ খুপরির মধ্যে এ ঐতিহাসিক সাক্ষাত চলাবস্থায় মুর্শিদে আ'মের অনুমতিক্রমে উস্তাদ সালেহ্ আবু রাকীক বললেন ঃ "তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে এমন ডাহা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছো যে, মিসরীয় কোন ভদ্রলোক এর চেয়ে ভয়ানক অপবাদের কল্পনাও করতে পারে না। তোমরা আবার তা ফলাও করে প্রচার করেছো। অথচ জামাল আবদুন নাসের খুব ভাল করেই জানে, প্রকৃত ঘটনা কি। আমরা কেবল এমন অবস্থায় জেল থেকে বের হতে পারি যখন জামাল আবদুন নাসের নিজে এ অপবাদ খন্ডন করবে। আমরা এমন পরিস্থিতিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি না। যেখানে আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতে লজ্জাবোধ করি না। যতদিন এ সমস্যার সমাধান না হচ্ছে ততদিন আমরা এখানে অবস্থান করাটাই উত্তম মনে করি।"

সাইয়েদ মুহাম্মদ আহমদ (যিনি এখনো বেঁচে আছেন) নাসেরের নিকট চলে গেলেন এবং সমাধান নিয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন। তিনি বললেন ঃ মুর্শিদে আ'ম এবং তার সাথে নেতৃস্থানীয় ছয়জন ইখওয়ানী (যাদের মধ্যে আমি নিজেও ছিলাম) কারাগার থেকে বের হবেন এবং মুর্শিদে আ'মের বাসভবনে চলে যাবেন। নাসের নিজে সেখানে উপস্থিত হবেন। এই উপস্থিতির খবর পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হবে। এবং রেডিওতে প্রচার করা হবে। (নাসের মুর্শিদে আ'ম-এর বাসগৃহে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আসেন এবং তা প্রচারও করা হয়।)

আমরা কারাগার থেকে বেরিয়ে এলাম এবং সরকার ইখওয়ানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলো। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমরা আবারও নাসেরের মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। তিনি মিছিল করাতে শুরু করেছেন। আইনবিদদের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ শ্লোগান। আইনজীবিদের এসেম্বলীর স্পীকার ডঃ সানহুরী পাশা মরহুমকে অপমান ও মারপিট ইত্যাদি (ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারি যে, "আল মিসরী" পত্রিকার ওপর সরকার হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে। এটা ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতিনিধিত্বকারী একটি সাময়িকী। নাসের সবসময় এই পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন।

নাসেরের সাথে সাক্ষাত

এ পরিস্থিতিতে মুর্শিদে আ'ম আমাকে নাসেরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেন। বারিউল কুব্বা নামক সামরিক সদর দপ্তরে আমি নাসেরের সংগে দেখা করি। আমি তাঁকে বললাম যে, আমাকে মুর্শিদে আ'ম আপনার নিকট

www.amarboi.org

পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তুমি ক্রমাগত বিক্ষোভ মিছিল করিয়ে যাচ্ছো তা অনতিবিলম্বে বন্ধ করাও এবং "আল মিসরী" সাময়িকীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক তৎপরতার চিন্তা পরিত্যাগ কর। এসব তৎপরতা আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগজনক।

নাসের আমার কথা শুনে বললো, আমি বিক্ষোভ মিছিল বন্ধ করিয়েছি এবং "আল মিসরী" সাময়িকীর বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হবে না। আমাদের বিরোধী সকল শক্তি এখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কেবল একটি ফ্রন্ট থেকেই এখনো পর্যন্ত আমাদের মোকাবিলা করা হচ্ছে। আর সেটা হচ্ছে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইখওয়ানী ছাত্র সংগঠন। তারা আমাদের নির্দেশনার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করছে না। তারা যেন বিদ্রোহের পতাকা উডডীন করে রেখেছে। আপনাদের স্বাধীনভাবে বিচরণে তো কোন রকম অসুবিধা নেই। এখন আমরা সেই ছাত্রদের ধোলাই করার জন্য যে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করি না কেন তাতে আপনারা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না। অন্যদের ব্যাপারে আপনাদের নাক গলানোর প্রয়োজন কি?

আমি নাসেরকে জানিয়ে দিলাম, জনাব সাইয়েদ জামাল! এটা আপনি কি বলছেন? আমাদের কি আমাদের সন্তানদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাপারে কোন ভাবনা-চিন্তা থাকা উচিত নয়? আপনি কি আপনার এ বিবৃতি সাংবাদিক সম্মেলনে দিতে যাচ্ছেন?

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ 'না'

যা হোক, আমি তার সংকল্প অনুমান করতে পারলাম। আর সে-ও আমাদের ভূমিকা ও দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট বুঝতে পারলো।

নাজিবের বিরুদ্ধে নাসেরের ষড়যন্ত্র

সে দিনগুলো বড়ই সংকটময়। প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনের খবর আসছিল। আমরা জানতে পারলাম যে, নাসের এবং জেনারেল মুহাম্মাদ নাজীবের মাঝে টানা পোড়ন শুরু হয়েছে। মুর্শিদে আ'ম এ সুযোগে নিজে নিজেই নাসেরকে বোঝানোর জন্য তার নিকট গমন করেন। সে তখনো পর্যন্ত নাসিয়াল বাকরী নামক স্থানে একটা সাধারণ বাড়ীতে বাস করতো। মুর্শিদে আ'ম-এর সাথে ছিলেন ডাক্তার মোহাম্মাদ কামাল খলিফা, উস্তাদ মুহাম্মাদ নাসর ও জনাব সালেহ আবু রাকীক প্রমুখ। মুর্শিদে আ'ম কোন রকম ইতস্তত না করেই খোলাখুলিভাবে নাসেরকে বলতে লাগলেন যে, এরূপ মতবিরোধের ফলে খুবই ক্ষতি হবে। তিনি তাকে আহবান জানান যে, এসব অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য অতিদ্রুত দূর করে পারস্পরিক বুঝাপড়া করার ক্ষেত্র তৈরীর চেষ্টা করুন। তার জানা ছিল যে, নাসের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তাই তিনি তাকে নসীহত করলেন যেন আরো দু'তিন দিন বিষয়টির ওপর চিন্তা-ভাবনা করা হয় এবং তড়িঘড়ি করে কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা না নেয়া হয়। এতে ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যেতে পারে। মুর্শিদে আ'ম-এর বক্তব্য শুনে নাসের বললেন ঃ সেনাবাহিনী কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছে তারা একটা কিছু করতে চাচ্ছে। (অর্থাৎ নাজীবকে বরখাস্ত করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।)

www.amarboi.org

এ সময়েই প্রায় আটশত সশস্ত্র সৈন্যের বিক্ষোভ মিছিল সেখানে গিয়ে পৌছে। তারা বিরাজমান পরিস্থিতির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছিলো। নাসের আরো বলেন যে, তিনি তিন দিনের জন্য বিষয়টি বিলম্বিত করবেন। তাছাড়া তিনি সাথী নাজীবের সাথে সাক্ষাত করতেও যাচ্ছেন।

গৃহযুদ্ধের আশংকা

মুর্শিদে আ'ম হক নসীহত করেই চলেছিলেন। তিনি নাসেরকে বুঝানো ছাড়াও নাজীবের নিকট তাঁর প্রতিনিধি মুহাম্মাদ ফারগলী ও সাঈদ রামাদানকে প্রেরণ করেন এবং একই নসীহত তাকেও করতে বলেন। পরিস্থিতি খুবই সংকটময় হয়ে পড়েছিল। মুহাম্মাদ নাজীবের সমর্থক অশ্বরোহী সৈন্যদের মধ্যে ছিল বেশী। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো ঃ যে সমস্ত অফিসার নাজীবের পক্ষে বিক্ষোভের জন্য বেরিয়েছিল নাসের তাদেরকে চক্রান্ত করে বন্দী করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেন। এভাবে নাজীবের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নাসের অব্যাহতভাবে তার শক্তির প্রদর্শনী করতে থাকে। আমরা ভাবছিলাম যে, যদি সামন্যতম কোন ভুলও হয়ে যায় তাহলে তা গৃহযুদ্ধের দিকে মোড় নেবে। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছিলাম এ বিপদ থেকে যেন প্রাণ প্রিয় দেশ মাতৃকা রক্ষা পায়। দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই আমরা বার বার আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন অকাতরে বরণ করে নিয়েছি। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে দেশ প্রেমিকই না হতাম তাহলে নিজেদের চামড়া বাঁচাবার জন্য সর্বদাই গৃহযুদ্ধের পথ বেছে নিতে পারতাম।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জামাল আবদুন নাসের বহুরূপী মানুষ। বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। আমাদেরকে যখন কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়েছিল তখন জামাল আবদুন নাসের প্রস্তাব পেশ করেছিলো যে, জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং জটিলতা ও সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটিতে ইখওয়ান ও সামরিক কাউন্সিলের সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। ইখওয়ান এবং কাউন্সিলের মধ্যে যদি কোন ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয় তাহলে এ কমিটি তা নিরসন করার দায়িত্বও পালন করবে। পরিতাপের বিষয় হলো ঠিক এই প্রস্তাবই আমাদের দু'জন সদস্য মুনীরউদ্দৌলা ও সালাহ্ শাদী ইতিপূর্বে পেশ করেছিলেন। তাতে নাসেরের প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, বিপ্লবী কাউন্সিলের ওপর আমরা কোন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান চাই না। আমরাই সরকার। সরকারের ওপর কোন প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা নেই।

এ ব্যাপারে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, এ প্রতিষ্ঠান সরকারের কর্মকাণ্ডে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আমরা এই সমঝোতা কমিটি থেকে শুধু পারস্পরিক বুঝা পড়ার কাজ পেতে চাই। আমাদের কদাচ এরূপ কোন উদ্দেশ্য নেই যে, সরকার কোন আইন বা সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বেই আমাদের অনুমোদন নিতে বাধ্য থাকবেন। নাসের সে সময় বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। এখন সে নিজেই প্রস্তাব পেশ করছে। যদিও এবারে সে কেবল প্রস্তাব পেশ করার কষ্টই স্বীকার করেছেন। অগ্রসর হয়ে আর কিছুই করেনি।

আমাদের ওপর দোষারোপের পালা আসলে হুঙ্কার ছেড়ে অত্যন্ত জোরেশোরে তীব্র প্রতিবাদী ভাষায় বলা হলো এই ইখওয়ানীরা নিজেদেরকে সরকারের উর্ধে মনে করে। তারা চায় তাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া ছাড়া যেন কোন আইন কার্যকরী না করা হয়। ইখওয়ানীরা চায়, তাদের অনুমতি ছাড়াও যেন কোন একটা পাতাও না নড়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের সাথে তার আচরণ তো সর্বদা এমনই হয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় আমাদের সহযোগিতা কামনা করেছে আর বিপদ কেটে গেলে বা মতলব হাসিল হয়ে গেলে তখন অভিযোগের পুরস্কার আর দোষারোপ তোহফা হিসেবে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

বিপ্লবের রোয়েদাদ

বিপ্লবের পূর্বের বর্ণনাও শুনে রাখুন। বিপ্লবের ফায়সালা হয় ইখওয়ানের পরামর্শক্রমে ও সার্বিক সহযোগিতায় কিন্তু বলা হয়, যেহেতু ইখওয়ান বিশ্ব শক্তিসমূহের দৃষ্টিতে একটা শক্তিশালী সংগঠন। বিশেষত ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো তাদের আত্মনিবেদনের দৃশ্য দেখেছে। সেজন্য প্রকাশ্যে এগিয়ে আসা তাদের জন্য উচিত নয়। কর্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করবে সেনাবাহিনী। আর ইখওয়ান পর্দার অন্তরালে থেকে সহযোগিতা করবে। তিনি বলেনঃ এসব ইখওয়ানী যুবক যারা মুহাম্মাদ (সা)-এর আনীত পয়গামের বিশ্বস্ত

www.amarboi.org

সংরক্ষক ও পতাকাবাহী। বিশ্বশক্তিগুলো তাদের দেখে খুবই আতঙ্কিত এবং ভীত সন্ত্রস্ত। তারা সম্মুখে অগ্রসর হলে ইসলামের সমস্ত দুশমন উঠে দাঁড়াবে। ফলে বিপ্লব সফলতা লাভ করতে পারবে না। আমরা বললাম ঃ ঠিক আছে, আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করাই মূল লক্ষ্য। সুনাম সুখ্যাতির কোন আকাংখা আমাদের নেই।

পাশ্চাত্য দূতাবাসসমূহ ও ইখওয়ান

মিসরে নাকরাশী পাশার মন্ত্রীত্বের আমলে পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ এক জায়গায় সমবেত হন এবং প্রধান মন্ত্রীকে এক কড়া নোট প্রেরণ করেন। সেই নোটে যেমনি ছিল পীড়াপীড়ি তেমনি ছিল হুমকি যেন ইখওয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ সময়ই আযাদ অফিসার বিপ্লবের জন্য একপায়ে দাঁড়িয়েছিল। নাকরাশী পাশা ইখওয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কঠিন পর্যায়সমূহ ও ত্যাগ স্বীকারের মত ক্ষেত্রসমূহের দাবী পূরণের জন্য ইখওয়ানের ওপরে ভরসা করে বসেছিলো। এই বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে সেনাবাহিনী বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা আন্দোলনকে কি কখনো নিঃশেষ করতে পারে?

নাকরাশী পাশার পক্ষ থেকে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তা ছিল প্রথম নিষেধাজ্ঞা। তারপর আমাদের ইতিহাস নিষেধাজ্ঞার ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়েছে। কথায় বলে এক পন্থা দুই কাজ, কিন্তু মিসর ও ইসলামের দুশমনরা এক পন্থা ও তিন কাজের প্রদর্শনী করে দেখিয়েছিলো। তারা ইখওয়ানের ওপর আঘাত করেন যা ছিল প্রকৃতপক্ষে মিসরের শাসকগোষ্ঠীর ওপর আঘাত এবং সর্বোপরি সমগ্র মিসরীয় জাতির ওপর আঘাত। আমাদের শত্রুরা জানে যে, মিসর আরব বিশ্ব ও ইসলামী দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে পারে। অতএব তারা মিসরকে কখনো ইসলামী রূপ গ্রহণের অনুমতি দেয় না। এভাবে তারা এক তীরে তিন তিনটি শিকার করে চলেছে।

হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করো তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর

আমি এখানে এ সত্যটি তুলে ধরাও জরুরী মনে করি যে, নাসেরের নির্যাতন ও দমননীতি ইখওয়ানের পয়গাম মিসরের বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সন্ত্রাসী পরিস্থিতির কারণে বহু ইখওয়ান দেশ থেকে হিজরত করে চলে যায়। যেহেতু নাসের নিজেও সর্বদা ইখওয়ানের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। তাই ইখওয়ানের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার ব্যাপারে কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি। সে মনে করতো যে, এরা মিসর থেকে চলে গেলে সে হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। দেশের বাইরে গমনকারী এসব লোকেরা আন্দোলনের পয়গাম তাদের সংগে নিয়ে যায়। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই ইখওয়ানের দাওয়াত প্রসার লাভ করেছে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, সুদূর ইউরোপ, প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে ইখওয়ানের প্রচেষ্টায় ইসলামের আলো ও জাগরণ ছড়িয়ে পড়া যেন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। ফাতেহ মুহাম্মাদের হাতে কনস্টান্টিনোপল বিজয় হয়। তখন

www.amarboi.org

ঈসায়ী আলেমগণ সেখান থেকে হিজরত করে। ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মহাদেশে তারা খৃস্টবাদের প্রসার ঘটান। এখন মিসরেও নাসের সত্য পন্থীদের ওপর জুলুম নির্যাতনের অস্ত্র প্রয়োগ করলো। তাই ইসলাম প্রিয় জনতা ইসলামের শাশ্বত বাণী বক্ষে ধারণ করে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সাথে ইসলামী আন্দোলনও এসব দেশে প্রসার লাভ করতে থাকে।

জুলুমের রাতের অবসান

আমার স্মৃতি পটে সেই দৃশ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে যখন ১৯৭১ সালে আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এটা ছিল ৩০শে জুন ১৯৭১ সালের কথা। ইখওয়ানী ভাইয়েরা মাগরিবের নামায সবে মাত্র শেষ করেছেন। আমি তখনও নামায পড়ছিলাম। এরই মধ্যে আমি ইখওয়ানী ভাইদেরকে উচ্চৈস্বরে পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলতে শুনলাম। তাদের আলোচনায় তারা বার বার আমার নাম উল্লেখ করছিলো। আমি সেদিকে তেমন ভ্রুক্ষেপ করলাম না। সালাতুল এশার পর জনৈক অফিসার আমার নিকট আগমন করে বলতে লাগলেন আপনি, উস্তাদ মামুন আল হুদ-াইবি এবং আপনার অন্যান্য সংগী-সাথীদের মুক্তিদানের নির্দেশ এসেছে। আপনাদের মালপত্র গুছিয়ে নিন এবং বেরিয়ে পড়ুন। আমি তাকে বললাম এটা কি সম্ভব নয় যে, আমি এই রাতটি এখানেই অতিবাহিত করি এবং আগামীকাল সকালে চলে যাই। কেননা আমি এত দীর্ঘ সময় কারাগারে অবস্থান করছি যে, কায়রোর রাস্তাঘাট পর্যন্ত ভুলে গেছি। এত বছরের দীর্ঘ সময়ে না জানি কায়রোতে কত পরিবর্তন এসেছে। রাতের বেলায় আমি আমার বসতবাড়ী কিভাবে খুঁজে বের করব ?

আমার কথা শুনে কর্মকর্তাটি চোখ কপালে তুলে বলতে লাগলো ঃ এটা আপনি কি বলছেন ? আপনি কি বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বেরিয়ে যেতে চান না ?

আমি বললাম ঃ "জেল থেকে ছাড়া পেতে চাই, কিন্তু আজ রাত এখানেই কাটিয়ে আগামী কাল প্রত্যুষে বেরিয়ে যাওয়া উত্তম বলে মনে করি।"

জেল অফিসার বিস্মিতও হলেন আবার পীড়াপীড়িও করছিলেন যেন আমি শীগ্রই জেলখানার বাইরে চলে যাই। তিনি বললেন ঃ যখন আপনার মুক্তির ফরমান আমার হাতে এসে পৌছে তখনই আপনার নাম কারাগারের হাজিরা পৃষ্ঠা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এখন আপনি আমাদের হিসেবের অন্তর্ভুক্ত নন। যদি আল্লাহ না করুন আজ রাতে জেলের ভেতর আপনার কিছু হয়ে যায় তাহলে সে দায়িত্ব বহন করবে কে ? আমাদের জন্য তা বড়ই বিপদের কারণ হবে। আমাদের আতিথেয়তা এ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। আপনি কারা ফটকের বাইরে সানন্দে রাত্রি যাপন করতে পারেন। কিন্তু এ চার দেয়ালের ভেতর এখন আর আপনার অবস্থান সম্ভব নয়।

একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ

অগত্যা আমি অফিসার মহোদয়কে অনুরোধ করলাম—অবস্থা যদি এই-ই হয় তাহলে আমার জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন।

www.amarboi.org

তিনি একখানা ট্যাক্সি নিয়ে আসলেন। ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে আমার বাসগৃহে নিয়ে গেল। এটা কত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমি আমার বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যে আমার পরিবার পরিজনের মাঝে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে গিয়ে হাজির হলাম।

আপনি বিস্ময়ে হতবাক হবেন যে, আমি বাড়ীতে কিংবা আমার মন-মগজে কোন বড় পরিবর্তন অনুভব করলাম না। মনে হচ্ছিলো যেন আমি গতকালই আমার বাড়ী থেকে গিয়েছিলাম আর আজ পুনরায় ফিরে এসেছি। অথচ ইতিমধ্যে প্রায় আঠারটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আরো জেনে নিন যে, আমি স্বভাবগতভাবে আমার পরিবার পরিজন ও প্রিয়জনদের খুব বেশী ভালবেসে থাকি। তারপরও কি রহস্যজনক ব্যাপার যে, এ সুদীর্ঘকাল একদিনের বেশী মনে হয়নি। আমি নিজে এ রহস্যের কিছু জানি না। আমার মনে হয় মানুষের শিক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালার অগণিত নিদর্শন সৃষ্টিজগতে বিদ্যমান। এটাও তারই একটা নিদর্শন।

এই উচ্চ মর্যাদা যিনি লাভ করেছেন

আমার নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ করুন। আমি স্বাধীনতার প্রেমিক। অথচ আমি এ সুদীর্ঘ সময় জেলখানায় অতিবাহিত করলাম। কিন্তু সেজন্য অন্তরে কোন দুঃখ কিংবা মনের ওপর কোন বোঝা অনুভব করিনি। আমার চিন্তা-চেতনার প্রতি লক্ষ্য করলে আমার ধৈর্য ও পরিতৃপ্তি এই অবস্থা দেখে আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন। আমি যখন পাখীদের ইচ্ছামত আকাশে উড়ে বেড়াতে দেখি তখন তাদের এই অবাধ স্বাধীনতা দেখে আকাংখা জাগে—আমার বড় ঈর্ষা হয়। মাছের কথা চিন্তা করি তারা গভীর পানিতে কত অবাধে বিচরণ করে থাকে। আবার যখন ইচ্ছা পানির বুক চিরে ওপরে ভেসে ওঠে। তখন তার সৌভাগ্য দেখে হতবাক হয়ে যাই। অথচ আমার নিজের অবস্থা এই যে, সুদীর্ঘ সময় কারাপ্রকোষ্ঠেই কেটে গেল। না ছিল মুখখোলার অনুমতি, না নড়াচড়ার স্বাধীনতা! তারপরও আন্তরিক প্রশান্তি! এটা আল্লাহর দ্বীনের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ

একথা সত্য যে, ছোট ছোট প্রাণী ও পাখীরা বড় বড় প্রাণী ও পাখীদের শিকারে পরিণত হয়। ছোট ছোট মাছগুলোকে বড় মাছেরা খেয়ে ফেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতদিন তাদের দেহে প্রাণ থাকে ততদিন তারা স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারে এবং এ মহানেয়ামত পেয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকে। তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে, মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াতে, সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে, গভীর পানিতে ডুব দিতে ও সাঁতার কাটতে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা ও এখতিয়ারকে কাজে লাগাতে পারে। এ ক্ষেত্রে কারো বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের কোন সুযোগ থাকে না। এসব প্রাণী, পাখী ও মৎস্যের জন্য আল্লাহর এত বড় নিয়ামত যে, তার কোন বিকল্প নেই। মানুষ সৃষ্টির সেরা কিন্তু আফসোস ! সে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে না-ওয়াকিফ এবং তার নেয়ামত থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। মানুষ যদি আইনের সীমানার মধ্যে থেকেই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতো এবং আইনের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে পাকড়াও

www.amarboi.org

করা হতো তাহলে মানবতা কতইনা সৌভাগ্যবান ও সমৃদ্ধ হয়ে যেতো। অথচ এখানে অবস্থা এই যে, ক্ষমতাধররা কেবলমাত্র এমন কথাই বলার অনুমতি দান করেন যা তাদের তোষামোদ এবং প্রশংসার জন্য উচ্চারিত হয়। আবার চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা তার নিকট ততক্ষণই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ তা থাকে তার মর্জির অধীন।

মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে এই স্বাধীনতা। এজন্য সে কখনো স্বৈরাচার ও একনায়কত্বকে পছন্দ করে না। আমার সুদীর্ঘ কারা জীবনে যে জিনিসটি আমাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে তা ছিল আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত তাকদীরের ওপর অবিচল আস্থা এবং অগাধ বিশ্বাস। আমার বলিষ্ঠ ঈমান ছিল যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমার প্রিয় জীবনের একটা অংশ জেলখানায় কাটানোর ফায়সালা করেছেন। তাই আমি তার সন্তুষ্টির ওপর রাজী থাকলাম। আমি আমার অন্তরের অন্তস্থলে এবং আবেগ-অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্ত্রীতে পর্যন্ত আপাদমস্তক আত্মসমর্পিত ও সন্তুষ্ট থাকি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই দোয়ার অর্থও আমার সম্মুখে সুস্পষ্ট—যাতে তিনি রাব্বুল ইজ্জাতের সমীপে আরজ করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার ফায়সালা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার জন্য দোয়া করছি না। বরং আমি তোমার নিকট আবেদন করছি তোমার গৃহীত সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে মেনে নেয়ার জন্য আমাকে মানসিক প্রশান্তি প্রদান কর। আর তা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দাও।

আর এটা যখন আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা এবং তারই নির্ধারিত তাকদীর —যাতে চুল পরিমাণ পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা কারো নেই। তখন অস্থিরতা ও অধৈর্য হওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? আমার জেলে যাওয়া এবং একটা মেয়াদকাল সেখানে অতিবাহিত করা ছিল আল্লাহ্ তায়ালারই ফায়সালা। এতে আল্লাহর ইহসান ও করুণা ছিল এই যে, আমি কোন অন্যায় কাজের জন্য কিংবা কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ জেলে যাইনি। আমি একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য শৃংখলাবদ্ধ হয়েছিলাম। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর পথে আহবান। এজন্য আমি পুরোপুরি আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিসহ্ সকল প্রকার প্রতিকূলতা এবং কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরী ছিলাম এবং এখনও আছি।

প্রবৃত্তির আকাংখা ও তার পূজা

হাসান আল হুদাইবি যখন ইখওয়ানের মুর্শিদে আ'ম নির্বাচিত হন তখন একই সাথে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যগণের নির্বাচনও সম্পন্ন হয়। তাঁর (মুর্শিদে আ'ম-এর) প্রত্যাশা ছিল নবনির্বাচিত সদস্যগণ উচ্চ শিক্ষিত সাথীদের মধ্য থেকেই যেন নির্বাচিত হয়। কোন কোন ইখওয়ান তাঁর এ মতের সাথে একমত হতে পারেননি। যা হোক নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক সদস্যের দৃষ্টিভংগী ও আচার আচরণে এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে, মুর্শিদে আ'ম হয় নির্বাচন কমিশনই বাতিল করে দেবেন নয়তো সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করবেন।

www.amarboi.org

তবে তিনি এখনো এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেননি। ইত্যবসরে আবদুর রহমান সিন্ধী যার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং যিনি সাইয়েদ হাসানুল বান্না শহীদের আমলে বিদ্রোহাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন—এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার অপেক্ষায় ছিলেন। ইমাম শহীদের সময় পরিস্থিতি ভিন্ন রকম ছিল। কিন্তু এখন জামাল আবদুন নাসের আবদুর রহমান সিন্ধীর মনোভাবের ফলশ্রুতিতে পিঠে হাত বুলাচ্ছিলেন।

উস্তাদ আল বান্না শহীদের জীবদ্দশায় তিনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করার সার্বিক অপপ্রয়াস চালিয়ে দেখেছিলেন যে, ইখওয়ানের মিজাজ ও প্রশিক্ষণের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে তাদেরকে মুর্শিদে আ'মের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো ও উত্তেজিত করা সম্ভব নয়। অথচ সেই তিনিই এখন পুনরায় অনুভব করেন যে, পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই এখন তার দূরভিসন্ধি কাজে লাগতে পারে। একদিকে নাসেরের সামগ্রিক পৃষ্ঠপোষকতা অপরদিকে কোন কোন ইখওয়ানের মানসিক অস্থিতিশীলতা সিন্ধী সাহেবকে আবার ভাগ্য পরীক্ষায় ব্রতী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে তোলে। হাসান আল হুদাইবি ছিলেন অত্যন্ত ধীর স্থির, অনমনীয় এবং প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি কারো কাছে নতি স্বীকার করার লোক ছিলেন না। আবদুর রহমান সিন্ধী ও তার সাথীরা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সহযোগিতায় একদিন রাতে মুর্শিদে আ'মের বাসগৃহের ওপর আক্রমণ করে বসে। টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং জোরপূর্বক মুর্শিদে আ'মকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়। বাড়ী থেকে কিছু দূর এক জায়গায় নিয়ে তাঁকে ইখওয়ানের নেতৃত্ব থেকে ইস্তফা দিতে বলে। এসব নির্বোধদের জানা ছিল না যে, হাসান আল হুদাইবি কারো চাপের মুখে কাবু হওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে, তার ঘাড়ের ওপর তলোয়ার ধরা হলেও তিনি ইস্তফা দিতেন না।

মুর্শিদে আ'ম-এর আহবান ও আমার উপস্থিতি

হাসান আল হুদাইবির নিকট থেকে ইস্তফা ও পদত্যাগপত্র নিতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে সেখানেই রেখে এসব ব্যক্তি কেন্দ্রীয় অফিসে এসে তা দখল করে। আমি যেখানে ভাড়ায় থাকতাম সে বাসার অপর অংশে বাড়ীর মালিক বাস করতেন। সেখানে টেলিফোন ছিল। সন্ধ্যায় কে বা কারা আমাকে ফোন করলো। অন্য প্রান্ত থেকে ভাই ফরিদ আবদুল খালেক কথা বলছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি মুর্শিদে আ'মের বাড়ীতে আছি আপনি এখনই এখানে চলে আসুন। আপনাকে নিয়ে আসার জন্য একটা মোটর সাইকেল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাড়ীওয়ালাকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তিনি বললেন ঃ আমি আপনাকে এভাবে যেতে দেব না। ফোনকারী কে আর এ মোটর সাইকেল আরোহীর পরিচয় এবং তার মতলব কি তা তো জানা নেই? মোটর সাইকেলওয়ালা আগে আগে যাবে আর আপনি আমার সাথে গাড়ীতে বসুন। আমি আপনাকে মুর্শিদে আ'মের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসবো। অতএব সেই সদয় বন্ধুর গাড়ীতে করেই আমি মুর্শিদে আ'মের বাসভবনে গিয়ে উপনীত হলাম।

www.amarboi.org

মুর্শিদে আ'মের বাড়ীতে তখন কয়েকজন ইখওয়ান বসে ছিলেন। আমি তাদেরকে অস্থির দেখে জিজ্ঞেস করলাম খবর ভাল তো ? তারা আমার কাছে সব ঘটনা বর্ণনা করলো। ভাই হারুন মুজাদ্দেদীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার নিজের প্রাইভেট কার ছিল। আমাকে কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করলাম। আমরা যখন কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়ে দেখতে পেলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তালাগুলোতে শিকল লাগানো দেখতে পেলাম। এবং ভিতর থেকে এক ভাই "সিন্ধী সাহেবের সাথী" দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করছে। আমার বন্ধু ও সহকর্মী ভাই সালেহ আসমাভীও (নায়েবে মুর্শিদে আ'ম) দফতরে উপস্থিত ছিলেন। প্রহরী আমাকে দেখে বললো ঃ আমি আসমাভী সাহেবের অনুমতি নিয়ে তার পর দরজা খুলে দিচ্ছি।

আমি বললাম মা'শায়াল্লাহ, বেশ ! এখনই কি সেই সময় এসে গেছে যে, আমি অনুমতি ব্যতীত এই দফতরে প্রবেশ করতে পারবো না। তারপর সে ভিতরে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দরজা খুলে দেয়। আমি সোজা ভেতরে প্রবেশ করি। মিলনায়তনে আমি প্রায় চল্লিশ জন সরকারী বিভাগের লোককে দেখতে পাই। আমি হল থেকে বেরিয়ে মুর্শিদে আ'মের দফতরে যাই। সেখানে ভাই সালেহ আসমাভী মরহুম বসে ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আলহাজ্জ সালেহ, এত উৎসব আয়োজন কিসের ? তিনি হেসে বললেন, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জলসা।

আবদুর রহমান সিন্ধী এই চল্লিশ ব্যক্তির সাহায্যে দফতর দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। টেলিফোনে আমি তার সাথে যোগাযোগ করি। উস্তাদ আহমদ বিন আবদুল আযীয টেলিফোন ধরেন অনেক দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা হয়। গোটা রাতই এই বিতর্কের মধ্যে কেটে যায়, আমি আবদুর রহমান সিন্ধীকে আচ্ছা রকম জব্দ করে বলি যে, তিনি এটা কেমন আচরণ করলেন। আন্দোলনের মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে সমাধান করা হয়ে থাকে। পুলিশ ফোর্সের সাহায্যে নয়। মোদ্দাকথা একদিকে ফজরের আযানের সময় হয়ে যায়, অপর দিকে আবদুর রহমান সিন্ধী সশস্ত্র ব্যক্তিদেরকে দফতর থেকে সরিয়ে নিতে সম্মত হয়।

মুসিবত কেটে গেল

অপরদিকে ইখওয়ানও এক জায়গায় সারারাত পরামর্শ করতে থাকে। পরিশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঢিলের জওয়াব পাটকেল দিয়েই দেয়া হবে। তারা সবাই সুলতান হাসান মসজিদে সমবেত ছিলেন। তারা ফায়সালা করেন যে, কেন্দ্রীয় দফতরে গিয়ে অবরোধকারীদেরকে বহিষ্কার করতে হবে। তবে আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, সংঘর্ষের পর্যায়ে যেতে হয়নি। এ লোকদের সেখানে গিয়ে পৌঁছার আগেই সরকারী লোকজন দফতর ছেড়ে চলে যায়। সমস্যাটি ভালোয় ভালোয় সমাধান হয়ে যাওয়ায় আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

www.amarboi.org

পরদিন ইখওয়ান কেন্দ্রীয় দফতরে মুর্শিদে আ'মের সম্মানে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে। উক্ত সমাবেশে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। সবার কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইখওয়ানের ওপর কারো নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। মুর্শিদে আ'ম তো ইখওয়ানের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত হয়ে থাকে। যার প্রতি থাকে ইখওয়ানের ঐকান্তিক ভালবাসা এবং যার নির্দেশে তারা জীবন বাজি রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে সদা প্রস্তুত।

সিন্ধী সাহেবের পুরস্কার ও পরিণতি

সেদিন থেকেই ইখওয়ানের সাথে আবদুর রহমান সিন্ধীর সকল সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর সে আর কখনো অগ্রসর হতে পারেনি। তার পরিণতি এবং পরিণামও শিক্ষণীয়। শুধু মাত্র স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য উল্লেখ করছি। জামাল আবদুন নাসের সিন্ধী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাকে শেল কোম্পানীর উচ্চ পদে নিয়োগ করা হয় এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় বড় জাকজমক পূর্ণ বাংলো প্রদান করা হয়। মহোদয় কিছুদিন বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবন যাপন করেন। কিন্তু কতদিন !

নাসেরের মেজাজ ছিল অস্থির প্রকৃতির। ১৯৬৯ সালে আবদুর রহমান সিন্ধীকে গ্রেফতার করা হয়। তার এত সেবা ও আনুগত্য সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় যে, ইখওয়ানের সাথে তার গোপন যোগসাজশ রয়েছে। তার সংগী-সাথী যারা ইখওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল যেমন আবদুল আযীয কামিল প্রমুখও বাদ পড়েনি। আবদুর রহমান সিন্ধীকে এমনভাবে ধোলাই করা হয় যে, জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মারের চোটে বেচারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অসুখই প্রাণঘাতি প্রমাণিত হয় এবং সে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যায়। আল্লাহ তায়ালা মরহুমকে ক্ষমা করে দিন এবং তার সমস্ত অপরাধ তাঁর রহমত দ্বারা ঢেকে দিন।

আবদুর রহমান সিন্ধী ইখওয়ানের সমস্ত তথ্য নাসেরকে পৌছানের দায়িত্ব পালন করতেন। এ কারণেই তিনি নাসেরের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু নাসেরের পৃষ্ঠপোষকতা ইখওয়ানের ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হয়নি। তিনি একটা অত্যন্ত মামুলী ধরনের তুফান সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তা সোডার বোতলের উথলিয়ে ওঠার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। এই ফিতনার খুবই সাধারণ আঁচড় তিনি রেখে যেতে সক্ষম হন। অনতিবিলম্বেই যার প্রতিকার হয়ে যায়। ইখওয়ানের বিরুদ্ধে তার এই গোয়েন্দাগিরী দুনিয়াতেও মরহুমের তেমন কোন কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। আবার আখেরাতে তা বড় রকমের কোন পুরস্কার লাভের কারণ হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলেরই ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিন।

www.amarboi.org

চতুর্দশ অধ্যায়

উস্তাদ আল হুদাইবির ব্যক্তিত্বকে সরকার কিংবা তার দোশরগণ কোনভাবেই ক্ষুণ্ন কিংবা ব্যাহত করতে পারেনি। তার সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রভাব প্রথম থেকেই ইখওয়ানের ওপর পড়ে অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে। জামাল আবদুন নাসের সিন্ধী ও তার সাথীদের সাহায্যে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। আল্লাহর নিরপত্তা ও তত্ত্বাবধানের মোকাবিলায় কি কারো কোন জোর-জবরদস্তি চলতে পারে। বাইয়াত গ্রহণকারীগণ জেনে বুঝে আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই মুর্শিদে আ'মের হাতে হাত রেখেছেন। কপটতার কূটকৌশল ও দুরভিসন্ধীর দ্বারা কি এ বাইয়াতের গ্রন্থি ছিন্ন হতে পারে। এ বিদ্রোহাত্মক আচরণ ইখওয়ানের শক্তি হ্রাসের পরিবর্তে তা আরো বৃদ্ধি করে। আমাদের এবং বিদ্রোহীদের মাঝে একটা মস্তবড় ফারাক রয়েছে। আমরা সর্বোতভাবে তাদের হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী। অথচ তারা আমাদের সর্বনাশ সাধনে তৎপর। কল্যাণের পতাকাবাহী এবং শিরকের প্রচারক কখনো সমান হতে পারে না। আমরা তাদের স্থায়িত্ব কামনা করতাম আর তারা ছিল আমাদের ধ্বংসের প্রত্যাশী। লতাপাতা ও খড়কুটো তো পানির স্রোতের সাথে ভেসে যায় বটে। কিন্তু পানি সরে যাওয়ার পর সেখানে আবার দেখা দেয় সবুজের সমারোহ। আর পারিপার্শ্বিকতায় বসন্তের ভরা যৌবনের আমেজ এনে দেয়। নিসন্দেহে এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এমনসব লোকদের জন্য যাদের অন্তর (দৃষ্টিশক্তি) রয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা

মানবেতিহাসে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যা দেখে দর্শক তাকে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার ফল বলে মনে করে অথচ তা কিন্তু আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করুন। বাস্তীল জেলখানা ভেংগে ফেলার ঘটনা কোন পূর্ব পরিকল্পনার ফলে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেনি। ঐ সময় শাহী জুলুম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো। এবং জনসাধারণের মন-মানসে এরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, বাস্তীলের কারাগার আযাদীর বধ্যভূমি। মানুষের মনে এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা ধূমায়িত হয়েছিল। রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণা ও ক্রোধ চরমে পৌঁছলে জনগণ সর্বপ্রথম ঐ জেলখানা ধ্বংস করে। এই ঘটনা মূলত ফরাসী বিপ্লবের পথ সুগম করে। কিন্তু এটা ছিল একটা আকস্মিক ঘটনা।

অনুরূপভাবে মিসরে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ১৯৫৪ সালে আবেদীন প্রাসাদের মধ্যে ছাত্রদের যে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাও কোন পরিকল্পনার ফল ছিল না। প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনুভব করলো যে, সামরিক সরকার দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। ছাত্ররা

www.amarboi.org

স্বভাবগতভাবেই স্বাধীনতা প্রিয় হয়ে থাকে এবং সকল প্রকার অন্যায় নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন তাদের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অতএব ছাত্ররা তাদের মনোভাব প্রকাশের জন্য বিক্ষোভ মিছিল করে। ইতিপূর্বেও মিসরের ইতিহাসে বহুবার এরূপ বিক্ষোভ হয়েছিল। জামাল আবদুন নাসের মনে করে যে, তার ক্ষমতার মসনদ উল্টে দেয়ার জন্যই এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। তাই তিনি দেশ মাতৃকার ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। এরূপ পাশবিক ও বর্বরভাবে ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো হয় যে, তার তুলনা মেলা ভার। বিশ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং শত শত আহত হয়। এভাবে শাসকগোষ্ঠী জাতির বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে।

জেনারেল নাজীবের সাথে নাসের পন্থীদের দুর্ব্যবহার

জনসাধারণ মনে করে যে, এসব ঘটনা সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথার পূর্ব পরিকল্পনার ফল। নাসের মনে করে যে, এসব বিক্ষোভের পশ্চাতে নাজীবের হাত সক্রিয় রয়েছে। দুই সামরিক নেতার মধ্যে তখন দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণ সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল ছিল। সাইয়েদ নাজীবের স্মৃতিকথাও ইতিমধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেখান থেকেও বিস্তারিত ঘটনা জেনে নেয়া যেতে পারে। এটা বাস্তব যে, মুহাম্মাদ নাজীব ছিলেন বহু মৌলিক মানবিক গুণাবলীর অধিকারী। তার মধ্যে ছিল বুঝাপড়া করার গুণ। তিনি ছিলেন একনায়কত্ব, কঠোরতা ও জুলুম-নির্যাতনের প্রতি অত্যন্ত পরাঙ্মুখ। এ কারণেই তার প্রতি ইখওয়ানের আগ্রহ ছিল। আর সে কারণেই তারা ছিল তার সফলতার প্রত্যাশী। তার কৃতকার্যতা দেশ ও জাতির জন্যও হতো অধিকতর কল্যাণকর।

জামাল আবদুন নাসের এসব বিক্ষোভ সমাবেশকে ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিহীত করেন।

নাসেরের সমর্থক সৈন্যরা জেনারেল নাজীবকে অপহরণ করে কায়রোর বাইরে নিয়ে গালি ও নির্দয় মার পিঠ দ্বারা তাকে সমাদর করে। জালিমরা তার সাথে কি জুলুম ও অপমানজনক আচরণ করেন তার বিস্তারিত বিবরণ কোন কোন অফিসার নিজেই তার আত্মকথায় বর্ণনা করেছেন।

নাজীবের অন্তরে ইখওয়ানের প্রতি সম্মান ও মমত্ববোধ ছিল। কেননা তিনি স্বচক্ষে ইখওয়ানের ইসলাম প্রীতি ও সংগঠনের নীতি পদ্ধতির প্রতি চরম আনুগত্যের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত মিছিলের বর্ণনা হয়তো পড়ে থাকবেন। উক্ত মিছিলে লক্ষ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করেছিল। যারা সরকারের কোন পদক্ষেপেই পশ্চাৎপদও ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আবদুল কাদের আওদা শহীদের একটি ইংগীতই ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মুহাম্মাদ নাজীব এ ঘটনায় নাসেরের মত হতভম্ব হয়ে হিংসাতুর ও বিদ্বেষপরায়ণ হওয়ার পরিবর্তে আবদুল কাদের আওদা ও

www.amarboi.org

ইখওয়ানের প্রশংসা গুণগ্রাহীতে পরিণত হন। তিনি চাচ্ছিলেন, জাতির মধ্যে এমনসব ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হওয়া উচিত যারা মানুষের আবেগ অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যাতে এই আবেগ ও স্পৃহাকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়। আমি একজন সচেতন মিসরীয় নাগরিক হিসেবে এ ঘটনার বাস্তবতা কোন রকম কম বেশী না করে অকপটে তুলে ধরলাম। আমি আমার মতামত কারো ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। যার ইচ্ছা সে এ কথাকে মেনে নিক আবার যে না চায় মেনে না চলুক।

ইখওয়ান ও আযাদ অফিসার-এর প্রথম পরিচয়

আযাদ অফিসার-এর সাথে ইখওয়ানের প্রথম পরিচয় হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুয়েজ খাল নিয়ে বিরোধের সময়। মিসরীয় সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইখওয়ানী মুজাহিদগণও সম্মুখ সমরে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উস্তাদ হাসান আল আসমাভী মরহুম ইখওয়ানী সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথম পারস্পরিক পরিচয় হয়েছিল তাঁর ও জামাল আবদুন নাসেরের। গোড়ার দিকে এই সম্পর্ক ছিল গোপনীয়। ক্রমশ ইখওয়ান ও আযাদ অফিসার-এর মাঝে অধিকতর নৈকট্য এবং প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে যায়। উস্তাদ আসমাভী ছিলেন এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন।

উস্তাদ হাসান আল আসমাভী মরহুমের বর্ণনা—যা আমি নিজেও স্বীকার করি তা হচ্ছে, নাসেরের সাথে তার সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। আর তিনি তার সাথে অধিকাংশ সময়ই সাক্ষাত করতে যেতেন। আযাদ অফিসার-এর ব্যাপারে তার অনুযোগ ছিল যে, একদিকে তাদের সাধারণ জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কম অন্যদিকে কোন উপযুক্ত ও কাজের লোকের সাথে ছিল না কোন পরিচয়। আর না জানতো কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাদের সম্বন্ধে তেমন কিছু। নাসের নিজে এদেরকে "উপস্থিত আত্মাসমূহের জলসা" এবং "ভূত প্রেতের কাহিনী বর্ণনাকারী আসর" থেকে রিক্রুট করেছিলেন। কখনো কখনো তিনি তাদের অবস্থা দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তারপর সে মনে করে যে, এরূপ নির্বোধ এবং পূর্ণ অনুগত লোকজনই তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সর্বোত্তম প্রমাণীত হতে পারে।

একটা মজার অভিজ্ঞতা

উস্তাদ আসমাভীর বর্ণনার সাথে আমি আরও কিছু সংযোজন করতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার একবার একটা চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মুহতারাম ভাই আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জাওদা (আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করুন) একদা আমাকে তার বাড়ীতে দাওয়াত করেন। আমি উস্তাদ আল বাহী আল খাওলীর সাথে তার বাড়ীতে উপস্থিত হই। সেখানে আমরা আযাদ অফিসার-এর সাতজন সদস্যকে উপস্থিত পেলাম। আমি তাদের মধ্য থেকে ইবরাহীম তাহাবী ও আহমাদ তোয়াইমা ব্যতীত অন্য কাউকেই চিনতাম না। সেখানে আমাদের পৌছার পর আত্মাসমূহকে হাজির করার কাজ শুরু হয়। আমি তো এ দৃশ্য দেখে অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

www.amarboi.org

একজন মোরাকাবায় (আধ্যাত্মিক ধ্যান) মগ্ন হয়েছিল। সে আত্মাসমূহকে হাজির করেছিল। এভাবে একটা শোরগোল ও হৈ চৈ সৃষ্টি হয়েছিল। এই কর্কশ ও বিরক্তিকর শব্দে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মুরাকিব (ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি) একটি অন্ধকার কামরার মধ্যে প্রবেশ করে। আমার মনে হচ্ছিলো, সম্পূর্ণ বুঝে শুনে ঠান্ডা মস্তিষ্কে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এ অভিনয় করা হচ্ছিল। মুরাকিব এমন বিড় বিড় করতে শুরু করলো যেন উপস্থিত আত্মাসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি আত্মা তার প্রতি কথা ইলহাম করছে। এটা কি কাজ ছিল? এটা মূলত ছিল জেনারেল মুহাম্মাদ নাজীব এবং উস্তাদ হাসান আল হুদাইবি এই দুইজনের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ।

এ সময় ইখওয়ান ও আযাদ অফিসার-এর মধ্যে পারস্পরিক অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এমনকি কখনো কখনো একে অন্যের প্রোগ্রামেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতো। কিন্তু ১৯৪৮ সালে আযাদ অফিসার ইখওয়ান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এজন্য তারা কোন প্রকার বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়নি। বরং তাদের যুক্তি ছিল এই যে, ইখওয়ানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এতই কড়া মানদন্ড রয়েছে যে, পুরোপুরিভাবে উতরে যাওয়া সকলের সাধ্য-সামর্থের কথা নয়।

নাসের কাপুরুষ না বীর পুরুষ

সুয়েজখাল যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে নাসের প্রায়ই ইখওয়ানের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতো। (এটা ১৯৪৮ সালে সংঘটিত লড়াইয়ের কথা ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়)। তথাপি সে নির্দোষ লোকদের ওপর সকল প্রকার ঘৃণ্য অভিযোগ আরোপ করার ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত কঠোর। পরে সে যখন ইখওয়ানকে ধ্বংস করার কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং নির্যাতনের একশেষ করে ছাড়ে তখন দেশী ও বিদেশী প্রচার যন্ত্রসমূহ তার বীরত্বের এমন গীত গাইতে থাকে যে, তার নিকট প্রকৃতপক্ষে ইখওয়ানকে নিষ্পিষ্ট করার কাজকে অত্যন্ত গৌরবজনক এবং কৃতিত্বপূর্ণ বলে বোধ হতে থাকে। এ মহতী কাজের জন্য তার অহংবোধ উপচে পড়ছিল। অবশ্য এটা "বীরত্ব"ই ছিল। কারণ ইখওয়ানের নওজোয়ানদেরকে জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে তাদের ওপর শক্তি পরীক্ষা করা হয়।

জীবনপাত করার পুরস্কার

কায়রোতে যে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে তার ফলে শহরে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই অগ্নি সংযোগের পর আযাদ অফিসার হাত বোমা, অস্ত্রশস্ত্র এবং যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের ভান্ডার যা বিভিন্ন বাড়ীতে তাদের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। সমস্তই কায়রোর বাইরে স্থানান্তর করে ফেলা হলো। একাজও আবার করা হয় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে। আল আসমাভী এ দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। এ কাজ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তথাপি ইখওয়ানের এই সাথী সকল প্রকার বিপদাশঙ্কা উপেক্ষা করে অত্যন্ত বিপজ্জনক মুহূর্তে এই অফিসারদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। হাসান আল

www.amarboi.org

আসমাভী মরহুমের পিতার কায়রোর বাইরে ছিল একটা মস্তবড় প্রাসাদ ও কৃষি খামার। এই ফার্মেই মুনীরুদ্দৌলা মরহুম এবং সালেহ আবু রাকীক (আল্লাহ তায়ালা তাদের দীর্ঘজীবি করুন)-এর ট্রাকযোগে এসব অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তর করা হয়।

১৯৫২ সালের মার্চ মাসের গোড়ার দিকে আবদুন নাসের এবং অন্যান্য কতিপয় আযাদ অফিসার বিপ্লব সাধনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তখন তারা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে মরহুমের সাথে দীর্ঘ সময় মতামত বিনিময় করেন। পরিশেষে তার পরামর্শের আলোকে নীল নকশা প্রণীত হয় ---- বিপ্লবের পর।

বিপ্লবী সরকার আসমাভী সাহেবের খেদমতের প্রতিদান এভাবে প্রদান করে যে, জানুয়ারী মাসে যখন কোন কোন ইখওয়ান নেতাকে গ্রেফতার করা হয় তখন তার সাথে এই চার্জশিটও দেয়া হয় যে আসমাভী ফার্মে এত বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করা হয়েছে যা দিয়ে কায়রো শহরকে দশবার ধ্বংস করা যায়। এই চার্জশীট তৈরী করেছিলেন নাসের সাহেব। এসব অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কেউ তাঁর চেয়ে বেশী জানতো না। আসমাভী এসব লোকের জীবন রক্ষার জন্য এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই নির্লজ্জ লোকগুলোর মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করুন ! যে এই সম্মানিত ব্যক্তিটিকে কি পুরস্কার দেয়া হলো।

আপনারা বিস্মিত হবেন। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। যে-ই নাসেরের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে অবহিত তার জন্য এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। নাসের ছিল বিচ্ছু আর বিচ্ছুর কাজই হচ্ছে দংশন করা। নাসের বিপ্লবী কাউন্সিলেও তার সংগী সাথীদেরকে এভাবে এক এক করে খতম করেছে। বিশ্বাস ভঙ্গ ও নির্লজ্জতা ছিল তার কাছে উন্নত চরিত্র ও মহৎগুণের পরিচায়ক। আসমাভী মরহুমের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলার অভিযোগ আরোপ করে নাসের ইখওয়ানের ওপর হস্তক্ষেপ করার পথ সুগম করে।

ক্ষমতার লোভ ও সেনাবাহিনী

উস্তাদ হাসান আল আসমাভী বর্ণনা করেছেন যে, আযাদ অফিসার-এর সাথে তার এই মর্মে মতৈক্য হয়েছিল যে, বিপ্লব সফলতা লাভ করলে আলী মাহেরের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। তারা দেশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার বহাল করবে এবং সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে।

সামরিক বিপ্লব সম্পর্কে ইখওয়ানের মধ্যে দুই প্রকার দৃষ্টিভংগী ছিল। কেউ কেউ ছিলেন বিপ্লবের বিরোধী, কিন্তু অন্য মত পোষণকারীদের সংখ্যা ছিল অধিক। অতএব ফায়সালা হয় যে, বিপ্লব সেনাবাহিনীর সাহায্যেই সাধিত হবে। কিন্তু পরক্ষণেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আসলে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর হয়। সেনাবাহিনী একবার জাতির ঘাড়ে চেপে বসলে আর তাদেরকে হটানো সহজসাধ্য থাকে না। এ সত্যই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল মিসরে।

www.amarboi.org

নাসের সম্পর্কে প্রথমেই কতিপয় ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন যে, সে একনায়কসূলভ মেজাজের অধিকারী। সফলতার সুযোগে সে নিজের শাহেন শাহী কায়েম করে বসবে। এ অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কোন কোন বন্ধুর সুধারণা শুধুমাত্র খোশ খেয়াল বলে প্রমাণিত হলো। নাসের কোন ব্যাপারেই তার মতের বিরুদ্ধে কারো কোন কথা শুনতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বিপ্লব সফল হওয়ার প্রথম দিনই তিনি ফায়সালা করেন যে, সংগীদের সবাইকে এক এক করে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই কাজ তিনি তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন।

রক্তই আর্তনাদ করে বলে দেবে খুনীর বাহুর পরিচয়

প্রথম দিকে আযাদ অফিসার সরকারের পরিবর্তনকে বিপ্লব না বলে আন্দোলন বলে অভিহীত করতো। কিন্তু ১৯৫২ সালের আগষ্ট মাসে নাসের আলী মাহেরকে তার প্রতিশোধের শিকার বানায় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পরিবর্তে "বিপ্লব" বলা হতে থাকে। আলী মাহেরকে পদচ্যুত করা হয় এবং তার স্থানে জেনারেল নাজীবকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করা হয়। নাসের প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে, নাজীবকে সরানোর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে হবে। যা কার্যত করাও হয়েছিল এবং তার প্রস্তুতিও নেয়া হয়েছিল। বৃটিশ দূতাবাসে মিষ্টার ইভান্সের সাথে আমাদের সাক্ষাতের সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, দূতাবাসের ইচ্ছা ও বিপ্লবী সরকারের ঐকমত্যে আমাদের বন্ধু মুনীরুদ্দৌলা এবং সালেহ আবু রাকীক মিষ্টার ইভান্সের সাথে মিলিত হন। মুর্শিদে আ'মের নির্দেশক্রমে উস্তাদ হাসান আল আসমাভী নাসেরকে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে সবিস্তারে অবহিত করেন। নাসের ও আবদুল হাকীম আ'মের উভয়েই এই সংলাপকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। পরবর্তী সময় মিষ্টার ইভান্স আবার মুর্শিদে আ'মের সংগে দেখা করার জন্য আবেদন জানায়। এমনকি তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার খেদমতে উপস্থিত হন। হাসান আল আসমাভী নাসেরকে এই সাক্ষাতের খবরও দিয়েছিলেন।

আমাদের এসব সাক্ষাতকে যে বিদ্রোহ ও জাতীয় বেঈমানী নামে অভিহীত করা হয় তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু নাসেরের এসব অভিযোগ ফলাও করে যতই রটানো হতে থাকে জনগণ ততই তার অসত্যতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে থাকে, সে তলোয়ার পরীক্ষা করতে থাকে আর আমরা আত্মার পরীক্ষা দিতে থাকি। তার অসির ভাষা নিশ্চুপ হয়ে পড়লেও তার রক্তরঞ্জিত হাত চিৎকার করে বলছে ওগো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অধিবাসীগণ ! তোমাদের মধ্যে কে এখনো এমন আছ যে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওনি। শোন! মিথ্যার মিথ্যা হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিপ্লবের পর আযাদ অফিসার-এর কারো কারো সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। খান আল খলিলে আমাদের সাথী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জাওদার চাউলের দোকান ছিল। এখানে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত

www.amarboi.org

হতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, নাসের ইখওয়ানের ওপর যে কোন সময় হস্তক্ষেপ করে বসবে। তথাপি আমার সযত্ন প্রয়াস ছিল যে কোন উপায়ে এই সংঘাত প্রশমিত হয়ে যাক। নাসেরের ব্যাপারে ইখওয়ানের কোন কোন সাথীর দৃষ্টিভংগী ছিল অত্যন্ত কঠোর। তারা ধারণা করছিলো যে, আমিও নাসেরের প্রতি আকৃষ্ট। এজন্য আমার ওপর তাদের কিছুটা সন্দেহ ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি তার সম্পর্কে আমার ধারণা কখনো ভাল ছিল না। আন্দোলনের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমি চাচ্ছিলাম যে অপেক্ষকৃত কোন উত্তম ও সমঝোতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক। আমার একান্ত আকাংখা ছিল যে, নাসের একান্তই যদি ইখওয়ানের বিরুদ্ধে কোন দমননীতি গ্রহণ করতে চায় তাহলে অন্যান্য দলসমূহকে সে যেভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তেমনি আমাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা যেন আরোপ করে। কারণ আমাদের দাওয়াতী কাজতো বন্ধ হয়ে যাওয়ার নয়।

সেই সময় নাসের আরো একটি চক্রান্ত করে। আবদুর রহমান সিন্ধীর কথা আপনারা পড়ে এসেছেন। নাসের তার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার পূর্বে আর এক চাল চালতে চায়। আযাদ অফিসার-এর সাহায্যে একটা প্রস্তাব প্রণয়ন করেন এবং তার ওপর ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কয়েকজনের স্বাক্ষরও যুক্ত করা হয়। চুক্তিনামার বিষয়বস্তু ছিল, মুর্শিদে আ'মকে নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারিত করতে হবে। যদিও তা হোক একান্ত সাময়িকভাবে ও অল্প সময়ের জন্য। এই সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে নাসেরের প্রত্যাশা ছিল যে, এতে সকল সদস্যই দস্তখত করবেন। কিন্তু তার এই অনুমান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। আমার নিকটও বার বার এই দস্তাবেজ নিয়ে আসা হয় এবং নানাভাবে অনুরোধ করা হয় যে, এতে সই করে দাও। কিন্তু আমি সর্বদাই কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি। আমি আল্লাহর নামে যে বাইয়াত করেছিলাম তা কিভাবে ভংগ করতে পারি। আর এটা কি করে হতে পারে?

আমি একজন ইখওয়ানী হিসেবেই বেঁচে থাকতে চাই এবং এই পরিচয় নিয়েই মৃত্যুর পথে পাড়ি জমাতে চাই। কিয়ামতের দিন যেন দাওয়াতে ইসলামীর নগণ্য একজন কর্মীরূপে উপস্থিত হতে পারি। তাই আমার প্রত্যাশা ! এটাই আমার আকাংখা।

যে সময় এ প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা চলছিলো তখন আমাদের নওজোয়ান সাথী ভাই আকেফ জেলখানায় ছিলেন। আমি জানতে পারলাম যে আকেফ ভাইকে সামরিক কারাগারে অত্যন্ত পাশবিকভাবে নির্যাতনের শিকার বানানো হয়েছে। ফলে তিনি গুরুতর আহত হয়ে পড়েছেন। একদিন সালাতুল আসরের পর আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জাওদার দোকানে আযাদ অফিসার-এর অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য মুহাম্মাদ আবদুর রহমান নাসিরের সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়। নামায শেষে তিনি যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন আমি তার কাছে এ ব্যাপারে নালিশ করলাম। আল্লাহ ও নামাযের কসম করে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, আকেফের ওপর কোন প্রকার জুলুম ও নির্যাতন করা হয়নি। তার গলে কুরআন মজীদ ঝুলছিল। তিনি কুরআন

www.amarboi.org

মাথার ওপর রেখে শপথ করে বলেন যে, আকেফের জুলুমের খবর একেবারেই মিথ্যা, তার এরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পর আমি মনে করলাম যে, খবরটি সম্ভবত ভুল। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে আমাকেও গ্রেফতার করে সামরিক কয়েদখানায় আটক করা হয়। আমি বন্ধুপ্রতীম আকেফের যে অবস্থা নিজ চোখে দেখতে পেলাম তা ছিল হৃদয়বিদারক। আমার চোখ থেকে অজ্ঞাতেই নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। কিন্তু আমি আল্লাহর লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি এই জন্য যে, সত্যের কাফেলায় এই তেজোদ্দীপ্ত যুবক এতসব জুলুম নিপীড়নকে অত্যন্ত শান্ত চিত্তে অনমনীয়ভাবে ও হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। তার কোন কথায় ও আচরণে আমি কোন প্রকার আতঙ্ক ও নিরুৎসাহের লক্ষণ দেখতে পাইনি। এই মোহকে কেউ কোনক্রমেই অবদমিত করতে পারে না, পরবে না।

নাসেরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনে যোগদান

জামাল আবদুন নাসের আমার স্বভাব প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় হওয়া সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিল। তথাপি সে আমাকে তার প্রতিশোধের শিকার বানায়। আমি ইতিপূর্বে একটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেছি যাতে মুর্শিদে আ'ম-এর পদচ্যুতির ষড়যন্ত্রও ছিল। আমি তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলাম। ১৯৫৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর নাসের আমাকে তার বাড়ীতে ডেকে পাঠায়। সেখানে পৌঁছার পর সেই কুখ্যাত প্রস্তাবাবলী পুনরায় আমর সম্মুখে পেশ করা হয়। আমি তাতে স্বাক্ষর করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করি। এটাই ছিল মূল কারণ যার ফলে আমাকে সুদীর্ঘ পনেরো বছর বন্দী এবং পরবর্তী সময় অতিরিক্ত আরো দু'বছর নজর বন্দীর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

জামাল আবদুন নাসের ইখওয়ানের রুকুনিয়াত তথা সদস্যপদও গ্রহণ করেছিলেন। সুধী পাঠকগণকে আমি এ প্রসংগে ভাই জেনারেল সালাহ শাদী বিরচিত গ্রন্থ "ইতিহাসের পাতা" থেকে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

জেনারেল সালাহর বক্তব্য অনুসারে নাসের সম্ভাব্য সকল উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিল। নিজের এই আকাংখার পরিতৃপ্তির জন্য সে ইখওয়ানের আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করে।

ইখওয়ানের সাথে তার সম্পর্ক তিন পর্যায়ে গড়ে ওঠেছিল—সামরিক দায়িত্ব পালনের জন্য নাসেরকে সুদান পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসার পর সামরিক অফিসার আবদুল মুনয়েম আবদুর রউফের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। এই অফিসার ছিলেন ইখওয়ানের সদস্য। তিনি নাসেরকে আবদুর রহমান সিন্ধীর নিকট নিয়ে আসেন (এটা ছিল অদ্ভুত ব্যাপার যে নাসেরের প্রথম সাক্ষাত ইখওয়ানের এমন এক লোকের সাথে হয় যার নিষ্ঠার ভান্ড শীঘ্রই ফেটে পড়ে। পাঠকগণ সে ঘটনা ইতিপূর্বেই পড়েছেন।)

www.amarboi.org

১৯৪৪ সালে মেজর মাহমুদ লাবীব মরহুমের সাথে নাসেরের সাক্ষাত হয়। তিনি তাকে ইখওয়ানের পয়গামের সাথে উত্তমরূপে পরিচিত করে দেন এবং কর্মনীতি ব্যাখ্যা করে শুনান।

তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৫০ সালের শেষের দিকে। তখন উস্তাদ মেজর মাহমুদ লাবীব গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অতএব আমি (জেনারেল সালাহ শাদী) নাসের ও অপর অফিসার সালাহ সালেমকে সাথে নিয়ে ইখওয়ানের ঐ ভাইয়ের নিকট গমন করি। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর মধ্যে ইখওয়ানের আন্দোলনের দায়িত্বশীল। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে মরহুম হাসান আল আসমাভীর দপ্তরে এই সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়।

সামরিক বাহিনীতে অফিসার ও জোয়ানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ছিলেন জনাব মেজর মাহমুদ লাবীব মরহুমের সাথে। ১৯৪৬ সাল থেকেই জামাল আবদুন নাসের তার সমর্থক সেনাদেরকে একান্ত সংগোপনে তার সাথে মিলাতে শুরু করে। বাহ্যত সে তাদের বিশ্বস্ততা ও আস্থা অর্জন করেন এবং নিজের কাজ জারী রাখেন। প্রথম দিকে নাসেরের ব্যাপারে আমার মতামত ছিল এই যে, তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং দায়িত্বপালনকারী জাগ্রত বিবেক সেনা অফিসার। আলসাগ্ মাহমুদ লাবীবের জীবদ্দশায় সে ইখওয়ানের নিকটে এসে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার ইনতিকালের পর এ সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ও সরবরাহ এবং অন্যান্য জরুরী সাজসরঞ্জাম যা ফিরিঙ্গি সেনাদের মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল—তখনই সংগ্রহ করা হয়। খরিদকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ জামাল আবদুন নাসের এবং মাজদী হাসনাইনের বাড়ীতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় এ আশঙ্কায় যে, গোপনীয়তা ফাঁশ হয়ে গেলে এই দুইজন সামরিক অফিসারের ওপরই মুসিবত এসে পড়বে তাই এসব অস্ত্রশস্ত্র আসমাভী ফার্মের সুপ্রশস্ত গ্যারেজে স্থানান্তর করা হয়।

ভাই সালাহ শাদী তার এক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে খুবই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, যে সমস্ত গোলাবারুদ ইখওয়ান তাদের জীবন বিপন্ন করে বিপ্লবের জন্য সংগ্রহ করেছিল এবং আযাদ অফিসারদেরকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নিজেদের ফার্মে গুদামজাত করেছিল—এ বিষয়কেই ইখওয়ানের ওপর দোষারোপের কারণ এবং তাদের শায়েস্তা করার উপলক্ষ বানানো হয়েছিল। কোন কৃতজ্ঞজন উপকার কর্তাকে ধ্বংস করে তার ইহসানের পুরস্কার দিতে পারে না।

ফারুকের দেশ ত্যাগ

ইখওয়ান ও স্বাধীনতাকামী অফিসারদের মাঝে বিপ্লব সংগঠিত করার পূর্বে কয়েকদফা সাক্ষাত হয়। আলহাজ্জ সালাহ আবু রাকীকের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত এসব আলোচনা বৈঠকে স্বাধীনতাকামী অফিসারদের প্রতিনিধিত্ব করতেন জামাল আবদুন নাসের। পক্ষান্তরে ইখওয়ানের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করতেন হাসান আসমাভী

www.amarboi.org

মরহুম এবং জেনারেল সালাহ শাদী। নাসেরের ঐকান্তিক অনুরোধ ছিল নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বিপ্লব সংগঠিত করা হোক। ইত্যবসরে এক বিস্ময়কর ঘটনা সংগঠিত হয় যার প্রতি সকলেই বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে দেখে। তা হচ্ছে, আমেরিকান দূতাবাস শাহ্ ফারুককে অনুপ্রাণীত করে যেন তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করেন। সে জন্য তাদের পরামর্শ ছিল এই যে, শাহ্ ফারুক দেশ থেকে চলে যাবেন এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো নিজের সঞ্চিত ধন-সম্পদের সাহায্যে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিবেন। তথাপি শাহ্ বিপ্লবের পূর্বে দেশের বাইরে পাড়ি জমাতে পারেননি। বিপ্লবের ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর মহামান্য বাদশাহর কোন বিচার ছাড়াই নিরাপদে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও নাসেরের হাতই ছিল সক্রিয়। ১৯৫২ সালের ২০শে জুলাই নাসেরের সাথে মুর্শিদে আ'ম আল হুদাইবি (র)-এর সাক্ষাত হয়। নাসেরের কোন কোন কার্যকলাপে মুর্শিদে আ'ম তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। তখন সে নীরবে সবকিছু হজম করতে থাকে। কিন্তু পরে ১৯৫৪ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বিপ্লবী কাউন্সিল ইখওয়ানের ওপর যখন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দেয় তখন তার পশ্চাতে নাসেরের তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ ছিলো। পরে ঘটনাপ্রবাহ যতদূর গড়িয়েছিল তা সকলেরই জানা রয়েছে।

আসল চেহারা

নাসের ছিল সেনা কর্মকর্তাগণের মধ্যে অত্যন্ত কর্মঠ ও সদা তৎপর কর্মী। তার প্রয়াস প্রচেষ্টার ফলে অধিকাংশ লোক তার প্রতি ছিল দুর্বল। কিছু সংখ্যক লোক ছিল তার অন্ধবিশ্বাসী। দুই জন লোকের মেধা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা আমি সর্বদাই করে থাকি। তারা দুইজন প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে বুঝতে পেরেছিলেন। উভয়েই নাসেরের দুরভিসন্ধি ও কূটকৌশল যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুই ব্যক্তি হচ্ছেন যথাক্রমে ইখওয়ানের মুর্শিদে আ'ম সাইয়েদ হাসান আল হুদাইবি ও ওয়াফদ পার্টির নেতা ফুয়াদ সিরাজ উদ্দীন। আবদুন নাসের শাহেন শাহী লাভের স্বপ্ন দেখছিলো। সে শুধুমাত্র মিসরের ওপরই তার আধিপত্য বিস্তার করতে চাচ্ছিলো না। বরং এতদঞ্চলের সবগুলো দেশের ওপরই তিনি তার কর্তৃত্ব করার অভিলাষ পোষণ করছিলেন। সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপ যদিও সে দেখতে পায়নি। কিন্তু তার জন্য সে মিসরের সমস্ত উপায় উপকরণ জাতির সমুদয় যোগ্যতা ও ক্ষমতা এমনকি মিসরীয় সেনাবাহিনী তথা সবকিছুকে জলাঞ্জলী দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

কৃতকর্মের ফলশ্রুতি ও নাসের

আমাদেরকে বিপ্লবের শত্রু মনে করা হয়। এটা ছিল একেবারেই মিথ্যা। আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ ইখওয়ানের সযত্ন প্রয়াস প্রচেষ্টা এবং ঐকান্তিক কুরবানীর বদৌলতেই মূলত বিপ্লবের পথ সুগম হয়। যদি আমাদের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা সমন্বিত রূপ লাভ না করতো তাহলে নাসের ও তার সংগীদের নাম নিশানাও মিসরের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হতো না। মিসর ও মিসরের বাইরের অন্যান্য দেশের সমস্ত প্রচার ও গণমাধ্যম নাসেরের অনুপম ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের গুণগান প্রচার করতে

www.amarboi.org

লাগলো। তার ভাবমূর্তি এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হলো বাস্তবতার সাথে যার দূরতম সম্পর্কও ছিল না। এই ব্যক্তির নেতৃত্ব মিসরের মর্যাদাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রেই অপমান ও অনগ্রসরতাই আমাদের ললাট লিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত সুয়েজ খাল লড়াইয়ের উল্লেখ করা হয় অত্যন্ত গর্ব ভরে। আল্লাহর শোকর যে, তাতে মিসরই বিজয় লাভ করে। তথাপি বিশ্লেষক এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারীগণ এ সত্য সম্পর্কে অনবহিত ছিল না যে, ১৯৫৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার বিশ্বরাজনীতিতে সর্বক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভাব বলয় সৃষ্টির জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রভাব, প্রতিষ্ঠার পথে বৃটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী শক্তি ছিল একটি অন্তরায়। আমেরিকার আকাংখা ছিল হাত ছাড়া করিয়ে দেয়া যাতে সৃষ্ট শূন্যতা আমেরিকা পূরণ করতে পারে। ফলাফলও তাই হলো। এই যুদ্ধে নাসেরের কৃতকার্যতার নিগূঢ় রহস্য উপরোক্ত কার্যকারণের মধ্যে নিহিত ছিল।

১৯৬৭ সালের অপমানজনক পরাজয় নাসেরের নেতৃত্বের উপহার স্বরূপ আমাদের ললাট লিপি হয়ে দাঁড়ায়। সেই অপমানের কথা কি আমরা কোন দিন ভুলে যেতে পারি? মিসরের কৃতিসন্তান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে যে পন্থায় বেইজ্জত করা হয় এবং মিসরের গৌরবজনক ইতিহাসকে যেভাবে কলঙ্কিত করা হয় তাকি কোন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মিসরীয় ভুলে যেতে পারে? আমরা কি নাসেরের গৃহীত এ সমস্ত ন্যক্কারজনক কৃতিকলাপ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারি—সে তার সংগীদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যা করেছিল?

এরূপ জগণ্য তৎপরতার পরও তার জন্য কি গৌরবজনক কোন কৃতিত্ব অবশিষ্ট থেকে যায়? আমি তো তার মধ্যে এমন কোন বিষয় দেখতে পাই না যার কারণে তাকে একজন উচ্চ পর্যায়ের নেতা মনে করা যেতে পারে। তবে হাঁ তার প্রতি যেসব বীরত্বগাথা আরোপ করা হয় তাতে কেউ প্রতারিত হতে পারে। এসব স্রষ্টা এমন সব লোক যারা কোন আন্দোলনে কোন দিন অংশগ্রহণ করেনি। এমনকি মিসরের জাতীয় বিপ্লবেও তাদের কোন অবদান নেই।

বিক্রয়যোগ্য সম্পদ নাকি শিষ্টাচার

মিথ্যা প্রচার প্রপাগাণ্ডাকারীগণ পয়সার ক্রীতদাস এবং বিক্রয়যোগ্য সম্পদ। তারা সম্মান, গৌরব ও কীর্তিগাথার এমন সব স্মরণীয় কৃতিত্ব রচনা করে। বিক্রয়ের জন্য বাজারজাত করে বাস্তবে যার কোন অস্তিত্বও কোন দিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের এই কাল্পনিক মূর্তিখানা তাদেরকে মহার্ঘ্য বিনিময় প্রদান করে। তারা হাজার হাজার পাউন্ড পুরস্কার লাভ করে এবং যার ফলে এসব শিল্পী কোন বামনকে আসমানে পৌঁছায়। মিসরের অপমানের জন্য আবদুন নাসেরই দায়ী। সে আগে ও পরে সবসময়ই ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং ইসলামী আন্দোলনের দুশমন ছিলো। তার কীর্তিকলাপ ইসলামী আন্দোলনের কাজকে কয়েক বছর পিছনে ঠেলে দিয়েছে।

www.amarboi.org

জামাল আবদুন নাসের ইখওয়ানের ওপর এমন সব অত্যাচার চালান যার কল্পনাও করা যায় না।

ছেলেকে বাধ্য করা হতো পিতাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে এবং তাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করতে। কারাবন্দীদের সহোদর ভাইদের ডেকে এনে বাধ্য করা হতো তাদের ভাইদের মুখের ওপর চপেটাঘাত করতে। অথবা কিল ঘুষি মারতে।

জেলখানার অফিসাররা এমন অনুভূতিহীন ও নির্লজ্জ যে, এটা তাদের চিত্ত বিনোদনের উপকরণ ছিল। আপনি কি কখনো কল্পনা করেছেন যে, মানুষ কখনো এতটা বিবেকহীন হতে পারে?

এই জালিমরা ইখওয়ানের পর্দাশীলা ও পুন্যাত্মা মহিলাদের ছবি অঙ্কন করেছে। অংকন শিল্পীরা তাদের নগ্ন বক্ষ প্রদর্শন করেছে। এমনকি তাদের সম্মুখে মদের বোতল রেখে এসব চিত্র অংকন করে। তাদের এক হাতে শরাবের পেয়ালা আর অন্য হাতে সিগারেট দেখানো হয়েছে।

আপনি একটু ভেবে দেখুন! যদি কোন মানুষ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় (আমি আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে দোয়া করছি কোন মানুষকে যেন এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে না হয়) তাহলে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে? কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন লোকের কন্যা, ভগ্নি অথবা স্ত্রীকে তারই চোখের সামনে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে আর সরকারী কুকুররা নির্লজ্জভাবে তাদের ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করবে তাহলে কি সেই ব্যক্তি এমন জীবনের তুলনায় মৃত্যুকে অগ্রাধিকার দেবে না? এরূপ অসহ্য অপমানের মোকাবেলায় একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই চাইবে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করা হোক তার দেহের মাংস থেঁতলে দেয়া হোক কিন্তু তার স্ত্রী ও মা বোনের সাথে এ আচরণ করা না হোক। এত কিছু সত্ত্বেও মিসরে এমন লোক আছে যারা নাসেরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি কখনো কারো কোন অনিষ্ট কামনা করি না। কিন্তু নাসেরের প্রশংসাকারীদের একটু চিন্তা করে দেখা উচিত যে, তাদের ওপর যদি এরূপ বিপর্যয় এসে পড়ে তাহলে তাদের সিদ্ধান্ত কেমন হবে? এটা সত্য যে, সামরিক বন্দীশালায় ইখওয়ানের সাথীদের মধ্যে আমার ওপর সর্বাপেক্ষা কম নির্যাতন চালানো হয়েছে। তারপরও লক্ষ্য করুন আমার সাথে তারা কিরূপ আচরণ করেছে। তাহলে সহজে অনুমান করা যাবে যে, অন্যান্য ভাইদের সাথে আরো কতবেশী অত্যাচার করা হয়েছে।

আমাকে জেলখানার ২৪নং সেলে বন্দী করা হয়। কিছুক্ষণ পর কারাগারের নাপিত আমার চুল কাটতে আসে। আমি আমার মস্তক তার সামনে অবনত করে দিলাম যেন সে সহজে তার কার্য সমাধা করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর সেই বান্দা আমার গালে সজোরে চপেটাঘাত করে বলে! "কুত্তার বাচ্চা! নীচে মাটির ওপর

www.amarboi.org

নেমে বস্ !" সে আমার মাথা মুন্ডন করলে আমি দেখতে পাই যে কারা অফিসারগণ লম্বা চওড়া এবং উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত রশি নিয়ে আমর কুঠরীতে এসে হাজির হয় এবং আমাকে উঠে দাঁড়াবার নির্দেশ দেয়। আমার উরুদেশ থেকে বক্ষ পর্যন্ত সেই দড়ি আমার শরীরের চারদিকে পেঁচিয়ে শক্তভাবে বাঁধা হয়। অনন্তর আমাকে একটি চেয়ারের ওপর দাঁড় করানো হয় এবং রশির এক মাথা ছাদের খুঁটির সাথে বেঁধে আমার পায়ের নীচে থেকে চেয়ার সরিয়ে ফেলা হয়। ফলে আমি ছাদ ও মাটির মাঝে রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে থাকি। আমার ওপর অত্যন্ত অশ্রাব্য গালি ও কোঁড়ার বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। দুঃখে ও ব্যথায় আমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। তবুও আমি উহ্ পর্যন্ত করি না। কারণ এই হিংস্র নরপশুরা আমার আর্তচীৎকারে মজা পেতো। আর আমিও চাচ্ছিলাম না যে, তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করুক। আমার শরীর যখন পুরোপুরি অবশ হয়ে গেল তখন তারা আমার শরীরের এক জায়গায় কোঁড়ার আঘাতে জর্জরিত করতে আরম্ভ করলো। এক স্থানের পরিবর্তে শরীরের বিভিন্ন অংশে কোঁড়ার আঘাত করার জন্য আমি তাদের অনুরোধ করি। কিন্তু তা করতে তারা অস্বীকার করলো।

এই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো। এটা ছিল ১৯৩৩ সালের কথা, আমি আমার পুত্র আবেদকে কোন কোন বিষয় পড়াতাম। আমার হাতে থাকতো একটা রোলার সে কোন ভুল করলে আমি উক্ত রোলার দ্বারা তার উরুর ওপর প্রহার করতাম। একাধারে ভুল ভ্রান্তি করতে থাকলে একই জায়গায় মারতে থাকতাম। সে কাঁদতো এবং একই স্থানে বার বার মারার পরিবর্তে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রহার করার আবেদন জানাতো। কিন্তু আমি বলতাম না তা হবে না। পাঠকদের জন্য এই ঘটনা হয়তো তেমন কোন গুরুত্বের দাবী রাখে না। কিন্তু আমার নিজের জন্য এতে বড় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। অবশ্য এটা সত্য যে, আমি আমার সন্তানের কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তায়ই শিক্ষামূলকভাবে তাকে শাস্তি দিতাম। কিন্তু তথাপি আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য অনুরূপ শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার ওপর জুলুমকারীরাও শাস্তি থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। দুনিয়াতেও নিশ্চিতই তাদের শাস্তি পেতে হবে আবার আখেরাতের শাস্তিও তাদের জন্য স্থির নিশ্চিত।

নিঃসন্দেহে দুঃখের পর রয়েছে সুখ

আল ওয়াহাত জেলখানায় আমাদের বিশেষ স্বাধীনতা ছিল। সেখানে আমরা জেলখানার ভিতর একটা ছোট কৃষি ক্ষেত্র তৈরী করে নিয়েছিলাম। সেখানে আমরা শালগম, বীট, গাজর, মূলা, খরবুজা, তরমুজ এবং অন্যান্য ফল ও সবজির চাষ করতাম। সেখানে আমরা ছোট আকারের একটি মুরগীর খামারও তৈরী করে ফেলেছিলাম। যেখানে আমি মুরগী ও খরগোশ পালতাম। কুরবানীর ঈদদোপলক্ষে জনাব মুহাম্মাদ হামেদ আবুন নাসর আমাদের জন্য বকরী নিয়ে আসেন। অনন্তর আমরা জেলখানাতেই কুরবানী করি। এই কয়েদখানায় আমরা জুমা ও দুই ঈদের

www.amarboi.org

নামায ছাড়াও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযই জামায়াতের সাথে আদায় করতাম। মংগলবারের দারসে কুরআন যা ইমাম শহীদ হাসানুল বান্নার সময় থেকেই ইখওয়ানের কর্মসূচীর বাধ্যতামূলক অংশে পরিণত হয়েছিল—জেলখানাতেও যথা নিয়মে সে ধারা অব্যাহত থাকে। কয়েকটি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা নিয়মিত চলছিলো। এই কারণে আমাদের প্রত্যাশা ছিল যেন আমাদের পুরো বন্দী জীবন এই জেলখানাতেই অতিবাহিত করি। যদিও এখানে গ্রীষ্ম ও শীতকালে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া বিরাজ করতো। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ছায়াতে বায়ান্ন ডিগ্রী পর্যন্ত পৌছে যেতো এবং শীতকালে হিমাঙ্কের ছয় ডিগ্রী নীচে নেমে যেতো। এতদ্ব্যতীত এই জেলখানায় বহু বিষাক্ত সাপ বিচরণ করতো। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, এই বিষাক্ত সাপ সময়ে সময়ে কয়েদীদেরকে দংশন পর্যন্ত করে বসতো। কিন্তু আমাদের অবস্থান কালে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত ইখওয়ানীকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখেন। আবদুন নাসের আমাদের জেলের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। তারপর তাৎক্ষণিক নির্দেশে আমাদেরকে বিভিন্ন জেলখানায় পাঠিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়। বছরের পর বছর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে লাগলো। আর আমিও আমার প্রিয় জীবনের সুদীর্ঘ সতেরটি বছর জেলখানার চার দেয়ালের মধ্যে অতিবাহিত করলাম। অত্যাচারের যে ষ্টীমরোলার আমার ওপর পরিচালিত হয় সে জন্য আফসোস নেই। বরং আমার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের সম্মুখে সদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কারণ তিনিই তো আমাকে এসব অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন এবং দৃঢ় পদ থাকার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমাদের প্রতিপক্ষ চেষ্টা করেছে যেন আমাদের মাথা তাদের সামনে নত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে এ শির কোন তাগুতের সামনে অবনত হয়নি। যদি কোন ব্যক্তি তার দুশমনের সম্মুখে মস্তক উন্নত রেখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তাহলে সেটা তার জন্য সেই অবস্থার চেয়ে সহস্র গুণে শ্রেয় যে সে তার পায়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যুর হিমশীতল পেয়ালা পান করবে। কবির ভাষায় ঃ

আমি সময়ের দাবী ও যুগের চাহিদার পাথরের ওপর
কখনো সিজদাবনত হবো না।
মৃত্যুকে সহাস্যে বরণ করে নিতে পারি তথাপি কোন মূল্যে
ঈমান কখনো বিক্রি করবো না।

আসমা বিনতে আবি বকর (রা) মুসলিম সমাজে বংশ পরম্পরায় আবর্তিত হয়ে চলে আসছেন। আর এসব ঘটনা প্রবাহে বড়ই হিকমত রয়েছে। হযরত আসমা (রা) তার বৃদ্ধ বয়সে তার মহাপ্রাণ পুত্র আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা)-কে হাজ্জাজের মোকাবিলায় শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

"ইজ্জাতের সাথে তলোয়ারের আঘাত খেয়ে জান কুরবান করে দেয়া দুশমনের সামনে অপমানের সাথে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হওয়া থেকে হাজার গুণে শ্রেয়।"

www.amarboi.org

ওগো মু'মিন বান্দাহ—তুমিই সৌভাগ্যবান আবার তুমিই হতভাগা

আমার স্মৃতিকথার মধ্যে কিছু মজার সরস ঘটনাবলীও সংরক্ষিত রয়েছে। একবার আমি কানার জেলখানায় বন্দী ছিলাম। এই জেলখানায় অবস্থান করছিলো একজন অপরাধী। তার নাম ছিল হিজাযী। এই দাগী আসামী বহুবার জেলখানায় এসেছে। এবারে তাকে আশি বছরের শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। জেলখানার সকল ছোট বড় কয়েদী এবং কারারক্ষীগণ তার দুষ্কর্মে অতিষ্ঠ ছিল। সে কাউকে কোন প্রকার তোয়াক্কা করতো না। এমনকি সে প্রত্যেককে সবার সামনে অপমাণিত করে খুবই আনন্দ বোধ করতো। একদিন সে আমার নিকট আগমন করে এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। আলোচনা প্রসংগে উম্মে কুলসুমের সেই নাতিয়া সংগীত যা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় গেয়েছিল—এর উল্লেখ করা হয়। জানি না এই ব্যক্তি আমাকে সম্মান করতো কেন ? সে জানতে পেরেছে যে, উম্মে কুলসুমের গান যা রেডিওতে মাঝেমধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকে—এর আমি খুবই গুণগ্রাহী ও ভক্ত। এ প্রসংগে কথাবার্তা হলো।

রাত্রিবেলায় আমি হাসপাতালের খাটের ওপর শয্যা গ্রহণ করলে অচিরেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। নিদ্রিত অবস্থায় আমার মনে হচ্ছিলো উম্মে কুলসুমের গান যেন আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি প্রকৃতই উম্মে কুলসুমের আওয়াজ শুনতে পাই।

আসমা বিনতে আবি বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী মুসলিম জাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে বড় রহস্য। বৃদ্ধ বয়সে হযরত আসমা (রা) তাঁর মহান সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন যে এসব তথাকথিত আদালতের সামনে ইখওয়ানদের পেশ করা হতে থাকলো। তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীও পেশ করা হতো। ইখওয়ানের আহত স্থানসমূহ থেকে তখনও রক্ত প্রবাহিত হতে থাকতো এবং নির্যাতনের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের শরীরে দেখা যেতো। এমতাবস্থায় মনগড়া ও বানোয়াট স্বীকারোক্তিসমূহকে ভিত্তি করে ফায়সালা প্রদান করা হতো। আফসোস ! বিষয়টির যদি এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটতো ! এরপরও কোন কয়েদী যদি আদালতে পেশকৃত জবানবন্দী অস্বীকার করতো তাহলে তাকে আদালত জেলখানায় ফেরত পাঠিয়ে দিতো যেন আরো নির্যাতন চালিয়ে তাকে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি সমর্থন করতে বাধ্য করা হয়।

জামাল সালেমের পরিণতি

জামাল সালেম যিনি তথাকথিত এসব আদালতের প্রধান ছিলেন। তিনি আসামীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ও কথায় কথায় তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে ছিলেন

www.amarboi.org

সিদ্ধহস্ত। আদালতের অপর দু'জন সদস্য এই বিচার প্রহসন চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ চুপচাপ বসে থাকতেন। এই জামাল সালেমের পরিণতিও হয়েছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। সামরিক উর্দি খুলে এখন তিনি সাদা বেসামরিক পোশাক পরিধান করেছেন। পরেছেন গেরুয়া রংগের আবা ও আলখেল্লা। দিনের অধিকাংশ সময় মসজিদে ও সাইয়েদা যয়নাবে অতিবাহিত করেন।

সে কি সত্যই তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ছিল। তিনি কি তার কৃত পাপরাশী থেকে তাওবা করে নিয়েছিলেন। নিসন্দেহে আল্লাহর রহমত অতিব সুবিস্তৃত। যে কেউই তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইবে সে কোন সংকীর্ণতার শিকার হবে না। অবশ্য তার তাওবা হতে হবে খাঁটি ও অকৃত্রিম। এরূপ তাওবাতে অসংখ্য কবিরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার তুলনায় কোন গুনাহই বড় নয়। আমি এ ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের গুণাবলী বর্ণনা করে তাদেরকে স্মরণ করো। আমাদের উচিত তাদেরকে আল্লাহর ইনসাফের ওপর ছেড়ে দেয়া। কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ন্যায় ও সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানকারী।

www.amarboi.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

মাহফিল পন্ড

আমার স্মৃতিকথার আলোচনা প্রসংগে সাদাতের সেই প্রস্তাবের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে যে সম্পর্কে তিনি "পাবলিক প্রোসিকিউটিং এজেন্সির" ভিত্তি রচনা করেছিলেন। পুলিশ বিভাগ তো বিভিন্নভাবে পৃথিবীর সকল দেশেই পাওয়া যায়। তথাপি সাদাত সাহেবের প্রতিষ্ঠিত এই বিভাগটি ছিল সর্বাপেক্ষা ভিন্ন। অন্য কোন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যার তুলনা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি কিন্তু কোথাও তা পাইনি। এই সংস্থার লোকজন কোন ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমার সহযোগিতা কামনা করে। প্রথম বৈঠক কোন প্রকার বিরতি ছাড়া একটানা ছয় ঘন্টা স্থায়ী হয়। তারপরও আরো পাঁচবার আমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। কোন অধিবেশনেরই সময়কাল দু'ঘন্টার কম ছিল না। এত দীর্ঘ ও প্রাণান্তকর অনুসন্ধানের পর ফলাফল দাঁড়ায় সম্পূর্ণ শূন্য। পর্বতের মুষিক প্রসব প্রবাদের নির্মম বাস্তব রূপ।

নিকৃষ্টতম গুপ্তচর বৃত্তি

এই অনুসন্ধান কার্য চলাকালীন সময়ে আমি জানতে পাই যে, এই সংস্থার কর্মকর্তাগণ আমার প্রতিটি গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত থাকতো। তারা ছায়ার ন্যায় আমার পশ্চাদানুসরণ করতো। আমার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস গুণে গুণে হিসেব কষতো। সাদাতের শাসনামলের শেষের দিকে তিনি এমনভাবে গুপ্তচর বৃত্তিতে তৎপর হয়ে উঠেন যে, আমি যখন যেখানেই মুখ খুলেছি তারা "কিরামান কাতিবিনের" মত তার সম্পূর্ণ রেকর্ড সংরক্ষণ করেছে। আমি কায়রোর বার এসোসিয়েশনে "ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা" শীর্ষক বিষয়ের ওপর বক্তব্য পেশ করি। যার প্রতিটি শব্দ এই বেচারাদের লিপিবদ্ধ করতে হয়। অনন্তর প্রতিটি শব্দের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয় যে, আমি কোথাও এমন কোন কথা বলেছি কি না যার পরিপ্রেক্ষিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এটা ছিল এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি নাগরিকের পিছনে সি আই ডি লাগিয়ে রাখা হতো। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেন কারো ব্যক্তিগত জীবন বলতে কোন কিছুই ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে, এতদসত্ত্বেও কোন কোন সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি সাদাতের আমলের প্রশংসায় মুখর।

কোন সরকারেরই এ ধরনের কর্মপন্থা শাসক ও শাসিতের কারো জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। এতে বরং উভয় পক্ষের মধ্যেই সংশয়-সন্দেহ, ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস ও অনাস্থাই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সত্য কথাই বলেছেন ঃ শাসক যখন প্রজা সাধারণের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে তাদের পেছনে লেগে যায় তখন সে তাদেরকে খারাপ করে ছাড়ে।

প্রতিটি লোকের পশ্চাতে গোয়েন্দা নিয়োগকারী শাসক নিশ্চিত এই অনুভূতি রাখে যে, জনসাধারণ তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। এমনকি তার অনুসৃত পলিসিও গণস্বীকৃতি লাভ করেনি। অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তির পেছনে সি আই ডি নিযুক্ত করার প্রয়োজন কি?

আমি কতবার বলে এসেছি যে, আমার এই স্মৃতি রোমন্থন করার উদ্দেশ্য কোন প্রকার গর্ব বা অহংকার প্রকাশ করা আদৌ নয়। মিসর ও মিসরের বাহির থেকে অসংখ্য লোক আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমার বাড়ীতে এসে থাকেন। অথচ আমার বাসগৃহের পরিবেশ খুবই অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে ধরনের। আমার ঘরের সাজ-সরঞ্জামের প্রায় সবই ১৯২৬ সালের। চেয়ার, সোফা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র পুরনো হওয়ার কারণে সেগুলো আসল রং রূপ ও চেহারা হারিয়ে বসেছে। আমার কোন কোন বন্ধু বান্ধবের এ দৃশ্য আদৌ পছন্দ নয়। মিসরের বাহির থেকে আগত আমার কোন কোন হিতাকাংখী প্রস্তাব করেছেন যে, আমার জন্য কোন বিলাস বহুল ও নামীদামী মহল্লায় বাড়ী ক্রয় করে তা উত্তমরূপে অত্যাধুনিক আরাম আয়েশের উপায় উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করে দেবে। আমি তাদের এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি শানশওকাত ও ভোগ বিলাসিতা আদৌ কামনা করি না। যে বাড়ীতে এবং যে অবস্থায় আছি তাতেই আমার মন ও মস্তিষ্ক খুব পরিতৃপ্ত আছে। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমাকে এভাবে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। আমার মনের গভীর কন্দরে কখনো এমন মনোভাব দেখা দেয়নি যে, বর্তমান বাসস্থান ও সাজ-সরঞ্জাম পরিবর্তন করে ফেলতে হবে। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তার শোকর আদায় করছি এবং তার রহমত ও আশ্রয়ের প্রত্যাশা করছি। আর তা আমি সর্বদা লাভও করেছি। একজন মু'মীন বান্দাহ যখনই আত্মতৃপ্তি ও মানসিক প্রশান্তি নিয়ে দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তারই নৈকট্য লাভের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যায় তখনই তার প্রকৃত সাফল্য অর্জনের সকল উপায় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে তার হস্তগত হয়ে যায়।

হে আল্লাহ! আমাকে এমন অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখো—যাতে তোমার সন্তোষ লাভ করতে পারি এবং এই ক্ষণস্থায়ী জগতের বিত্ত-বৈভবের কঠোর পরীক্ষায় তুমি আমাকে ফেলো না।

যেমন রাজা তেমন প্রজা

আমার মতে মুসলিম উম্মাহ আজ যেসব বিপদ ও কঠোর পরীক্ষার ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তার কারণ অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের দুষ্প্রাপ্যতা নয়। বরং প্রকৃত

www.amarboi.org

সমস্যা সেসব অদৃশ্য হাতের সৃষ্ট যারা এসব মৌলিক প্রয়োজনের কলকাঠি নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি মুসলিম জাহানের প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আমানতদার ও বিশ্বস্ত লোকদের হাতে এসে যায় তাহলে ইসলামী দুনিয়া বিশ্বের সব জাতির মোকাবিলায় সর্বাপেক্ষা অধিক মজবুত ও আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে পারবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথেই বলতে হচ্ছে যে, মুসলিম বিশ্বের এরূপ অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনাই সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে এবং একান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র উল্টো হাওয়াই প্রবাহিত হচ্ছে। সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকজন উচ্চশ্রেণীর লোকদের প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে এবং যদি দেখতে পায় যে, তারা অধপতনের গভীর পংকে নিমজ্জিত হচ্ছে তাহলে এরাও একই অপরাধে অপরাধী হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। এভাবে এই অকল্যাণের চক্র গোটা জাতির দেহে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে। "যেমন রাজা তেমন প্রজা" প্রবাদ বাক্যের সত্যতার ন্যায় সমাজের নীচুস্তরের লোকেরা উঁচুস্তরের লোকদের অনুসরণ করে থাকে। যেহেতু ওপরের তলার লোকদের মধ্যে এ ব্যাধি সংক্রামক রোগের মত বিস্তার লাভ করে আছে। দেশ ও জাতির মংগল ও কল্যাণ কামনার তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই প্রত্যেকেই আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত আছে।

চেষ্টা দ্বারাই অভ্যাস গড়ে ওঠে

আমি যখন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম তখন দেখতে পেলাম মসজিদগুলোর অবস্থা খুবই করুণ। যে মসজিদেই আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সেখানেই বয়োবৃদ্ধ, গরীব ও কাংগাল মানুষ দেখতে পেয়েছি। সচ্ছল ও যুব সমাজের কোন সম্পর্ক মসজিদের সাথে নেই বললেই চলে। নিত্য দিনের লেন-দেনে ও সভ্যতা সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানুষ অইসলামী কাজ-কর্ম করতে কোন প্রকার লজ্জা অনুভব করতো না। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াতের সূচনা হলে কিছু দিনের মধ্যেই এর সুফল প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন আসতে থাকে। মসজিদে মসজিদে যুবকশ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যার আগমন শুরু হয়। উঠতি বয়সের এসব মুসলিম তরুণ ইবাদাতে নিষ্ঠা ও ইসলামী জ্ঞান চর্চায় প্রবল ঈমানী প্রবণতা প্রদর্শনী করতে থাকে। সর্বত্র বিরাজমান পরিস্থিতিতে গঠনমূলক ও সম্ভাবনাময় আমূল পরিবর্তন প্রতিভাত হতে লাগলো। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, সাধারণ রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দও দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ধারাবাহিক আলোচনা করতে থাকে। এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তন। ইখওয়ান তো আল্লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজের সূচনা করেছিল। কিন্তু কতিপয় রাজনৈতিক দল ইসলামের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন দেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ইসলামের পক্ষে কথা বলতে শুরু করে যাতে তারাও কিছুতেই ইখওয়ান থেকে পিছিয়ে না পড়ে। যা হোক ভাল কাজের প্রতিযোগিতা করাও উত্তম অবশ্য তজ্জন্য শর্ত হলো নিয়ত সৎ হতে হবে।

www.amarboi.org

আমাদের দূরদৃষ্টিকে ব্যাপকতা দাও

এই দাওয়াতের ফল এই যে, এখন প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাদের ঘোষণাপত্রের শিরোনামে এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে দেয় যে, বিজয় লাভ করলে তারা দেশে ইসলামী শরীয়াত চালু করবে। এটা দাওয়াতে ইসলামীর সফলতার চাক্ষুষ প্রমাণ। ইসলামের শত্রুরা এই দ্বীনের বিরুদ্ধে যত চক্রান্ত ও কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ; এক্ষণে তা প্রায় সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। খৃস্টান মিশনারীদের সম্মুখে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। দাওয়াতের এসব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলো একে নির্মূল করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সকল দেশেই মিশনারীদের গৃহীত কর্মনীতি হচ্ছে, তারা হাসপাতাল, স্কুল ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজকে তাদের বাণী প্রচারের উপলক্ষ বানিয়ে থাকে। জনগণের সেবার ছদ্মাবরণে মূলত ক্রমে আন্দোলন তার পাঞ্জা শক্ত করে গেড়ে দেয়। এ ব্যাপারে আমি কখনো উদাসীন ছিলাম না। আমার মনে পড়ে শাবীনুল কানাতিরে হারমূল হাসপাতালে সর্বদা রোগীদের ভিড় লেগেই থাকে। আমি জানতে পেরেছি যে, চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যের সাথে সাথে খৃস্টবাদের দাওয়াত দেয়া হয়ে থাকে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানের মুখোশ উন্মোচন করে এর আসল চেহারা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। তারপর আর যায় কোথায় ? হাসপাতাল রোগী শূন্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে পেঁচকের দল বাসা বাঁধে। ইখওয়ান গ্রামীণ কৃষককুল, পেশাজীবি, শ্রমজীবি এবং সাধারণ বস্তিবাসীদের অবহিত করে যে, মানবীয় সহানুভূতির পর্দার অন্তরালে হাসপাতালের আমলা ও কর্মচারীরা তাদের দ্বীন ও ঈমানের ওপর কুঠারাঘাত করছে। ফলে এই হাসপাতাল অন্যভাবে বলতে গেলে খৃস্টবাদ প্রচারের কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

ত্রুটিমুক্ত ব্যবস্থা

আমার মনে পড়েছে যে, যখন কোন লোক ইখওয়ানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক দর্শনের উল্লেখ করতো তখন আমার মনে এই "দর্শন" শব্দটি বেশ খটকা সৃষ্টি করতো। কোন কোন দর্শনশাস্ত্রবিদের মতে "দর্শনের" সংজ্ঞা হচ্ছে, "মানুষের অনুসন্ধান ও ভুল-ভ্রান্তির সমষ্টি, হোঁচট খাওয়া তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে হোঁচট খাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা"—ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি দর্শনের সংজ্ঞা এই হয় তা হলেতো ইসলামী আকীদা বিশ্বাস এই দর্শন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। কেননা এখানে হোঁচট খাওয়া এবং ভুলভ্রান্তির পর সংশোধনের না কল্পনা করা যায় আর না তার অবকাশ আছে। এটা আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত জীবন বিধান যা সূর্যের চেয়েও দীপ্তিময়। আমাদের আল্লাহ্ এক আমাদের শরীয়াত এক আমাদের রাসূল এক আমাদের দ্বীনের সকল বিষয় সুস্পষ্ট, সর্বজনবোধ্য ও কার্যকরী করার যোগ্য। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি তা এমনভাবে বুঝতে পারে যেভাবে তা বুঝতে পারে একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এতে কোন দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা তর্কশাস্ত্রের মারপেচের আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই।

www.amarboi.org

আমাদের কোন কোন স্বনাম ধন্য ইমাম ও আলেম দর্শনের ময়দানে যে সমস্ত তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করেছেন তা কেবলমাত্র গ্রীক এবং অন্যান্য বিজাতীয় দেশ থেকে আনীত যুক্তিবিদ্যার প্রভাব এবং ইসলামের ওপর আরোপিত ভিত্তিহীন অবান্তর আপত্তি ও সমালোচনার যথাযথ প্রতিবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্তেই ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম গাযযালী ও ইবনে রুশদ প্রমুখ মনীষীর গবেষণামূলক গ্রন্থ লক্ষণীয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনসমাজের ওপর থেকে অবাঞ্ছিত দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব জনিত ভীতি বিদূরিত করা এবং সক্রেটিস, হিপক্রাটিস ও প্লেটো প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের ভ্রান্ত মতবাদের প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক এসব দার্শনিক মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ এবং সংশয় সৃষ্টি করার জন্য সযত্ন প্রয়াস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ওয়াহদাতে অজুদ বিষয়ে কালামশাস্ত্র এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের মাথা ঘামানো নিরেট পন্ডশ্রম মাত্র। এভাবে সময়ের অপচয় ও মস্তিষ্কের ক্ষয় ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

আমি আমার সারা জীবন প্রত্যাশার স্বপ্নে বিভোর হয়ে অতিবাহিত করে দিয়েছি। আমি সর্বদা প্রতিটি জিনিসের উজ্জ্বল দিক দেখে থাকি। হতাশা ও নৈরাশ্য কখনো আমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তার কারণ শুধু একটাই আর তা হচ্ছে এই আকীদা বিশ্বাস যে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত কোন ঘটনা এই পৃথিবীতে সংগঠিত হতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। তার ইচ্ছাই অবশ্যম্ভাবীরূপে কার্যকরী হয়ে থাকে। এ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। আল্লাহ অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, যেসব বিষয়ে আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না সেগুলোর ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আমাদের কর্মনীতি স্থির করতে হবে ঃ

১–আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত কি নিরংকুশ বিচারক নন ? নিশ্চিত তিনি মহাবিচারক। তাহলে যা কিছু ঘটেছে তাতেও নিশ্চয়ই কোন নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত রয়েছে।

২–আল্লাহ তায়ালা কি পরম দয়ালু ও দাতা নন ? অবশ্যই । তবে আর ঐ সমস্ত বিপর্যয় যা বাহ্যত মুসিবতরূপে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোন নিগূঢ় জ্ঞানের ওপর ভিত্তিশীল এবং তাতে আল্লাহর রহমত নিহিত। যদিও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান তার গভীরে পৌঁছতে অপারগ।

৩–আল্লাহ তায়ালা কি সুবিচারক নন ? নিশ্চয়ই তাহলে তাঁর এমন কোন ফায়সালা হতে পারে না যার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে।

এরূপ চিন্তাধারা গ্রহণ করলে হতাশা উদাসীনতা, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা কিছুতেই আমাদের অন্তরে শিকড় গজাতে পারে না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি সর্বদা হাসি মুখ থাকতেন। মানুষকে হতাশা থেকে দূরে রাখার জন্য সুসংবাদ শুনাতেন এবং আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালার ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকতেন। তার পবিত্র চেহারায় অসন্তোষের লক্ষণ এবং ললাটে ভাঁজ শুধু মাত্র এমন অবস্থায় পরিদৃষ্ট হতো যখন আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ কার্যাবলীর কোথাও কোন বিরুদ্ধাচরণ হতো। এতদ্ব্যতীত তিনি সর্বদা অত্যন্ত আনন্দিত থাকতেন।

ইখওয়ানের সমস্ত সাথী জেলখানার দুঃসহ জীবনেও সর্বদা হাসিখুশী ও অত্যন্ত আশাবাদী থাকতেন। কারারক্ষীগণ কখনো কখনো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতো তোমরা কি আল হুদাইবির সাথে রয়েছো নাকি আবদুন নাসেরের সাথে? আমাদের মধ্যে থেকে কোন এক ভাই জবাব দিতেন—"আমি তো রয়েছি আল্লাহর সাথে।" একথা শ্রবণে সরকারী কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ করতো।

সিরাজের দাওয়াত

আমরা যখন কেন্দ্রীয় অফিসে একাধারে কয়েক ঘন্টার অধিবেশনে মিলিত হতাম তখন সেখানে যা কিছু পাওয়া যেতো সম্মিলিতভাবে খেয়ে নিতাম। আন্দোলনের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমাদের এক ভাই আলীর অভ্যাস হচ্ছে, তিনি সম্মেলন চলাকালীন সময়ে লুবনের তরকারী রুটি ও ভুনা কলিজা নিয়ে এসে উপস্থিত সকলের খেদমতে হাজির করতেন। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি তার ব্যক্তিগত খরচে এই সব খাদ্য সামগ্রী এনে ইখওয়ানদের খাওয়াতেন। দামের কথা জিজ্ঞেস করা হলে পাশ কাটিয়ে যেতেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে বেশী করে পুরস্কৃত করুন। তাকে তার এই খেদমতের সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। তাকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন এবং নেক আমলের তাওফীক প্রদান করুন। আমাদের পারস্পরিক আচরণ সকল প্রকার লৌকিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইখওয়ানের মধ্য থেকে কোন ভাই যদি কখনো দাওয়াত খেতে আমন্ত্রণ জানায় তখন কম বেশী কিছুটা ধুমধাম পড়ে যায়। সারীদ ও গোশত দ্বারা সকলকে আপ্যায়ন করা হয়। কোন কোন ভাই যাকে আল্লাহ তায়ালা পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ দান করেছেন তিনি মেহমানদারীর সময় রকমারী সুস্বাধু ও ঘৃতপক্ক খাদ্য হাজির করতেন। এ ব্যাপারে নিয়ম ছিল, সংগীদের মেহমানদারী করার জন্য কোন প্রকার কার্পণ্য করা হতো না। আবার কোন রকম বাহুল্য ব্যয়ও পছন্দ করা হতো না। প্রত্যেক ভাই তার দ্বীনি ভাইদেরকে তার সামর্থানুযায়ী সম্মান করতে তৎপর থাকতো। কেননা রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণীর মর্মার্থ এই যে, "তোমাদের মধ্যে যেই আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে তার উচিত মেহমানদের সম্মান করা।"

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

আমার জীবনের প্রথম দিকে আমার আগ্রহ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ওয়াফদ পার্টির প্রতি। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল বন্ধু প্রতীম। এই কারণে অনেক মজার কাহিনীও সংঘটিত হয়েছে। যেমন দু'টো

www.amarboi.org

পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল একই সময় আমাকে তাদের দলের সদস্য রূপে মনে করেছে। মরহুম আহমদ হামজা পাশা ক্ষমতাসীন ওয়াফদ পার্টির অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। তার সাথে ছিল আমার ঐকান্তিক সম্পর্ক। আল কালয়ুবিয়া প্রদেশের প্রাদেশিক সংগঠনে তিনি আমার নাম ওয়াফদ পার্টির কমিটির অন্তরভুক্ত করেয়েছিলেন। একই সময় শাবিবুল কানাতির অঞ্চল থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আল ফাকী বেগ মরহুম আমার নাম তার পার্টির মধ্যে শামিল করেছিলেন। আমাকে কখনো না ওয়াফদ পার্টির কোন সদস্য কিছু জিজ্ঞেস করেছে না দাস্তুরীগণ। আমিও এতে কোন রকম অসুবিধা মনে করতাম না। কেননা ইখওয়ানের মধ্যে আমাদের মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মোহাম্মদ আবদুর রহমান নাসির মরহুম হিজবে দাস্তুর-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এমনকি তিনি এই দলের পক্ষ থেকে নাবহা এলাকার পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন। ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ তাঁর হিজবে দাস্তুর-এর সদস্য পদের ব্যাপারে কখনো কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি।

এই সময় ইখওয়ান সদস্যগণ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্য হতে পারতেন, যদি তাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইখওয়ানের আন্দোলনের পয়গাম সর্বস্তরের জনগণের নিকট পৌছানো হতো এবং অন্য সকল বিষয়ই তার কাছে গৌণ বলে বিবেচিত হতো। ইখওয়ানের বেশ কিছু সদস্য ওয়াফদী, দস্তুরী, সা'দী (সা'দ জগলুল পাশার নামানুসারে), মাহাযী, কিংবা হিজবুল ওয়াতানী দলের সদস্য ছিলেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন সেই প্লাটফর্ম থেকেই দাওয়াতে হকের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে থাকতেন সদা তৎপর। আর তাদের মূল বিশ্বস্ততা ছিল আল্লাহ ও রাসূলের সাথে।

আমি কখনো কোন দলের সদস্য পদ ও দাওয়াতে হকের মধ্যে সংঘাতের কোন লক্ষণ দেখতে পাইনি। ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ধারণাও আমার ছিল না। অবশ্য আমি শেক্সপিয়ারের কায়জারের কাহিনীর ঐ অংশ সর্বদা পছন্দ করতাম যে কোন অবহেলিত গ্রামের নেতৃস্থানীয় পদ লাভ রোম নগরে দ্বিতীয় পজিশন অপেক্ষা শ্রেয়। এ বাক্যাংশে আমার এজন্য ভাল লাগতো না যে, আমি নাম ও যশের প্রত্যাশী। বরং এর লেশমাত্রও আমি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে থাকি। আমি কোন দিনই কোন পদলোভী ছিলাম না। আর এজন্য কোন প্রকার চেষ্টা তদবীরও করিনি। মাকতাবে ইরশাদের সদস্য পদ থেকে আমি সর্বদা পাশ কাটিয়ে চলতাম। কিন্তু ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ আমাকে এর কর্মকর্তা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর যখন ইমাম আল হুদাইবি মুর্শিদে আ'মের দায়িত্বে অভিষিক্ত হন তখন প্রতিষ্ঠা মজলিশের সদস্যগণ আমাকে এই পদ সামাল দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। মিসর কিংবা মিসরের বাহিরে যখনই আমাদেরকে কোন কক্ষে বসতে হতো তখন সর্বদা আমার প্রচেষ্টা থাকতো দরজার পাশে বসার যাতে কেউ আমাকে আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে এরূপ অনুরোধ করার সুযোগ না পায় যে, আমার পাশে বসুন!

www.amarboi.org

আমি কি আর আমার ক্ষমতাই বা কি ?

আমি আমার ও পূর্ববর্তী দু'দু'জন মুর্শিদে আ'মের মাঝে আসমান জমিনের ফারাক মনে করি। সত্য করে জেনে রাখুন এটা বিনয় নয় বরং সত্য। আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করি আর এটাই বাস্তব। আমার ওপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং ইখওয়ান আমাকে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনে করে থাকে। অথচ আমি নিজেকে এই কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্য বলে আদৌ মনে করি না। নিজের মর্যদা যোগ্যতা ও অবস্থান সম্পর্কে আমার ভালভাবেই জানা আছে। আল্লাহ্ তায়ালা এমন ব্যক্তির ওপরই রহমত নাযিল করেন যিনি তার সম্মান ও আত্মপরিচয় সম্পর্কে সচেতন থাকেন।

আমার স্মৃতিকথার মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান জিনিস হচ্ছে, আমি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াতের সাহায্যে আমার নিজেকে জানার সুযোগ পেয়েছি এবং এই জীবনে এমন ব্যক্তিত্ব লাভ করেছি যার অস্তিত্ব ও অবস্থান রয়েছে। এই দাওয়াতের বদৌলতে আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমি খাদ্য গ্রহণ করে থাকি জীবন ধারণ ও দ্বীনি দায়িত্ব পালন করার জন্য কেবলমাত্র খাওয়ার জন্যই আমি বেঁচে থাকি না।

জীবনটা ধরে রাখতে হলে খেতে হয় ; খাওয়ার জন্যই বেঁচে না থাকার নিষ্ঠুর বাস্তবতা আমার সম্মুখে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের পয়গামই তুলে ধরেছে। যদি আমার যৌবন ফিরে আসে যার জন্য আমার কোন আকাংখা নেই বরং আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আমার বার্ধক্যের বিরাট অংশ রয়েছে। এর বদলে আমি পুনরায় যৌবন লাভ করে এই মহাসম্পদ হাত ছাড়া করতে চাই না। যা জীবনভর আমি জমা করেছি ---। তা হলে আমি সেই নবযৌবনে কি গতিধারা অলম্বন করবো ? আমাকে যদি এই যৌবন দেখিয়ে বলা হয় যে, তুমি তোমার নিজের জন্য রাস্তা বেছে নাও। তাহলে আমি নির্দ্বিধায় সেই পথই অবলম্বন করবো যে পথে আমি আমার বিগত জীবন অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে এ অপেক্ষা বেশী নৈকট্য আর কি হতে পারে যে, জীবন তারই পথে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার ন্যায় দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তির পক্ষে অতসব মুস্কিল ও কঠিন চড়াই উৎরাই অতিক্রম করা কি করে সম্ভব ছিল যদি আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও তার পক্ষ থেকে অবিচল থাকার তাওফীক আমাকে পরিবেষ্টন না করে নিতো এই চড়াই উৎরাই ও উত্থান পতন—যাতে আমার জীবন কেটে গেলো—তার স্মৃতি রোমন্থন করতে আমার খুবই ভাল লাগে। এটাই আমার মূলধন এবং এটাই আমার সম্বল ও পাথেয়। এটাই দুনিয়াতে সম্মান এবং আখেরাতে মংগল ও কল্যাণ। আমি আমার জীবন নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত।

বদদোয়া ও তার লক্ষ্য

একবার আমি মিসরের পাহাড়ী অঞ্চলের এক জেলখানায় বন্দী ছিলাম। জেলের কর্মকর্তাদের একজন আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠায় এবং জামাল আবদুন

www.amarboi.org

নাসেরের গুণাবলী ও গৌরবজনক কীর্তিগাথা বর্ণনা করতে থাকে। সাথে সাথে ইখওয়ানের সংগঠন ও মুর্শিদে আ'মের বিরুদ্ধে বিষোধগার করতে থাকে ও তার সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে। সে এমন সব মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে যা মিসরে নিত্যদিনকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এবং যার কোন অস্তিত্ব এই ইখওয়ান বিদ্বেষীদের মনমানস ও কথাবার্তা এবং আচার আচরণ ব্যতীত আর কোথাও ছিল না। সে অন্যূন আধা ঘন্টা পর্যন্ত ভাষণ দিতে থাকে। আমি পিন পতন নীরবতার সাথে ও নিবিষ্ট মনে তার বক্তৃতা শুনতে থাকি। সে মনে করে যে, তার বক্তব্যের যাদু আমার ওপর ক্রিয়া করেছে। তারপর সে বলতে লাগলো, "এখন তোমার মতামত কি ? তুমি কি আবদুন নাসেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ?"

আমি জবাব দিলাম তুমি তোমার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করতে নিসন্দেহে কোন কসুর করনি। কিন্তু আমি আমার বিবেককে প্রশ্ন করছি সুদীর্ঘ এতগুলো বছর অত্যাচারের ষ্টিম রোলারে পিষ্ট হওয়ার পর এখন আমি জালিমের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আরম্ভ করবো যার অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে এসেছি আমি নিজেও ? এত বছর ধরে আমি কি একেবারে জ্ঞানহীন ও গন্ডমূর্খ ছিলাম যে, এখন স্বীকৃতি প্রদান করবো নাসের হকের ওপর আছে। আর আমি আছি বাতিলের ওপর ? যদি বাস্তবিকই আমার অবস্থা এমনই হয়ে থাকে তাহলে তো আমি এর চেয়েও অধিক কঠোর শাস্তিএবং দীর্ঘ কারা জীবনের উপযুক্ত। অতএব আমার পক্ষ থেকে অপারগতা প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি আপনার দাবী মেনে নিতে পারছি না।

এই কর্মকর্তা আমাকে পুনরায় আমার কুঠরিতে নিয়ে যায় তখন তার মুখ থেকে অভিশাপের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। সে কোন রকম বিরতি ছাড়াই বলে যাচ্ছিলো আল্লাহ্ তোমার বংশ পরিবারকে ধ্বংস করে দিন, আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ করুন.......। আমি সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম যে, তার বদদোয়া আমার ওপর পতিত হওয়ার পরিবর্তে শূন্যে ঘুর পাক খাচ্ছে এবং কয়েক পলক আবর্তিত হওয়ার পর যোগ্য লক্ষ্যের ওপর গিয়েই আঘাত হানবে। এর লক্ষ্যবস্তু আমি নই বরং কারাগারের এই কর্মকর্তা। আর সুধি পাঠক ! আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন যে, প্রকৃত অবস্থা তাই পরিদৃষ্ট হলো। সে ব্যক্তি ক্যানসারের শিকার হয়ে মারা যায়। আল্লাহ্ তাকে তার রহমতের ছায়া তলে স্থান করে দিন এবং আমার ও তার ক্ষমার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

জিহাদে অংশ গ্রহণের দাবী

১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল নিয়ে যুদ্ধের সময় আমি আল ওয়াহাত জেলখানায় বন্দী ছিলাম। আমরা জেলখানার দারোগার নিকট দরখাস্ত করলাম যেন আমাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্যে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমাদের প্রতিটি বৃদ্ধ ও যুবক দেশ মাতৃকার রক্ষার প্রেরণায় ছিল উজ্জীবিত। জেলখানার দারোগা এই আবেগ দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং সে বিলক্ষণ বুঝতে পারে যে, এই লোকগুলো

www.amarboi.org

যারা শুধুমাত্র এই অপরাধের কারণে কারাগারের শাস্তি ভোগ করে যাচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাদের রব বলে মনে করে—দেশের জন্য কত পবিত্র আবেগ পোষণ করে। তাই সে আমাদের দাবী সরকারের নিকট প্রেরণ করে দেয়, কিন্তু সেখান থেকে জবাব আসলো, না, এই "অপরাধী"দেরকে কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতেই থাকতে দাও। অনুমান করুন, ক্ষমতাশীনদের চিন্তার ধরন কত ভ্রান্ত ও জুলুমমূলক। নাসের ও তার তল্পীবাহকদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা ইখওয়ানদের মুখ নিঃসৃত প্রতিটি কথারই প্রবল বিরোধিতা করতো। এমন কি ইখওয়ান যদি বলতো, "সালামুল্লাহ" (তোমাদের উপর আল্লাহর প্রশান্তি নেমে আসুক) তখন তারা প্রত্যুত্তরে বলতো "গাজাবুল্লাহ" (তোমাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক)।

ইখওয়ানের নামে ব্যাংগ-বিদ্রূপ

মিসরের জাতীয় ইতিহাসে ইখওয়ানের কীর্তিমালা সর্বজন বিদিত। বিশেষত ইখওয়ান ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দশ বছরে যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছে তারই আলোকে মিসরের পুরো ইতিহাস এবং এই সময়ে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা ইখওয়ানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। এতদসত্ত্বেও এই অত্যাচার উৎপীড়নের স্বরূপ দেখুন যে, উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই সময়ে প্রকাশিত কোন গ্রন্থেই ইখওয়ানের কোন আলোচনা স্থান পায়নি। একেই বলা হয়ে থাকে "ক্ষমতাধরদের ইতিহাস রচনা।"

ফিরিঙ্গি সভ্যতার দাস

বৃটেনের বিদেশ মন্ত্রী মিষ্টার ইভেন্স আরব লীগ প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা বিনা কারণে ছিল না। তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য শক্তিগুলো উপলব্ধি করেছিলো যে, ইখওয়ান বিশ্বব্যাপী একটি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব তারা ইসলামের পরিবর্তে আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি সংস্থা গড়ে তোলার জন্য তাদের ভক্ত-অনুরক্ত ও দোষরদের উৎসাহিত করে। আমি অত্যন্ত অকপটে বলতে পারি যে, ফিলিস্তিন সমস্যাকে উপলক্ষ বানিয়ে আরব লীগের কাঠামো গড়ে উঠে এবং এই কারণেই তা হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। আরবলীগের দ্বারা ফিলিস্তিন যুদ্ধের অসীম ক্ষতি তো সাধিত হয়েছে। লাভ হয়নি মোটেও। এটা ছিল গোটা মুসলিম উম্মাহর সমস্যা। আরব নেতৃবৃন্দ নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির জাতিগত গোঁড়ামি ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। আরবলীগ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য অনারব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই জিহাদ থেকে বাইরে রাখে। আমাদের শত্রুরা এটাই একান্তভাবে কামনা করছিলো।

আমি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নববী ইসমাঈলের সাথে আলোচনা করেছিলাম যে, আমাদেরকে মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত সংগঠন কায়েম করা উচিত। আমার এই আলোচনার পর "মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত লীগ" সম্পর্কে আলোচনা শোনা যেতে

www.amarboi.org

থাকে। এমনকি তা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেয়া হয়। কিন্তু যেহেতু এর ভিত্তি মজবুত ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তি বিশেষের সুনাম সুখ্যাতি, লাভ করাই ছিল এর পশ্চাতে সক্রিয়। ফলে এই মহতী উদ্যোগ সফলতার মুখ দেখার সুযোগ পায়নি। যে কাজের পশ্চাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য থাকে না। তা কখনো ফলপ্রসূ হয় না। ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের মুজাহিদগণের কৃতিত্ব সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখার মত। এই জিহাদের পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, প্রতিটি আরব রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপক প্রতিযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লব ছিল ধীর স্থির মস্তিষ্ক প্রসূত পরিকল্পনার ফল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক সরকারের সাহায্যে এই গজিয়ে ওঠা ইসলামী শক্তি "আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন"কে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেয়া। পরবর্তী কালে সংঘটিত ঘটনাবলী আমার এই মতামতের সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ করেছে। কেউ তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারবে না। কেননা ইতিহাস তার ফায়সালা দিয়ে দিয়েছে। ইসলামী জাগরণ এবং সঠিক ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করে এই জালিমগণ তাদের প্রভুদের খুশী করেছে। ফলে এই সংস্কার কাজ বহু বছর পিছিয়ে পড়েছে। একে একদিন অবশ্যই সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে হবে। কিন্তু সেই সুদিন আসবে কবে তা আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না।

www.amarboi.org

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হাতের কঙ্কন দেখতে আর্শির কি প্রয়োজন ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন ইখওয়ানের দাওয়াতের যথার্থ অবদান। নাকরাশী পাশার আমলে কুবরী আব্বাসের ঘটনাবলী এবং ছাত্রসমাজের ত্যাগ ও কুরবানী সবই ইখওয়ানের দাওয়াতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। ইখওয়ানের দাওয়াতের ইতিবাচক ফলাফল অগণিত। কিন্তু আমাদের দেশের লেখকগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং একেবারেই চক্ষু বন্ধ করে রয়েছে। বস্তুত ভাবলে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না, তারা কোথাও আমাদের আলোচনা করলেও সে আলোচনায় তাদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও আকাংখার রং ভাল করেই চড়িয়ে দেয়। এসব তথাকথিত সাহিত্যিক গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিকগণ ইখওয়ানের ইতিহাস বিকৃত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তারা জানে না যে, এতে তারা সফলকাম হতে পারবেন। তারা পরস্পরের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হলেও এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ঘৃণিত কাজের উদ্যোগ নিলেও। এই ব্যর্থ উদ্যোগের পশ্চাতে ইসরাঈলের নাপক হাত ক্রীয়াশীল রয়েছে। অবশ্য কোন কোন সরল প্রাণ লেখক বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত। আবার অনেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবি জেনে বুঝেই এই খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে।

ইখওয়ানের বিরুদ্ধে এসব চক্রান্ত এবং তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য মুছে ফেলার সর্বাত্মক দুরভিসন্ধি সত্ত্বেও এই দাওয়াত মর্তের মাটিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে শিকড় গজিয়ে ফেলেছে। তার শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লব নিঃসীম আকাশের দিগন্তে আন্দোলিত হচ্ছে। তার সঞ্জীবনী ফল সত্যান্বেষীদেরকে সকল ঋতুতেই সরবরাহ করা হচ্ছে। এই বরকত ও কল্যাণময় বৃক্ষ শরৎ, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত ও হেমন্তের মুখাপেক্ষী নয়। তা চির যৌবনা। এই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় বৃক্ষের নীচে বাতিলের মরীচিকায় উল্লসিত এবং জুলুমের ঝলকানীতে দিশেহারা ও উদ্ভ্রান্ত প্রতিটি যুবক শীতলতার পরশ পেয়ে যায়। কোন সংগঠন বা দল কোনও উপলক্ষে যদি কোন সভা সমাবেশ করতে চায় এবং জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানায় তখন দেখা যায় যে, নগণ্য সংখ্যক লোক সমবেত হয়। পক্ষান্তরে ইখওয়ানের কোন প্রোগ্রাম যদি করতে হয় এবং সরকার যদি তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তাহলে হাজার হাজার জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণ করে। ইখওয়ানের প্রতি সর্বসাধারণের এই আগ্রহ ও ভালবাসা শুধু এই কারণে যে, তাদের দৃষ্টিতে এই দাওয়াতের মধ্যে সার্বিক কল্যাণ ও মংগল নিহিত। আমরা কোন প্রকার লোভ ও প্রলোভন ছাড়াই জনগণকে শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আহবান জানাই। এই কাজটাই ইসলামের দুশমনদের চক্ষুশূল এবং অন্তর্জালারও কারণ। তারা অত্যাচার উৎপীড়ন, সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হকের এই আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু

www.amarboi.org

জ্বীন ও ইনসান সকলের সম্মিলিত ও যুগপৎ প্রচেষ্টায়ও এ প্রদীপ নির্বাপিত হবার নয়। আল্লাহ্ তায়ালার অংগীকার রয়েছে যে, তিনি নিজেই তার দ্বীনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আর তিনি কখনো তার ওয়াদার পরিপন্থী কোন কাজ করেন না।

রেকর্ড সংশোধনের জন্যে

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিও ইতিহাসের চোখের সামনে সংঘটিত স্বীকৃত ঘটনাবলীকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে কোন প্রকার লজ্জাবোধ করে না। উদাহরণ স্বরূপ শহীদ ইমাম যখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন নাহাস পাশা তাঁকে ডেকে পাঠান এবং নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বলেন। কেননা মরহুমের ওপর বৃটেনের চাপ ছিল যে, হাসানুল বান্নাকে যে কোনভাবেই হোক নির্বাচন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করতে হবে। ইমাম তো কারো চাপের মুখে নতি স্বীকার করার মত লোক ছিলেন না। এটা সবারই জানা কথা। এমনকি স্বয়ং নাহাস পাশা মরহুমও এ বিষয়ে ছিলেন সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি ইমাম শহীদের নিকট আবেদন জানান যে, আপনি নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন না। বিনিময়ে আপনার সংগঠনকে দাওয়াতী কাজ করার জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। তিনি ওয়াদা করেন যে কেন্দ্রীয় অফিস, গণমিলনায়তন এবং সর্বত্র গণকেন্দ্র খোলার শুধুমাত্র অনুমতিই দেয়া হবে না বরং সেজন্য সহযোগিতাও প্রদান করা হবে। এই সাক্ষাতকারের সময় অন্য যেসব লোক উপস্থিত ছিলেন এবং যারা পরবর্তী সময় নাহাস পাশার মৃত্যু ও ইমাম শহীদের শাহাদাতের পর সংবাদপত্রে তাদের সাক্ষাতকার ছাপেন তারা সকল ঘটনাপ্রবাহকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে পেশ করেন। তারা নাহাস পাশার এই অনুরোধ ও আবেদন নিবেদনকে ধমকের রংগে রাঙ্গিয়ে তোলেন এবং তার মুখে ইমামকে বলিয়ে দেন যে, তিনি যেন ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করা ছেড়ে দেন। অথচ তাদের উত্তমরূপেই জানা রয়েছে যে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তারপরও নিজেদের আমলনামায় এরূপ "নেকী" লিপিবদ্ধ করানোকে তারা জরুরী মনে করেছেন যে, হাসানুল বান্নার মত একজন প্রথিত যশা অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কীর্তিকলাপকে অপকীর্তির রূপ দান করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইমাম কারো লোভ দেখানো (উৎসাহ প্রদান) ও ভীতি প্রদর্শনকে কোন আমলই দিতেন না। তাঁকে যখন অবহিত করা হয় যে, তাঁর নির্বাচনে দাঁড়নোর ফলে দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়েছে। তখন তিনি তাঁর প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নেন। ইতিপূর্বেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছি।

"এই আন্দোলন আল্লাহর দ্বীন ও রিসালাতে মুহাম্মাদীর পয়গামকে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর অনুকূলে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা যা অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে অব্যাহত। একে নির্মূলকারীগণ হারিয়ে ফেলবে তাদের অস্তিত্ব এই মর্তের মাটিতে। নানা চক্রান্ত ও

www.amarboi.org

ষড়যন্ত্র এর আদৌ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বৈরিতা ও বিরোধিতা এর অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। ইখওয়ানের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ক্ষিপ্ত করতে প্রয়াসী ব্যক্তিরা তো শুরু থেকেই আমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সোচ্চার রয়েছে। আমরা তাদের সামাল দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার ওপর সমর্পণ করেছি। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি যখন আমাদের শাসকদের চোখ খুলে যাবে এবং তারা হেদায়াত লাভ করবে যে, তাদের এবং তাদের প্রভুদের সার্বিক কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, তারা আল্লাহর শরীয়াত কার্যকরী করবে। আমরা এ উদ্দেশ্যেই প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছি। তথাপি মানুষের হৃদয় মনে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহরই হাতে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা মানুষের মন-মানসিকতাকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। জনৈক সৎব্যক্তির এই উক্তি কতইনা যথার্থ যে, "মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনতে মাত্র এক মুহূর্ত সময়ের প্রয়োজন।"

শাহ ফারুকের শাসনকালের প্রাথমিক অধ্যায়

আমার খুব ভালভাবে মনে আছে যে, শাহ ফারুক তার যুবরাজ থাকাকালে শান্তিপ্রিয়তা ও নেক চালচলনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন জনসাধারণের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল। এই জন্যই তিনি ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হলে সারা দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উৎসব উদযাপন করা হয়। জনগণ ধারণা করেছিলেন যে, এখন থেকে মিসরের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে এবং ইসলামী আইন ও ইসলামী মূল্যবোধ সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। ইখওয়ানও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ফারুককে স্বাগত জানায়। কারণ তার কাছ থেকে কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রত্যাশা করা হচ্ছিলো। ইখওয়ানীগণ ফারুকের মনে একথাও বদ্ধমূল করে দিতে চাচ্ছিলো যে, তার আগমনে দেশময় যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে তা তার ইসলাম প্রীতিরই ফল মাত্র। যদি তিনি সঠিক অর্থে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে তিনি দেশবাসীর চোখের মণিতে পরিণত হবেন।

ফারুকের শাসনামলের গোড়ার দিকে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ ইউসুফ ইরশাদ ইমাম শহীদের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মিলিত হওয়ার জন্য আগমন করেন। এটা একথারই স্বাক্ষর বহন করছিলো যে, মিসরের ভবিষ্যত ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে চলেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী অদৃশ্য হস্ত এই সময়ও সুগভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ফারুকের মনে ইখওয়ান সম্পর্কে প্রভূত সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করেন যা পর্যায়ক্রমে ভয়ভীতি ও আতঙ্কের রূপ পরিগ্রহ করে। এমনকি বাদশাহ ইখওয়ানকে তার এক নম্বর শত্রু মনে করতে থাকে। তিনি ইখওয়ান বিরোধীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং মুর্শিদে আ'ম ও ইখওয়ানকে উৎখাত করার সকল চক্রান্ত শুরু হয়ে যায়। শীগ্রই এই গোপন হস্তের ইংগিত ফারুককে একটা নতুন জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তোলে যা ছিল তার যুবরাজ

www.amarboi.org

থাকাকালীন রাজকীয় জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মিসরীয় জনগণ এখন তার প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকে। ফারুককে বলা হয় যে, হাসানুল বান্না যেখানেই যায় মানুষ তার চারিপাশে পতংগের ন্যায় সমবেত হয়ে থাকে। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে তারা তার কথাবার্তা এমন মনোযোগ দিয়ে শুনে যেন তাদের মাথার ওপর পাখী বসে রয়েছে। এ ব্যক্তি বড়ই ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। ....

ইখওয়ানের আদর্শপ্রীতি

আমার মনে আছে ইসমাঈল সাদকীও ইমামের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন। তার এসব সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা তার জামাতা ইবরাহীম পাশা করে দিতেন। এটা ছিল সেই সময়ের কথা যখন ইসমাঈল মিষ্টার বেগিনের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যা সফলতার মুখ দেখতে পায়নি।

নাকরাশী পাশা জাতিসংঘের অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য গেলে ইখওয়ান তাকে সমর্থন করেন এবং ওয়াফদ পার্টির মন্ত্রীবর্গ কেন্দ্রীয় গণমিলনায়তনে উপস্থিত হন এবং সকলেই ইখওয়ানের প্রশংসায় বক্তব্য পেশ করেন। আহমদ হামযা, ফুয়াদ সিরাজ উদ্দীন, সবরী আবু ইলম ও সোলায়মান গানাম সকলের সমবেত হওয়া বিশেষভাবে মনে পড়ে। অনুরূপভাবে ফারুকের শাসনামলের প্রথম দিকে প্রাথমিক কবি যার নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। জনসমাবেশে আসেন এবং ভাষণও প্রদান করেন। অনন্তর ইখওয়ানের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করা হয় যে, এই সংগঠন দেশ প্রেমিক নয়। এটা অমুকের এজেন্ট, অমুকের দোশর ও দালাল। আফসোস ! আমরা কি এমনসব লোকের এজেন্ট ছিলাম যারা এই আমলে আমাদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। কিছুটা হলেও তো জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা উচিত। প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা দেখে প্রতিটি ব্যক্তি তাদেরকে নিজেদের সাথে একাত্ম করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু ইখওয়ান ছিল একটি আদর্শবাদী দল। তারা তাদের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য কখনো প্রস্তুত ছিল না। ফল এই দাঁড়ালো যে, ঐসব ব্যক্তি ও দল তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও একটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে যে, ইখওয়ানের বিরোধিতা করতে হবে। অতএব আমাদের প্রতি সকলেই ঢিল ছুঁড়তে থাকে, যে প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত গতিতে চলছে।

www.amarboi.org

সপ্তদশ অধ্যায়

অদ্ভূত ঘটনাবলীর মধ্যে আমার একটি ঘটনা সংঘটিত হয় ভাই মোস্তফা মু'মিন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে। ইস্রাঈলের সাথে ক্যাম্পডেভিট চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তিনি "আদ দাওয়া" সাময়িকীর বর্তমান অফিসে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। এই চুক্তি সম্পর্কে আলাপ হতে থাকে। তিনি বলতে লাগলেন ইখওয়ান লজ্জাবোধসহ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করেছে। একথায় আমি ঈষৎ হেসে ফেললাম। আমি বললাম, এই চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কি কোন অপমানজনক কাজ যে, তা করতে গিয়ে আমরা লজ্জাবোধ করবো ? বরং বাস্তবতা কি এই নয় যে, উপরোল্লিখিত ব্যক্তি আমাদের ভূমিকার সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি লজ্জা বোধ করতে থাকেন।

আমার সমালোচনা পদ্ধতি

সত্য কথা হলো, আমি যখন কোন ব্যাপারে সমালোচনা করেছি তখন একটু ঢেকেই তা করেছি। কেননা একদিকে আমি কারো সম্মুখে এমন কোন বিষয় উপস্থাপন করা আদৌ পছন্দ করি না যা সে পছন্দ করে না। অপর দিকে আমি এমন দাবীও কখনো করি নাই যে, আমার মতামতই সঠিক ও নির্ভুল এবং তার বিপরীতে যত বক্তব্যই আসুক না কেন সবই বাতিল। আমি আমার মতের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতাম ঠিকই কিন্তু কখনো কখনো আমি আমার নিজের মতেরও সমালোচনা করতে কসুর করি না। আমি এই বিষয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত যে আমার দৃষ্টিভংগী ঈমান আকীদার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বাকী থাকে এই বিষয়টি যে, আমি নিজেকে সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করবো এরূপ মনোভাব আমার কখনো ছিল না। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হালাল ও হারাম ঘোষিত জিনিস সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। কারণ, আল্লাহ ও রাসূলের (সা) ফায়সালা মুসলমানদের জন্য সনদ যা কখনো চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আমার কর্মনীতি হচ্ছে, আমার মতামত আমি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। এমন আকাংখাও কখনো আমার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি যে, আলোচনার টেবিলে আমাকেই বিজয় লাভ করতে হবে। আমার আচরণ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ন্যায়। অর্থাৎ তাঁর উক্তি অনুসারে আমিও চাই যে, যার সাথেই আমার আলোচনার সুযোগ হয় তার সামনেই যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (এটা জ্ঞানের পরিচায়ক যে, সত্য যদি প্রতিপক্ষের কাছে থাকে তাহলে আপনি তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখার পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন। পক্ষান্তরে আপনিই যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন আর অপর পক্ষ তা মেনে নিতে না চায় তাহলে তার ওপর তা চাপিয়ে দিতে পারেন না।)

দাওয়াতে হক ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলা ও আলাপ আলোচনা করার প্রতি আমার তেমন কোন আকর্ষণই নেই। আর এটাই ইখওয়ানের কর্মপদ্ধতি।

www.amarboi.org

গন্তব্যে তারাই গিয়ে উপনীত হয়েছে যারা সফরে অংশগ্রহণ করেনি

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও আবদুন নাসেরের মধ্যে যত মতানৈক্যই হয়েছে তা পারস্পরিক বুঝা পড়ার মাধ্যমে অবশ্যই দূর করা যেতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল এই যে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হতো এবং নেপথ্যে থেকে তার পরিচালনাকারী ছিল। বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিল নাসেরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বিপ্লবের রাতে সে তার বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রদূতগণকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, কোন বিদেশী শক্তি অথবা মিসরে বসবাসরত বিদেশী কোন নাগরিক এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্যবস্তু হবে না। আমরা আমেরিকা ও তার কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের খুব ভাল করেই জানি যে, তাদের উদ্দেশ্য কেমন হয়ে থাকে এবং কোন প্রকৃতির লোকদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিপ্লব সংঘটিত হলে জানা গেলো নাসেরের লক্ষ্য ছিল ইখওয়ানকে নির্মূল করা। সে এক এক করে সঙ্গী-সাথীদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং অবশেষে একনায়কসুলভ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করার আকাংখা তার অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। সে ইখওয়ানকে তার পথের একমাত্র প্রতিবন্ধক মনে করতে থাকে। আপন বন্ধুদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে ইউসুফ সাদিককে শিকার করে। অথচ বিপ্লবের রাতে ইউসুফ সাদিকই সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

অভ্যুত্থানের রাতে জামাল আবদুন নাসের ও আবদুল হাকিম আমের উভয়েই বেসামরিক পোশাক পরিহিত ছিল। তারা কোন এক গোপন স্থানে ছিল যা কারো জানা ছিল না। সেই রাতে সাদাত এক সিনেমা হলে ফিল্ম দেখছিলেন। যেহেতু বিপ্লবের কথা অবশ্য তার জানা ছিল কিন্তু সফলতার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই জন্য সিনেমা হলেই কোন একজনের সাথে মিথ্যা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং পুলিশ ষ্টেশনে রিপোর্ট করার জন্য চলে যান। যাতে বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত কার্য কলাপের সাথে তার কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকার কথা তিনি সহজেই প্রমাণ করতে পারেন। তিনিও বেসামরিক পোশাক পরিধান করেছিলেন।

নাসেরের সর্প স্বভাব ব্যক্তিত্ব

স্ত্রী সাপ যেভাবে তার বাচ্চাদেরকে এক এক করে খেয়ে ফেলে। কোন সৌভাগ্যবানই কেবল তার গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। অনুরূপ নাসের সাহেবও তার সংগী সাথীদেরকে এক এক করে গলধকরণ করে ফেলে। নাসেরের দ্বিতীয় লক্ষ্যবস্তু ছিল মুহাম্মাদ নাজীব। তারপরই একের পর এক খালেদ মুহীউদ্দীন, বাগদাদী, যাকারিয়া হাসান ইবরাহীম ও কামালুদ্দীন হোসাইন প্রমুখ সকলেই প্রতিশোধের শিকারে পরিণত হয়। তার বিষাক্ত ছোবল থেকে কেবলমাত্র সেই রক্ষা পেয়েছেন যে তার পদতলে আত্মসমর্পণ করে তাকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেছে যে, সে তার পূর্ণ আনুগত্য করতে ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে কখনো কসুর করবে না।

www.amarboi.org

ইখওয়ানের ভূমিকা সম্পর্কে তো মোটামুটি সকলেরই জানা ছিল। তাদের ওপরও যুগের জঘন্যতম একনায়কের হাত তোলা বোধগম্য হয়। কিন্তু নাসেরের প্রচন্ড আক্রমণ থেকে আযহার শরীফের ন্যায় একটি অক্ষতিকর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও রক্ষা পায়নি। আল আযহারের শেখ জনাব আল খিদির হোসাইন দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। নাসেরের জন্য তা ছিল অসহনীয়। সম্মানিত শেখের ওপরও তিনি চাপ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন এবং আল আযহারের কর্তৃত্ব গ্রহণের কয়েক মাস পরই তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তাঁর স্থলে যে নতুন শেখ নিযুক্ত হন স্থায়ী রোগ ব্যধি ও বার্ধক্য তাকে কোন কাজের উপযুক্ত রাখেনি। তিনি ছিলেন নাসেরের গুণগ্রাহীদের অন্যতম। এই গুণাবলীর ভিত্তিতেই তাকে এই গুরু দায়িত্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

এই শেখ সাহেবকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করুন। তিনি নাসের সম্পর্কে এমন উক্তিও করেছেন যে, এই নওজোয়ানকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রদান করা হয়েছে। তিনি তার সকল দুশমনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

নাসের ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার পথ অবলম্বন করে এবং এতদূর গিয়ে উপনীত হয় যে, সাধারণ সভা সমাবেশে তাঁর মন্ত্রী প্রবরদেরকে মুজরিদান নামে সম্বোধন করতো। তাদের সাথে তার আচরণ ছিল এমন যে, তারা যেন তার ব্যক্তিগত সেবাদাস। এরূপ আত্মগর্বী কর্মনীতি সাদাত ও তার আমলের শেষের দিকে অবলম্বন করেছিল। আমার কাছে তো এই বিষয়টি বিস্ময়করই মনে হতো যে, এই মন্ত্রীরা কেমন করে এই স্বৈরাচারের কর্তৃত্ব মেনে চলছিলো। বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার শাসনকর্তারা তাদের মন্ত্রীদেরকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করেন। যেমন তারা কোন মন্ত্রীকে আহবান করতে গিয়ে মিষ্টার মুঁসিও কিংবা সিনোর শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের শাসকগোষ্ঠীর এরূপ কর্মপদ্ধতির কোন সংগত কারণ হয়ত থেকে থাকবে? মনস্তত্ব বিশারদ ও সমাজ বিজ্ঞানীগণ কি এর কোন কারণ নির্দেশ করতে পারবেন? আসল কথা হচ্ছে আমি নিজে এর কোন কারণ জানি না। অতএব এটাই উত্তম হবে যে, যা আমার জানা নেই তা আমাকে জেনে নিতে হবে। অন্যথায় আমার পক্ষ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পাবে যার কারণে কিছু মানুষ নারাজ হয়ে পড়বে। বস্তুত মনস্তত্ববিদগণই মানসিক রোগীদের ব্যাপারে অধিকতর ওয়াকিফহাল।

গুজবে কান দেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়

অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকদের দৃষ্টিভংগী ইখওয়ান সম্পর্কে মোটেই ভাল নয়। এর কারণ ইখওয়ান সম্পর্কে তাদের সামনে যেসব রিপোর্ট আসে তাতে তাদের সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ধারণা দেয়া হয়। তাকে এমন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করা হয়। যারা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন প্রকার সন্ত্রাস ও শক্তি ব্যবহার করতে সদা প্রস্তুত। এর সমর্থনে যুক্তি হিসেবে তারা ইকাদের ঘটনা পেশ করে থাকে। এতে আমাদের কিছু সরলপ্রাণ যুবক বল প্রয়োগের জবাবে বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করে থাকে। এই কর্মপদ্ধতিতে ন্যায় ও সত্যের আন্দোলনের কোন লাভ হয়নি বরং

www.amarboi.org

ক্ষতি হয়েছে। এই দায়িত্বশীল ও কর্তাব্যক্তিগণকে আল্লাহ তায়ালা যদি কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, শোনা কথার ওপর আমল করার পরিবর্তে তারা সরাসরি ইখওয়ানের সাথে যোগাযোগ করে প্রকৃত সত্য জেনে নেয়ার উদ্যোগ কেন গ্রহণ করে না?

ইখওয়ানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সঠিক তথ্য লাভ করতে পারেন এবং এতে নিশ্চিতভাবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ আসতে পারে এবং বিদ্যমান বেদনাদায়ক পরিস্থিতির প্রতিকার হতে পারে। এরূপ মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তারা উদ্যোগী হয় না। অথচ এতে তাদের কোন লোকসানের ভয় নেই। ইখওয়ানুল মুসলিমুন তো অন্তরের অন্তস্থল থেকেই এই প্রত্যাশা করে যে, মুসলিম শাসকগণ তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যাক। এবং দ্বীনি পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার মহতী কাজে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুক। যাতে এই বুনিয়াদী ফরজ উত্তমরূপে আদায় হতে পারে। তারা যদি একান্তই সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করতে না পারে তাহলে অন্তত-পক্ষে বাধার প্রাচীর দাঁড় করাতে যেন ব্রতী না হয়। আমাদেরকে আমাদের অবস্থার ওপরই যেন ছেড়ে দেয়।

আমি বলছি না যে, আমরা আজ থেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা করছি বরং এই দাওয়াতী তৎপরতার প্রথম দিন থেকে এটাই আমাদের ভূমিকা এবং ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের লিখিত ইসলামী সাহিত্যগুলো এই দাবীর সত্যতার প্রমাণ দিয়ে থাকে। ইমাম শহীদ আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে প্রত্যেকের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতেন। কিন্তু যারা এই দাওয়াতের বিরোধিতা করে তাদের কারো ব্যাপারে তিনি কখনো ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর দাওয়াত নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ লোকেরা তো মহব্বতের পয়গামই বন্টন করে থাকে। যারা তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে তারা তাদেরকে বুকে তুলে নেয়। আর যারা তাদের থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য প্রাণ খুলে হিদায়াতের দোয়া করতে থাকে। এই বিশ্বস্ত অনুরাগীর দল কারো বিরুদ্ধে কখনো কোন ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে না। এমনকি যারা তাদের সাথে কোন অশালীন ও অমার্জিত ব্যবহার করে কিংবা তাদের কষ্ট দেয় অথবা তাদেরকে হত্যা করে তারা তাদের সকলের কল্যাণের জন্যই দোয়া করতে থাকে। তারা ভাল করেই জানে যে, এসব দুঃখ মুসিবত তারা আল্লাহর পথেই বরণ করছে এবং এর বিনিময়ও তারা তার নিকট থেকে পেয়ে যাবে।

মাথা উলংগ অথচ পায়ে মাথার রাজমুকুট

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নওজোয়ানগণ যখন সুয়েজের তীরে এবং অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসলামী জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের বুকের তপ্ত লহু ঢেলে ধরিত্রির তৃষ্ণা নিবারণ করে তাতে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলিম সমাজে আজও এমন লোক রয়েছে যারা তাদের মর্যাদার নিরাপত্তা বিধান করতে

www.amarboi.org

পারেন। ইসলামের শত্রুরা একথা বুঝতে পারে যে, যে জাতিকে তারা ভীরু কাপুরুষ বলে মনে করতো তাদের মধ্যে ত্যাগ স্বীকার করার মত প্রেরণাদীপ্ত লোক এখনো রয়েছে। ইখওয়ানের কোন কোন বন্ধুবান্ধব এরূপ প্রকাশ্য শক্তির মহড়া প্রদর্শন করা পছন্দ করেনি। তাদের ভূমিকা ছিল এই যে, এভাবে শক্তির প্রদর্শনী ছিল হিকমাত, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। কেননা এতে আন্দোলনের শত্রুগণ এখন থেকেই সতর্ক হয়ে উঠবে। মোটকথা তরংগের আঘাতে জর্জরিত ব্যক্তিও উপকূল থেকে দর্শনকারী লোক কখনো সমান হতে পারে না। এ সময় পরিস্থিতির দাবীই ছিল এই যে, ইখওয়ান নির্বিকার বসে থাকতে পারে না। এটা ছিল কাজের সময় কামান থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীর কখনো ফিরে আসে না। আমাদের সেই সমস্ত ভক্ত অনুরক্ত যারা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার শিকার ছিলেন তাদের আপত্তি ছিল শুধুমাত্র তত্ত্বগত। আমি এরূপ মন্তব্য করছি কয়েকটি কারণে ঃ

১-মিসরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংগঠনে শরীর চর্চা টীম বর্তমান ছিল। স্কাউটিং ও অন্যান্য প্রশিক্ষণমূলক প্রোগ্রাম আইনগতভাবে বৈধ ছিল। ইখওয়ানের জন্য আত্মিক ও দৈহিক প্রশিক্ষণের চিন্তা করা জরুরী ছিল। ইখওয়ান কোন গোপন সংগঠন ছিল না। এর সমস্ত কর্মতৎপরতা প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে হতো। ট্রেনিংক্যাম্প, ভ্রমণটীম বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী সবকিছুই তখন আইনের দৃষ্টিতে অনুমোদিত ছিল। বিভিন্ন টীম তাদের মান উন্নত করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশ গ্রহণ করতো। অধিকন্তু এই সমস্ত কর্মসূচী গোপনে নয় বরং খোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হতো। পরবর্তী সময়ে সরকার যখন এসব কর্মসূচীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শুরু করে তখন তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আবার এই বিধিনিষেধও ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি। ইখওয়ানের ভ্রমণটীমকে মিসরের ভেতরে ও বাইরে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং দাওয়াত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এসব টীম কার্যত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

২-দাওয়াত ইলাল্লাহ বা আল্লাহর পথে আহবান এমন একটা কাজ যা প্রকাশ্যে ও খোলামেলাভাবে করা উচিত। যাতে সর্বসাধারণ তা জানার ও বুঝার সুযোগ লাভ করতে পারে এবং একে গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ওকাজ ও যুলমাজান্না মেলায় গিয়েও উপস্থিত হতেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন এখানে কি এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমার সাহায্যের জন্য দাঁড়াতে পারে যাতে আমি আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌছে দিতে পারি। অনন্তর দাওয়াতে হকের এই আহবান যে সমস্ত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাদের স্বীকৃতি লাভ করে এবং অধিকাংশ মুসলিম এদিকে ছুটে আসে তখনো কি মানুষের নিকট আমরা বলবো ঃ আমাদের দিকে আসবে না আমাদের কথায় কর্ণপাত করবে না কিংবা আমাদের থেকে দূরে থাকো। সত্যের পথে আহবানকারীদের জন্য এটা খুবই খুশীর কথা যে, মানুষ তাদের দাওয়াতে সাড়া দেবে। আমরা কখনো শক্তির মহড়া দেইনি এবং প্রদর্শনীও করিনি। আর কখনো

www.amarboi.org

গায়ের জোরে কাউকে অবদমিত করতেও চেষ্টা করিনি। কিন্তু দাওয়াতে হক যখন শিকড় মজবুতভাবে গেড়ে বসলো এবং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ফলদায়ক হয়ে উঠলো তখন আপনা থেকেই তার শক্তিমত্তা প্রকাশ পেতে থাকলো। এটা কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না বরং ছিল স্বাভাবিক প্রকাশ।

৩-ইহুদীরা ফিলিস্তিন ভূখন্ডে উড়ে এসে জুড়ে বসে এবং ইংরেজরা তাদেরকে মুসলিমদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়। মযলুম ফিলিস্তিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদীরা অত্যন্ত জঘণ্য অপরাধ করে চলেছে। বিরাজমান এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সামনে সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম সরকার ও জনগণ এমন বেপরোয়া ও উদাসীন কর্মনীতি গ্রহণ করেছে যে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তবে হাঁ, নিষ্ফল প্রতিবাদ এবং বৃথা শ্লোগানের তোড়জোড় প্রায়শঃই দেখা যায়। এসব বিক্ষোভ মিছিল দ্বারা ফিলিস্তিনবাসীরা কিছুই লাভ করেনি। অবশ্য তাতে তাদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করার অবাধ সুযোগ ইহুদীরা লাভ করেছে ঠিকই। শরীয়াত ও নৈতিক দিক থেকে ইখওয়ানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিকে ইহুদীদের নাপাক থাবা থেকে মুক্ত করা। মুসলিমগণ যখন সামষ্টিকভাবে এই ফরজে কেফায়া আদায় করতে অপারগ। তখন ইখওয়ানই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এই গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতে ব্রতী হয়। এভাবে তারা গোটা উম্মাতের মাথার ওপর থেকে একটা গুণাহের বোঝা নামিয়ে দেয়। এর পুরস্কার ইখওয়ানগণ এভাবে লাভ করে যে নাকরাশী পাশা মরহুমের মন্ত্রী পরিষদ তাদেরকে জিহাদের ময়দান থেকে ডেকে পাঠিয়ে কারা অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়। নাকরাশী পাশার এই আচরণের ওপর আপনি কি মন্তব্য করবেন? তিনি কি ইহুদীদের এজেন্ট ছিলেন? নাকি তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুগভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন যে, এরা ফিলিস্তিনের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য ইহুদীদের সাথে কেন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে?

৪-এই সময় অবশ্য কর্তব্য ছিল সমস্ত দুনিয়াবাসীকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, যে ইসলামকে তারা মৃত মনে করে তা আসলে মৃত নয় বরং জীবিত। আর ইসলামের সন্তানগণ অপমান ও লাঞ্ছনা এবং তাদের রাসূল ও দ্বীনের অসম্মান কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ইসলামের স্বার্থে তারা তাদের জানমাল ও পরিবার পরিজন সবকিছুই কুরবানী করতে পারে।

৫-ঐ সময় ইহুদীদেরকে এই শিক্ষা দেয়া অত্যাবশ্যক ছিল যে, ফিলিস্তিনকে তারা যেন তাদের মুখের গ্রাস মনে না করে যা কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই গলধঃকরণ করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা তাদের গলায় কাঁটা হয়েও বিদ্ধ হতে পারে।

৬-ইসলামের অনুসারীরা সুদিন ও দুর্দিন সকল অবস্থায়ই দুশমনদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র হয়ে এসেছে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। মুসলিমদের এ সামর্থ আছে যে, তারা তাদের অন্তরের আকীদার

www.amarboi.org

প্রভাব প্রমাণ করবে। যেহেতু তারা বস্তুগতভাবে দুর্বল। ক্রুসেড যুদ্ধ এবং তাতারদের অভিযানের মুখে তারা সে ক্ষমতা দ্বারা ইংরেজদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে প্রদর্শন করেছে। মুসলিম উম্মাহ আজ অধোপতিত অবস্থায় কালাতিপাত করছে। তা সত্ত্বেও তাদের বীরত্বের ব্যাপারে আমরা কখনো নিরাশ নই।

৭-হোদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় আগমন করেন তখন তিনি সাহাবাদেরকে শক্তির মহড়া প্রদর্শন করার জন্য উৎসাহিত করেন। যদিও কিছু লোক অসুস্থ্যতার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন। হাদীস বর্ননাকারীগণ এই প্রসংগে যে সমস্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তার ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ "আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন যিনি আজ তার শারীরিক শক্তি ইসলামের দুশমনদের সম্মুখে প্রদর্শন করে দেখাবে।"

৮-সিদ্ধান্তকর সময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং বীরত্ব প্রদর্শন খুবই জরুরী হয়ে থাকে। এই সময় আমাদের গৃহীত ভূমিকায় সরকারের একটা উত্তম আস্থা লাভ হয়েছিল যে, তারা ইহুদীদের মোকাবিলা করতে সক্ষম। নাকরাশীর দুর্ভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন যে, এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর পরিবর্তে সে উল্টো ইখওয়ানকেই তার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে। সে ইহুদীদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সমস্ত বিপর্যয় বিপত্তির মূলে নাকরাশী পাশার সেই ভুলই ছিল দায়ী। তার কাছে বাহুবল না থাকলেও অন্তত ইখওয়ানকে জিহাদের ময়দানে কাজ করে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারতো। তারপর আপনারা দেখতে পেতেন যে, ইতিহাসের গতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ অধ্যায়

বহুশক্তি ইখওয়ানকে তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে সম্মত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্য এমন কিছু যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক ইখওয়ান তা করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ইখওয়ানী এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে। সমর্থকদের যুক্তি ছিল, যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, নাম পরিবর্তনের পর ইখওয়ান স্বাধীনভাবে দাওয়াতী তৎপরতা চালিয়ে যেতে পারবে। তাই নাম পরিবর্তনে ক্ষতি কি ? কিন্তু নাম পরিবর্তনে সত্যিই ক্ষতি ছিল। যেমন ঃ

১–এই প্রস্তাব উত্থাপন যখন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অবাধ তৎপরতার সুযোগ প্রদানের ওয়াদা করেছেন তখন নাম পরিবর্তনের কি অর্থ থাকতে পারে ? স্বীয় অবস্থানের ওপর অবিচল থেকে কেবলমাত্র নাম পরিবর্তন করে আমরা কি সেইসব লোকদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারবো যারা এই কাজের বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে নাম পরিবর্তনের দাবী আন্দোলনের দুশমনদের প্রথম অপপ্রয়াস ও দূরভিসন্ধি। এর পরই পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্তর অতিক্রম করা তাদের উদ্দেশ্য। প্রতারক, চরিত্রহীন ও লম্পট রাজনীতিবিদদের কর্মনীতি ও তৎপরতা এমনই হয়ে থাকে।

২–এ নাম তো কুরআন মজীদ থেকে গৃহীত। কুরআন ঘোষণা করছে اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ। ("নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পরের ভাই)"—তাইতো আমাদের পরিচয় ইখওয়ান فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ "আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।" অথচ আল্লাহর শোকর যে আমরা সকলেই মুসলিম। অতএব আমরা সকলেই ইখওয়ানুল মুসলিমুন।

৩–এ নাম গোটা মুসলিম জাহানে পরিচয় লাভ করেছে এবং মুসলিম চিন্তাবিদও নেতৃস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিগণ একে বিশ্বস্ত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। ফলে সকল মুসলিম রাষ্ট্রেই আমাদের ভাইয়েরা এই সংগঠনের ঢংয়ে ইকামাতে দ্বীনের জন্য সুসংগঠিত হয়ে গেছে। মনে করুন ইখওয়ান যদি মিসরে তাদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করতে সম্মত হয়ও তাহলে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশসমূহে এর কি প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে ? নাম বদল করার ফলে বিভিন্ন দেশে আমাদের সুসংগঠিত আন্দোলন বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে পড়বে। আর আমাদের দুশমনরা ঐকান্তিকভাবে এটাই চায়। তারা অনেক দূর থেকে এই উদ্দেশ্য হাসিলের অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি। এখন তারা ভেতর থেকে এই লক্ষ্য অর্জন করতে মেতে উঠেছে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কোন নিবেদিত প্রাণ কর্মী কি তাদের এই অভিলাষের সামনে মাথা নত করতে পারে ?

৪–বিংশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে ইমাম হাসানুল বান্নার নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইখওয়ান এই অনুভূতি ও সচেতনতার সাথেই তার হাতে বাইয়াত করেন যে, তারা ইসলামী পুনর্জাগরণ ও রেঁনেসা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য

www.amarboi.org

অংশে পরিণত হতে যাচ্ছে। ইসলামের পুত-পবিত্র বিধি-বিধানকে কিছু সংখ্যক লোক নির্মূল করতে চায় এবং তার দীপ্তি নির্বাপিত করে ফেলার জন্য ফুঁৎকার দিচ্ছে। কিন্তু এই অশুভ উদ্দেশ্য লাভের ক্ষেত্রে তারা কোন দিন সফলতার মুখ দেখবে না। ইখওয়ান ইমাম শহীদের হাতে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মুর্শিদে আ'ম। তার ইনতিকালের পর কি করে এই বাইয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারে? কোন মুসলিমের দ্বারা এমন কাজ হতে পারে না যে, সে তার অংগীকার ভংগ করবে ও অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেবে। ইমাম শহীদ আমাদেরকে যে নীতি পদ্ধতির ওপর রেখে তিনি তার রবের রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন সেই পন্থা ও প্রক্রিয়াতে আমরা কিভাবে পরিবর্তন সাধন করতে পারি?

৫-ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন অন্যান্য ইসলামী সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এটা শুধুমাত্র একটি দলই নয় বরং প্রশিক্ষণ স্কুল ও আন্দোলন। এখানে ইসলামের পূর্ণাংগ বিধান শিক্ষা দেয়া হয়। এমন কতিপয় সাথী যারা আন্দোলন ত্যাগ করে চলে গেছে এবং নিজেরা অন্য নামে পৃথক দল গঠন করেছে। ইতিহাস এই ফায়সালা দিয়ে রেখেছে যে, তারা তাদের পৃথক সত্তা নিয়ে কোথাও টিকে থাকতে ও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। কতিপয় বন্ধু যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তারাও এই নামের মাহাত্ম উপলব্ধি করে আজও নিজেদেরকে ইখওয়ানুল মুসলিমুন নামেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

৬-মুসলিম জাহানে বহু আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যে, অন্য কোন সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ন্যায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম বৈরী শক্তিগুলো এই আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করার জন্য যত বেশী শক্তি প্রয়োগ করেছে তার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এত কিছু করা সত্ত্বেও ইখওয়ানকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হয়নি। তারা অনেক বাধা বিপত্তি ও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর কাছে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অস্তিত্ব আজও আতঙ্কের কারণ। এই শতাব্দিতে হাসানুল বান্নাই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে ইলমকে আমলে রূপায়িত করেন। এমনকি ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমুন।

৭-এই আন্দোলন শত সহস্র শহীদানের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করেছে। শাহাদাতের এই মিছিলের সর্বাগ্রে ছিলেন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নিজে। এসব শহীদ এই জ্ঞান গর্ব, আমলী ও প্রকৃত নামের পশ্চাতে নিজেদের জীবনের নজরানা পেশ করেছেন। তাদের চলে যাবার পর এই নামকে যা এই সালফে সালেহীনগণ তাদের রক্ত দিয়ে লিখে গেছেন পরিবর্তন করা কোন ভাল কাজ হতে পারে না।

www.amarboi.org

৮–ইসলামী দাওয়াতের মধ্যে কোন কোন বিষয় উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এর মর্যাদা রাখে। ইসলামের প্রথম যুগেও আমরা দেখতে পাই যে, বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী এবং বদরযুদ্ধে শরীক সাহাবাদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। ইখওয়ানের জন্যও জরুরী যে, মুখের জোরে যারা গাজী সেজে বসেছে তাদের পশ্চাতে চলার পরিবর্তে নিজেদের পরিচয় ও কৃতিত্বের হেফাজত করবে। আমাদের অমংগলকামীদের সকল তৎপরতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দল ও তার নাম পবিত্রতা ও মহত্বের সাথে আজও বর্তমান। এই নাম আমাদের ইতিহাসের আমানতদার।

৯–ইসলামের নিজের বিশিষ্ট রূপ ও পরিচয় আছে। এবং তার রুকনসমূহের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী। এসব শব্দাবলীও অর্থহীন নয় বরং এগুলো বাস্তবতার পরিচয়বাহী। ইসলামের একটা হচ্ছে বুনিয়াদ বা ভিত্তি আর অপরটা হচ্ছে ইমারত। একদিকে রয়েছে চিন্তা অপরদিকে রয়েছে বাহ্যিক রূপ ও আকৃতি, যেমন বুনিয়াদ হচ্ছে ঃ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। ইবাদাতের মূল প্রাণসত্তা হচ্ছে নিয়াত—আর নিয়াতের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। নিয়াত যদি বিশুদ্ধ হয় এবং যথাযথ পন্থায় ইবাদাত করা হয় তাহলে সেই ইবাদত আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য। যে ব্যক্তি ওজর ছাড়াই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রদর্শিত পথে সালাত আদায় করে না সে অমুসলিম। যদিও সে দিবারাত্র তার মনগড়া পন্থায় সালাত আদায় করতে থাকে।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নামও এই আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। যা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই নামের যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য লক্ষ্য করে অগণিত লোক এই দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। এই নাম পরিবর্তন করার সকল প্রকার উদ্যোগ আয়োজন এসব বাস্তবতা বদলে দেবারই নামান্তর। এসব এখন পাহাড়ের ন্যায় অনড় এবং বলিষ্ঠভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। নাম বদলে ফেললে বহু সংখ্যক মর্মার্থেরও বিলুপ্তির সম্ভাবনা ও আশংকা রয়েছে। সর্বোপরি নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজনই বা কি ? আমরা কি আল্লাহর পথের ইখওয়ান নই ? আমরা কি মুসলিম নই ? এই পুত-পবিত্র নামের সাথে কার কি স্বার্থ জড়িত আছে ? এমন নয় তো যে, কিছু লোক আমাদের মুসলিম হওয়া এবং ইখওয়ান হওয়াকে আদৌ পছন্দ করে না ? গোটা দুনিয়াও যদি আমাদের সাথে এই বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তথাপি আমরা এই নাম পরিত্যাগ করবো না।

আমরা কখনো এমন কথা বলিনি যে, শুধু আমরাই মুসলমান। আমরা ছাড়া আর কেউ মুসলমান নয়। আমরা কোন দিন কোন সগীরা এমনকি কবিরা গোনায় লিপ্ত মানুষকে কাফের বলিনি। আমরা সহযোগিতা প্রদান করতেও কখনো অস্বীকার করিনি। যখনই আল্লাহর কোন বান্দাহ আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াত বাস্তবায়িত করার আহবান জানিয়েছে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা দান করেছি। তাহলে নাম পরিবর্তনের আসল উদ্দেশ্য কি ? হে আল্লাহ ! তুমিই উত্তমরূপে জান যে, আমরা

www.amarboi.org

তোমারই ভালবাসা, তোমার পথে জিহাদ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম সাধনা এবং তোমার দ্বীনের স্বার্থেই পারস্পরিক সম্প্রীতি সৌহাদ্য ও সৌভ্রাতৃত্বের জন্যই এই নামকে মজবুতভাবে ধারণ করে আছি। আমরা আমাদের মুর্শিদের পবিত্রতা বর্ণনা করি না। আর হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নবী ব্যতীত আর কারো নেতৃত্ব ও অভিভাকত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নই। অতএব হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের ঈমানের হেফাজত করো, আর তোমার সার্বিক সাহায্যের হাত আমাদের জন্য প্রসারিত করে দাও। তুমি ব্যতীত নিশ্চিতই আর কোন উপকারী নেই। সকল প্রকার সাহায্য ও বিজয় শুধু মাত্র তোমার পক্ষ থেকেই লাভ করা যেতে পারে।

১০–সমস্ত বিশ্ববাসী জানে যে, এই নামেই ইখওয়ানের অন্তরে পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের ভাইদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এই নামের পতাকা উত্তোলন করে ইখওয়ান আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে এবং শহীদি কাফেলার খুন এক জন থেকে অন্য জনের ধমনীতে সঞ্চারিত হয়েছে। যে নাম ও পরিচয় তাদেরকে শাহাদাতের গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদা প্রদান করেছে সেই নামকে আমরা কি করে মুছে ফেলতে পারি ?

১১–ইখওয়ানের উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান সুদীর্ঘ ইতিহাস ইখওয়ানের দুশমনদেরকেও তাদের বীরত্ব শৌর্যবীর্য, অনমনীয়তা ও দাওয়াতে হকের পথে অসীম ত্যাগ ও কুরবানীর স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য করে। তারা এই নামের আমানতদার । ইখওয়ানের পবিত্র রক্ত যা ফিলিস্তিনের মাটিকে সিক্ত করেছে তা এই আকীদা বিশ্বাসের গভীর প্রভাবেরই সাক্ষ্য বহন করছে। তা এমন এক কৃতিত্ব যা আমাদের হৃদয় স্পন্দনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সুয়েজের তীরের ভূখন্ড তার সাক্ষ বহন করছে। আমাদের ইতিহাস এই নামের সাথে সাথে এসব কৃতিত্ব দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে। যে নাম পরিচয় নিয়ে আমরা জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তা কি ভুলে যেতে পারি ?

১২–এই নামের কি দোষ ? কোন কোন মানুষ এই নাম শুনামাত্রই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং নানা প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। এখন তো সরকারের দায়িত্বশীলরাও মাঝে মধ্যে বলে থাকেন যে, নির্যাতন ও সন্ত্রাসের সাথে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নূন্যতম কোন সম্পর্কও নেই----। কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে গোটা দলের মাথায় তা চাপিয়ে দেয়ার যুক্তি কোথায় ? প্রতিটি পরিবার সমাজ ও জাতির মধ্যে কি সৎ ও ভুল পথগামী লোক থাকে না ? তাহলে ইখওয়ানে কোন ব্যক্তি বিশেষের ভুল-ত্রুটির দায়-দায়িত্ব গোটা দলের ঘাড়ে চাপানোর অর্থ কি ?

১৩–এই নামের ত্রুটি কোথায় ? এই নাম কি জীবন, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের প্রমাণ বহন করছে না ? এই নাম কি সমস্ত মুসলিম জাহানের দৃষ্টি দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতি আকৃষ্ট করেনি ? যা দীর্ঘ দিন থেকে মানুষ বেমালুম ভুলে আছে ? এই নামই কি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দ্বীনের রাস্তায় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেনি ?

www.amarboi.org

১৪-মানুষ কি তার উৎসের পবিত্রতা এবং মহত আকাংখার জন্য গর্ববোধ করে না ? আমরা কি এই ব্যাপারে আমাদের দায় দায়িত্বের কথা অস্বীকার করে বসবো যে, আমরা সালাফী তো বটে কিন্তু সালফেসালেহীনদের সাথে আমাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ও যোগসূত্র নেই ? আমরা সেই নাম ও পরিচয়েই পরিবর্তন সাধন করে ফেলবো যা যুবকদের অন্তরে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রেরণা উজ্জীবিত করেছে ?

১৫-ইখওয়ান একটা বিরাট সংস্কার কর্মসূচী পেশ করেছে। সেই কর্মসূচীর ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। এই কর্মসূচী খেলাফতে রাশেদার প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির পতাকাবাহী। কাজেই যে-ই এ নামের পরিবর্তন করতে চায় সে মূলত এই কর্মসূচীতে অসন্তুষ্ট নয়। আমরা কি করে তার কথা শুনতে পারি এবং কিভাবে তার নির্দেশ মেনে নিতে পারি ? এমন জঘন্য কাজ আমাদের দ্বারা কস্মিনকালেও হতে পারে না ?

১৬-ইসলামের শত্রুরা যখন এই নাম পরিবর্তনের জন্য অব্যাহতভাবে চাপ সৃষ্টি করে তখন নিশ্চিতই তাদের সম্মুখে এমন সব অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে যাতে মুসলিম সমাজের জন্য কোন কল্যাণ থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা কি নির্বুদ্ধিতা ও উদাসীনতার এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হতে পারি যেখান থেকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অনায়াসেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতে পারে ? আমরা যদি আমাদের শত্রুদের ইচ্ছার আনুগত্য করি তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্য ও দুরাবস্থা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

১৭-বিভিন্ন দলের সফলতার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার নামের ওপর পূর্ণ আস্থা। আস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না এই দলের আহবানকারীগণ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ভাবে তার নামের সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি না করে। নিজেদের দল ও তার কর্মসূচীর ওপর কি আমাদের আস্থা এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, আমরা এর নামই পরিবর্তন করে ফেলবো ? অন্ততপক্ষে তার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা দেয়া আবশ্যক ?

১৮-মিসরের সমস্ত দল এমনকি কোন কোন ইসলামী সংগঠনও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ওপর আক্রমণ করেছে এবং তাদের সম্পর্কে অবান্তর কথাবার্তা ছড়িয়েছে। তারা মনে করেছিল যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুনও প্রত্যুত্তরে তাদের ওপর অনুরূপ হামলা চালাবে। কিন্তু এই দলটি তাদেরকে অতি বড় রকমের শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছে। এই শিক্ষা ছিল তাদের সমালোচনার মোকাবিলায় আমাদের নীরবতা অবলম্বন এবং অন্যায় ও অশ্লীলতার জবাব অন্যায় দ্বারা না দেয়ার নীতি। আমরা মুসলামনদের মধ্যে বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকি। কিছু মনে না করা এবং ক্ষমা করে দেয়ার এই শিক্ষা খুবই কার্যকরী ও ফলপ্রসু। এই দলের নাম একথাই প্রমাণ করে যে, এটা মুসলিমদেরকে সমবেত করে, বিভেদ সৃষ্টি করে না। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে থাকে—প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গভীর

১৯—

www.amarboi.org

মনোনিবেশ সহকারে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। সকলের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে। বস্তুত আমাদের সামনে এতবেশী বড় বড় কাজ রয়েছে যে, এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে নাক গলানোর ফুরসতই আমাদের নেই।

১৯–ধরে নিন, আমরা যদি নাম পরিবর্তন করেই ফেলি তাহলে কেউ কি একথা মেনে নেবে যে, আমরা এখন আর ইখওয়ানুল মুসলিমুন নই। এমন অনেক লোক যারা আন্দোলনের রজ্জু নিজেদের গলদেশ থেকে খুলে ফেলে রেখে চলে গেছে তারা এই নামের সাথে তাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু তাতে তারা লাভবান হয়নি। যারা এই নামের পরিবর্তন আনয়নের অভিলাষী তারা তাদের সম্পর্কচ্ছেদের সত্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে এই হতভাগার দল সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে এবং যেখানে গিয়ে তারা যোগদান করতে চাচ্ছিলো তারাও তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব আমরা যদি নাম পরিবর্তন করেও ফেলি তবুও এই দাবী উত্থাপনকারীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী আমাদের সম্পর্কে থাকবে এক ও অভিন্ন। সমস্ত মানুষ এক বাক্যে যদি এরূপ সাক্ষ্যও প্রদান করে যে, তোমরা ইখওয়ানুল মুসলিমুন নও—তথাপি তা হবে বাস্তব সত্যের অপলাপ মাত্র। কাজেই এমন কাজের পশ্চাতে আমাদের কালক্ষেপনের কি প্রয়োজন যা আমাদের জন্য কোন উপকারিতা লাভের উপলক্ষ হবে না, হতে পারে না। বরং এটাই কি অধিকতর সম্মানজনক নয় যে, আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমুনই থেকে যাই? এটা কোন অহংকার ও অন্ধ অনুসরণের কারণে নয় বরং আত্মসম্মান এবং উত্তরাধিকারের নিরাপত্তা বিধানের প্রেরণায়। আর যদি আমরা তাও করতে না পারি তাহলে আমাদের উপমা হবে এমন নির্বোধ উত্তরাধিকারীদের সাথে যারা তাদের পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকারকে বিনষ্ট করে ফেলে।

www.amarboi.org

ঊনবিংশতম অধ্যায়

বৃটিশ দূতাবাস সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইখওয়ান সরকারের পরামর্শক্রমেই বৃটিশদের সরে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে জামাল আবদুন নাসের ইখওয়ানের ওপর হস্তক্ষেপ করার জন্য আলোচনাকেই অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তার এই চক্রান্ত আদৌ সফলকাম হয়নি। তারপর নাসের একটা অত্যন্ত জঘন্য নাটক রচনা করে অর্থাৎ সে নিজেই তার অনুচরদের সাহায্যে নিজের ওপর আক্রমণ রচনা করায় এবং এই ষড়যন্ত্রের জন্য ইখওয়ানকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে। আমরা সকল প্রকার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র থেকে সর্বদা মুক্ত। এই সত্য এখন সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই তথাকথিত আক্রমণ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে ভেবে দেখার বিষয় ঃ

১-মুহাম্মাদ নাজীব তার সামরিক পদমর্যাদা ও সম্মানের শপথ করে এই সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, "আল মানশিয়ার" ঘটনা একটা বানোয়াট ও মিথ্যা নাটক।

২-সাইয়েদ মুহাম্মাদ আল তিহামীর সাক্ষ্য রোজ আল ইউসুফ সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিলো। উল্লেখিত সাময়িকীর যে ১৯৭৮ সংখ্যা রেফারেন্স হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই নিবন্ধে লেখক দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সি, আই, এ-এর একজন বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছিল।

নাসেরের প্রথম দিকের দু'জন অন্তরংগ সহচর হোসাইন ইসাফেয়ী ও আনোয়ারুস সাদাত মরহুমের সাক্ষ্য ও রেকর্ড বিদ্যমান রয়েছে। এই দুই ব্যক্তির ভাষ্য অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, নাসের তার পরিকল্পনাকে গোপন রাখতো। এমনকি তার ঘনিষ্ট সহযোগীদেরও এর বাতাস পর্যন্ত লাগতে দিতো না। আবদুল লতিফ বাগদাদী তার "আল সামেতুনা ইয়াতাকাল্লামুন" (নীরবরা কথা বলছে) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। হোসাইন আল শাফেয়ীর এই কথাই ছিল যথার্থ যে, জনগণের সম্মুখে যে ভাবে ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ইখওয়ান জামাল আবদুন নাসেরের ওপর গুলি বর্ষণ করেছিলো। আল মানশিয়ার সুবিশাল প্রান্তরে এই গুলি চালানো হয় এবং সরকারী প্রভাবাধীন প্রচার মাধ্যম প্রচারনার জোরে মানুষকে একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, গুলি পরিচালনাকারী ছিল ইখওয়ান।

হোসাইন শাফেয়ীর এই উক্তি আবদুল লতীফ বাগদাদীর বিশ্লেষণকে সমর্থন করে যে, অব্যাহতভাবে যদি এক তরফা প্রচারনা চালানো হয় তাহলে একটা ডাহা মিথ্যাও সত্য বলে প্রতিয়মান হতে থাকে।

৩-মুহতারাম মুর্শিদে আ'ম জানতে পারেন যে, ইখওয়ানের কোন কোন যুবক এমন সব সভায় অংশগ্রহণ করেছে। যেখানে আবদুন নাসেরের বক্তৃতা করার কথা থাকে। তিনি আরো অবহিত হন যে, এই যুবকগণ নাসের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ও

www.amarboi.org

ক্রোধ প্রকাশ করে থাকে। এমনকি নাসেরের ওপর সময় সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে বসারও সম্ভাবনা রয়েছে। মুর্শিদে আ'ম তৎক্ষণাৎ ইউসুফ তালাত শহীদকে ডেকে পাঠান এবং এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে কঠোরভাবে সাবধান করে দেন। ইউসুফ তালাত শহীদ ছিলেন ইখওয়ানের সামরিক শাখার ইনচার্য। মুর্শিদে আ'ম বলেন—আমি এই ধরনের প্রশিক্ষণের ঘোর বিরোধী যার উদ্দেশ্য থাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করা। আমি কোন অবস্থাতেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের ও ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারি না। এরূপ কার্যকলাপের ফলে যদি বিরোধীদের কিংবা নিজেদের যুবকদের রক্তপাতের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে জেনে রাখুন, সকল প্রকার রক্তপাতের দায় দায়িত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবো। পর্যালোচনা কালে এসব বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

৪–এরূপ অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল যে, আমরা মাহমুদ আবদুল লতীফ শহীদকে এই তথাকথিত হামলা পরিচালনার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রেরণ করেছিলাম। এটা একেবারেই অযৌক্তিক কথা। মাহমুদ শহীদ আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তা ঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ না-ওয়াকিফ ছিলেন এবং এ ঘটনা সম্পর্কেও ছিলেন একেবারেই অনবহিত। যদি আমাদেরকে এরূপ কিছু করতে হতো তাহলে আলেকজান্দ্রিয়ার কোন লোককে নিযুক্ত করতাম না কেন। কিংবা যদি মাহমুদ আবদুল লতীফকে দিয়েই এ কাজ করাতে হতো তবে কি কায়রোতে এই কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেতো না? কায়রোতেই তো বিস্তর জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। সেখানে সহজেই নাসেরকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা যেতো।

৫–কোন্ জ্ঞানান্ধ এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে যে, একজন মাত্র নিঃসংগ আক্রমণকারীকে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং তার পশ্চাতে বিকল্প লোক থাকবে না। এ ধরনের হামলার ক্ষেত্রে হামলাকারীর পেছনে মজবুত সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য থাকে হত্যাকারীর নিরাপত্তা বিধান করা এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করা।

৬–পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগে নিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিকিউরিটির লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কি করে আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে পৌছতে সক্ষম হলেন? তারা কি মনে করেছিল যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় তারা বিভিন্ন উপায়ে সামরিক ব্যারাক এবং নৌবহরের ওপর কবজা করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার সামরিক ব্যবস্থা ও নৌবহর সম্পর্কে সরকারের ধারণা ছিল এই যে, কোন বিদেশী শক্তিও তা পদানত করতে পারবে না।

৭–এটা কি অধিকতর বাস্তবসম্মত এবং সহজ হতো না যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় এ কাজ করার জন্য সেখানকার স্থানীয় সুযোগ-সুবিধাকে ব্যবহার করা হতো। কেননা, তারাইতো তাদের শহর সম্পর্কে অধিকতর অবগত ছিল। এবং তারাই ভালভাবে জানতো কোন অঘটন ঘটানোর পর পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কিভাবে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে।

www.amarboi.org

৮–এই অভিনয়ের পরদিন আবদুন নাসের প্রত্যুষে কায়রো অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করছিলো। নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন বুলেট প্রুপ কোর্ট তার খেদমতে এনে হাজির করলে তা দেখে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো এবং বলতে লাগলো এখনতো এই ব্যাপারটি সমাপ্ত হয়ে গেছে। যেন তার জানা ছিল যে, আগের দিন যে নাটক মঞ্চস্ত করা হয়েছে তার সময় ফুরিয়ে গেছে।

৯–আবদুর রাহমান সিন্ধীর কতিপয় অনুসারী যখন মুর্শিদে আ'ম-এর বাড়ীতে আক্রমণ চালায় এবং তাকে পদত্যাগ করতে চাপ দেয় তখন এই ঘটনা ইখওয়ানের জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইখওয়ান মুহাম্মাদ ফারাগলী শহীদ ও সাইদ রামাদানকে আবদুন নাসেরের নিকট প্রেরণ করে। তারা উভয়ে যুগপৎ আবদুন নাসেরের নিকট আবেদন জানায় যে, এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করার অনুমতি যেন সে ইখওয়ানকে দিয়ে দেয়। নাসের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, যা হোক এরপর ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়। হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণের কোন কারণ বাকী থাকলো না। কেননা তখন আমাদের ও নাসেরের মাঝে কোন টানাপোড়েন ও ভুল বুঝাবুঝি ছিল না। এর কিছুদিন পরই যখন আমরা এই বানোয়াট হামলার খবর শুনতে পাই তখন খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

১০–প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জনগণকে অত্যন্ত হাস্যকর সংবাদ শুনানো হয়। পরিবেশিত খবর অনুযায়ী আদম ফৌজি নামক এক ব্যক্তি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রেল সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে কায়রো পৌঁছে। এবং সে জামাল আবদুন নাসেরের খেদমতে সেই রিভলভারটি পেশ করে যা এই ঘটনার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। খবরের বিবরণ অনুযায়ী উল্লেখিত আদম ব্যবহৃত সেই পিস্তলটি কোথাও পড়ে থাকা অবস্থায় পেয়ে যায়। নাসের সাহেব খুশী হয়ে তাকে একশত পাউন্ড পুরস্কার প্রদান করেন। এ খবর শুনেই কি আপনি তা বিশ্বাস করতে পারবেন নাকি একে একটা সাজানো নাটক মনে করে হাসবেন? প্রশ্ন হলো আক্রমণকারী ব্যক্তিকে নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় কিন্তু এই ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রের সন্ধান কেন করেনি? এটা একটা অদ্ভূত ব্যাপার যা নিজে বুঝা কিংবা অপরকে বুঝানো সম্ভব নয়।

১১–আদালত এই অভিযোগ তো আরোপ করে যে, সংশ্লিষ্ট পিস্তল থেকে আটটি গুলি চালানো হয়েছিল যা দেয়ালের ওপর গিয়ে লেগেছিল। কিন্তু তারা না দেয়ালের ওপর এসব গুলির কোন চিহ্ন দেখায় আর না প্রেসিডেন্টের মঞ্চে-এর কোন লক্ষণ ছিল। এমনকি আশেপাশের কোথাও এমন কোন প্রমাণ পেশ করা যায়নি।

১২–সুদানের জনৈক মন্ত্রী এবং আইনবিদ মিষ্টার বদর যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন। কিন্তু তার শরীরে কোন গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিল না। বরং তা ছিল ব্যালকুনির কাঁচ যা তাঁর শরীরে গিয়ে লেগেছিলো।

১৩–এই মোকদ্দমার তদন্ত চলাকালে এও প্রমাণিত হয় যে, হিন্দাভী দুওয়াইর একবার পিস্তল পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন যে কারণে মাহমুদ আল হাওয়াতেকী তাকে

www.amarboi.org

জিজ্ঞেস করেন যে, মুর্শিদে আ'ম যখন কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেন কোন অস্ত্র কারো ওপর অন্যায় হামলা করার জন্য সংগ্রহ না করা হয়। তথাপি তোমরা পিস্তল কেন চাচ্ছো? প্রত্যুত্তরে সে জানায় যে, আমি অনুশীলনের জন্য পিস্তল চাচ্ছি। মাহমুদ হাওয়াতেকী জবাব দিলেন না এই ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে পারছিনে।

১৪–শূন্যে আটবার গুলির আওয়াজ শুনা যায়, যে ব্যক্তিকে এই গুলি চালাতে দেখা গিয়েছিলো সে আজও বেঁচে আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত রয়েছে। গুলি বর্ষিত হওয়ার সময় এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলেছিলো তুমি যেখানে আঘাত হানছো তা তোমার লক্ষ্য বস্তু নয়। তারপর সেই চিৎকারকারী এমনভাবে গা ঢাকা দেয় যে, আজ পর্যন্তও আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদি সে আত্মপ্রকাশ করতো তাহলে হয়তো এই ষড়যন্ত্রের রহস্য উদঘাটিত হতো।

১৫–নাসের সাহেবের পকেটে একটা বিশেষ কলম ছিল। যাতে রক্ত বর্ণের কালি ভর্তি ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে কলমটি কে ভেংগে ফেলেছিল? নাসের সাহেবকে কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তথাপি জনসাধারণ দেখতে পেয়েছিল যেন নাসেরের বক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আজ পর্যন্তও এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয়া হয়নি যে, কোন আঘাত ছাড়াই রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণ কি ছিল?

১৬–এই নাটক চলাকালে হিন্দাভীর দুওয়াইরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে মৃত্যু দন্ড প্রদান করা হয়। যখন তাকে ফাঁসির মঞ্চে উঠনো হচ্ছিলো তখন সেখানে উপস্থিত সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে সে বলেছিল যে, এই কৌতুকপ্রদ অভিনয়ের পরিসমাপ্তি আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করলো।

১৭–সামরিক বিপ্লবী কাউন্সিলের প্রধানের ওপর প্রাণনাশী আক্রমণ পরিচালিত হলো অথচ আক্রমণকারী সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের এ সম্পর্কে কিছুই জানা থাকবে না তা কি করে সম্ভব? এই আক্রমণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মোকাবিলার কোন প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইখওয়ানের পক্ষ থেকে গৃহীত হয়নি। সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধি কি একথা মেনে নিতে পারে যে, কোন সংগঠন এতটা অসংগঠিত ও বুদ্ধি-বিবেক শূন্য হবে? তদন্তকালীন সময়ে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ইউসুফ তালাত শহীদ ইনচার্জ স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ইবরাহীমুত তীব শহীদ, ইনচার্জ স্পেশাল ব্রাঞ্চ, কায়রো শাখা—এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে ছিল একেবারেই অনবহিত। তারা এই ঘটনার খবর রেডিওর মাধ্যমে জানতে পারেন।

১৮–হিন্দাভী দুওয়াইর এই মিথ্যা মামলার বলির পাঁঠা হন। এই জালিমরা নাসেরের সর্বজন স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই হতভাগাকে ফাঁসির কাষ্ঠে চড়িয়ে দেয়। মিসরীয় জনগণের অভ্যাস হলো তারা এমন ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে যার সম্বন্ধে তারা বুঝতে পারে যে, তার ওপর জুলুম হয়েছে। এই নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল যে, জামাল আবদুন নাসেরের প্রাণনাশের জন্য সুগভীর চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হচ্ছে।

www.amarboi.org

ইংরেজদের প্রতি আমাদের ঘৃণার কারণ

মানুষের মধ্যে ইখওয়ানের বড় দুশমন ইংরেজ। ইখওয়ানও তাদেরকে নিজেদের বড় শত্রু মনে করে। এই বিষয়টি শুধু কোন আবেগ অনুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিভিন্ন জাতির জীবনে নানা প্রকার কার্যকারণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপলক্ষ হয়ে থাকে। ইখওয়ান ও ইংরেজদের মধ্যেকার এই পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিনা কারণে নয়। ইখওয়ানকে যদি কোন বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং তজ্জন্য কোথাও থেকে সাহায্য সহযোগিতা চাওয়ার প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলে ইংরেজই হবে সর্বশেষ জাতি যাদের সম্পর্কে আমরা চিন্তা করে দেখবো। বরং আমি বলতে চাই যে, ইংরেজদের নিকট থেকে কোন সাহায্য-সহায়তা লাভের প্রত্যাশা করার প্রসংগটা আদৌ কোন আলোচনার ব্যাপারই নয়। আমার এই মনোভাব পোষণ করার কয়েকটি কারণ আছে ঃ

১–এ জাতি আমাদের দেশের ওপর প্রায় সত্তর বছর ধরে তাদের ঔপনিবেশিক নীতি চাপিয়ে রেখেছে। এই সময়ে তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে ইসলামের বাহ্যিক দিকগুলোকে আঘাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে রেখেছে। এই ঔপনিবেশিক শক্তি মিসরের দ্বীনি পরিবেশকে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তবে আল্লাহর শোকর এবং এই কৃতিত্ব তারই যে, তিনি ইখওয়ানের আন্দোলনের সাহায্যে এই মুসলিম রাষ্ট্রটিকে গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন যা ইংরেজরা খনন করে রেখেছিল। অন্যথায় অলসতা ও উদাসীনতার ব্যাধিতে আক্রান্ত মুসলিমরা সেই গর্তে পতিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল।

২–এই ইংরেজ জাতিই কুখ্যাত বেলফুর চুক্তির সাহায্যে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের পিতৃ ভূমি বলে ঘোষণা করে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশ্বে বিশাল ভূখন্ড ছিল। কিন্তু এ জাতির ইসলাম বৈরিতা এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাবই ছিল মূল কারণ, যে জন্য তারা ফিলিস্তিনকেই এই উদ্দেশ্য হাসিলের উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত করে।

৩–তারাই ফিলিস্তিনের মুসলিমদেরকে সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে ইহুদীদেরকে পুরোপুরি সশস্ত্র বানিয়ে দেয়। ফলে ফিলিস্তিনের মাটিতে ইহুদীদের হাতে বার বার ব্যাপক মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়। দীর ইয়াসিনের মর্মান্তিক গণহত্যার কথা কেউ কি ভুলে যেতে পারে? এই জঘন্য ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডে ইংরেজদের পর আমেরিকানরা তাদের থেকেও অধিক নির্লজ্জ ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষের ক্ষমতা কতটুকু? সে তো বাতাসের একটি প্রবাহ বরং পানির একটি বুদ্বুদ মাত্র। তথাপি জুলুম-নির্যাতন চালাতে উদ্যত হলে আল্লাহ তায়ালার ভয়ভীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েই তা করতে প্রয়াস পেয়ে থাকে।

শহীদ ইবরাহীম আত তীব

শহীদ ইবরাহীম আত তীব পেশায় ছিলেন একজন আইনজীবি। অত্যন্ত চরিত্রবান, মহাপ্রাণ এবং দ্বীনের একনিষ্ঠ সৈনিক। তিনি ইখওয়ানের কায়রোস্থ

www.amarboi.org

সামরিক শাখার দায়িত্বশীল ছিলেন। আমরা এই সংগঠন স্থাপন করে ছিলাম ইংরেজ আধিপত্য ও ইহুদী সম্প্রসারণবাদের মোকাবিলা করার জন্য। এটা কোন গোপনীয় বিষয় নয় বরং আমরা আজও বলে থাকি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেয়ার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত। আর ইহা জীবনের এমন এক মহৎ উদ্দেশ্য যা থেকে অধিকতর গৌরবজনক অপর কোন লক্ষ্য হতে পারে না। আমি ইবরাহীম আত তীব শহীদকে খুব ভাল করেই জানি। তিনি কোন অপরাধে জড়িত কিংবা কোন হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আদৌ কোন দিন চিন্তাই করেননি। এটা ছিল তার ভাগ্যলিপি যে, নাসের কর্তৃক তার বিরুদ্ধে সাজানো এই মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়ে তিনি শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করবেন। আমরা ইতিপূর্বে যে নাটকের উল্লেখ করে এসেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে শহীদকে মৃত্যুর শাস্তি প্রদান করা হয়। অন্যান্য শহীদদের ন্যায় এই নিষ্পাপ রক্তপাতের সম্পূর্ণ দায় দায়িত্বও নাসের এবং তার অন্যান্য সহযোগীদের ওপরই বর্তায়। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ হাশরের দিন তার ন্যায় ও পক্ষপাত মুক্ত ফায়সালা ঘোষণা করবেন।

শহীদ হিন্দাভী দুওয়াইর

শহীদ হিন্দাভী দুওয়াইরের ব্যাপারে বলতে হয়—তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবেগ প্রবণ যুবক। কোন ঘটনা শোনা মাত্রই তিনি আবেগ আপ্লুত ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। তাকেও এই ষড়যন্ত্রের জালে আটকানো হয়েছিল। বেচারার সরলতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলো যে, ইখওয়ানের হাই কমান্ড এ ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছেন। এমন সবলোক যাদের ব্যাপারে হিন্দাভী দুওয়াইর-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা ইখওয়ানের নিবেদিত প্রাণ কর্মী তাদেরকেও এই ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। হিন্দাভী দুওয়াইরকে সাথে নিয়ে এক ব্যক্তি এই ঘটনার একদিন পূর্বে নাসেরের বাড়ীতে গিয়ে উপনীত হন। সে ব্যক্তি আজও জীবিত আছে। যদিও সুদীর্ঘ দিনের ব্যধি তাকে তার ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই গৃহবন্দী করে রেখেছে। হিন্দাভী দুওয়াইর ঘুণাক্ষরেও জানতো না যে, এটা একটা সাজানো নাটক।

আমার নিকট যদি আরো অতিরিক্ত কিছু তথ্য প্রমাণ থাকতো তাহলে আমি আরও কয়েকটি নাম পেশ করতে পারতাম। যাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তারাও এই চক্রান্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু আমি উপযুক্ত দলীল প্রমাণ ব্যতীত কারো বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কোন অভিযোগ পেশ করার পক্ষপাতি নই। শোনা কথার ওপর না আমি বিশ্বাসও করি আর না তার ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও সমীচিন মনে করি।

শহীদ আবদুল কাদের আওদার চিঠি

কোন কোন লোক জিজ্ঞেস করে থাকে যে, এমন কি অজুহাত ছিল যার ভিত্তিতে আবদুল কাদের আওদা শহীদ এই মর্মে আবদুন নাসেরের নিকট চিঠি লিখেছিলেন

www.amarboi.org

যাতে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, সে যেন ইখওয়ানের বিশেষ ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করে দিক এবং ইখওয়ানের নিকট যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে তাও নিয়ে নিক------- আমি আমার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই। এমন কোন পত্র সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। এ সম্পর্কে অন্যরা যেমন রেডিও মারফত খবর শুনতে পেয়েছিল আমিও তেমনি রেডিও মারফতই জানতে পেরেছিলাম। ধরা যাক শহীদ বাস্তবিকই এরূপ চিঠি লিখেছিলেন। সে ক্ষেত্রে আমার নিকট এর মমার্থ এই যে, তিনি ইখওয়ানের পক্ষ থেকে সার্বিক সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং নাসেরকে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করতে চাচ্ছিলেন যে, ইখওয়ানের পক্ষ থেকে তার জীবনের জন্য কোন আশংকা নেই। আর কোন্ পরিস্থিতিতে কেন এই পত্র লিখা হয়েছিল, তাও তো কেউ জানে না। আবদুল কাদের আওদা শহীদ সকল উত্তেজনা ও অসন্তোষ দূর করে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করছিলেন।

সামরিক কারাগারে ইখওয়ানের ওপর যে অমানবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছিলো জামাল আবদুন নাসের সে সম্পর্কে সম্যকরূপে জ্ঞাত ছিলেন। সে সি আই ডি এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওপরও তার একান্ত গুপ্তচর নিয়োগ করে রেখেছিলো। তাই এই গোয়েন্দা সংস্থা মিসরের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে সকল ছোট বড় কথা তার সমীপে এনে উপস্থাপন করতে থাকতো।

হে দিব্য দৃষ্টির অধিকারীগণ !
শক্তির নেশা বিপজ্জনক

সামরিক কয়েদখানায় যা কিছু ঘটতো মিলিটারী পুলিশের প্রধান আহমদ আনোয়ার তা নিজে চোখে দেখতেন। বিপ্লবী কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য আবদুল হাকিম আমেরও বার বার সেই কয়েদখানার পরিদর্শনে যেতেন। আমরা আজ পর্যন্তও ভুলতে পারিনি যে, একবার আহমদ আনোয়ার জঙ্গী কয়েদখানার দারোগা হামজা আল বুয়ুনিকে হাজার হাজার ইখওয়ান ও সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বলেন হে হামজা! এদেরকে খুব শিক্ষা দাও ওদের হাড্ডি গোশত একাকার করে দাও এবং এ কাজ ঢোল পিটিয়ে করো। হামজা আল বুয়ুনি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে কুর্ণিশ করে জবাব দেন। জনাব ! তাই হবে !

সামরিক বন্দীশালায় আমাদের ওপর যে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য শুধু শাস্তি প্রদান করাই ছিল না। বরং আমাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো। কারা কর্মকর্তাদের মনে অপমান ও লাঞ্ছনার চিন্তা আপনা থেকে আসেনি। তারা হয়তো কঠোরতা আরোপ করাকেই যথেষ্ট মনে করতো কিন্তু এই ভেবে যে স্বীয় প্রতিপক্ষকে অপমানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে হবে। এটা এমন এক ব্যক্তির উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি যে স্বয়ং অপমান ভোগ করেছিল। ফলে সে আমাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যে অপমাণিত ব্যক্তি প্রতিটি সম্মানিত মানুষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়, এরূপ নীচাশয় মানুষের হাতে ক্ষমতা ও প্রভাব কুক্ষিগত হলে তার

www.amarboi.org

প্রতিশোধ দাবানল থেকে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বাঁচতে পারে না। তার অহং সম্মানিতদের লাঞ্ছিত করে তৃপ্তি পায়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে, যে আচরণ আমাদের সাথে করা হয়েছে তা কোন অদৃশ্য হস্ত পুরস্কার ও সম্মানী দিয়ে করিয়েছিল না এর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ লুকায়িত ছিল। বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমার কলম তা লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম।

ইখওয়ানের ওপর নির্যাতন চালানোর পুরস্কার

কেউ কেউ বলে, জেলখানায় যা কিছু করা হয়েছে আবদুন নাসের সে ব্যাপারে ছিল একেবারেই অনবহিত। আমি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। যে ব্যক্তি আবদুন নাসেরকে জানে তার খুব ভালভাবেই জানা থাকার কথা যে, মিসরে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে সে উত্তমরূপে অবগতছিল । সামরিক কয়েদখানায় সে যা কিছু করিয়েছে তা সে বুঝে শুনে ও সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায়ই করিয়েছে এবং এ কারণেই সে আবদুন নাসের হয়েছে। একথাও মনে রাখা দরকার যে, ইখওয়ানকে নির্যাতনের শিকার ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা আইনের দৃষ্টিতে ছিল বড় রকমের অপরাধ এবং যেসব অফিসার এই অপরাধের পরিণাম ও পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত তারা এ ধরনের কাজের দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু এখানে অবস্থা ছিল এই যে, এসব অফিসারকে পাকা পোক্ত নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল যে, এই অপরাধে তাদেরকে কিছুই বলা হবে না শুধু তাই নয় তাদেরকে অনেক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হবে। এই গ্যারান্টিও দেয়া হয়েছিল স্বয়ং নাসের সাহেবের পক্ষ থেকেই। এমনকি কার্যত সেই লোকদেরকে পুরস্কার প্রদান করাও হয়েছিল।

এই ব্যক্তিদেরকে যেসব আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হতো তার বিশেষ নাম দেয়া হয়েছিল, সেই নাম ছিল "শাস্তিদানের বিনিময়"। এসব টাকা কড়ি কে খরচ করতো ? এবং সামরিক বাজেটের কোন খাতে তা দেখানো হতো। জামাল আবদুন নাসের নির্যাতনের বিষদ বিবরণ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। তিনি তো ছিলেন রাষ্ট্রের কর্ণধার। সামরিক কয়েদখানা সম্পর্কে তো মিসরের সর্বস্তরের জনসাধারণ সম্যকরূপে ওয়াকিফহাল ছিল। এই জেলখানার নাম শুনা মাত্রই সকল মিসরবাসীর অন্তরে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার ঝড় বয়ে যেতো। এমনকি নাসেরের নিকটতম সাথীও এ কারাগারের নাম শুনে কেঁপে উঠতো যে, যদি কখনো তাকে এরূপ ভাগ্য বরণ করতে হয় এবং এই জিন্দানখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তার জীবনের কি করুন ও মর্মান্তিক পরিণতি হবে। সাথে সাথে একথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এসব নির্যাতনের টেপ ও ফিল্ম তৈরী করা হতো যা নাসেরের খেদমতে পেশ করতে হতো। এবং সে অতীব আগ্রহ ভরে তা শুনতো ও দেখতো এবং মহা উল্লাসে ফেটে পড়তো।

বাদী নিজেই বিচারক

ইখওয়ানের বিরুদ্ধে সাজানো মামলার মধ্যে সর্বপ্রথম মিথ্যা ছিল এই যে, তারা সরকার উৎখাত করতে চায়। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিচার প্রার্থী এবং বিচারক

www.amarboi.org

ছিল স্বয়ং সরকার আর অভিযুক্ত ও আসামী ইখওয়ান। প্রচলিত মানব রচিত কিংবা আসমানী কোন আইনের মধ্যে এমন কথার স্বীকৃতি রয়েছে যে, বাদী নিজেই বিবাদীর ওপর ফায়সালা প্রদান ও ডিক্রী জারী করবে ? এই প্রশ্নের জবাব তো সর্বজনবিদিত। সাথে সাথে আইনের একটা সাধারণ মূলনীতি ইহাও যে, অপরাধীর নিকট থেকে যে জবান বন্দী গ্রহণ করা হবে তা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এবং কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ না করেই তার ইচ্ছানুযায়ী লাভ করতে হবে।

আপনি বিস্ময়ে হতবাক হবেন যে, এই তথাকথিত আদালতের সম্মুখে ইখওয়ানকে পেশ করা হতো। তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীও পেশ করা হতো। আদালতে আনীত আহত ইখওয়ানদের ক্ষত স্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়তে থাকতো। এবং নির্যাতনের সুস্পষ্ট চিহ্নসমূহ তাদের শরীরে দেখা যেতো। এমতাবস্থায় এই মনগড়া স্বীকারোক্তিসমূহকে ভিত্তি করে রায় প্রদান করা হতো। আফসোস ! বিষয়টি যদি এখানেই শেষ হতো ! একটু সাহস করে যদি কোন কয়েদীকে আদালতে আনয়নের পর স্বীকৃতি প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করতো তখন আদালত পুনরায় তাকে কারাগারে ফেরত পাঠাতো যেন আরো নির্যাতনের শিকার বানিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি সমর্থন করতে তাকে বাধ্য করা হয়।

জামাল সালেমের পরিণতি

জামাল সালেম যিনি তথাকথিত এসব আদালতের প্রধান ছিলেন। তিনি আসামীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ও কথায় কথায় তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আদালতের অপর দু'জন সদস্য এই বিচার প্রহসন চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ চুপচাপ বসে থাকতেন। এই জামাল সালেমের পরিণতিও হয়েছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। সামরিক উর্দি খুলে এখন তিনি সাদা বেসামরিক পোশাক পরিধান করেছেন। পরেছেন গেরুয়া রংগের আবা ও আলখেল্লা। দিনের অধিকাংশ সময় মসজিদে ও সাইয়েদা যয়নাবে অতিবাহিত করেন।

সে কি সত্যই তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ছিল। তিনি কি তার কৃত পাপরাশী থেকে তাওবা করে নিয়েছিলেন। নিসন্দেহে আল্লাহর রহমত অতিব সুবিস্তৃত। যে কেউই তার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইবে সে কোন সংকীর্ণতার শিকার হবে না। অবশ্য তার তাওবা হতে হবে খাঁটি ও অকৃত্রিম। এরূপ তাওবাতে অসংখ্য কবিরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার তুলনায় কোন গুনাহই বড় নয়। আমি এ ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের গুণাবলী বর্ণনা করে তাদেরকে স্মরণ করো। আমাদের উচিত তাদেরকে আল্লাহর ইনসাফের ওপর ছেড়ে দেয়া। কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ন্যায় ও সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানকারী।

---

www.amarboi.org

বিংশতম অধ্যায়

ইখওয়ানের প্রথম ও দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম উভয়েই অতীব সৎ ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম তো অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উস্তাদ হাসান আল হুদাইবি ইখওয়ানের নেতৃত্বের হক আদায় করার পর আল্লাহর রহমতের ছায়ায় চলে যান। গুরুদায়িত্বসমূহ সামাল দেয়া, আমানত আদায় করা, ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রদর্শন করা এবং সকল বিপদাপদকে উত্তম প্রতিদান লাভের প্রত্যাশায় অসীম সাহসের সাথে বরদাশত করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম মরহুমের জীবনে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তার প্রিয়তম বান্দাগণের সারিতে শামিল করুন এবং উত্তম মর্যাদায় বিভূষিত করুন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে মু'মিনদের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষণের মমার্থ ছিল এই যে, মু'মিন বান্দার ইজ্জাত ও সম্মান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কা'বা শরীফ এবং মসজিদে হারাম-এর গুরুত্ব অপেক্ষাও বেশী। ইখওয়ান নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের আহকামের পুরোপুরি অনুসারী। ইখওয়ানের দৃষ্টিতে কোন মুসলিমের ইজ্জাত-আবরু হালাল করা কিংবা তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও নির্যাতনের হাত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। কেননা আমরা প্রকৃতপক্ষে সালফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি আর সালফে সালেহীন কোন মুসলিমের রক্তপাত বৈধ বলে স্বীকার করেননি। এমনকি সে চুরি কিংবা মদ্যপান করলেও না। ইখওয়ানের নিকট তাদের দ্বীনের ব্যাপারে দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম একাধারে দ্বীন ও এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা উভয়টিই। আমাদের এই মনোভাবই দ্বীনের দুশমনদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে। তারা আমাদের ওপর এমন সব ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করে থাকে যা কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কল্পনার জগতেও কখনো স্থান লাভ করতে পারে না। দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার যন্ত্র ও গণমাধ্যমগুলো এই শ্রেণীর লোকদেরই কুক্ষিগত। এগুলো সদা সর্বদাই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ইখওয়ানের নেতৃত্ব

মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবি মৃত্যু বরণ করলেন। ইখওয়ান আইনগতভাবে ছিল নিষিদ্ধ। ইখওয়ান আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে এবং নিজেদের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসের অনুসরণও করে থাকে। এই ইখওয়ানের সবাই মিলে নতুন মুর্শিদে আ'ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, কর্মপরিষদের সদস্যগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁকেই মুর্শিদে আ'ম বানানো হোক। সংগঠন করা যদিও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ

www.amarboi.org

কিন্তু ইখওয়ান তো তাদের ছোট বড় সকল ব্যাপারেই মুর্শিদে আ'মের শরনাপন্ন হয়ে থাকে।

ঘটনাক্রমে তখন কর্মপরিষদের সমস্ত সদস্যের মধ্যে আমিই ছিলাম বয়োজ্যেষ্ঠ। অতএব এই গুরু দায়িত্ব আমার ওপরই অর্পণ করা হয়। যদিও সরকার আইনগত-ভাবে আমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু কার্যত সরকারও আমাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। সরকারও আমাকে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা বলে মনে করে এবং এই পর্যায়ে রেখেই আমার সাথে দেখা সাক্ষাত করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনাও করে। আমরা তাদেরকে এমন সুযোগ কখনো দেইনি যাতে তারা আমাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার আইনগত বৈধতা পেতে পারে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আজও যদি তাদের হাতে এমন কোন সুযোগ এসে যায় তাহলে তারা আমাদেরকে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়ে দেবে। সংবাদপত্রের কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মাঝে মধ্যে এরূপ অনেক কথা বলাবলী করে যে, কার্যত ইখওয়ান মিসরে এখনও বিদ্যমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু পত্রিকা আমার সৌজন্য সাক্ষাতকার গ্রহণের ব্যবস্থাও করে।

কাকে বিশ্বাস করবেন

এই পরিস্থিতিকে আমরাও মেনে নিয়েছি এবং অনেক ক্ষেত্রে আমি দেশ ও জাতির স্বার্থে কোন কোন ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, বাহ্যিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইখওয়ানের সংগঠন এখনো রয়েছে এবং দেশে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রায়ই আমার সাথে মত বিনিময় করতে আসেন। যখনই আমার সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ করার প্রয়োজন পড়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছোট বড় সর্বস্তরের কর্মচারীদের জানা আছে যে, তখনই আমি সাক্ষাতকার প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি না। আমি কখনো এমন হঠকারিতাও প্রদর্শন করিনি যে, তাদেরকেই আমার নিকট আসতে হবে বরং আমি তাদেরকে আগাম জানিয়ে রেখেছি। দেশ ও জাতির কল্যাণ জড়িত রয়েছে এমন বিষয়ে আমি নিজেই তাদের নিকট যাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছি। আমাকে শুধু টেলিফোন মারফত অবগত করলেই চলবে, আমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে এসে পৌঁছে যাব। অবশ্য মাঝে মধ্যে আমার শারীরিক দুর্বলতার কারণে কিংবা কোন বিশেষ দিবস উপলক্ষে কোন কোন কর্মকর্তা আমার এখানেও এসে যান। তাদের এই আগমনে আমি যারপরনেই কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি। আমার ওপর আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে আমি কখনো কোন হাংগামা করার মত অবস্থানে গিয়ে উপনিত হইনি। তবে হাঁ যদি আমি কখনো কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি এবং তা পূরণ করার জন্য আমাকে যেতে হয়। আমি সবসময় শান্তি ও নিরপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যেই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বর্তমান কর্মচারীবৃন্দ এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করে থাকেন। যাদিয়াতুহুল হামরা নামক স্থানে সংঘটিত দুর্ঘটনার ব্যাপারে হাসান আবু পাশা নিজে আমার ভূমিকার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন তাতে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক কোন

www.amarboi.org

অপতৎপরতার সাথে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া সন্ত্রাসী কোন সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের পৃষ্ঠপোষকতায় কখনো বেড়ে উঠতে পারে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আভ্যন্তরীন শান্তি-শৃংখলা বিধানকারী এক নম্বর দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তার মুখ থেকেই এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে। অথচ ইখওয়ানের দুশমনদের হাতে তাদের ছবি অতিরঞ্জিত হয়ে বড় ভয়ানকভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এক্ষণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, না প্রচার মাধ্যমগুলোর ওপর ?

আবেগের ওপর যুক্তির বিজয়

এ ব্যাপারে আমার স্থির সংকল্প ছিল যে, যখনই "আদ দাওয়া" সাময়িকীতে সম্পাদকীয় লিখবো তখন কোন লোকের ওপর ব্যক্তিগতভাবে কিছুতেই আক্রমণ করবো না। এই নীতি অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। লিখনী পরিচালনার সময় আমি বাস্তবসম্মত ও তথ্য সমৃদ্ধ লেখার প্রতি পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আমি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানিয়ে থাকি যেন তারা তাদের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেষ্ট হয়। ১৯৮১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যখন বিভিন্ন রাজনৈতকি দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করা হয় তখন সেখানে আমরা পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করি। এক দলের একজন সদস্য আমাকে বললো যে, আপনি আমাদের দেশের যুব সমাজকে একেবারে নিস্তেজ ও বলবীর্যহীন বানিয়ে ফেলেছেন এবং তাদের শৌর্যবীর্য ও আগ্রহ উদ্দীপনাকে ফ্রিজের মধ্যে ফেলে একেবারে বরফ বানিয়ে ছেড়েছেন।

আমি জানতাম না যে, একথাগুলো দ্বারা ভদ্রলোক আমার সুনাম বর্ণনা করছিল, না দুর্ণাম। যা হোক আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম এবং শুধুমাত্র এতটুকু বললাম যে, এর অর্থ এই যে আমার কথার কিছুটা প্রভাব রয়েছে। এত কিছুর পরও এবং এই দুর্দিনেও সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের হামলা থেকে আমি নিরাপদ থাকতে পারিনি। সেই সন্ত্রাসবাদিতার অভিযোগ যদিও তখন এই হামলা ছিল কিছুটা নমনীয়। তথাপি ইনসাফের দাবী হচ্ছে, সাদাতের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও এ বিষয়টি বর্ণনা করা দরকার যে, তিনি ইখওয়ানকে কিছুটা স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমাদের সাময়িকী "আদ দাওয়া"ও এই আমলে নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে। এমনকি দ্বীনি পরিবেশে আমরা সারা দেশে কিছু কিছু সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের সুযোগ লাভ করি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের ওপর রহম করুন এবং সাদাতের ওপরও। তাকেও ক্ষমা করে দিন আর আমাকেও ক্ষমা করে দিন।

আপন বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত

সম্মানিত উস্তাদ আল হুদাইবির জীবদ্দশায় এবং তার ইনতিকালের পর কিছু কিছু ইসলামী সংগঠন ইখওয়ানের ওপর কঠোর হামলা করতো। মনে হতো যে, ইখওয়ানের ওপর হামলা করা তাদের উদ্দেশ্য। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি এবং শুধু মাত্র কুরআন নিয়ে বসে গিয়েছি। একবার যখন কোন এক ইখওয়ানী ভাই আমার সম্মুখে এরূপ নিষ্ঠুর হামলার অভিযোগ করে তখন আমি অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তভাবে জবাব দিলাম যে, আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালার শোকর যে, আমাদের এই ভাইয়েরা আমাদের প্রতি ইনসাফ করেছেন। তারা বলে যে, আমরা শুধু কুরআন অবলম্বন করেছি। খুবই ভাল কথা কুরআনের মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই রয়েছে। শান্তির কথাও আছে আবার জিহাদের কথাও। তারা সম্ভবত দোষারোপ করার জন্যই এ মন্তব্য করেছে। কিন্তু তারা যদি তাদের কথার অর্থ হৃদয়ংগম করতে পারতো তাহলে দেখতো যে, এটা আমাদের জন্য একটা সনদ। আমরা এ কথা অস্বীকার করি না যে, আমরা কুরআন মজিদকে খুব মজবুত ভাবে ধারণ করেছি। আর সার্থকতা এতেই নিহিত। যদি সমালোচকদের মুখেই মহৎ কর্মের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। আমাদের তুখোড় সমালোচকগণ এটা মেনে নিয়েছেন যে, আমরা কুরআনকেই আমাদের বুকে ধারণ করে রেখেছি।

আপনাদের আনন্দদানের জন্য এও জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের এসব ভাই যারা আমাদের ওপর কুফরের অভিযোগ আরোপ করেন এবং জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অপবাদ দেন তাদের মামলা মোকদ্দমা ইখওয়ানী আইনজীবিগণই আদালতে লড়েছেন এবং বিনা পারিশ্রমিকেই এই খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কারো নিকট থেকে আমরা প্রতিদানের আশা যেমন করি না তেমনি বাহবাও পেতে চাই না। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাবো।

আমাদের সামনে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপানেই আমরা সর্বদা এগিয়ে চলি। পথিমধ্যে যদি কোন কাঁটা আমাদের পায়ে বিধেঁ কিংবা কোন পাথরের চাঁই আমাদের গতিরোধ করে বসে তাতে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে যাই না। আমরা কোন না কোন পন্থা উদ্ভাবন করে আমাদের লক্ষ্যপানে অবিরাম চলতে থাকি। ওপরে যে সমস্ত দলের কথা আলোচনা করা হয়েছে তাদেরকে নিকট থেকে দেখেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই বলতে পারে যে, এসব দল একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই গঠন করা হয়েছিল। আর সেই উদ্দেশ্যও এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, ইখওয়ানের ওপর একটি নতুন ফ্রন্ট থেকে নতুনভাবে আক্রমণ করতে হবে।

তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন

অমুসলিমদের সহযোগিতায় এবং অ-ইসলামী পন্থায় ইখওয়ানের ওপর হামলা করানোর পর আর একটা পন্থাই অবশিষ্ট ছিল অর্থাৎ ইসলামী নামে ইখওয়ানের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। সুতরাং একটা অদ্ভূত প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিমদের ওপর মুসলিমরাই আক্রমণ করছিল। আর দুশমনরা উল্লসিত ছিল এই ভেবে যে, যে পক্ষই পরাজিত হোক না কেন তাতে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন যে, পাল্টা আক্রমণ করার পরিবর্তে আমরা নীরবতা অবলম্বন করেছি। এতে দুশমনরা ছটফট করেছে এবং পরিণামে ইসলামের মুখোশ ধারণ করে আমাদের ওপর আক্রমণ রচনাকারী এসব দলের অস্তিত্বই ক্রমশ মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত এমনও পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, তাদের দলের সদস্যগণ একে অপরের বিরুদ্ধে মারমুখি হয়ে উঠেছে। আর এভাবে প্রত্যেক মানুষ তার আপন কর্মফল ভোগ করে থাকে।

www.amarboi.org

একবিংশতম অধ্যায়

এখন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত মিসরের বাইরে বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে অব্যাহতভাবে। এমনকি বিশ্ববাসী আমাকে সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি ও সেমিনার সিম্পোজিয়ামে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ক্রমাগতভাবে। আমার শারীরিক অবস্থা এখন সফরের কষ্ট সহ্য করার উপযুক্ত নয়। বার্ধক্য আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে তথাপি আমি এসব সম্মেলনে হাজির হচ্ছি। এসব ভ্রমণের সময় ভ্রাতৃপ্রতীম ইবরাহীম শারফ আমার সফর সংগী হিসেবে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। কারণ তিনি সর্বদা আমার বিশ্রাম ও আরামের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখেন। এসব সম্মেলনে আমি যা দেখেছি তাতে আমার মন খুশীতে ভরে গেছে। ইসলামী দাওয়াতের সম্যক ধারণা ও বাস্তব প্রেরণা যুব সমাজের অন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং সর্বদাই আমি যুবকদেরকে দেখতে পেয়েছি। তারা তাদের মিসরীয় ভাইদেরকে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দ্বারা সিক্ত করেছে। এসব সম্মেলনে সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করে থাকে। এভাবে সর্বত্র মুসলিম অপর মুসলিম ভাইদের সাথে হৃদ্যতা ও নৈকট্য সৃষ্টি করে নেয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মস্তবড় এক নিয়ামত।

কৌশলের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষা অত্যাবশ্যক

"আদ দাওয়া" সাময়িকী যোগসূত্র স্থাপন এবং ঘনিষ্টতা সৃষ্টির উত্তম মাধ্যম মিসরে এই সাময়িকীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর যখন তা ইউরোপ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তখন তা পাওয়ার জন্য সকল জায়গা থেকে গ্রাহকগণ চাঁদা পাঠাতে থাকেন। সুদূর নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান মোটকথা প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ স্বতঃস্ফূতভাবে এর গ্রাহক হয়। সাময়িকীটির অফিসে পেশাজীবি সাংবাদিক এবং বিশেষ বুৎপত্তি সম্পন্ন সাহিত্যিক ও যোগ্য সম্পাদক কোনটাই বড় একটা ছিল না। সাময়িকীটির সম্পাদনা, প্রকাশনা ও পরিচালনা এবং পরিবেশনার সার্বিক দায়-দায়িত্ব ছিল যুবকদের ওপর। যারা অতি সম্প্রতি গণসংযোগ বিষয়ক কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করে বেরিয়ে এসেছে কিংবা শিক্ষারত আছে। লক্ষ্য অর্জনের একাগ্রতার ফলে এসব কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে যা দেখে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা চোখ কপালে তুলতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় যখন পত্রিকা আমাদের হাতে এসে পৌছতো তখন আমরা সকলে একত্রে মিলে বসতাম এবং তাতে থেকে যাওয়া ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করতাম। আপনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন যে, "আদ দাওয়া"ই এ ধরনের একমাত্র পত্রিকা যার কোন নিয়মিত প্রুপ রিডার ছিল না। কিন্তু তারপরও প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। মিসরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্ব পর্যন্ত পত্রিকাটি কায়রো থেকেই প্রকাশিত হতো। এরপর অষ্ট্রিয়া থেকে প্রকাশ হতে থাকে।

www.amarboi.org

কারাগার থেকে আমাদের মুক্তি লাভের সময় থেকে নিয়ে ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কাল ছিল অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ। যদিও এ সময়েও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাঝে মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আপত্তি করতো। কিন্তু সার্বিকভাবে পত্রিকার প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

আরব এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এমনকি অমুসলিম দেশসমূহেরও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর প্রতিনিধিগণ "আদ দাওয়ার" দফতরে আসতো। তারা আমার থেকে সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির জন্য সাক্ষাতকার প্রদানের অনুরোধ জানাতো। এসব লোক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও নাজুক বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করতো এবং আশা করতো যে, আমি বিভিন্ন সরকারের সমালোচনা করবো। অথবা তাদের গৃহিত পলিসির ওপর হামলা করে বসবো। অথচ আপনারা ভাল করেই জানেন যে, এসব ক্ষেত্রে অসন্তোষের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করতে আমি কখনো অভ্যস্ত নই। আমি তাদের সে মানসিকতাকে এড়িয়ে যেতাম। আমার জবাব শুনে তারা সন্তুষ্ট হতে পারতো না। সে যাই হোক আমি নিজেকে কিছুতেই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে চাই না যার ফলে পরক্ষণে শুধু আফসোস অনুতাপ প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার না থাকে।

একবার লন্ডনে জনৈক সাংবাদিক আমাকে এ পর্যন্ত বলে ফেলেন যে, আপনি প্রশ্নাবলীর সুস্পষ্ট জবাব পাশ কাটিয়ে যান। আমি তাকে বললাম, পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমার অভ্যাস নয়। দেশের বাইরে গিয়ে সরকারের সমালোচনা করা আমার স্বাভাব বিরুদ্ধ। আমি কখনো আমার দেশের সরকারের কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপের সমালোচনা করতে চাইলে মিসরের ভেতরে থেকেই সততা ও নিষ্ঠার সাথে তা করতে পারি। দেশের বাইরে গিয়ে নিজ দেশের সরকারের সমালোচনা করা নীতিগতভাবে আমি ঠিক বলে মনে করি না। কিছু লোকের ধারণা, আমি রাজনৈতিক কারণে এরূপ ভূমিকা পালন করে থাকি। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং এটা আমাদের অন্যতম মূলনীতি।

ব্যক্তিত্বের লালন ও খ্যাতির আনন্দ

কিছু লোক যারা নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়—তারা মানুষকে খুশী করার জন্য অধিকাংশ সময় নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থি কথাবার্তা বলে থাকে। কিন্তু আমার কর্মনীতি এরূপ নয়। সত্য কথা বলার ব্যাপারে আমার মতে কপটতার কোন সুযোগ নেই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন! সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমুন কোন দিন কপটতার নীতি গ্রহণ করেনি। মানুষ দেখেছে ভীতি এবং নৈরাজ্যের জঘন্যতম সময়েও আমরা পিছ পা হইনি। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি যিনি তার অফুরন্ত রহমতের সাহায্যে আমাকে এমন সৌভাগ্য দান করেছেন যে, আমি বাতিলের সম্মুখে মস্তকাবনত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আবদুন নাসেরের শাসনামলে একটা বিদয়াত প্রসার লাভ করেছিল।

www.amarboi.org

প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রতি বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিতো। ইখওয়ানুল মুসলিমুন কারাগারে কঠোর নির্যাতন ভোগ করছিল। ইত্যবসরে সরকারী কর্তাব্যক্তিরা আবদুন নাসেরকে সমর্থনদানের দাবী করেন। এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতেও আমি আমার দ্বীন ও নৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে জালিমের সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলাম। এর ফলে যা কিছু ভোগ করতে হয়েছে তা সবই হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছি। আমি জানতাম কুরআনের বহু পাঠক এমন রয়েছেন যারা না বুঝে শুনেই-এর শাব্দিক তেলাওয়াতে মশগুল থাকেন। অথচ কুরআন তাদের ওপর অভিশাপ দিতে থাকে। তারা পাঠ করে থাকে—জেনে রাখো জালিমদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়ে থাকে। তারপরও হয়তো নিজেই জালিমে কিংবা জালিমদের সহযোগিতা দানকারীতে পরিণত হয়।

এমনিভাবে উভয় অবস্থাতেই তারা এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে নিজেদের কর্মে ও আচরণে। এই বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবদুন নাসের জঘন্যতম জুলুম করে যাচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করছিলাম যে, আমি যেন নিজেই নিজেকে আল্লাহর লা'নতের উপযুক্ত না করে ফেলি। নাসেরের সমর্থন করা ছিল আল্লাহ তায়ালার লা'নতেরই নামান্তর। আল্লাহর লা'নতের অর্থ হচ্ছে, মানুষ আরহামুর রাহেমীনের রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। অথচ আমি আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী সবচেয়ে বেশী। এতদ্ব্যতীত কোন জালিমের সহযোগিতা করা নিজেই নিজেকে তার সামনে অপমাণিত করার সমার্থক। এই পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যা আমাকে দুনিয়ার বিনিময় দ্বীন বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারে। জালিমের সম্মুখে কাকুতি মিনতি করা জঘন্যতম অপমানের শামিল। কোন সত্যিকার মুসলমান এত নীচে নামতে পারে বলে আমি মনে করি না। দাওয়াতে হকের পথে আমাকে যত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা একথারই প্রমাণ যে, আল্লাহর ব্যাপারে আমি কাউকে ভয় করি না। তা না হলে আমার জন্য কি কঠিন কাজ ছিল যে আমি দাওয়াত ছেড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে না কোন মুসিবত ভোগ করতে হতো আর না কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার মুখোমুখি হতে হতো।

মু'মিন বান্দা তার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে কখনো বিচ্যুত হতে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কারো ভয়-ভীতির তোয়াক্কা করতে পারে না। পরিবেশ পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক না কেন। জালিম যখন দেখে যে, একজন মু'মিন বান্দা তার দুর্বলতা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তার সামনে মাথা নত করতে প্রস্তুত হচ্ছে না তখন তার স্নায়ু অস্বাড় হয়ে যায়। জালিমের জন্যে এটা চরম পরাজয় যে, সে একজন প্রশান্ত আত্মার মু'মীনের মর্যাদাবোধের সামনে তার শক্তি ও প্রতাপকে অসহায় দেখতে পায়। এই মু'মিন না তীর-তলোয়ারকে ভয় করে, না ধন-দৌলত ও বিত্ত বৈভবের লালসা তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে। আমি নিজে দাবী করছি না যে, আমি আমার বীরত্ব শৌর্য বীর্য ও নির্ভীকতার ভিত্তিতে এমন প্রদর্শনী করতে

www.amarboi.org

সক্ষম। বস্তুত প্রত্যেক মু'মিন বান্দা সবসময় আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত দৃঢ় চিত্ততা এবং অবিচল ধৈর্যের বদৌলতেই হকের ওপর টিকে থাকতে পারে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت"

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

সাদাতের আমলে আমরা শুরু থেকেই ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিরোধিতা করেছিলাম। এই বিষয়ে প্রথম থেকেই সাদাতের তৎপরতা ছিল আমাদের মতে অমংগলের কারণ। আমরা তার জেরুজালেম যাওয়ার ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম। অথচ শুধু আমরা ছাড়া সমগ্র মিসরে তখন আর কেউ মুখ খোলেনি। আমরা একাধারে ক্যাম্প ডেবিড এবং শান্তি চুক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের মতামত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত পরিষ্কার ও সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা কারো অজানা ছিল না। এই সময়ে সাদাতের পদলেহী ও সেবাদাস সাহিত্যিক ও সাঙ্গপাঙ্গরা আমাদের ওপর তীর বর্ষাতে থাকেন। তারা আমাদেরকে রাজনীতিতে অদক্ষ বলে অভিহিত করেন এমনকি শান্তি ও নিরাপত্তার দুশমন বলে অভিযুক্ত করে ছাড়েন।

অনন্তর যখন এসব চুক্তি বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্যোগ শুরু হয় তখনও আমরা যথারীতি তাদের প্রতিহত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই। "আদ দাওয়া" সাময়িকীর এক সম্পাদকীয়তে আমি লিখেছিলাম যে, এসব চুক্তি বাস্তবায়ন সার্বিক অকল্যাণ ডেকে আনবে। আমার এই মন্তব্যের স্বপক্ষে আমি ক্রমান্বয়ে বিশটি কারণ উল্লেখ করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে রুকনুল কানাতিরিল খাইরিয়াতে আমার সাথে যখন সাদাতের সাক্ষাত হয় তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমি কেন এই চুক্তির বিরোধিতা করছি? আমি প্রত্যুত্তরে তাকে বললাম যে, আমি শুধু মাত্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই এই চুক্তিগুলোর বিরোধিতা করছি না। কেননা আজকাল জনসাধারণ রাজনীতির যে অর্থ বুঝে থাকেন—এমন রাজনীতির সাথে আমার দূরতম সম্পর্কও নেই। আমি শুধু মাত্র দ্বীনি দৃষ্টিভংগীতেই এই চুক্তিসমূহের বিপক্ষে কথা বলছি। কারণ ইসলাম কখনো স্বীকার করে না যে, কোন অমুসলিম শক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর বলপূর্বক আধিপত্য স্থাপন করুক এবং তারাও সেই সাম্রাজ্যবাদকে মাথা পেতে মেনে নিক। বরং যখনই মুসলিমদের কোনও অঞ্চলে কোন অমুসলিম ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তখন মুসলিম উম্মার প্রতিটি সক্ষম নরনারীর ওপরই জেহাদের জন্য বেরিয়ে পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

মুসলমানদের ঘাড়ের শিরা ও ইহুদী থাবা

আমি আল্লাহর নামে কছম করে বলতে পারি যে, সাদাত আমার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় এবং আমাকে বলে যে—"এই ধারায় যত ইচ্ছা লিখে যাও।" এটা সাদাতের মহত্বের পরিচায়ক যা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। সে যতকিছুই করে থাকুক না কেন এ পর্যায়ে আমার মনে হয়েছে সে আন্তরিক ও

www.amarboi.org

মানসিকভাবে আমার যুক্তির সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিল। সাদাত তার বেশ কিছু সাংবাদিক সম্মেলনে এ ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল যে, ইস্রাঈল মূলত তত্বগত ও বাস্তব উভয় দিক থেকেই শান্তিচুক্তি লংঘন করেছে। তদুপরি রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্ণধারগণও অনুরূপ বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করতে থাকেন। বিরাজমান এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইস্রাঈলের ঘৃণা সংকল্প উপেক্ষা করার কোন কারণ কি অবশিষ্ট থাকে ? ইস্রাঈলের তার সীমানা সুদূর মদীনা মনোয়ারা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার নীল নকশা, পশ্চিম তীর, গাজা ভূখন্ড এবং গোলান মালভূমিকে ইহুদী আগ্রাসনের রংগে রাংগিয়ে তোলার অবিরত প্রচেষ্টা, দক্ষিণ লেবাননের ওপর তার জবর দখল সাবেরা ও শাতিলার তার পাশবিক হত্যাকান্ড কি আমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয় ?

আমরা অবশ্য এমন কোন কৃতিত্বের দাবী করি না যে, শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগী ও তার যে বাস্তবতা সময় প্রমাণ করে দিয়েছে—তা আমাদের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতার প্রমাণ। বরং আমাদের বক্তব্য হলো, আমাদের কাছে এমন একটি দ্বীন রয়েছে যা সরল সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দান করে থাকে। আমরা যদি তার মজবুত রশিকে শক্ত হাতে ধারণ করতে পারি তাহলে কিছুতেই পথভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। আজ ইসলামী জগতের যে ক্রান্তিকাল চলছে এবং ইরাক ও ইরান যেভাবে একটা অর্থহীন যুদ্ধে নিজেদের শক্তির অপচয় করছে তা দেখে বাস্তবিকই খুব দুঃখ হয়। এই ভ্রাতৃঘাতি ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নেপথ্যে আমেরিকা রাশিয়া ও ইস্রাঈলের সক্রিয় হাত রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ সম্মিলিতভাবে নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরীয়াতকে কার্যকরী করেন তাহলেই কেবল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ওপর ছেয়ে থাকা বিপদের ঘনঘটা একদম কেটে যাবে। মানুষ যে জিনিসের আকাংখা করে তাই-ই লাভ করা সহজসাধ্য নয়। তথাপি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সকল বিপদকেই কাবু করা যায়। এখন তো আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতে কালেমার বদৌলতে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় যে, তিনি আমাদের অবস্থা পরিশুদ্ধ করে দেবেন। আমরা যদি তার দিকে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে এই আকাংখা পূরণ হতে দেরী হওয়ার কথা নয়।

সাংবাদিকতার ইসলামী নীতি

“আদ দাওয়া” সাময়িকীর ডিক্লারেশন ছিল আলহাজ্জ সালেহ আসমাভী মরহুমের নামে। তিনিই ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। সম্পাদক মন্ডলীর মধ্যে আলহাজ্জ মোস্তফা মরহুম শাইখ সালেহ আসমাভী মরহুম ও আমি ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন যুবক ছাত্র। আমরা প্রতি রবিবারে সন্ধ্যায় পত্রিকার পান্ডুলিপি শেষবারের মত দেখার জন্য বসতাম। বিষয় ও ভাষাগত ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করা হতো। হ্রাস বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ই আলোচনায় স্থান পেতো এবং প্রত্যেক বারই পত্রিকার শ্রী বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হতো।

www.amarboi.org

মতানৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হলে অত্যন্ত ধীর স্থির ও শান্ত পরিবেশে আলোচনা অব্যাহত থাকতো। এই আলোচনা চলাকালে আমি স্বভাবত নীরবতা অবলম্বন করতাম—যাতে কিছু শিখতে পারি। কারণ সাংবাদিকতার ময়দানে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অবশ্য আলোচনা কোন সময় দীর্ঘায়িত হয়ে গেলে আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হতো। যাতে আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা যায়। তখন পর্যন্ত আমি আদৌ জানতাম না যে, সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত লেখার জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে আমি তা জানতে পারি। সংবাদপত্র সেবীদেরকে বিনিময় প্রদান করা হবে এতে আমার অবশ্য কোন প্রকার আপত্তি ছিল না। তথাপি আমি কখনো কোন সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোন প্রবন্ধের জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করিনি। পত্রিকা ও সাময়িকী কোন বিশেষ বিষয়ে আমার নিকট প্রবন্ধ চাইলে আমি বহুবার দিয়েছি কিন্তু তারা আমাকে বিনিময় দিতে চাইলে আমি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। কেননা আমি একজন দা'য়ী, সাংবাদিক নই। আমার অভ্যাস হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য যখন কেউ সময় চায় তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার কিংবা কোন সাধারণ মানুষ যা-ই হোন না কেন সর্বাবস্থায়ই আমি সেজন্য প্রয়োজনীয় স্থান ও সময় নির্ধারণ করার ইখতিয়ার তার ওপরই ছেড়ে দিয়ে থাকি। এই অভ্যাস আমি আমার জন্য রপ্ত করে নিয়েছি। কারণ, আমি নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পূর্বেই গিয়ে পৌঁছতে চাই। যখন নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন "আদ দাওয়া" পত্রিকার অফিসে হামলা করে তখন সবকিছুই তছনছ করে ফেলে। সমস্ত কাগজপত্র ও নথিপত্র সাময়িকীর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক তার প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করেই নিয়ে যায়। আমার বার বার দাবী করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্তও ঐ সমস্ত কাগজপত্র ফেরত দানের কোন ব্যবস্থা হয়নি।

স্বৈরাচারীরা সাবধান

আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষা কর্তৃপক্ষ পত্রিকার অফিসে হামলা চালানোর সময় কিছু সংখ্যক ইখওয়ানীকেও পাকড়াও করে নিয়ে যায়। তারা আমাকেও জিজ্ঞসাবাদের জন্য ডেকে পাঠায়। আমি তাদের প্রতিটা প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করি। তারা বার বার বলছিলো যে, ইখওয়ান বেআইনিভাবে সংগঠন চালু রেখেছে। এই লোকগুলোর অবস্থা দেখলে আশ্চর্য হতে হয়, যখনই কোন ইখওয়ান অন্য কোন দেশ থেকে ফিরে আসে এবং তার সাথে কোন জরুরী কাগজপত্র থাকে তখন শান্তির এসব রক্ষকরা তাদেরকে গ্রেফতার করে হাজতে বন্দী করে। এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস এই নিরাপরাধীদেরকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত না করেই বন্দীশালায় আটক রাখার পর যখন আদালতে হাজির করা হয় তখন আদালত তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বেকসুর খালাস প্রদানের নির্দেশ দেয়। কেননা আদালত এমন কোন সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পায় না যা তাদের শাস্তির উপলক্ষ হতে পারে। তা সত্ত্বেও তারা বার বার এরূপ আচরণ করেছে। এমন কি এই ধারা অব্যাহত রেখেছে আজও। আমি চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে গিয়েছিলাম তখন একটি পত্রিকা এই

www.amarboi.org

সংবাদ পরিবেশন করে যে, আমি রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছি। আমি যখন এই সংবাদ পাঠ করি তখন আমার চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই চলে আসি। রাত সোয়া নয়টার সময় (প্লেন) বিমান বন্দরে এসে পৌঁছে। ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট অফিসার আমার পাসপোর্ট নিয়ে নেয় এবং আমাকে অপেক্ষা করতে বলে। আমি এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরের হল রুমে রাত দু'টা পর্যন্ত বসে অপেক্ষা করতে থাকি। আমার পাসপোর্ট রাত দু'টার সময় আমাকে ফেরত দেয়া হয়। আমি একবার চিন্তা করলাম যে এই ঘটনার রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করাই। কিন্তু পরক্ষণে আমি ভেবে দেখলাম যে, এই পাসপোর্ট অফিসার বেচারার কি দোষ। সে তো হুকুমের দাস মাত্র। তাকে টেলিফোনে হুকুম দেয়া হচ্ছে অথচ পরবর্তী সময় হুকুম দাতা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সমুদয় দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে বসে। আর যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হয় তাহলে কোন দুর্বল শরীরে সর্দি কাশির ন্যায় ছোট কর্মচারীকেই পাকড়াও করা যায়। অগত্যা আমি আমার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকি। এই অন্যায় আচরণের কারণ যাই হোক না কেন আমি গোটা ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দিয়েছি। আমি আমার বাম হাঁটুর যে চিকিৎসা করিয়েছিলাম এবং যার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতিও হয়েছিল—এক নাগাড়ে এই সুদীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা সময় প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে গুণতে পুনরায় তা সফরের পূর্বের মতই হয়ে যায়। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই লোকগুলো আমার সাথে এমন আচরণ করছে কেন ? অথচ তারা খুব ভাল করেই জানে যে, এরূপ অসম্মানজনক আচরণের ফলে নাতো আমি আমার ভূমিকায় কোনরূপ পরিবর্তন সাধনকারী আর না কোন প্রকার আবেগ উত্তেজনা প্রদর্শনকারী। তাদের আরো চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ্ তায়ালার সম্মুখে তাদের নিজেদের এ ধরনের আচার ব্যবহারের কারণে বিপজ্জনক ফলাফল ও মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তখনকার সেই আক্ষেপ অনুতাপের কোন সুফল তারা ভোগ করতে পারবে না।

www.amarboi.org

বাইশতম অধ্যায়

পরিবার সংগঠন ও তার বাস্তবরূপ

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের পরিবার সংগঠন কর্মসূচী শুরু করলে তাতে সফলতা লাভ করে। শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকারী সংস্থাগুলো অকারণে এই ব্যবস্থার ওপর অত্যন্ত ক্ষ্যাপা ছিল। সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে এই ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন দায়িত্বশীল পর্যায়ের লোক যখনই আমার সাথে সাক্ষাত করেছেন সর্বদাই আমাকে পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই প্রশ্ন করেছেন। তারা সর্বদাই এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন এই ব্যবস্থা পুনরায় শুরু করেছে। আমি বার বার তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করি যে, এ ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। তথাপি তারা কিছুতেই একথা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। বিষয়টি যখন তিক্ততার সৃষ্টি করে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলতে হয় "যদি তোমরা এই ব্যবস্থা কার্যকরী দেখতে পাও তাহলে তাতে অংশগ্রহণকারী ইখওয়ানের ঘাড় মটকে দাও।"

প্রকৃত ব্যাপার হলো, পরিবার সংগঠনের ব্যাপারে সিকিউরিটিওয়ালাদের উদ্বেগ ও সংশয়ের কোন কারণ আজ পর্যন্তও আমি জানতে পরিনি। সিকিউরিটির জনৈক ব্যক্তি একবার আমাকে বলেছিল যে, বাহ্যিকভাবে এই ব্যবস্থা বিপদজ্জনক বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা এতই বিপদজ্জনক যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এর সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সশস্ত্র করে তোলা যেতে পারে-----আমি এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে চাই যে, যদি দল ও সংগঠনের মধ্যে ইসলামী প্রশিক্ষণের জন্য এ ব্যবস্থা চালু করা যায় তাহলে সুদূর প্রসারী সুফল পরিদৃষ্ট হবে।

এই ব্যবস্থার পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে তা হবে উত্তম। বিভিন্ন পরিবারের যুবক—যারা আত্মীয়তা কিংবা প্রতিবেশী হওয়ার দিক দিয়ে ঘনিষ্টতার দাবী রাখে—কোন এক জায়গায় একত্রিত হয়ে বসতো যেখানে কুরআন পাঠ হাদীস মুখস্ত করা রাসূলের জীবনী ফিকাহ্ এবং তাফসীর চর্চা করা তাদের কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। উপস্থিত লোকদের প্রত্যেককে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হওয়ার মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। সাথে সাথে যুব সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ককে ইসলামী নীতির ওপর মজবুত করে দেয়া হতো। নিজে নিজের পরিবারের সদস্য, নিজের সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে নিজের জাতি সম্পর্কে তার ওপর বর্তানো দায়িত্বের অনুভূতি তাদের অন্তরে জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতো। কোন কোন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলেও এ ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল। অতএব আমি বুঝতে পারি না যে, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলো কেন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করে থাকে?

মুসলিম এবং খৃষ্টান নির্বিশেষে আমি মিসরের সকল যুব সমাজ এবং তাদের সকল প্রকার সংগঠন ও দলগুলোকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যেন তারা এই ব্যবস্থা

www.amarboi.org

অধ্যয়ন করে দেখে এবং নিজ নিজ সাংগঠনিক নেতৃত্বের অধীন এবং তাদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে এই অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে চেষ্টা করেন। ইখওয়ানের ওপর নিষেধজ্ঞা থাকার কারণে আমি ইখওয়ানকে বলবো, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছায় এই নিষেধাজ্ঞা উঠে না যায় ততদিন তারা যেন এই ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকে। অতপর যখন আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা হয় এবং এই নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় তাহলে তারা যেন এই অনুপম প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী সোৎসাহে শুরু করে দেয়। আমার ধারণা যদি এ সময় ইখওয়ানের কোন পর্যায় এই পদ্ধতি চালু থাকতো তাহলে আইন শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিশ্চিতই তাদেরকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করতো। আমার ভাবতেও অবাক লাগে যে, একদিকে শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ পরিবার সংগঠনকে খতম করে বসে আছে। অপর দিকে সরকার দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন দলের যুব শাখা প্রতিষ্ঠাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে এবং তাদেরকে সাহায্যও করছে। এ ধরনের গ্রুপ সৃষ্টি করায় মারাত্মক ক্ষতিও আছে। কেননা এভাবে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসী তৎপরতাও। এসব গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রগণ তাদের শিক্ষা জীবন সমাপনের পর কর্মজীবনেও একে অন্যের বিরুদ্ধে খড়গ হস্ত ও মারমুখী ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কাজ অন্যদের জন্য অনুমোদনযোগ্য তাই আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। আমরা (আমাদের সরকার) কবে নাগাদ যাবতীয় টালবাহানা বাদ দিয়ে সোজা সরল পথ অবলম্বনের উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

বলে দিন যে, সেই সুদিন হয়তো খুব বেশী দূরে নয় !

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য

আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বদা এই মর্মে দোয়া করছি যেন তিনি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সরকার প্রধানদেরকে সিরাতুল মুসতাকিমের ওপর সর্বদা অবিচলভাবে চলার প্রয়োজনীয় হেদায়াত দান করেন। আজ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে যে, আমাদের দেশগুলোতে সংবাদপত্রগুলোকে লাল ব্যানার হেডে এই সচিত্র সংবাদ ছাপাতে হয় যে, অমুক রাষ্ট্র প্রধান কিংবা সরকারী কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব খোলা গাড়ীতে করে অমুক জায়গায় পরিদর্শনে গিয়েছেন। যেন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। যে সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা জরুরী। মূলত এ শাসকগোষ্ঠী তাদের গৃহীত আচরণ ও কর্মকান্ডের ফলে জনগণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছে। ফলে তারা সর্বদা তাদের জীবন বিপন্ন দেখতে পায়। মিথ্যা ধারণা দেয়ার জন্য কখনো কখনো এমন প্রদর্শনীর মহড়া দেয়া হয়ে থাকে যা অত্যন্ত হাস্যকর এবং কৃত্রিমতার নমুনা বলে মনে হয়। যদি কোন শাসনকর্তা তার দেশবাসীর নিকট নিরাপদ থাকতে না পারে তবে তার জন্য নিরাপত্তার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে ?

উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে বড় বড় অফিসার ও রাজকর্মচারীগণ এমন কি রাষ্ট্র প্রধানগণও খোলা গাড়ীতে চড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান অথচ কোন

www.amarboi.org

ব্যক্তি তাদের প্রতি একটুখানি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ফিরেও তাকায় না। কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপতিদের ব্যাপারেতো এতদূর সুখ্যাতি রয়েছে যে, তারা তাদের দেশের রাজপথে সাধারণ মানুষের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে মোটর সাইকেলে আরোহণ করে দিবারাত্র ঘোরাফেরা করে থাকেন। যদি কখনো কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ও তাহলে বলা যায় যে, যতদিন দুনিয়া টিকে থাকবে ততদিন এরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে থাকবে। রিগানের ওপর প্রাণ নাশী হামলা করা হয়েছিল। বর্তমান রোমান ক্যাথলিক পোপের ওপরও অনুরূপ আক্রমণ করা হয়ছিল এবং জন কেনেডিকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঐসব দেশের সংবাদপত্রে লাল ব্যানার হেডে কখনো এ খবর প্রকাশিত হয় না যে, অমুক রাষ্ট্র প্রধান খোলা গাড়ীতে করে অমুক শহরে গিয়েছিলেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ

ইখওয়ানুল মুসলিমুন ইয়ামান অথবা জার্মানীতে অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নিচ্ছে এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ ধরনের অপবাদ আরোপকারীদের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে চাই যে, এ অপরাধ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। ধরা যাক তর্কের খাতিরে আমরা না হয় মেনেই নিলাম যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন অস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং গ্রহণ করেছে। এই অভিযোগ আরোপকারীরা কি জানে না যে, ইয়ামানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকাশ্যে তার অস্ত্র নিয়ে চলা ফেরা করে এবং প্রত্যেক ইয়ামানী নিজের কাছে তলোয়ার রাখা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে। যদি কোন ইয়ামানবাসী ইখওয়ানীকে তার দেশের অন্যান্য অধিবাসীদের মত অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে দেখা যায় তাহলে এরূপ মন্তব্য করা কি সমীচিন হবে যে, আমরা এসব অস্ত্রশস্ত্রকে মিসরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নামান্তর বলে অভিহিত করবো ? আল্লাহই ভাল জানেন এসব লোক এ ধরনের অবান্তর কথাবার্তা বলে বেড়ানোতে কি ধরনের আনন্দ বোধ করে ? যদি দশ বিশ একশ জন ইখওয়ানের নিকট অস্ত্রশস্ত্র থেকেও থাকে তাহলে তা লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র সেনা, পুলিশ এবং সিকিউরিটির বিরুদ্ধে মিসরে কি করতে পারবে ? যদি কোন মিসরীয় ইখওয়ানী জীবিকার সন্ধানে ইয়ামানে চলে যায় তাহলে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার সাথে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। অথচ বেচারা সেখানে অতি কষ্টে তার জীবিকা আহরণের জন্য সময় বের করে। অস্ত্রের ট্রেনিং যার জন্য পর্যাপ্ত অবকাশের প্রয়োজন তা কি করে তার জন্য এত সুলভ হতে পারে ? আজ পর্যন্ত এরা কোন ইখওয়ানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে একটা প্রমাণও কোন আদালাতে পেশ করতে সমর্থ হয়নি। তথাপি ঢোল অনবরত বাজিয়ে চলেছেন।

আমি কয়েক বার জার্মানীতে গিয়েছি। আমি সেখানকার সিকিউরিটি অফিসারদেরকে কোন কোন সময় প্রশ্ন করেছি যে, "জার্মানীর জংগলে কি মানুষকে অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়ার অনুমতি আছে ?" প্রত্যুত্তরে তারা বলেছে কখখনো নয়। কেননা জার্মানীর আইনে এটা অপরাধ এবং এ অপরাধের জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

www.amarboi.org

ভিন্ন ভিন্ন মানদন্ড

মুসলিম জাহানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের জন্য কি সেই সময় আসেনি যখন তারা চোখ খুলে বাস্তবতাকে মেনে নেবে। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এ ধরনের কাজ থেকে বহু দূরে থাকে এবং আল্লাহ তাদেরকে এমন বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন যে তারা অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয় না। নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা ইখওয়ান ব্যতীত আর কারো পক্ষ থেকে বিপদ দেখতে পায় না। এমনকি একটি আরব দেশের জনৈক দায়িত্বশীল ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেননি যে, ইখওয়ান ইহুদীবাদীদের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক। একটু অনুমান করুন যে, এই লোকদের বিবেক-বুদ্ধি কোন্ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে? দুনিয়ার কোন প্রত্যন্ত এলাকায়ও যদি কোন মানুষকে কষ্ট দেয়া হয় তাহলে পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্য জগতে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমান এবং বিশেষ করে ইখওয়ানের ব্যাপারে সভ্যতার ঝান্ডাবাহীদের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদেরকে জঘন্যতম নির্যাতনের শিকার বানানো হলেও কেউ টু শব্দ পর্যন্ত করে না। "আল আহরার" পত্রিকায় আমি উস্তাদ আল ফারুক আবদুস সালামের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম যাতে তিনি আমাদের সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন যে, আমরা কারো কোন সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই। বরং আমাদের জন্য মহীয়ান গরীয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট।

তাঁরই সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক রয়েছে অবনত

গণপ্রজাতন্ত্রী সুদানের প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ জাফর নিমেরী তাঁর দেশে ইসলামী শরীয়াত কার্যকরী করার ঘোষণা দিলে আমরা যারপরনেই উল্লসিত হই। দৈনিক 'আল আখবারের' কর্মকর্তাদের একজন আমাকে অনুরোধ জানায় যে, আমি যেন সুদানী পার্লামেন্টের মুখপত্রে প্রকাশ করার জন্য এই বিষয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাই। সেই সময় কতিপয় লোক এরূপ প্রপাগান্ডা চালাচ্ছিলো যে, নিমেরী সাহেবের নিয়াত পরিষ্কার নয়। তিনি শুধু তার পতনোম্মুখ রাজনৈতিক প্রভাব পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরূপ প্রচারণায় আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। আমি ধারণা করেছিলাম, যদি এই ঘোষণায় কিছু দুর্বলতা থেকেও থাকে তবুও পরবর্তী সময়ে তা সংশোধন করে নেয়া যেতে পারে। অন্ততপক্ষে সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা তো প্রদান করা হয়েছে-------সেই সময়েই প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরীর সাক্ষাতকার কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যা দেখে আমি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ি। আম্মদের সুনাম সুখ্যাতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করতে কসুর করেননি যে, "ইখওয়ানুল মুসলিমুন" প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই। আমি এই খবর পড়ে মনে মনে বলেছিলাম ঃ

দেখ সে-ও বলছে যে, এরা সম্পূর্ণ চরিত্রহীন। এই যদি আমার জানা থাকতো তাহলে আমি আমার বাড়ী ঘর বিলিয়ে দিতাম না।

আমাদের ইখওয়ানী ভাইয়েরা সুদানে নিমেরী সাহেবের হাতে বাইয়াত করেছেন এবং সুদানের ইখওয়ানের প্রধান ডাক্তার হাসান আল তুরাবী সদর নিমেরীর উপদেষ্টা

www.amarboi.org

নিযুক্ত হয়েছেন। এরপরও আপনারা তার বিবৃতি লক্ষ্য করেছেন যেন তাতে কি ধরনের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আহ ! আমাদের শাসকরা যদি নিজেদের এই আচরণের পূর্ণমূল্যায়ন করতো! এই ভারসাম্যহীন কর্মতৎপরতা আর কতদিন অব্যাহত থাকবে। নিয়াতের অবস্থা তো আল্লাহই ভাল জনেন। আর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আমরা নিয়াতের ফায়সালা সেই মহান সত্তার ওপরই ছেড়ে দেবো যিনি মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে আছেন এবং যার নিকট কোন বিষয়ই গোপন নেই। আর আমার ব্যাপার হলো, আমি কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি না।

আল আহরাম পত্রিকা আমার সম্পর্কেও একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সেই সময় মিসর ও সুদানের মধ্যে ঐক্যের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলছিল। প্রতিবেদক আমার সাথে সম্পর্কিত করে লিখেছিল যে, আমি মিসর ও সুদানের পূর্ণাঙ্গ ঐক্যের দাবীদার। আমি বলতে চাই, এই মন্তব্য যথার্থ। দু'টি দেশের সামগ্রিক কল্যাণ-এর মধ্যেই নিহিত যে, তারা একই জাতি ও একই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাক। এতে সমগ্র মুসলিম জাহানই লাভবান হবে। এ একটা প্রত্যাশা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। এই আকাংখাকে তিনি অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপায়িত করে দেবেন।

মিসরেও শরীয়াতকে সব আইনের উৎস নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে সুদান সরকারও এই উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। নিঃসেন্দেহে দু'টি দেশেই শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাকে শরীয়াতের আলোকে ঢেলে সাজালে ঐক্য ও সংহতির পক্ষে তা হবে শুভ পদক্ষেপ। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করছি তিনি যেন আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেন।

তোমার বাহুতো তাওহীদের শক্তিতে শক্তিশালী
ইসলামই তোমার দেশ আর তুমি মোস্তফারই অনুসারী।

আমেরিকান দূতাবাসের যোগাযোগ

১৯৭৯, ১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালে কায়রোস্থ আমেরিকান দূতাবাসের প্রেস এটাচি মিষ্টার জোশেফ লরেন্স আমার সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মিলিত হন। "আদ দাওয়া" পত্রিকার মাধ্যমে তিনি যখন সর্বপ্রথম আমার সহিত মিলিত হন তখন খুবই ভাল আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন তারই দোভাষী সিরানাদিয়াতুল কিলানী। এসব সাক্ষাতকার সম্পর্কে আমি তাৎক্ষণিকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনণালয়কে অবহিত করে ছিলাম। কেননা মিষ্টার ইভান্সের ব্যাপারটি আমার তখনো পর্যন্ত মনে ছিল। (ইতিপূর্বে আমি এই বিষয়ের উল্লেখ করে এসেছি)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব সাক্ষাতকারের কোন বিরোধিতা করেনি। যদি তারা আপত্তি উথাপন করতো তাহলে আমি সাথে সাথে মিষ্টার জোশেফের নিকট আমার অপারগতা প্রকাশ করে এ বিষয়টি বন্ধ করে দিতাম। আমি ইখওয়ানের ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলাম না।

www.amarboi.org

১৯৮০ সালের জুন মাসে কায়রোস্থ বৃটিশ দূতাবাসের লোকজন আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং আমাকে এই মর্মে অবহিত করে যে, বৃটেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী "আদ দাওয়া" পত্রিকার অফিসে আসতে চান। আমি বললাম ঃ "এই আগমনের উদ্দেশ্য যদি পারস্পরিক পরিচিতি এবং অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে স্বাগতম আর যদি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই হয় রাজনৈতিক আলোচনা করা তাহলে আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করছি।" ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমাদের দপ্তরে আগমনের প্রোগ্রাম বাতিল করে দেয়। তৎকালে পার্লামেন্টের নির্দলীয় সদস্য এবং বিরোধীদলের রাজনৈতিক দলগুলো অধিকাংশ সময় প্রেস কনফারেন্সে মিলিত হতেন এবং সরকারের ওপর এলোপাথাড়ী আক্রমণ চালাতেন। আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নীরব। তা সত্ত্বেও আমাদের ওপর কঠোর প্রহরা লাগানো হয়েছিল। এই কর্মপদ্ধতির কি কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব ? সম্ভবত বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে তা কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।-----এমনিতেই আমরা সকল কঠোরতাকে সহ্য করতাম। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সেদিনটি অবশ্যই আসবে যেদিন কোন রকম কম বেশী ছাড়াই আমাদের সকল কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসেব হবে এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে সীমারেখা টেনে দেয়া হবে।

"আদ দাওয়া" অফিসে ইহুদী বুদ্ধিজীবিদের আগমন

সুধী পাঠক বৃন্দ নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন না যে, তেল আবিব ইউনিভারসিটির চারজন শিক্ষক "আদ দাওয়া" সাময়িকীর দপ্তরে আগমন করেন। তখন আমি ছিলাম দেশের বাইরে। সম্মানিত ও মহামান্য ভ্রাতা মোস্তফা মাশহুরের সাথে তাদের আলাপ হয়। মোস্তফা মাশহুর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে এবং ইসলামী শিষ্টাচার ও শালীনতা সৌজন্যের সাথে এই মেহমানদের সাথে কথা বলেন। আলোচনার ফাঁকে ইহুদী অধ্যাপকগণের একজন বলেন "মিসরে শান্তি চুক্তির যে বিরোধিতা করা হচ্ছে তা আমাদের নিকট কোন বিস্ময় উদ্রেককারী ব্যাপার নয়। কেননা ইস্রাঈলেও এই চুক্তির বিরোধিতাকারী আছে।" ভাই মোস্তফা মাশহুর তার বিশেষ শান্ত ভাবমূর্তি বজায় রেখে বলেন ঃ "আমাদের এখানে এই চুক্তির বিরোধিতা করা হচ্ছে এ জন্যে যে, এ চুক্তির সাহায্যে ফিলিস্তিন জাতির সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে আপনাদের ওখানে এর বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে এ জন্য যে, আরো অধিকার কেন কেড়ে নেয়া হলো না ? আগত অতিথিগণ প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়নি।

তারা যখন আমাদের দফতরে এসে উপস্থিত হন তখন দপ্তরে উপস্থিত ইখওয়ান ইসলামী রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী মার্জিতভাবে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এবং অনুরূপভাবে তাদের বিদায় অভিবাদনও জানিয়ে বিদায় করেন। কিন্তু এভাবে ইহুদীদের আমাদের দেশে আগমন তাদের উগ্র ও একরোখা মনোভাবেরই

www.amarboi.org

বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাদের সশরীরের আগমন যেন বাস্তবে একথাই বলছে যে, "আমরা এসে গেছি তোমাদের সরকার সরকারীভাবে ফিলিস্তিনে আমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা করে তোমরা আমাদের কি কেড়ে নিতে পেরেছো ?"

তাদের গর্বিত আচরণ এবং আমাদের দেশে বুক টান করে বেড়ানো আমাদের কাছে বিষসদৃশ্য মনে হয়। তা সত্ত্বেও যখনই তারা আমাদের অফিসে এসে যায় তখন আমরা তাদের সাথে ইসলামী নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচারের প্রদর্শনী করাকে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কখনো তাদের অপমান করার চেষ্টা করিনি। তবে এটাও ধ্রুব সত্য যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রতি যে পরিমাণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইস্রাঈলের রয়েছে তেমনটি সারা দুনিয়ায় আর কারো নেই।

ইখওয়ানকে সন্ত্রাসী, রক্ত পিপাসু গোঁড়া এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর অধিকারী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ইস্রাঈলী রাশিয়ান ও আমেরিকান থেকে প্রতিদিন আমাদের এসব উপাধি প্রচারিত হয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের আতিথেয়তা

এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হকের কিছু কীর্তিগাথা আলোচনা করাটা জরুরী বলে মনে করি। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমন্ত্রণক্রমে তাদের মেহমান হিসেবে আমি পাকিস্তানে গিয়েছিলাম। জেনারেল জিয়াউল হক যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আমি যতদিন পাকিস্তানে অবস্থান করবো ততদিন যেন তার আতিথেয়তা গ্রহণ করি। আমার জন্য তিনি একটা বিশেষ গাড়ী ও একজন দেহরক্ষী পাঠিয়ে দেন। প্রেসিডেন্ট ভবনে তিনি নিজে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। আমি যখন তার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাই তখন জনাব মিয়া তোফায়েল মুহাম্মাদ (আমীর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান), জনাব খলীল হামেদী এবং দু'জন ইখওয়ানী সাথী জনাব মোস্তফা মাশহুর ও জনাব ইবরাহীম শারফ আমার সাথে ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের সাথে আন্তরিকতা এবং সৌভ্রাতৃত্বমূলক আচরণ করেন। পাকিস্তানের অনেক মূল্যবান পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করলেন যার উদ্দেশ্য ইসলামী পুণর্জাগরণ। যেমন প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে আরবী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে মহামান্য প্রেসিডেন্টকে তার যেসব নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস প্রচেষ্টা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সাধন করতে উদ্যোগী হয়েছেন তা যেন সফলতা লাভ করে এবং স্বীয় দেশ মাতৃকার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁর মহৎ আকাংখাগুলোকে বাস্তবরূপ দান করেন।

আফগান জিহাদ এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুন

আফগানিস্তানে উদ্ভূত বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম এই পাশবিক হামলা রাশিয়া এবং আমেরিকার মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত চক্রান্তের ফল মাত্র। আফগানিস্তানকে জবর দখল করার এ দু'টি দেশের পূর্ণাংগ ঐকমত্যে হয়েছিল।

www.amarboi.org

আমেরিকার পক্ষ থেকে মৌখিক জমাখরচ আর মাঝেমধ্যে রাশিয়ার নিন্দায় দু'য়েকটি করে বিবৃতি প্রদান দুনিয়াবাসীর চোখে ধূলা নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার আফসোস যে, মিসরীয় জাতি সামষ্টিকভাবে এই নাজুক সমস্যার ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার কথা তা করেনি। এই জবর দখলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। তারা জবরদখলকারী রুশ একনায়কত্বকে খোলাখুলি সমর্থন করেছে। যতদূর পর্যন্ত ইখওয়ানুল মুসলিমুন আফগানিস্তানের সমস্যাকে তাদের নিজেদের সমস্যা বলে মনে করে। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা সর্বদাই ইতিবাচক এবং বাস্তবসম্মত। এই সমস্যার বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য আমরা আল আযহারে এক কনফারেন্সের আয়োজন করি। এতে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমুন আফগানিস্তানের জিহাদে কার্যত যোগদান করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে আবেদন করেন। যার ফলে যুবকরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে "আদ দাওয়া" পত্রিকার অফিসে এসে নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা তালিকাভুক্ত করে। জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত এসব যুবক তাদের আফগান ভাইদের কাঁধে কাধ মিলিয়ে রাশিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত মিসর সরকার তাদেরকে দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। ওপরে যে কনফারেন্সের উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আমি উপস্থিত লোকদেরকে একটা কথা বলেছিলাম, তাহলো মিসর সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের ভাষ্য অনুযায়ী আফগানিস্তানের মুজাহিদদেরকে মিসর থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হচ্ছিলো। কর্তা ব্যক্তিদের মুখে যখন আমি এই খবর শুনতে পাই তখন স্বভাবগতভাবেই খুবই আনন্দ বোধ হয়। কিন্তু আমার এটা জানা নেই যে, বাস্তবিকই কথিত এই অস্ত্রশস্ত্র মুজাহিদদের হাতে গিয়ে পৌঁছছে নাকি শুধু মাত্র পাবলিসিটির স্বার্থে আমার নিকট এই বিবৃতি প্রদান করানো হয়েছে।

একথা বলতে আমার কোন বাধা নেই যে, মিসর থেকে অন্যান্য দেশে চলে যাওয়া ইখওয়ান কথায় ও কাজে সকল প্রকারে তাদের আফগান ভাইদেরকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করছে। তারা ঔষধপত্রও সংগ্রহ করে এবং চিকিৎসকদেরকেও সেখানে প্রেরণ করতে থাকে। এতদ্ব্যতীত তারা বেশ কিছু সংখ্যক ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র ও আফগান মুজাহিদ ও মুহাজিরগণের জন্য খুলেছে--------এসব খেদমত প্রশংসনীয় ও মূল্যবান। কিন্তু একটা সুপার পাওয়ারের সামনে বাঁধ বাঁধার জন্য এসব প্রচেষ্টা মহাসমুদ্রের বিপুল জলরাশির মধ্যে বারি কণা অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। এ বিষয়ের অধিক কিছু বলা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন আফগানিস্তানের জিহাদের ব্যাপারে ইখওয়ানের আবেগ ও অনুভূতি কেমন।

হয়তো আমার কথা তোমার ভাল লাগবে

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ হোসনী মোবারক কিছু ভাল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তার প্রেসিডেন্টশীপের শুরু করেন। রাজনৈতিক বন্দী এবং নজরবন্দীদের মুক্তি প্রদান করেন। এবং সংবাদপত্র সাময়িকীকে সমালোচনা করার অধিকার প্রদান করা হয়।

www.amarboi.org

এই মহতি উদ্যোগের সাথে সাথে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে যাতে সংস্কার আনয়ন করা আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ প্রেসিডেন্ট একই সাথে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলেরও প্রধান। তাঁকে এই দু'টির মধ্যে যে কোন একটা পদই রাখা উচিত।

মানুষ আমাকে একথাও জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা রাষ্ট্রপতি হোসনী মোবারকের সাথে এখনো পর্যন্ত সাক্ষাত করতে যাওনি কেন? যেভাবে মেলামেশা করতে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টগণের সাথে। এর জবাব হচ্ছে, সাক্ষাতের এ বিষয়টি প্রেসিডেন্টের এখতিয়ারাধীন কারো সাথে মিলিত হওয়া না হওয়ায় আমাদের মান-সম্মানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। তথাপি প্রেসিডেন্ট যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চান তাহলে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

নির্বাচনী ময়দানে

১৯৮১ সালে যখন আমি জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করি তখন ইখওয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকার কারণে আমাদের কর্মতৎপরতা প্রায় ছিলই না। আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম যে, আমরা নিজেদেরকে কিভাবে গতিদান করতে পারি। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য রাস্তা খুলে দেন। দেখতে দেখতে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা হয়ে যায়। আমরা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে চেষ্টা করি। এমনকি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য পথও সুগম করে ফেলি।

প্রথম প্রথম আমাদের ধারণা ছিল যে, পৃথক পৃথক নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এটা একদিক থেকে আমাদের জন্য ছিল একটা কঠিন অবস্থা। কেননা এই পদ্ধতিতে নির্বাচনী যুদ্ধে খরচ পড়ে অনেক বেশী। যা বহন করার শক্তি ও সামর্থ আমাদের ছিল না। সরকারী দল তাদের নিজেদের স্বার্থে সারা দেশে এমনভাবে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করে যেন তাতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্যের সাহয্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এরূপ নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুরূপ প্রতিনিধিত্বের মূলনীতি থেকেও ছিল সুস্পষ্ট পদস্খলন। কেননা এটা ছিল দুনিয়াতে এ ধরনের একমাত্র নির্বাচন পদ্ধতি। সে যাই হোক এই পদ্ধতির নির্বাচনে বহু কম খরচে নির্বাচনী যুদ্ধে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল। সরকারী দল বহু প্রপাগান্ডা চালায় যে, বাহির থেকে ইখওয়ানের জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড সাহায্য আসছে। আমাদের জানা নেই এই সাহায্য কোথায় চলে গেছে? আমাদের হাত পর্যন্ত তো এসে পৌছায়নি। নতুন এই নিয়মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যদিও খরচ হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম। তথাপি আমরা আজ পর্যন্ত নির্বাচনী খরচের জন্য গৃহীত ঋণের বোঝা টেনে যাচ্ছি।

ইখওয়ানের বাজেট সদস্য ও কর্মীদের এয়ানত দ্বারা পুরো হয়ে থাকে। আমরা কখনো কোন সরকার কিংবা অইখওয়ানী ব্যক্তি এবং সংস্থার নিকট সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিনি। কিংবা গ্রহণ করিনি। নির্বাচনী ঋণও পর্যায়ক্রমে আমরা আমাদের কর্মী ও সদস্যগণের আর্থিক কুরবানীর সাহায্যে ইনশাআল্লাহ পরিশোধ করতে সক্ষম হবো।

www.amarboi.org

তেইশতম অধ্যায়

আমার স্মৃতিপটে ১৯৫৪ সালের ঘটনাবলী ঘুরপাক খাচ্ছে। এ বছর জানুয়ারী মাসে সুদানে প্রথম পার্লামেন্টের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। এ অধিবেশনে সদস্য অধিকাংশই মিসরের সাথে একীভূত হয়ে যাওয়ার দাবী করে-----আজ আবার লক্ষ্য করে দেখুন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। দু'টি ভ্রাতৃপ্রতীম দেশের মধ্যে পুনরায় একীভূত হওয়ার আলোচনা চলছে। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যত চেষ্টা হয়েছে তার সবই কোন না কোন কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আমি আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে আকুলভাবে দোয়া করছি যেন এবারের আলাপ আলোচনা ফলপ্রসু হয় এবং দু'টি দেশ একই ঐক্যসূত্রে নিজেদেরকে গ্রথিত করার ব্যাপারে সফলতার মুখ দেখতে পায়।

সুদান আশার আলোকচ্ছটা !

সুদানে ইসলামী শরীয়াতের বাস্তবায়নে ও কার্যকরী করার কারণে ইনশাআল্লাহ সুদূর প্রসারী ফলাফল দেখা দেবে। মিসরের শাসনতন্ত্র এবং সংবিধানও এ ব্যাপারে ইসলামকেই সকল আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে ঘোষণা করে। আল্লাহর হুকুমে কার্যক্ষেত্রেও যেন এদিকেই অগ্রসর হয়। আইন প্রণয়নের মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর একীভূত হয়ে যাওয়ার জন্য মজবুত ভিত্তি রচিত হয়ে যাবে। ইতিপূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, প্রেসিডেন্ট নিমেরী ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে ইখওয়ানুস শাইয়াতীন নামে অভিহীত করে আমাকে যারপরনেই গোলাক ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলেন। তথাপি আমরা নিমেরী সাহেবের সাথে কোনরূপ আশোভন ও অশালীন আচরণ করিনি। বরং আমরা সর্বদা তার হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী এবং এই মহতী কার্যে তার সহযোগিই রয়েছি। সুদানী আইন পরিষদের সাময়িকীতে আমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাতে ইসলামী আইনকে কার্যকরী করার মহতী উদ্যোগকে বড় সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম এবং এই পদক্ষেপকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলাম। আমরা মন্দের প্রতিদানে মন্দ করি না। আমাদের দোয়া এই যে, সুদানে ইসলাম বাস্তবায়নের প্রয়াস-প্রচেষ্টা সাফল্য মন্ডিত হোক। যাতে সমগ্র দুনিয়ার জন্য এই শাসন ব্যবস্থাকে নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

কামাল আতাতুর্কের ধর্মহীন গণতন্ত্র

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। এ সময় মিসরে তুর্কী রাষ্ট্রদূত তুগায়ীকে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদূত কূটনৈতিক নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে পড়লো যে, মিসরের এক রাষ্ট্রদূতের সাথেও তুরস্কে এক আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এটা ছিল মিসরের বাদশাহ্ প্রথম ফুয়াদের আমলের কথা। সেই সময় কামাল আতাতুর্ক ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তুরস্কে ধর্মহীন গণতন্ত্রের

www.amarboi.org

ঘোষণা দিয়েছিলেন। তুর্কী টুপি অথবা পাগড়ী পরিধান নিষিদ্ধি ঘোষণা করা হয়। তৎপরিবর্তে ইউরোপীয় হ্যাট ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়। মিসরের রাষ্ট্রদূত আবদুল মালেক হামযা বেগ কোন সরকারী কার্য ব্যাপদেশে রাষ্ট্রপতি ভবনে গমন করেছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল তারবুশ (টুপি)। মোস্তফা কামাল (চরম ঔদ্ধত্বের সাথে) রাষ্ট্রদূতের মাথা থেকে টুপিটি নিয়ে মাটির ওপর ছুঁড়ে মারেন। এ অবাঞ্ছিত ঘটনা সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।

বিপ্লবী কাউন্সিল কর্তৃক ইখওয়ানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসেই বিপ্লবী কাউন্সিল ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে বেআইনী ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবি, ডাক্তার খামীস, হুসান আসমাভী, জনাব মুনীর দাল্লাহ, ভাই সালেহ আবু রাকীক, ফরিদ আবদুল খালেক, জেনারেল সালাহ শাদী ও জনাব ফারাগলি প্রমুখকে গ্রেফতার করে জিন্দানখানার চার দেয়ালের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দু'মাস পর মার্চ মাসে তাদের মুক্তি দেয়া হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ইখওয়ানী নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার সময় আবদুল কাদের আওদা শহীদ আবদুন নাসেরের সাথে তার বাসভবনে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতের পর তিনি আমাদেরকে বললেন যে, অতি শীগ্রই সকল সমস্যা ও সংকটের অবসান হয়ে যাবে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগণ আমেরিয়া কারাগারে ছিলেন। আওদা শহীদ সেখানে গিয়ে তাদের সহিত দেখা করেন এবং তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারে তাদের সবাইকে অবহিত করেন।

মিসর ও সিরিয়ার ঐক্য

আমার আজও মনে আছে যে, ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সিরিয়াতে মারাত্মক গোলযোগ দেখা দেয়। তখন জামাল আবদুন নাসের ও জামাল সালেম সিরিয়া গমন করেন যেন বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা করিয়ে দেয়া যায়। আমার মনে হয় নাসের সিরিয়ায় বিরাজমান পরিস্থিতি দেখে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে ঐক্য ঘটানোর ব্যাপারে মত স্থির করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সিরিয়া অর্থনৈতিক-ভাবে দারিদ্রের শিকার হয়ে পড়েছে, এ থেকে মুক্তি লাভের জন্য সিরিয়ার নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ মিসরের সাথে ঐক্যের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। নাসের তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইতিমধ্যে মনে মনে চিত্র অংকন করে ফেলেছিলেন। তার সেই নকশা মোতাবেক ইরাক থেকে সুদূর মরক্কো পর্যন্ত পুরো এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করাই ছিল উদ্দেশ্য। অনেক সময় প্রতিকূল আবহাওয়ার নিষ্ঠুর আঘাত জাহাজকে মঞ্জিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছতে দেয় না। নাসেরের স্বপ্ন বাস্তবতার মুখ দেখতে সক্ষম হয়নি। বস্তুত মানুষ চিন্তা করে এক আর তাকদীর ঘটিয়ে ফেলে অন্য! যে কাজের ভিত্তি মহৎ উদ্দেশ্যের ওপর রাখা হয় না তার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না।

www.amarboi.org

জেনারেল নাজীবের সাময়িক পদত্যাগ

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। সেটা ছিল জেনারেল মুহাম্মাদ নাজীবের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা প্রদান। পদত্যাগ করার দু'দিন পরই জেনারেল নাজীব পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। সবাই এই ভেবে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে যে, দেশের সর্বোচ্চ পদটিও তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সামরিক সরকারের অধীনে এসব বিষয়ে বিস্ময় বোধ করার কোন কারণ নেই। ক্ষমতার মসনদের প্রতি যখন সেনাবাহিনীর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তখন সব কিছুই উলট পালট হয়ে যায়। সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে সীমান্ত রক্ষা করা, রাষ্ট্র পরিচালনা নয়। সরকার পরিচালনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্বে অভিষিক্ত হতে পারে সেসব লোক যাদেরকে এই মহতী উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা করা রাজনীতিবিদদের কাজ; কিন্তু ক্ষমতার লিপসা ও গদির মোহ সমস্ত নিয়ম-শৃংখলা উলটে পালটে দেয়।

ওয়াফদ পার্টির শাসনকাল

এখানে আমি একথাটাও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা জরুরী বলে মনে করি যে, ওয়াফদ পার্টির মন্ত্রীত্বের আমলে জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল; অন্যান্য দলের মন্ত্রীদের সময় যা ছিল না। ওয়াফদদের মন্ত্রীত্বের আমলেও কখনো কখনো ওয়াফদদের কোন কোন নেতা তাদের নির্বুদ্ধিতার দ্বারা পরিবেশ কলুষিত করে ফেলতো। কিন্তু সার্বিকভাবে এই আমল অন্যদের আমলের চেয়ে অনেক উত্তম ছিল। আমার মনে আছে নাহাস পাশার মন্ত্রীত্বের আমলে পুলিশ শাবীনুল কানাতিরে অবস্থিত আমার বাড়ী ও অফিস তল্লাসী করে। তাদের সন্দেহ ছিল যে, মুকাররম আবীদ পাশার নিষিদ্ধ ঘোষিত গ্রন্থের কপি আমার কাছে আছে। লেখক এই বইটি নাহাস পাশা এবং তার ওয়াফদ পার্টির বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। সরকার এ পুস্তক নিষিদ্ধ করে দেন এবং তার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করেন। আমার সম্পর্কে কেউ সরকারকে এই মর্মে মিথ্যা খবর দেয় যে, উক্ত গ্রন্থের কপি আমার নিকট আছে। পুলিশ বাসগৃহ ও দফতরের সবকিছু তন্নতন্ন করে খোঁজ করেও বইটির কোন কপি বের করতে পারেনি। এই দলটির চেহারায় এ ধরনের কলঙ্ক রেখা রয়েছে। যদিও তুলনামূলকভাবে তাদের রেকর্ড কিছুটা ভাল।

গোপন অধিবেশন

একদিকে যেমন ওয়াফদ পার্টির এই গ্রন্থকে বেআইনি করা এবং মানুষের ঘর বাড়ীতে আকস্মাত তল্লাশী চালানো ছিল অপছন্দনীয় কাজ অপরদিকে তেমনি আমার মতে মোকাররম আবীদ পাশার এই বই লেখাও সঠিক পদক্ষেপ ছিল না। আবীদ পাশা ছিলেন ওয়াফদ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই পার্টির সাথে ছিলেন বেশ কয়েকটি বছর। এমনকি মন্ত্রীত্বের পদ পর্যন্ত অলংকৃত করেন। অতপর তিনি ওয়াফদ পার্টি থেকে আলাদা হয়ে হিযবুল কুতলা বা কুতলা পার্টির গোড়া পত্তন করেন এবং

www.amarboi.org

ওয়াক্ফদদের বিরুদ্ধে বই লিখেন। বিশ্বস্ততা ও দ্বীনদারীর পরিপন্থি যে কোন ব্যক্তি কোন দলে থাকবেন এবং সেই পার্টি থেকে মন্ত্রীত্বের পদও অলঙ্কৃত করবে কিন্তু পরে পার্টির আভ্যন্তরীণ গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবেন এরূপ আচরণে গোপনীয়তা ও দায়িত্বশীলতা আহত হয়ে থাকে—প্রত্যেক পার্টির সদস্যেরই এটি মেনে চলা দরকার, যদি এর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা না হয় তাহলে কেউই কারো তোয়াক্কা করবে না এবং সামাজিক জীবন বিশৃংখলার শিকার হয়ে পড়বে।

আমি ওপরে আমার যে মতামত উল্লেখ করেছি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সংখ্যক হাদীস এবং কর্মনীতি থেকে গৃহীত। হযরত রাসূল (সা) থেকে একটি রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে যে, "এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট এসে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি ছিলাম মুনাফিকদের অন্তর্গত বরং তাদের সরদার মুনাফিকদের মজলিশে কি কি কথাবার্তা হয়ে থাকে আমি খুব ভাল করে জানি। আমি কি আপনাকে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবো ? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) একটা উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, "এমনটি কখনো করো না------যিনি মোনাফিকী পরিত্যাগ করে তোমার মত নিষ্ঠাবান মুসলিম হয়ে যায় এবং আমাদের নিকট চলে আসে আমরা তাকে খোলা মনে গ্রহণ করি এবং তার জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করি। পক্ষান্তরে যে মোনাফিকীর ওপর অবিচল থাকে আমরা তার পশ্চাতে লেগে থাকি না। তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্য আল্লাহ তায়ালাই তার জন্য যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীস সর্ব যুগে দুনিয়াবাসীকে মজলিশের শিষ্টাচার সম্পর্কিত সোনালী নীতি শিক্ষা দিতে থাকবে। এই হাদীসের আলোকে মানুষের গোপনীয়তা নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকতে পারে। এই হাদীসের মমার্থ হচ্ছে, কারো গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়া সমীচীন নয়। ইসলামী দাওয়াতের শিক্ষাসমূহের মধ্যে এটা একটা মৌলিক শিক্ষার মর্যাদা রাখে। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এই শিক্ষাকেই মানুষের মধ্যে প্রচার করে থাকে। নিজেরাও এর ওপর আমল করে থাকে এবং এর আলোকে জীবন যাপন করেন।

ভ্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মপন্থা ও তার ফলাফল

ইসমাঈল সিদকীর মন্ত্রীত্বের আমলে মিসরে অদ্ভুত আর্থিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। ১৯৩১ সালে এক মণ তুলা মিসরীয় দেড় পাউন্ডে বিক্রি হতে থাকে। রসুন পেয়াজের স্তুপ রাস্তা ও সড়কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। কারণ কোন পাইকারী কিংবা খুচরা খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছিলো না। এতকিছু সত্ত্বেও সেই সময় খাদ্য ও বস্ত্রের কোন অভাব সৃষ্টি হয়নি যেমনটি আজকের দিনে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সারা দুনিয়াতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, ব্যক্তির আয় দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির সাথে পাল্লা দিতে পারছে না। বিভিন্ন সরকার অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য স্বাভাবিক ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য বিশাল অংকের অর্থ ভর্তুকি হিসেবে খরচ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের দুঃখ দুর্দশা

www.amarboi.org

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিদিনই তারা বিভিন্ন আর্থিক দায়-দায়িত্বের নীচে পিষ্ট হয়ে চলেছে।

অর্থনীতি বিশারদ এবং লেখকগণ একাধিকবার একথা প্রকাশ করেছেন যে, দ্রব্য মূল্য হ্রাস করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সাহায্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌছাচ্ছে না। ধনী ও প্রাচুর্যের অধিকারীরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এই সাহায্যও গ্রাস করে ফেলছে। এই ব্যবস্থা ভ্রান্ত পদ্ধতি ও ভুল মূলনীতির ওপর স্থাপন করা হয়েছে এবং পুনঃ পুনঃ অভিযোগ ও দাবী দাওয়া পেশ সত্ত্বেও পরিস্থিতি পরিবর্তনের ন্যূনতম আশাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। গরীব শ্রেণীর সমস্যার সমাধান করার জন্য বাস্তবসম্মত যেসব প্রস্তাব পেশ করা হয়ে থাকে—তার প্রতি কেউ কর্ণপাত করে না। বুঝা যায় না, তারা বধির হয়ে গিয়েছে নাকি এর প্রতিকারের কোন চিন্তাই তারা করতে পারে না। অথবা কোন অদৃশ্য শক্তির ভয় তাদের সিদ্ধান্তের পথে অন্তরায় হয়ে আছে ? এই ব্যাপারে আমিও কিছু প্রস্তাব পেশ করতাম। কিন্তু পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী আমার নীরবতা অবলম্বন করাটাই অধিকতর সমীচীন। মহীষের সম্মুখে ব্যান্ড বাজিয়ে কি লাভ ? আমার পূর্বেও কিছু সংখ্যক লোক অনেক কিছু বলেছে এবং এখন নিরাশ হয়ে নীরব ভাষায় বলছেন ঃ "অন্ধদের সামনে কেঁদেকেটে নিজের চোখ খোয়ানো বৃথা চেষ্টা ছাড়া লাভ কি ?"

দাসদেরকে দাসত্বে সম্মত করা

১৯৫৪ সালের ২৫শে মার্চ বিপ্লবী কাউন্সিল আযাদী পন্থীদের বহাল করতঃ কয়েদীদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আযাদ অফিসার এবং মুহাম্মাদ নাজীবের মধ্যে আপোষ চুক্তির পর এই ফায়সালা জারি করা হয়। কিন্তু এটা প্রকৃত আযাদীর দিকে কোন পদক্ষেপ ছিল না। বরং এটা ছিল জনসাধারণের চোখে ধূলা নিক্ষেপের অপচেষ্টা মাত্র। পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই পদক্ষেপ ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে নস্যাতের সূচনা মাত্র। সে যাই হোক এই ফায়সালার পর আমাকে সামরিক কয়েদখানা থেকে সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকার সময় ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯৫৪ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে জামাল আবদুন নাসের তার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রীসভার কার্যকালে বরং প্রকৃত প্রস্তাবে জামাল আবদুন নাসেরের গোটা শাসনকাল মিসরের ইতিহাসে জঘন্য প্রকৃতির নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। নাসেরের স্তবকরা যদি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের শত্রুতায় অন্ধ না হয়ে যেতো এবং ইনসাফ ও সুবিচারের সীমা পরিপূর্ণরূপে অতিক্রম না করতো তাহলে নাসেরের গুণাবলীর সাথে তার দোষ-ত্রুটিরও উল্লেখ করতো। তার "গুণাবলীর" কয়েকগুণ অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হতো। প্রকৃতপক্ষে তার দোষ-ত্রুটি ছিল গুণাবলী অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। নাসেরের হাতে নিরপরাধ মানুষের যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে তাকে এই তোষামোদকারীরা শুধু সংস্কার বলেই দায়িত্ব শেষ করে থাকেন। এটা ইতিহাসের সাথে সরাসরি জুলুম এবং জাতির সাথে নির্মম তামাশা মাত্র।

www.amarboi.org

কালের আয়নায় মিসর ও মিসরের বাইরের অবস্থা

ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার জন্য ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার নৌবহর দূরপ্রাচ্যে এসে পৌঁছে। সংবাদপত্রে খবর বের হয় যে, লাল চীনের সেনাবাহিনী ইন্দোচীনের যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছে। যার ফলে ফ্রান্স আমেরিকার নিকট সামরিক সাহায্য চেয়েছে। অনুরূপভাবে সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয় যে, ইরাক মধ্যপ্রাচ্যে হস্তক্ষেপের জন্য আমেরিকার কাছে আবেদন জানিয়েছে। ফ্রান্স ইন্দোচীনকে স্বাধীনতা দানে সম্মত হয়েছে এবং শীগ্রই দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময়েই ইস্রাঈল সরকার তার আশেপাশের আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে। ঐসব আরবদের শাসকগণ তাদের চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক শত্রুর বাড়াবাড়ির জবাবে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে প্রতিবাদমূলক বিবৃতি ও তর্জন গর্জন করে ইস্রাঈলকে ভীতি প্রদর্শনের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

১৯৫৪ সালের মে মাসে উস্তাদ আহমদ আবুল ফাতাহকে দশ বছর ও উস্তাদ আহমদ হোসাইন মরহুমকে পাঁচ বছর কারাদন্ডের ফরমান শুনিয়ে উভয়ের মৃত্যুদন্ড মওকুফ করা হয়। "আল মিসরী" পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল এবং এর প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই মাসেই নিরাপত্তা পরিষদ আরবদের বিরুদ্ধে ইস্রাঈলের সাহায্য করার প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে ফিলিস্তিন সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে ইস্রাঈলের যে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় তার প্রত্যুত্তরে আরব শাসকরা শুধু শ্লোগান ও জ্বালাময়ী বক্তৃতার সাহায্যে নিজেদের ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এরূপ শ্লোগান দ্বারা না কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে আর না ভবিষ্যতে হওয়া সম্ভব। ফিলিস্তিন সমস্যার ব্যাপারে এই লোকগুলো কখনো কোন সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেনি। তা না হলে এই অঞ্চলের জনগণ অধিকৃত ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য লক্ষ লক্ষ গর্দানের নজরানা পেশ করতে সদা প্রস্তুত।

মুর্শিদে আ'মের সিরিয়া ও লেবানন সফর

১৯৫৪ সালেই মুহতারাম মুর্শিদে আ'ম জনাব হাসান আল হুদাইবি লেবানন ও সিরিয়া সফর করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে ইখওয়ানদের অবস্থান ও সার্বিক অবস্থা জেনে নেয়া। তৎকালে আবদুন নাসেরের সরকার ও ইংরেজদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। মুর্শিদে আ'ম উক্ত চুক্তির ব্যাপারে কতিপয় প্রশ্নের জবাবে সুস্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করেন। তাঁর এই মত জামাল আবদুন নাসেরের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় হয়। পরবর্তী কালে সংঘটিত ঘটনাবলীতে নাসেরের সেই অসন্তোষের বিশেষ প্রভাব ছিল।

এসব কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত

যদি আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারিত না করে থাকে—তাহলে আমার মনে হয় যে, ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন উজীরে আওকাফ হিলমী ঈসা পাশা নাহাস

www.amarboi.org

পাশাকে একটি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে হিলমী ঈসা পাশার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, তিনি যে মসজিদে জুমার নামায পড়তে যান সেখানে রাজনৈতিক শ্লোগান দেয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তখন নাহাস পাশাকে সরকার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল এবং জনগণ তাকে মসজিদে দেখতে পেয়ে তাঁর পক্ষে শ্লোগান মুখর হয়ে উঠছিল। এই পরিস্থিতিতে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে, এসব লোক মূলত একই মতের লোক। নাহাস পাশা তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কালে অন্যদের বিরুদ্ধে যেসব প্রতিহিংসামূলক নির্দেশ জারী করেছিলেন সেসব ফরমানই এখন তার বিরুদ্ধে কার্যকরী হচ্ছিলো। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত মসজিদসমূহের খতিবদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই নির্দেশ জারী করা হতো যেন তারা রাজনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে কোন আলোচনা না করেন। আমি মনে করি, খতিবগণ যদি রাজনৈতিক সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করে জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তাহলে তাতে কি ক্ষতি হবে? মসজিদ কি এমন স্থান নয় যেখানে মুসলমানদেরকে তাদের জীবন সমস্যার সাথে পরিচিত করে তার সমাধান অবহিত করে দেয়া যেতে পারে? রাজনৈতিক কার্যকলাপ কি মানুষের জীবনের অংশ নয়? এমন খতিবদের সম্পর্কে জনসাধারণের অন্তরে কতটুকু সম্মান বোধ থাকবে যাদের ব্যাপারে তাদের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, তারা তাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়ে মুখ খুলতে পারে না। নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞান এমন সব বিভাগ যে সম্পর্কে খতিবগণকে জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামী দৃষ্টিভংগী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা উচিত। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্কন্ধের ওপর এমন সব দুর্বহ বোঝা তুলে নিচ্ছেন যার পরিণতি কালই তাদের নিয়ে ডুববে। তাদের এই বাড়াবাড়ির কারণে একদিন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা এরূপ আচরণ করেছিলে কেন? অপরাধী ব্যক্তি তার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু তার কোন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক সে খুঁজে পাবে না। বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মস্তক অবনত হয়ে পড়বে। আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি আমাদের প্রত্যেকে মানুষের পরিবর্তে সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলে তাহলে যাবতীয় অন্যায় আপনা থেকেই নির্মূল হয়ে যাবে এবং আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানজনক আসনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবো। আমাদের বিপদ হচ্ছে এই যে, আমরা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তালাশে একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছি অথচ চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আমরা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করছি না। জবাবদিহি করার দিন নিশ্চিত আসবে সেদিন কোন বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো কোন কর্তৃত্ব চলবে না।

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তোমরা শুধু তাই লাভ করতে পারো

১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে আবদুন নাসের ও ইংরেজদের মধ্যে চলে যাওয়ার প্রাথমিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির ব্যাপারে ইখওয়ান তাদের লিখিত অভিমত প্রধান মন্ত্রীর সমীপে পেশ করেছিলো। ঐ বছরই আগষ্ট মাসে উস্তাদ আল

www.amarboi.org

হুদাইবির বাড়ীর নিকটবর্তী মসজিদুর রওদায় ইখওয়ানের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘাত ভবিষ্যত ঘটনাবলীর সূচনা এবং ইখওয়ানকে ভীত সন্ত্রস্ত করার সর্তক সংকেতের নামান্তর। এই সময় কেন্দ্রীয় অফিসে ইখওয়ানদের খুব কমই দেখা যেতো। তথাপি ডাক্তার খামীস মরহুম নিয়মিত কেন্দ্রীয় অফিসে উপস্থিত থাকতেন। আর আমি অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। অনুরূপ আমি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জাওদা রাইস মার্চেন্টের দোকানে খানুল খালিলীতেও বেশীর ভাগ সময়ে চলে যেতাম। যেখানে আযাদ অফিসার এর লোকদের সাথে আমার দেখা সাক্ষাত হতো। এসব দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল ইখওয়ান ও আযাদ অফিসার-এর মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিলো তার প্রতিকার হতে পারে। সেই দিনগুলো ছিলো বড় বিপজ্জনক এবং মওসুমের দিক থেকেও ছিল ভীষণ গরম। আমি তখনই অনুমান করেছিলাম যে, জামাল আবদুন নাসেরের পক্ষ থেকে ইখওয়ানের ওপর মুসিবত অত্যাসন্ন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নির্ধারিত হয়ে গেছে তা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। ইখওয়ানের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত কিছু কিছু লোকের জন্য শাহাদাত প্রতিক্ষার প্রহর গুণছিল। একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইখওয়ান নেতৃত্ব তাদের স্বভাবসুলভ সরলতার কারণে প্রতারিত হয়েছিল। সত্য কথা হলো, আল্লাহর ফায়সালা ও নিয়তির সম্মুখে কোন বুদ্ধিমত্তা কাজে আসে না।

ইখওয়ানের নেতারা তো সাধারণ মানুষ। তাকদীরের সামনে নবী রাসূলগণও অসহায় হয়ে পড়েন। একবার মদীনা মনোয়ারাতে কতিপয় বদ্দু (গ্রামীণ অশিক্ষিত আরব) নবী (সা)-এর খেদমতে এসে হাজির হয়। তারা ছিল পীড়িত। কিছুদিন অবস্থানের পর সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করে। সাথে সাথে আরো আবেদন জানায় যে, তাদের সাথে কিছু সংখ্যক ক্বারী ও হাফেজে কুরআনও প্রেরণ করা হোক। যারা তাদের গোত্রের লোকজনকে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা দিবে। নবী (সা) কয়েকজন সাহাবীকে তাদের সংগে পাঠিয়ে দিলেন। মদীনা থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর বদ্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। ক্বারীগণকে শহীদ করে ফেলে এবং বকরীর রাখালদেরকে মেরে বকরীর পালগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে খুবই মর্মাহত হন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর তো ওহী অবতীর্ণ হতো এবং আল্লাহ যখনই চাইতেন বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর নবী (সা)-কে দিকনির্দেশনা দিতেন। এখন এ ব্যাপারে কোন মুসলিম একথা বলতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতারিত হয়ে ছিলেন। এটা ছিল আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা। যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। যদি ১৯৫৪ সালের দিনগুলো আবার ফিরে আসে তাহলে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পুনরায় আবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কেননা তাকদীরকে বদলানো যায় না এবং আল্লাহর ফায়সালা থেকে পালিয়ে বাঁচাও সম্ভব না। এজন্য যে-ই এই বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলে যে, যদি বিচক্ষণতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো তাহলে এমনটি ঘটতো না। আর যদি সর্তকতা অবলম্বন করা হতো তাহলে ধোঁকার ফাঁদে পড়তে

www.amarboi.org

হতো না। সে মূলত আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ও ফায়সালা সম্পর্কেই অনবহিত। আল্লাহ তায়ালার প্রতিটা কাজেই হিকমত লুকায়িত থাকে। যা কেবল সেই হাকীম এবং খাবীরই পরিজ্ঞাত। তিনি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে তা জানা কিছুতেই সম্ভব নয়। মানুষকে তার সকল চেষ্টা-তদবীর এবং চিন্তা-ভাবনা পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা উচিত। সাথে সাথে তার জেনে রাখা উচিত যে, ফলাফল সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার ইখতিয়ারাধীন। কোন মানুষ জানে না যে, আগামীকাল তার সাথে কি আচরণ করা হবে।

সর্বাবস্থায় অস্থিরতা জাঁহাপনা !

আমি স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে তার আলোতে অসংখ্য যুবক ছেলেমেয়েকে দেখতে পাই। তারা ইখওয়ানুল মুসলিমুনে শামিল হয়েছিল কিন্তু পরক্ষণে এর কোন দুর্বলতার কারণে নয় বরং নিজেদেরই অপারগতার কারণে সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এরপরও তাদের অন্তরের অন্তস্থলে এবং অনুভূতির পরতে পরতে সর্বদা কল্যাণ ও মংগলের অনুভূতি কার্যকর রয়েছে। একবার যদি কেউ সংগঠনের রংয়ে নিজেকে রাঙিয়ে নেয় তাহলে তা একেবারে মুছে ফেলা খুবই কষ্টসাধ্য। এসব যুবক যুবতীরা সংগঠন থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হৃদয় মনে সংগঠনের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করে এবং যে সংগঠনের স্নেহ ছায়ায় এক সময় তারা প্রশিক্ষণাধীন ছিল তার দিকে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের জন্য তাদের চিত্ত অস্থির থাকে। কালের আবর্তন এবং ঘটনা প্রবাহ এই সুন্দর স্মৃতিগুলোকে নিষ্প্রভ করে ফেলতে পারে না। যে ব্যক্তিই কোন সময় ইখওয়ানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনন্তর বিপদ মুসিবত সহ্য করতে না পারার কারণে ইখওয়ান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে তারপরও তার আচার আচরণ এবং জীবনের দিবা-রাত্রিগুলোর ওপর দাওয়াতের গভীর ছাপ সব সময়ই বিদ্যমান রয়েছে।

নিজের অক্ষমতার কারণে ইখওয়ানকে ছেড়ে যাওয়া সাথীরা অন্যদের দৃষ্টিতে সর্বদাই ইখওয়ানী বলেই পরিগণিত হতে থাকে। তাদের কেউ যদি শপথ করেও বিশ্বাস করাতে চায় যে, ইখওয়ানের সাথে তার সম্পর্কের লেশমাত্রও নেই তবুও মানুষ তা বিশ্বাস করে না। জামাল আবদুন নাসেরের আমলে বহুবার এমন হয়েছে যে, ইখওয়ানের প্রাক্তন সাথীদেরকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকি যেসব লোক তার পক্ষে শ্লোগান দিয়ে থাকে এবং তারই প্রশংসায় গীতি ও কীর্তিগাঁথা শত মুখে গেয়ে বেড়ায় তাদের ব্যাপারেও কোন পার্থক্য করা হয় না।

মিষ্টার গান্ধীর উদ্ধৃতি ও উদাহরণ

১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দু নেতা মিষ্টার গান্ধীকে ইংরেজরা মুক্তি দেয়। গান্ধীর মুক্তি পাওয়ার ফলে স্বাধীনতাকামীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। উত্তম দৃষ্টান্ত যার পক্ষ থেকেই পেশ করা হোক কিংবা কোন দ্বীন অথবা মিল্লাতের বিশেষজ্ঞ

www.amarboi.org

প্রশংসনীয় কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক তাহলে তার প্রশংসা বর্ণনা করতে কার্পণ্য প্রদর্শন করা অনুচিত। আমি গান্ধীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। এর লক্ষ্য এই বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, নিজেদের অধিকার আদায়ের পথে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত দেখে ঘাবড়ে যাওয়া ও মুষড়ে পড়া আদৌ উচিত নয়। আত্মসম্মান নিয়ে যে ব্যক্তি প্রাণপণ সংগ্রাম করে যেতে থাকবে সে অবশ্য তার অভিষ্ট লক্ষ অর্জনে সক্ষম হবে। এই দুর্বল, ক্ষীণকায় ও অর্ধউলংগ গান্ধী তার লক্ষ্য অর্জনে অধ্যবসায় ছিল আপোষহীন। সে তার আমলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি ইংরেজকে বলে দিয়েছিল যে, আমাদের দেশ ছেড়ে চলে চাও। উপনিবেশবাদী ইংরেজ সরকার তাকে কারাবন্দী করে এবং কষ্ট দিতে থাকে। সে ছিল দুর্বল এবং বৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও সে শক্তিধর উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করে নেয়। উত্তম শিক্ষা যেখান থেকেই পাওয়া যাক না কেন তা গ্রহণ করা উচিত। গান্ধী অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যদি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন পাগল পারা হতে পারে তাহলে ইসলামের অনুসারীদের তাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরো অধিকতর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

মূর্তির প্রেম থেকে হাত গুটিয়ে নাও এবং আপন খুদীতে নিমগ্ন হয়ে যাও

আমার মনে পড়ে একদিন আমার বড় ভাই আসিউতের কারাগারে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। কথাবার্তার মাঝে তিনি আমার মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন এবং উপদেশের ভংগীতে বলেন আমি যেন সরকারের সহযোগিতা করি যাতে জেলখানার মুসিবত থেকে নাজাত মিলে যায়। আমি তাঁর এই অনুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তার নিকট আবেদন জানাই যেন এ বিষয়ে কোন কথাই তিনি আলোচনায় টেনে না আনেন। অন্যথায় আমি আগামীতে আর কখনো তার সাথে সাক্ষাতই করবো না। ভাইসাহেব আমার কথা হৃদয়গম করতে সক্ষম হন এবং এই প্রসংগে আর কোন কথাই বলেননি।

কারো এরূপ মনোভাব পোষণ করা উচিত নয় যে, জেলখানা একটা আরামদায়ক জায়গা কিংবা নিজ বাসস্থানের তুলনায় অগ্রাধিকার যোগ্য। কিন্তু আমার আকীদা-বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে বাড়ীতে অবস্থান করা এবং অপমানিত ও লাঞ্ছনাকারী শক্তির সম্মুখে মাথানত করা কারাগারের কঠোরতার তুলনায় সহস্রগুণে বেশী কষ্টদায়ক। জেলখানার শত কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে মানুষের মন একথার ওপর অবশ্যই সান্ত্বনা লাভ করে যে, সে অন্তত শত্রুর সম্মুখে মাথানত করেনি। সে তাকে ভয় করেনি বা তার সামনে সন্ত্রস্তও হয়ে পড়েনি। স্বীয় অক্ষমতা এবং জালিমের শক্তি ও দাপট সত্ত্বেও সে জালিমের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিয়েছে। আমি অবশ্য প্রখ্যাত আরবী কবি আনতারার কথার প্রতিধ্বনী করছি না যেখানে এই স্বনামধন্য ও জগৎ বরেণ্য কবি এই উক্তি করেছিলেন যে, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জাহান্নামে চলে যাওয়াও উত্তম বৈকি ! কেননা আমরা সকলেই

www.amarboi.org

জাহান্নামকে ভয় করে থাকি এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি। যা হোক আমি আনতারার মনোভাবের এই দিকটি সমর্থন করছি যে, মানুষ তার আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য যে পরীক্ষা নিরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে থাকে—তা তার জন্য কঠিন এবং কঠোর হওয়া সত্ত্বেও সহজ ও সুগম হয়ে যায়।

সরকারের অন্ধ আনুগত্য ও গোলামীর এই পংকিল পরিবেশে আল্লাহ্ তাঁর পুত-পবিত্র বান্দাদের কাউকেও যদি হেফাজত করেন তাহলে সেটাই চরম সৌভাগ্য।

দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ—এই আত্মীয় পরিজনের সম্পর্ক

ইখওয়ানুল মুসলিমুনে শামিল হওয়ার প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন আমি সংগঠনের কাজকর্মে কার্যত অংশগ্রহণ করতে শুরু করি তখন আমাকে সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মাঝে মধ্যে পাঠানো হতো। একবার মানুফিয়া জিলার ছোট্ট শহর দামাহওয়াজে দু'টি পরিবারের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া হয়েছিলো। তাদের একটি পরিবারের সম্পর্ক ছিল ইখওয়ানের সাথে। আমি অপর এক ভাই ইজ্জত আবুল মুয়াতির সংগে উক্ত দুই পরিবারের মাঝে আপোষ মীমাংসা করিয়ে দিতে যাই। দু'পক্ষই ঝগড়ার বিশদ বিবরণ এবং তাতে নিজ নিজ ভূমিকার কথা বর্ণনা করলো। যা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইখওয়ানী পরিবারটি ছিল সম্পূর্ণ হকের ওপর, আমি গ্রামবাসীদের সামনে একটা উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাইলাম। মুর্শিদে আ'ম হাসানুল বান্না শহীদের পক্ষ থেকে ইখওয়ানীদের প্রতি এরূপ নির্দেশনাই ছিল। অতএব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আমি ইখওয়ানী পরিবারের কাছে আবেদন জানাই যেন তারা তাদের অধিকার ছেড়ে চলে আসে এবং তাদের বড়রা অন্য পরিবারের কাছে তাদের বাড়ীতে চলে যায়। আর এভাবে মানুষের সামনে কুরআন মজীদের আয়াত অনুযায়ী যেন দৃঢ় সংকল্পের নমুনা পেশ করা যায়।

"আর অবশ্য যারা ধৈর্যধারণের নীতি অবলম্বন করলো এবং ক্ষমার আদর্শ স্থাপনের জন্য এগিয়ে এলো নিসন্দেহে তা খুব কঠিন কাজের অন্তর্গত।"

এই ঘটনা লক্ষ্য করে গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং তারা জানতে পারে যে, ইসলাম সমস্যার সমাধান কিভাবে করে। এবং ইখওয়ানরা কিরূপে এই মূলনীতির ওপর তৎপর রয়েছে।

ঐ মাসেই আমি কালিয়ুবিয়া নামক শহরে যাই। সেখানে ওয়াফদ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক আলে আলম পাশার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। আমিও ঐ বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। একই মাসে মুকাররম আবীদ বার এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই আমলে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কোন রুকনের জন্য কোন রাজনৈতিক দলের মেম্বার হওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

www.amarboi.org

হাসানের উৎসাহ এবং সৌন্দর্য থেকে বঞ্চনা

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের ক্ষমতাশীল দলগুলো শতকরা নিরানব্বই ভাগ কিংবা তার চেয়েও বেশী ভোট লাভ করে। এই দৃশ্য দেখে আমার কতগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ে। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হিটলার শতকরা নিরানব্বই ভাগ ভোট লাভ করেছিলো। কিছু লোক মিসরীয়দের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে যে, তারা ক্ষমতাসীনদের ধৃষ্ঠতামূলক আচরণ ও অপতৎপরতার মোকাবিলায় তৎপর হয় না কেন? মিসরীয়দের অপমান ও লাঞ্ছনায় সন্তুষ্ট থাকা জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এসব লোক জার্মান, ইতা-লিয়ান, স্পেনিশ এবং পর্তুগীজদেরও ভুলে যায় যারা বর্তমানে ইউরোপের জীবন্ত জাতি হিসেবে পরিগণিত কিন্তু নিকট অতীতে তারাও এরূপ অপমান ও লাঞ্ছনার জীবনই অতিবাহিত করেছে। জার্মানীতে হিটলার নিকৃষ্টতম একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিল। ইটালী, স্পেন ও পর্তুগালে যথাক্রমে মুসোলিনী, ফ্রাঙ্ক ও সালাজার প্রমুখ আজীবন স্বৈরতান্ত্রিক থাবা বসিয়ে রাখে। এই পুরো সময়ে এই জাতিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি জাতিও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কেননা অত্যাচার নির্যাতন, গুলি, লাঠি, জেল ও জুলুম ইত্যাদি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা তাদেরকে অসহায় করে রেখেছিল। মিসরীয় জাতি অপমান ও লাঞ্ছনার ওপর কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এই জাতি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকচক্র কখনো এই জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়নি। যদি শুধু পাঁচ বছর কালই জাতিকে প্রকৃত আযাদী প্রদান করা হয় এবং জনসাধারণ মানবীয় সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে অবগত হতে পারে তাহলে আর কারো কোন মায়ের পক্ষেই তাদের পদানত করে রাখা সম্ভব হবে না। আমার ঐকান্তিক কামনা এই দেশ মাতৃকার ভাগ্য বিড়ম্বিত অধিবাসীরা যেন প্রকৃত আযাদী লাভ করে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের একটাই মাত্র উপায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

www.amarboi.org

চব্বিশতম অধ্যায়

ইখওয়ানের সামরিক সংগঠন

ইখওয়ানের সামরিক সংগঠনের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনো সম্পর্কিত ছিলাম না। এই সংগঠন সম্পর্কে খুব বেশী অপপ্রচার চালানো হয়েছে। আমি এই সংগঠনের ব্যাপারেও এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আমার এই নিবেদন হবে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত এবং সত্য নির্ভর যাতে কোন প্রকার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ কিংবা এই সংস্থার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন প্রভাব নেই।

এ বিষয়ে আমি অনুতপ্ত যে, আমি এ সংগঠনের নিয়মিত রুকন কখনো ছিলাম না। অথচ এই ব্যবস্থা স্বীয় উদ্দেশ্যপূর্ণ, বিশ্বস্ততা, সমস্যার মোকাবিলায় বীরত্ব, নিজের সকল মূল্যবান বস্তু আল্লাহর পথে কুরবান করে দেয়া এবং সর্বব্যাপী ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি অনুভূতির সমার্থক। যদি শহীদ ইমাম এই সংগঠন কায়েম করার প্রতি দৃষ্টি না দিতেন তাহলে দাওয়াতের হক আদায় করার ক্ষেত্রে অপারগ থেকে যেতেন। ইখওয়ানের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই জরুরী এবং মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। কেননা ঃ

১–প্রিয় দেশ মিসরের ওপর ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল এবং তার সমস্ত কাজ কারবার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃটিশ রাজ নিযুক্ত ভাইসরয়ের মর্জি মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছিলো।

২–ফিলিস্তিন ভূখন্ডের ওপর ইহুদীদের দখলদারী কায়েম হয়ে গিয়েছিল। ইহুদীরা দেশের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং পবিত্র স্থানসমূহের অসম্মান করে। তা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তিসমূহ আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে।

৩–বিদেশী ব্যাংকগুলো আমাদের রক্ত শোষণ করছিলো এবং আমরা যেন তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিলাম।

৪–সকল প্রকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো। চিন্তা-ভাবনা, সাহিত্য-সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য সংকলন ও রচনার কোন স্বাধীনতাই ছিল না।

ইসলামে দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা ও শৌর্য-বীর্য সবকিছুরই দাবী ছিল এই যে, এই ধ্বংসাত্মক ব্যধি থেকে মুক্তিলাভ করে নিজেদের আযাদী বহাল করতে হবে। যে ব্যক্তি এই পরিস্থিতিতেও স্বাধীনতার চিন্তা করে না এবং তা লাভ করার জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে না সে তার আকীদা-বিশ্বাস, আত্মসম্মান, দেশ ও পৌরুষ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায় এবং পাপী ও অপরাধী বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের জন্য এমন অপমান ও অসম্মানজনক অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। দ্বীন, মাতৃভূমি এবং ইজ্জত আবরুর হিফাজতের জন্য এ ছিল

www.amarboi.org

অতীব জরুরী যে দেশ মাতৃকার সন্তানগণ সামরিকভাবে নিজেদেরকে তৈরী করতে ব্রতী হবে। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কারণ যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম মুর্শিদে আ'ম এই ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। আমার দুর্ভাগ্য যে, এই সংগঠনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার সম্মান আমি লাভ করতে পারিনি।

দেশ ও জাতির হিফাজতে সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা

বলা হয়ে থাকে যে, উপরোল্লিখিত কর্তব্য সম্পাদন করার দায়িত্ব দেশের সেনাবাহিনীর এটা ঠিক। এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নেই। তথাপি যে সংস্থার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যও নিজ দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নয় বরং প্রয়োজনের সময় তাদের হাতকে শক্ত করা এবং তাদেরকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য এগিয়ে যাওয়া। এই সংগঠনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকগণ দেশ মাতৃকার সুসন্তান এবং দেশ প্রেমিক নাগরিক তাদের সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় এবং অকারণে স্পর্শকাতরতা প্রকাশ করা দুর্বোধ্য। কয়েকটা ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর একটা বিশেষ অংশ সা'ইকা নামে পরিচিত। তার দায়িত্ব সম্বন্ধেও শুনে রাখুন এটি নাগরিকদেরকে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি দেয়া, সর্তক এবং শাস্তি দেয়ার জন্য গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যোগ্যতর ছাত্রদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে রেখেছে। অতএব বিভিন্ন সংগঠনকে আকীদা-বিশ্বাস এবং দেশ ও জাতির হিফাজতের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত যুবকদের সংগঠিত করার অনুমতি দিতে বাধা কোথায়? দলীয় রাজনীতি ও কোন্দল নয় বরং শুধু দেশ ও আকীদা-বিশ্বাসের হিফাজতই এসব সংগঠনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সা'ইকার ন্যায় সেনা ইউনিট বৈধ এবং তাদেরকে দেশ ও জাতির সেবক মনে করা হয় কিন্তু ইখওয়ানের জন্য যুবকদের প্রশিক্ষণদানের অনুমতি নেই।

আমি জানি আমার একথায় অনেক লোকই খুশী হবে না বরং ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করবে। ইসলামী সংগঠনসমূহের সমালোচনাকারী কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির ভ্রান্ত তৎপরতাকে ভিত্তি করে এই ধারণাকেই ধ্বংসাত্মক মনে করা হয়। আমি না সেসব লোককে সমর্থন করি যারা এই সংগঠনের অপব্যবহার করে। আর না তাদের সমালোচনা ও বিরোধিতার কোন গুরুত্ব দিয়ে থাকি যারা খোঁড়া অজুহাতে একটা গঠনমূলক কর্মসূচীর ওপর কুঠারাঘাত করে। আমি অবশ্য আমার এই মনোভাব দ্বারা কাউকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছি না। আমার উদ্দেশ্য স্বীয় দ্বীন ও দেশের কল্যাণ সাধন করা। যদি আমার মতামত সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত তাওফিকের বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। আর যদি সঠিক না হয়ে থাকে তবে তাকে আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা মনে করতে হবে। মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণাঙ্গ। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিটি কথা যথার্থ সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে মানুষকে পরিচালনা করতে পারেন।

www.amarboi.org

হাসান আল হুদাইবির নির্দেশনা বনাম সামরিক সংগঠন

দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম জনাব হাসান আল হুদাইবি (র) ইউসুফ তালাত শহীদকে যখন বিশেষ সংস্থার প্রধান নিযুক্ত করেন তখন সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছিলেন যে, এটা কোন গোপন সংগঠন নয়। কিংবা এর তৎপরতাও গোপন নয়। এর উদ্দেশ্য সরকারের ক্ষমতার মসনদ উল্টে দেয়া নয়। বরং এর সাহায্যে যুবকদেরকে উন্নত চারিত্রিক গুণ সম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে দেয়া। যারা মনে করে যে, দুই এক হাজার যুবকের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য পুলিশ গার্ড ও সিকিউরিটি বিভাগের কর্মচারীদের পরাজিত করা যেতে পারে—তারা পাগলের স্বর্গে বাস করে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট, যার গুরুত্ব ও উপকারিতা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমাদের কাছে এমন লোকদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা থাকতে পারে যারা উজ্জ্বল দিবালোককে অস্বীকার করতে কোন প্রকার ইতস্তত বোধ করে না।

বিষনাশক বিষে রূপান্তরিত হলো

১৯৫২ সালে জুলাই মাসের পট পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল প্রিয় দেশ থেকে অন্যায়ের কুৎসিত কলঙ্ক দূর করা এবং কল্যাণ ও মংগলের বিস্তৃতি ঘটানো। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এই উদ্দেশ্য পূরো হতে পারেনি। বরং উল্টো ভাল এবং মন্দের মানদন্ডই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বিপ্লবী কাউন্সিল ও তার মন্ত্রীরা তাদের নিজেদের মনমত সমস্ত কাজকর্ম করে যেতে লাগলো। প্রতিদিন এ মর্মে লজ্জাজনক খবরাদি প্রকাশ হতে লাগলো যে, অমুক চিত্রাভিনেত্রী অমুক মন্ত্রীর প্রেমিকা। এ ধরনের একটি ঘটনা এতটা ছড়িয়ে পড়ে যে, তার দুর্গন্ধ গোটা পরিবেশকেই কলুষিত করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত ঘটনার সাথে জড়িত বিদেশী প্রেমিকাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আবদুন নাসেরের মৃত্যুর পর সেই কুখ্যাত চরিত্রহীনা নারী মিসরে ফিরে আসে। এয়ারপোর্টে তাকে যে উষ্ণ সম্মানজনক অভ্যর্থনা জানানো হয় তা সর্বস্তরের মানুষের জন্য ছিল বিস্ময়কর। উক্ত নারী সম্পর্কে জানা যায় যে, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। তাই সে তার মেজবান দেশে নিজের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ইচ্ছায় অবস্থান করতে থাকেন। উল্লেখিত মহিলা সম্পর্কে শুনা যায় যে, তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে। তাই হৃত সাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থ করেছেন। না আছে কারো লাজ লজ্জার বালাই আর না তার অনুভূতি। চিত্র তারকা যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আমাদেরকে দেশ প্রেম, প্রতিশ্রুতি পালন এবং উন্নত ও মহৎ চরিত্রের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, অথচ বাস্তবে তিনি নিজেই এসব উন্নত নৈতিক গুণাবলী শিষ্টাচার ও শালীনতাবোধ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং পুণ্যশীলতা, পবিত্রতা ও লজ্জার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই।

যেসব আকাশ কুসুম কল্পনা ও রংগীন স্বপ্নের দাবীতে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার নাকের ডগায় তিনি সকল অন্যায় অশ্লীলতার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ওপরে বর্ণিত

www.amarboi.org

নির্লজ্জতা থেকেও অগ্রসর হয়ে এই অপরাধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, শক্তিধর ও ক্ষমতাশালী লোকেরা কোন নারীকে দেখেও তার রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বেচারা স্বামীকে শক্তির বলে বাধ্য করতো তার স্ত্রীকে তালাক দিতো, যাতে সে তাকে তার শয্যা সংগিনী রূপে বরণ করতে পারে। বেচারী তালাক প্রাপ্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে বিবাহের অভিনয় করা হয়। এর চেয়েও অধিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হতো রূপালী পর্দার সুন্দরীদেরকে সরকারী তত্ত্বধানে প্রশ্রয় দিয়ে। ক্ষমতাসীনরা তাদের নিয়ে মহাশূন্যে উড়ে বেড়াতে থাকে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পর তাদেরকে এসব উচ্চস্থান থেকে এমনভাবে নীচে ছুঁড়ে মারে যে, তাদের ঘাড় ভেংগে চুরমার হয়ে যায় এবং শরীরের সবগুলো সুন্দর অংগ-প্রত্যাংগ যার সাহায্যে হাজার হাজার মানুষকে বিপথগামী করা হয়েছে—মাটিতে এমন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যে, তা শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়ে যায়। আলেকজান্ডার ও চেঙ্গিজের হাতে পৃথিবীতে শত শতবার সম্মানিত মানুষের ইজ্জত-আবরু ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

তোমাদের কিন্তু লজ্জা নেই

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এসব সুন্দরী শিল্পি দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং সর্বত্র তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। বিয়ে ছাড়াই যা হয়ে থাকে সেটা আল্লাহই ভাল জানেন কিন্তু প্রতি কয়েক মাস পর পর প্রত্যেক মক্ষীরাণী কোন নতুন স্বামীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে আমার বোধগম্য নয়। কোন পুরুষের মধ্যে যদিও বিন্দুমাত্র মর্যাদাবোধ এবং পৌরুষ থেকে থাকে, সে কি করে এমন রমণীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হতে পারে যে প্রতিটি আসরের প্রদীপ এবং প্রত্যেকের শয্যা সংগিনী হওয়ার জন্য থাকে সদা প্রস্তুত। হে আল্লাহ আমাকে সকল প্রকার অন্যায় অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করো এবং ক্ষমা করে দাও। নিসন্দেহে তুমি অতীব ক্ষমাশীল।

নাসেরের ব্যক্তিত্ব ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

কেউ কেউ আমার কাছে দাবী করে যে, আমি যেন নাসেরের শাসনব্যবস্থা ও তার ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরি এবং তার নেতিবাচক দিকগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখি। অথচ আমি নাসেরের ব্যক্তিত্বের ওপর কখনো কোন আক্রমণ করিনি। কিংবা তা করার অভ্যাসও আমার নেই। তথাপি নাসের দেশ ও জাতির ব্যাপারে যেসব বাড়াবাড়ি করেছে তাথেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা ইতিহাসের সাথে গাদ্দারী এবং সত্য ও সততার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গেরই নামান্তর। আমি কোন মানুষেরই মহৎ গুণাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করি না। নাসেরের ব্যাপারে তার ঘনিষ্ট কিছু বেসামরিক সংগী-সাথীদের নিকট আমি শুনতে পেয়েছি যে, সে মদ পান করতো না। অনুরূপ আরও জনশ্রুতি রয়েছে যে, সে নারীদের পশ্চাতে ছুটে বেড়াতো না। সুদানে সামরিক দায়িত্ব পালন করার সময় তার ব্যাপক সুখ্যাতি ছিল যে, সে অধিকাংশ সময়ই একাকী ও নিঃসংগ অবস্থায় অতিবাহিত করতো। নিজের ফৌজী সাথীদের সম্পূর্ণ বিপরীত খেলাধূলা, আনন্দ-উল্লাস ও ক্লাবগুলোতে রাত্রিযাপন করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতো।

www.amarboi.org

তাঁর জীবনের এই ব্যতিক্রমী দিকগুলো নিসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু তার রাজনৈতিক নেতিবাচক দিকসমূহ এবং অসৎ বৈশিষ্ট্যে কলঙ্কিত ও কলুষিত। আভ্যন্তরীণ জুলুম-অত্যাচার ছাড়াও সকল মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুতা কুড়ানো কেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ? নাসেরের স্তবক লেখকদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ছোট বড় সবাইকে গালী দেয়া এবং প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা কি তাদের নিকট ইতিবাচক কৃতিত্বের পরিচায়ক ? মিসরে মার্কসবাদের প্রবর্তন কোন মহৎকাজ নয়। নাসেরের মৃত্যুর পর মার্কসবাদের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ করা হচ্ছে তা থেকেও অনুমান করা যায় যে, নাসেরের কর্মকান্ডের সত্যিকার মূল্য কতটুকু।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে নাসেরের উত্তরাধিকারী আনোয়ার সাদাতের মন্তব্য উদ্ধৃত করাই উত্তম বলে মনে করি। সাদাত ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন যে, তিনি নাসেরের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে অর্থনীতি লাভ করেছেন তা শুধু শূন্যই নয় বরং শূন্যেরও অনেক নীচে। উস্তাদ মুস্তাফা আমীন (প্রখ্যাত মিসরীয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক)-এর এই উক্তি এখন প্রত্যেক মিসরবাসীর মুখে মুখে যে, নাসের প্রতি দু'টি কারখানার মাঝে তৃতীয় কারখানা স্থাপন করে যার ফলে পুরাতন কারখানা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং নতুন কারখানাও কোন ইতিবাচক কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি।

বলা হয়ে থাকে যে, নাসের অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করেছেন। সত্যিকারভাবে আমাকে বলা হোক যে, উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মিসরের কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামরত ছিল না ? উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করার পর নাসের জুলুম-নির্যাতন শুরু করলে তার অত্যাচার ও নির্যাতনের সামনে উপনিবেশবাদী যুগের জুলুম-নির্যাতন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আমি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথেই বলতে চাই যে, যদি কোন মিসরীয় আমাকে নাসেরের শাসনামলের একটিও ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখিয়ে দিতে পারে—যার ফলে দেশবাসীর সৌভাগ্য ও কল্যাণ করতে সক্ষম হয়েছে তাহলে আমি কোন প্রকার দ্বিধা না করে তা প্রকাশের জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করবো।

সাদাত নাসেরের স্থলাভিষিক্ত

সাদাতের শাসনকাল যতদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত তার সূচনা খুবই ভাল ছিল। যদিও সে রাজনৈতিক নজরবন্দী ও কয়েদীগণকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি প্রদান করেনি। তথাপি মাত্র দু'বছরের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। আমার ধারণা যে, এই বিলম্বের কারণও ছিল মূলত নিরাপত্তা বিভাগীয় আমলা এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের টালবাহানা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গুপ্ত ব্রাঞ্চের অফিস শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম রাখার ব্যাপারে যদি পরিশ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতো তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থারও উন্নতি হতো এবং জনগণকে অকারণে সমস্যার সম্মুখীনও হতে হতো না। তাদের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সরকার ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা যাতে সকল ব্যাপারেই

www.amarboi.org

উত্তমরূপে আনজাম পেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এসব লোক এর সম্পূর্ণ বিপরীত সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করতেই সদা সচেষ্ট থাকে।

সাদাতের দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম

ধারণা করা হয়ে থাকে যে, প্রথমদিকে সাদাতের আশংকা ছিল তার শাসন স্থায়ী হবে না। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে, কোন শক্ত চ্যালেঞ্জ ছাড়াই সে তার ক্ষমতার মসনদকে মজবুত করে নিয়েছে। তখন তার দেমাগও খারাপ হয়ে যায়। এক্ষণে সে তার প্রতিপক্ষের সকলকে একই লাঠি দ্বারা হাঁকিয়ে পুনরায় সেই জঘন্য কারাগারে প্রেরণ করে যেখান থেকে স্বীয় শাসনামলের গোড়ার দিকে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। এসব জেলখানার অবস্থা ছিল বর্ণনাতীত যেখানে বন্দীদের মৌলিক মানবিক অধিকারের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করা হতো না। সাদাতের শাসনামলের পরিসমাপ্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দৃষ্টান্তমূলক। নিজের ক্ষমতার নেশায় বিভোর হয়ে সে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্মিত মঞ্চে সালামী গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়েছিল। ইতিপূর্বে সে তার সমস্ত বিরোধী পক্ষকে শৃংখলিত করে ফেলে। আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে দুর্বিনীত গর্দানকে অবনত করে দিলেন যে, মঞ্চ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। চারদিকে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায় এবং সাদাত সাহেব এখানেই সবকিছু ছেড়ে পরপারের পথে পাড়ি জমান।

সেনাবাহিনীর কাজ সীমান্ত রক্ষা রাজনীতি নয়

১৯৬৭ সালের অপমানজনক পরাজয় অনুশোচনাযোগ্য ছিল অবশ্যই কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিল না কিছুতেই। ১৯৫২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন কিছু। কিন্তু সেনাবাহিনী সংস্কারের পরিবর্তে ক্ষমতার নেশায় বিভোর হয়ে পৃথক সামরিক সরকার চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন থেকেই আমাদের মনে আশংকা দানা বেঁধেছিল যে, মিসরের ওপর দিয়ে একের পর এক বিপদের ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হবে। কারণ সরকারের কাজকর্ম এবং সামরিক দায়দায়িত্ব দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কর্মক্ষেত্র। যখন কোন দেশের ওপর সেনাবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করে তখনই একদিকে তারা তাদের পেশাগত যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অপরদিকে সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধিত হয়। সামরিক বাহিনীতে নির্দেশ প্রদান এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে তার আনুগত্য করার নীতি কার্যকর। পক্ষান্তরে সরকারের কর্মকান্ড আলাপ আলোচনা, যুক্তি তর্ক, সলা পরামর্শ এবং গরিষ্ঠতা ও লঘিষ্ঠতার মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল। মহাবিজয়ের নামে অভিহীত ১৯৫৬ সালের লড়াইয়ের রহস্য উদঘাটিত হয় ১৯৬৭ সালে। যাকে পরাজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা শুধু পরাজয়ই ছিল না বরং জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা—সর্বকালের নিদারুণ অপমানের নামান্তর।

www.amarboi.org

বস্তুত তোমরা খুব কমই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো

আমাদের ধারণা ছিল এই দৃষ্টান্তমূলক পরাজয়ের পর হয়তো আবদুন নাসেরের চোখ খুলবে এবং সে তার পরামর্শ ও মন্ত্রণাদাতাদের পরিবর্তন ও বিরাজমান পরিস্থিতির আশু সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু সে বরং আরো এক প্রহসনমূলক নাটকের অভিনয় করে। সে প্রদর্শনীমূলকভাবে পদত্যাগের ঘোষণা করে বসে। যার ফলে তার চাটুকার ও তল্পীবাহকরা তাকে তোষামোদ করতে শুরু করে যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে সে যেন তার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেয়। নাসের নিজে হয়তো ধারণাও করতে পারেনি যে, এরূপ শিক্ষণীয় পরাজয়ের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। কিন্তু আমাদের জন্য এই পরাজয় কোন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। আল্লাহর কিতাব, ইসলামী শরীয়াত এবং স্বয়ং মানবজাতির ইতিহাস এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যখনই কোন ব্যক্তির একনায়কত্ব কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ধ্বংস ও বিপর্যয় এবং বিপদ মুসিবত ব্যতীত আর কিছুই দাঁড়ায় না। হিটলার, মুসেলিনী, সালাজার এবং ফ্রাঙ্কো প্রমুখ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জাতির জন্য তাই করেছিলেন। মিসরে আবদুন নাসের যার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। পূর্ব থেকেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যাতে এ পরাজয় আরো বলিষ্ঠ হয়ে যায় যে, দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম সমাগত।

একমুষ্টি মাটি কিন্তু জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত

মিসরের রাষ্ট্রীয় আইন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সংগঠনকে স্বীকার করে না। আমরা মানব রচিত আইনকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু আইনকে নিজের হাতেও তুলে নেই না। আমরা সর্বদা এ আইন বাতিল করার দাবী করে আসছি। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সংগঠন যা তাদের মুর্শিদে আ'মকে নির্বাচিত করে থাকে তা আইনগ ভাবে নিষিদ্ধ। তথাপি মুর্শিদে আ'মকে বাছাই করা হয় এবং সরকারও তা মেনে নেয়। আমি ইতিপূর্বেও আরজ করে এসেছি যে, ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা কমিটিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, কোন কারণে যদি মুর্শিদে আ'ম নিখোঁজ হয়ে যান এবং তার সহকারীও বর্তমান না থাকেন, কিংবা তিনি দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন, তাহলে কর্মপরিষদের সদস্যগণের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ সদস্য মুর্শিদে আ'ম-এর দায়িত্ব পালন করবেন। উস্তাদ আল হাসান আল হুদাইবি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার সহকারী ডঃ খামীস হামীদাও ইনতিকাল করেন। তখন ঘটনাক্রমে কর্মপরিষদের সদস্যগণের মধ্যে আমিই ছিলাম বয়োজেষ্ঠ। অতএব এ গুরু দায়িত্ব সমর্পণ করা হয় আমার ওপর। অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি আদৌ-এর উপযুক্ত নই। কোথায় হাসানুল বান্না, হাসান আল হুদ-াইবি আর কোথায় সম্পূর্ণ দুর্বল ও অযোগ্য আমি !! ইখওয়ানী ভ্রাতাগণ তাদের ভাল মন্দ সকল ব্যাপারেই আমার পরামর্শ গ্রহণ জরুরী মনে করতেন এবং ইখওয়ানের মুর্শিদে আ'ম হিসেবে সরকারও আমার সাথে আলাপ আলোচনা করেন। আমাকে

www.amarboi.org

যখন মুর্শিদে আ'ম বলে সম্বোধন করা হয় তখন আমি কোন প্রকার উল্লাস বোধ করি না। আবার তা অস্বীকারও করি না। তথাপি এদিক থেকে এটা একটা সম্মানের বিষয় যে, আমাকে মুর্শিদে আ'ম বলে প্রকারান্তরে ইখওয়ানের অস্তিত্বই মেনে নেয়া হচ্ছে। এটা একটা সান্ত্বনার বিষয়।

সাদাত আমাকে ১৯৭৯ সালে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালে মুর্শিদে আ'ম হিসেবেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে কোন রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকারী দায়িত্বপূর্ণ কোন লোকের সাথে মিলিত হওয়ার কোন অভিলাষ আমার ছিল না। আল্লাহ্ তায়ালা জানেন যে, আমি সুনাম সুখ্যাতি এবং প্রচারণা ইত্যাদিকে খুবই অপছন্দ করে থাকি। সাদাত কানাতিরুল খাইরিয়াতে আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং আমার সম্মুখেই তাঁর সচিবকে নির্দেশ দেন যেন এ সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ ও ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। আমি রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন জানাই যাতে এ সাক্ষাতের পাবলিসিটির কোন ব্যবস্থা কিছুতেই করা না হয়। আমার অনুরোধের ফলে সাদাত তার সেক্রেটারীকে পুনরায় আদেশ করেন যেন খবর প্রকাশ করা না হয়। কিন্তু পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি তো দেখে এসেছেন মানুষ রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত এবং তার পাবলিসিটির জন্য অত্যন্ত আগ্রহী অথচ আমিই ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি যে স্বয়ং এ পাবলিসিটি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করলাম। আমি শাসকদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য এড়িয়ে চলি। কারণ আমার মতে এতেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ। কদাচিৎ তাদের সমীপে গেলেও তা শুধু দ্বীনি উদ্দেশ্যেই যাই ব্যক্তিগত সুনাম সুখ্যাতির জন্য নয়।

"মুর্শিদে আ'ম উপাধিটি খুবই মর্যাদা ও সম্মানজনক। বড় বড় মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাও এই গুরু দায়িত্বের বোঝা সামাল দিতে ইতস্তত করে থাকে। আমি কোনদিন এর প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাই ছিল এরূপ যে, এ কঠিন দায়িত্বভার আমার ক্ষীণকায় স্কন্ধের ওপরই সমর্পণ করবেন। বস্তুত আল্লাহ যে ফায়সালা করেন তা অটল অবিচলই হয়ে থাকে। কে এমন দাবী করতে পারে যে, সে তার সকল কর্মকান্ডেই স্বাধীন ও খোদ মোখতার।

সুয়েজখাল জাতীয় করণ

আমার মনে পড়ে ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে অর্থমন্ত্রী সুয়েজখাল কোম্পানীর ডাইরেক্টরের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। তিনি মিসর সরকারের মুনাফার অংশ বৃদ্ধি করা এবং কোম্পানীতে মিসর সরকারের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ানোর দাবী করেন। এটা একথারই ইংগিত দেয় যে, মিসরের সকল সরকারই সুয়েজখালের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল এবং দেশের স্বার্থের হিফাজতের জন্য সবসময়ই সচেষ্ট ছিল। চুক্তি অনুসারে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত কোম্পানীকে খাল লিজ দেয়া হয়েছিল। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোটা কোম্পানী কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীতই সমুদয় সাজ সরঞ্জামসহ মিসর সরকারের মালিকানায় চলে আসবে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে

www.amarboi.org

এ চুক্তি ছিল লাভ জনক। নাসের সাহেবের মাথায় হিরো হওয়ার ভূত নগ্নভাবে সওয়ার হয়েছিল। সে নিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সুয়েজখাল জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোটি কোটি পাউন্ড বিনিময় আদায় করে এবং এর ভিত্তিতে নিজের মিথ্যা মূর্তি মানুষের মন ও মগজে বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করে। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেংগে চুরমার হয়ে যায় এবং নাসের সাহেবের আমিত্ব প্রশান্তি লাভ করে। তারপর আরো একটি শখ তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি ছাড়াই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত বোকামি করে বসে। অগণিত নিষ্পাপ যুবক এই উদ্দেশ্যহীন লড়াইয়ের অসহায় শিকার হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রের মজুদও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। অধিকাংশ জাতীয় বীর যাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা করা হয় এভাবেই তাদের জাতিকে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য ধ্বংসের অতল গহবরে ঠেলে দিয়ে থাকে। দূরের বাদ্য আনন্দদায়ক হওয়ারই নামান্তরের ন্যায় যখন এসব লোককে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় তখন তাদেরকে খড়কুটা অপেক্ষা বেশী কিছু বলে মনে হয় না।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে কায়রো এবং বাগদাদের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন ব্যবস্থার উদ্বোধন হয়। ফলে আলী সাহেব ও হোসাইন আল হাশেমী কায়রো এবং বাগদাদ থেকে যথাক্রমে একে অন্যের সাথে কথাবার্তা বলেন। আমার এই স্মৃতি কথাগুলো সেই সব নোট থেকে গৃহীত যা আবদুন নাসেরের সেনাবাহিনী আমার বাসগৃহ থেকে সমস্ত কাগজপত্র, বই-পুস্তক এবং ফাইল-নথি নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও থেকে গিয়েছিল।

১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে আমেরিকার গৌরব ও কৃতি বৈমানিক লিন্ড বার্গের পুত্রের হত্যাকারীকে ফাঁসি দেয়া হয়। অপরাধী অত্যন্ত নির্মমভাবে এই ছোট্ট শিশুটিকে হত্যা করেছিল। ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর ও পাশবিক। কিন্তু আমাদের দেশের মত এ ঘটনাকে বাহানা বানিয়ে না কোন সংগঠনকে বলির পাঠা বানানো হয়েছে না জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। লিন্ড বার্গ ছিলেন এমন এক বৈমানিক যিনি সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালে একটি ক্ষুদ্র বিমানে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত একটানা সফর করেছিলেন।[১]

---

১. চার্লস লিন্ড বার্গ যিনি বিমান যোগে উত্তমাশা অন্তরীপের ওপর দিয়ে উড্ডয়ন করতঃ নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তার নাম ছিল স্পিরিট আপ সেন্ট লুই। ইহা ছিল মহাশূন্যে উড্ডয়নের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা এবং মহাশূন্যচারীদের এক দুঃসাহসিক অভিযান। এই উড্ডয়নের পর লিন্ড বার্গের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের মধ্যেও অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে তাকে দেখা হতে থাকে। অতপর তিনি রাজনীতিতেও জড়িত হয়ে পড়েন এবং আমেরিকার স্বনামধন্য রাজনীতিবিদরূপে পরিগণিত হতে থাকেন। তারই ছোট্ট বাচ্চাকে হত্যা করা হয়েছিল।

www.amarboi.org

হোসনী মোবারকের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগী

অনেকেই আমার নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, মুহাম্মাদ হোসনী মোবারকের সরকারের সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি ? আমার জবাব হলো, তিনি কতিপয় ভাল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তার শাসনামলের সূচনা করেছিলেন। যেমন তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা আরব রাষ্ট্রসমূহের শাসকদের বিরুদ্ধে লিখনী পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকেন। আমার আকাংখা আমাদের সংবাদপত্রসমূহ এরূপ নির্দেশনা ছাড়াই যেন নিজেরাই যুক্তিসংগত কর্মপন্থা অবলম্বন করেন।

রাষ্ট্রপতি বিরোধীদলের সংবাদপত্র ও সাময়িকীকে সমালোচনার অধিকার দিয়ে একটা উত্তম ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন। মাঝে মধ্যে রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারেও নিশ্চিয়তা প্রদান করতেন যে, তিনি মৌলিক মানবাধিকারের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল এবং তিনি তার এ ভূমিকার ওপর অবিচল থাকবেন। এসব কথা আনন্দদায়ক। রাষ্ট্রপতিরও আমাদের ওপর এ অধিকার রয়েছে যে, আমরা তার এসব মহৎ গুণাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করব। এবার আসুন অপর দিকে তাকাই। আমাদেরও তার ওপর এমন কিছু অধিকার আছে যা সংকল্প সংশোধন দাবী করে আমরা সেগুলো চিহ্নিত করে তাকে জানাবো। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধানের ওপরই বর্তায়। কিন্তু যা হচ্ছে তা খুব একটা প্রশংসার যোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এমন কোন সপ্তাহ অতিবাহিত হয় না যখন বেশ কিছু সংখ্যক ইখওয়ানকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হয় না। পাকড়াও করার পর তাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ ও রূঢ় ব্যবহার করা হয়। কয়েক ঘন্টা, দিন অথবা সপ্তাহের পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু তাদের বলাও হয় না যে কেন এবং কি অপরাধে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ছেড়েই বা দেয়া হচ্ছে কেন। কোন ইখওয়ানীকে যখন আদালতে উপস্থিত করা হয় তখন আদালত সংগে সংগে তাকে মুক্তিদানের নির্দেশ জারী করে কেননা আনীত অভিযোগের কোন যৌক্তিকতা ও ভিত্তি পাওয়া যায় না।

এগুলো এমন সব জুলুম-নির্যাতন যা এই প্রতিশ্রুতির সাথে খাপ খায় না। যাতে আযাদী ও নাগরিকদের হিফাজতের গালভরা বুলি আওড়ানো হয়ে থাকে। এ নাজুক বিষয়ে বিরোধী দলের পত্র-পত্রিকায় বার বার মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা।

আমাদের এ অভিযোগ যথার্থ ও বাস্তব যা প্রকাশ করার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু আমরা বার বার বলেছি যে, আমরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার পক্ষপাতি নই। আমরা যথার্থ সমালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে থাকি। এটা খুবই দুর্বল পদক্ষেপ মাত্র। যার পরে আছে নীরবতা ও মৃত্যু। আমাদের বিরোধিতা করার কোন শখ ও আবেগ নেই। কিন্তু ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়া দ্বীনি দায়িত্ব ও জাতীয় কর্তব্য। এ কর্তব্য সম্পাদনে আমরা জঘণ্যতম স্বৈরাচারী আমলেও নির্বিকার ও উদাসীন থাকিনি।

www.amarboi.org

পঁচিশমতম অধ্যায়

সাদাতের হত্যা এবং ইখওয়ান

জনসাধারণ জানতে চায় সাদাতের হত্যাকান্ডে ইখওয়ান সমর্থিত দ্বীনি ব্যক্তিরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছে কেন ? কিছু লোক তো ইখওয়ানের বিশেষ সংগঠনকেই এ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী বলে মনে করে থাকে। আপনি যদি পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন তাহলে এ উক্তি ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং আদালতের ফায়সালা ছাড়াই রায় প্রদান করার নামান্তর প্রতীয়মান হবে।

আমি মনে করি শোনা কথা বলে বেড়ানো এবং মনগড়া গুজব প্রচারের পরিবর্তে এ ব্যাপারে ইখওয়ানের ভূমিকা তাদের মুখ থেকেই শোনা উচিত। ইনসাফের দাবী হচ্ছে এই যে, আমাদের থেকে এ পরিস্থিতি এবং এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা কি তা জেনে নেয়া। আমি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণিত স্বল্প পরিসরে কয়েকটি লাইনে এ ব্যাপারে ইখওয়ানের ভূমিকা তুলে ধরছি ঃ

১–এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরই গণপ্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মাদ হোসনী মোবারক সুস্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন যে, ঘটনার সাথে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কোন সম্পর্ক নেই। দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তির সুস্পষ্ট ঘোষণার পর সকল প্রকার গুজব বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। রাষ্ট্রপতি নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধান এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পরই এরূপ মন্তব্য করেছেন।

২–সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাসান আবু পাশাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, সন্ত্রাসীচক্র ইখওয়ানের কোন সহযোগিতা অবশ্যই পায়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলার নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্বে থাকেন। তার নিকটই থাকে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য। তারপরও একথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, সাদাতের হত্যাকারীরা ইখওয়ানের সাহায্য লাভ করেছিলো।

৩–সাদাত শুধু ইখওয়ানদেরই বন্দী করেছিল না। বরং ওয়াফদ পার্টি, হিয্‌বে আমাল, তাজাম্মু পার্টি এমন কি সাদাতের সমালোচনাকারী মসজিদের খতিবগণকেও কারাগারে বন্দী করা হয়েছিলো। ফলে সাদাতের বিরুদ্ধে এ সমস্ত দলের সদস্যগণ ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলো। তারপরও এ দুর্ঘটনার দায় দায়িত্বের বোঝা একা ইখওয়ানের ওপর কেন চাপানো হচ্ছে ? মসজিদের একজন খতিব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সাদাতের এরূপ খেদোক্তি প্রকাশ করা যে, সে এখন জেলখানায় কুকুরের ন্যায় পড়ে আছে। তার একথা দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিমের জন্য মনোকষ্টের কারণ হয়েছিলো। এদিক থেকে সাদাত তখন সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন।

www.amarboi.org

৪–আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা যার নামে আমাদের ওপর এ অভিযোগ চাপানো হচ্ছে তা বিগত ত্রিশ বছর থেকে বাতিল হয়ে রয়েছে। জামাল আবদুন নাসের সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর সংগঠনের সমস্ত সদস্য বিশেষত বিশেষ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ইখওয়ানদেরকে বর্ণনাতীত অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ দায়িত্বশীলদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপর হঠাৎ এই ব্যবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে বসে ? কবে এবং কোথায় তারা পরিকল্পনা করেছে আর কথিত সে ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপদানের উদ্যোগও গ্রহণ করে ফেলে ?

৫–একথাও বেশ শোনা যায় যে, গুলি সম্মুখের পরিবর্তে পাশ্চাত দিক থেকে চালানো হয়েছিলো। পোষ্টমর্টেমেও প্রমাণিত হয় যে, গুলি লেগেছিলো পেছন থেকে। আমি এটা তো বলছি না যে, এসব জনশ্রুতি পুরোটাই সত্য হবে। কিন্তু তারপরও এটা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রসংগত এ প্রবাদবাক্যও স্মরণ রাখা উচিত যে, আগুনের অস্তিত্ব ব্যতীত ধোঁয়া নির্গত হয় না।

বিশ্লেষণ ও গুজব

কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি তো এমন উক্তিও করেছেন যে, সাদাতকে তার উপদেষ্টা এবং অকল্যাণকামীগণই হত্যা করেছেন। আমার ধারণা আমি ইতিপূর্বে সাদাতের ব্যাপারে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করেছি। তিনি আমাদেরকে জেল থেকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন এবং চলাফেরার ও দ্বীনি মাহফিল অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এটা ছিল একটা ইতিবাচক পরিবর্তন। যার ফলে ইখওয়ান কিছুটা আনন্দ প্রকাশ এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

কোন কোন পর্যালোচকের বিশ্লেষণ এও যে, সাদাত গোড়ার দিকে ইখওয়ানের সাথে এ সদাচরণ শুধুমাত্র মার্কসবাদী তরঙ্গকে প্রতিহত করার এবং কমিউনিস্টদের উৎখাত করার জন্যই করেছিলেন। এভাবে তিনি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে চাচ্ছিলেন। তা না হলে তার নিয়ত কিন্তু ভাল ছিল না। তারা তাদের মন্তব্যের স্বপক্ষে এ যুক্তি পেশ করে থাকেন যে, সাদাত যদি সত্যিই সরল মনে এসব করতেন তাহলে ইখওয়ানের ওপর থেকে আইনগত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নিতেন এবং তাদের কেন্দ্রীয় অফিস ও বাজেয়াপ্তকৃত সহায় সম্পত্তি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তিনি এগুলোর মধ্যে কোন একটা কাজও করেননি। বরং প্রায়শই ধর্ম ব্যবসার কথা বলে কঠোর সমালোচনা করতেন এবং তার কথায় ইংগীত থাকতো ইখওয়ানের প্রতিই। আইনগতভাবে ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করে রাখার জন্য এবং তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক দল বিষয়ক আইনকে বিস্তারিতভাবে দফাবন্দী করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহকে তৎপরতার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হলেও ইখওয়ানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়।

www.amarboi.org

আমরা এসব গুজবে কান দেই না। কেননা আমরা মানুষের বুক চিরে তাদের অন্তরের খবর তো আর জানতে পারি না। এ ব্যাপারটি পুরোপুরি আল্লাহ্ তায়ালার ইখ্‌তিয়ারে । সাদাত তাঁর শাসনামলের শেষের দিকে ইখওয়ানের ওপর খুব কঠোরভাবে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার পূর্বে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ দারুল ইখওয়ানে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালায়। সেদিন থেকেই আমাদের সম্মুখে এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে পড়েছিল যে, সাদাত সাহেবের দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমরা যতদূর সম্ভব ভাল ধারণা নিয়েই কাজ করে যেতে চাই। আমাদের সামনে কুরআন মজীদের এ আয়াত সর্বদাই দিকনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে থাকে ঃ "قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى" — আমাদের এ কর্মনীতি কেবলমাত্র সাদাতের বেলাতেই নয় বরং আমাদের কোন কোন সম্মানিত বন্ধু যারা এক সময় ইখওয়ানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এমন কি ইখওয়ানের বিরুদ্ধে জামাল আবদুন নাসেরের সহযোগিতা করেছেন তাদের বেলায়ও। এরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো আর সে ওদের পিঠ চাপড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। আমরা তাদের সম্পর্কেও কখনো কোন খারাপ শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করি না। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকেও। তারা ভাল করেই জানতো এবং আমাদেরও জানা আছে যে, নাসেরের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ করা হতো এবং আমাদের ওপর যে কাদা ছোঁড়া হতো তাতে সত্যের লেশ মাত্র ছিল না।

আমার পথ ধনীর পথ নয় দারিদ্রের

আমার মনে হয় আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, ১৯৭৯ সালে ইসমাঈলীয়াতে "আল ফিকরুল ইসলামী" বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সাদাতের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মনসুর হাসানের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল যেন এ সেমিনারে সমস্ত দ্বীনি জামায়াত অংশগ্রহণ করে। তিনি এ ব্যাপারে সাদাতের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো যায়। মন্ত্রী মহোদয় একান্তভাবে কামনা করছিলেন যেন ইখওয়ান ও সাদাতের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝি দূর করে ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা সৃষ্টি করে দেয়া যায়। তাঁর কি জানা ছিল যে, সাদাত সাহেব আমার সাথে মিলিত হয়ে কি খেল খেলবেন ? এ সাক্ষাতকারের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আমার এমন কোন আগ্রহই ছিল না যে, রাষ্ট্রপতির সাথে আমার সাক্ষাত হোক আর সেজন্য কোন তদবিরও আমি করিনি। আমি শুধুমাত্র আমার রবের সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষী। যদি তিনি আমার প্রতি রাজী থাকেন তাহলে দুনিয়ার যে কোন বড় থেকে বড় জিনিসও আমার নিকট কোন গুরুত্বই বহন করে না।

এ ব্যাপারে আমি আমার রচিত গ্রন্থ "আইয়াম মা'আস্‌সাদাত"এ উক্ত সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছি। ২৬শে রমযানের রাতে যখন সংস্কৃতি ও তথ্য বিষয়ক মন্ত্রী সাইয়েদ মনসুর হাসান আমার সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ জানান

www.amarboi.org

যে, আমি যেন তার দফতরে তার সাথে সাক্ষাত করি। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যখন গমন করি তখন ভ্রাতৃপ্রতীম আলহাজ্জ আহমদ হাসনাইন (আদ দাওয়া সাময়িকীর সার্কুলেশন ম্যানেজার) ছিলেন আমার সাথে। মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে এ সাক্ষাতকার রাত সোয়া নয়টায় শুরু হয়ে সাড়ে এগারাটায় শেষ হয়। তিনি আমাকে সেমিনারে যোগদান করার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করতে থাকেন এবং আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে থাকি। কেননা আমি সাদাতের অহংকার এবং জনগণের মোকাবিলায় মিথ্যা ঔদ্ধত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। সাদাত জনসাধারণের সাথে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের আচরণ করতেন। আমার কাছে এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, কোন ব্যক্তি আমার ওপর তার প্রভাব বিস্তার করবেন, তার মার্যাদা ও অবস্থান যত উঁচুই হোক না কেন ! আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারো সামনে হস্ত প্রসারিত করতে চাই না। কিংবা মহাসম্মানিত আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অপর কারো নিকট মস্তকাবনত করতে চাই না। যে মহান সত্তার হাতে সমস্ত সৃষ্টিজগতের নিরংকুশ কর্তৃত্ব তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে আমি ভয় করি না। সৃষ্টি-কুলের কেউই কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। যদিও সে নিজে নিজেকে অনেক শক্তিধর ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করে এবং মানুষও তার শক্তিকে ভয় করে থাকে।

মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমার ক্রমাগত অস্বীকৃতির পরও তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ জানাতে থাকেন। তখন অগত্যা রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি তাঁকে বললাম। ঠিক আছে আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। কিন্তু আমি সেমিনারে অংশগ্রহণ করবো না। উজির মহোদয় বললেন, ঠিক আছে আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, আপনি দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দাওয়াত কবুল করার পর আমি অবশ্যই আমার অংগীকার পালন করবো। অতএব এতটুকু কথার পর আমি সেখান থেকে চলে আসি।

সাদাতের বক্তৃতা

আমার কল্পনারও অতীত ছিল যে, সাদাত আমার সাথে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের পরিপন্থী কোন অপ্রিয় অযৌক্তিক ভংগীতে কথা বলবেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে হবে। আমি ছিলাম সাদাতের পিতা কিংবা তদপেক্ষাও বয়সে প্রবীণ। সাদাতের মাথায় তখন ক্ষমতার ভূত সওয়ার হয়েছিল। সে মনে করছিল যে, সে যাচ্ছেতাই বলে বেড়াবে কেউ তার কথার প্রতিবাদ করার মত নেই। কিন্তু আমি ফলাফল ও পরিণতির ব্যাপারে একেবারেই বেপরোয়া। তাঁর অভদ্র ও অশালীন কথাবার্তা শুনে নীরবে বসে থাকতে পারি না। যা কিছু ঘটে গেলো তা সে কস্মিন কালেও কল্পনা করেনি। কিংবা তার তল্পীবাহী সহযোগীরা কোনদিন ভাবতেও পারেনি। ২৮শে রমযান রাতে আমি কায়রো থেকে ভ্রাতৃপ্রতীম আলহাজ্জ মোস্তফা মাশহুর এবং ডাক্তার আবদুল আযীম আল মাতআনী সমভিব্যাহারে ইসমাঈলিয়ার দিকে রওয়ানা হই। সম্মেলন স্থলে গিয়ে আমি পশ্চাৎদিকের সারিতে বসে পড়ি। কয়েক মুহূর্ত পর

www.amarboi.org

প্রটোকল অফিসার আমার নিকট আগমন করেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রথম সারিতে গিয়ে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। আমি মনে করলাম হয়তো সে আমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং পারস্পরিক বুঝাপড়ার সুবিধার্থে আমাকে সম্মুখের সারিতে নিয়ে বসাতে চাচ্ছে। আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে সামনের সারিতে চলে যাই। পরক্ষণে আমি বুঝতে পারি যে, এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমাকে সামনে নিয়ে বসানো কোন আন্তরিকতার ভিত্তিতে ছিল না। যে আসনে আমাকে বসানো হয় সেখান থেকে মঞ্চের দিকে যদি কোন সরল রেখা টানা হতো তাহলে তা সোজা সেই আসন পর্যন্ত চলে যেতো যার ওপর সাদাত সমাসীন ছিল। সম্ভবত আমাকে এজন্য সাদাতের নিকটতম আসনে নিয়ে বসানো হয়েছিলো যেন তার অভিযোগ ও দোষারোপের লক্ষ্য বস্তু বানানোর জন্য আমাকে খুঁজে বের করতে কোন বেগ পেতে না হয়। মুহতারাম রাষ্ট্রপতি ভাষণ দিতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল আমার ওপর অবান্তর অভিযোগের বৃষ্টি বর্ষণ করা। মহাত্মন আমার দক্ষিণ ও বাম এবং সম্মুখ ও পশ্চাত সব দিক থেকে তীর বর্ষণ করতে লাগলেন।

আমার ও ইখওয়ানের ওপর অগণিত আক্রমণ করা হলো। ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড, বিদেশীদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা, ছাত্রদের হাংগামা সৃষ্টিতে উস্কানি দান এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য আমাদেরকেই দায়ী করা হয়। পরিবেশ ছিল অতিরঞ্জন ও উচ্ছাসপূর্ণ। ইসমাঈলিয়ার সবুজ শ্যামল গাছপালার ডালে ডালে সবুজের মনোলোভা সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ছিলো। ঘনছায়া ও পাখীর কলকাকলী অদ্ভূত পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। এই নীরবতা ভংগকারী পরিবেশে সাদাত সাহেব পংখীরাজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বাগ্মিতা এবং কবিতা ও কাব্যের হক আদায় করছিলেন।

ধৈর্যের শেষ সীমা

গালমন্দ ও অশালীন কথাবার্তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে ধৈর্যের পাত্র কানায় কানায় ভরে ওঠে। আরও সহ্য করার যখন কোন অবকাশ রইলো না এবং ইখওয়ানের আন্দোলনের সাথে আমার আবেগপূর্ণ সম্পর্ক আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো তখন আমি সুবক্তার বক্তব্যে বাধা দিয়ে বললাম বক্তৃতার এই ধারা তার প্রত্যুত্তর দাবী করে। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে বললেন, ঠিক আছে, আমি যখন আমার কথা শেষ করবো তখন তোমাদের যা কিছু বলার ইচ্ছা বলবে-----মহোদয় পুনরায় তার অবান্তর ও অপ্রাসংগিক কথাবার্তায় অতিশয়োক্তির রং মিশ্রণ করতে লাগলেন।

সাদাত সাহেবের বর্ণানাভংগীতে উপস্থিত সকলেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি গালমন্দ উচ্চারণ ও দোষারোপ করার পর কথার সমাপ্তি টানছিলেন এই বলে যে, ওমর এটা কি ঠিক নয়? সমস্ত জাতি এমন কি তার কিছু কিছু সংগী সাথীও এই বাচনভংগী অপছন্দ করে। তিনি শুধু আমার নাম নিয়ে আমাকে সম্বোধন করছিলেন যা সকল প্রকার শিষ্টাচার ও শালীনতার পরিপন্থী। তিনি না আমার বার্ধক্যের প্রতি কোন

www.amarboi.org

সম্মান প্রদর্শন করেছেন না রমযানুল মোবারকের পবিত্র মাসের কোন তোয়াক্কা করছিলেন। ইউনিভারসিটি আমাকে আইনশাস্ত্রে যে ডিগ্রী দিয়েছিলো না তার প্রতি কোন বিবেচনা করা হয়, না তাঁর নিজের মর্যাদার প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করে। সাদাতের নিকট তখন শিষ্টাচারের মানদন্ড এবং শালীনতার সীমা এটা বৈ আর কিছুই ছিল না যে, যা কিছু তার মনে আসে.তাই সে বলে যাবে। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি হয়তো আমাকে অত্যন্ত হীন ও নীচ দেখানোর চেষ্টা করছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকেই আহত করে দুর্নাম কুড়ানোর ক্ষেত্রই প্রশস্ত করছিলেন। তার বক্তৃতা দানের সময় সে এতবেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল যে, শব্দমালাও তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে প্রতীক্ষমান। আল্লাহ তাঁকেও সাহায্য করছিলেন এবং আমাকেও। তাঁর সাহায্য এই অর্থে যে, সে যা কিছু বলতে চাচ্ছিলো তা বলার ইখতিয়ার তাকে প্রদান করা হয়েছিলো। আর আমার স্বাধীনতা এই অর্থে যে, আমি অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সকল প্রকার গালিগালাজ শুনে যাচ্ছিলাম। এই ধৈর্য ও স্থৈর্যের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার প্রত্যক্ষ সাহায্য শামিল ছিল। তাঁরই সমীপে উপযুক্ত বিনিময়ের প্রত্যাশাই আমি করছি।

কাঁপছে পাহাড় কাঁপছে তৃণভূমি ও নদীনালা

রাষ্ট্রপতির ভাষণ শেষ হওয়ার পরপরই আমি আমার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সম্মুখে না ছিল কোন লাউড স্পীকার আর না তখনো পর্যন্ত আমার মনে জবাবের কোন চিত্র অংকিত হয়েছিলো। কিন্তু অতিশয় পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ নিজেই আহলে ঈমানদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মাহফিলের ব্যবস্থাপকগণ সাথে সাথে লাউড স্পীকার আমার সামনে এনে হাজির করলো। সম্ভবত তারা মনে করেছিলো যে রাষ্ট্রপতির এরূপ নির্লজ্জ ও সাঁড়াসি আক্রমণের পর আমি ক্ষমা ভিক্ষা ও অনুতাপ প্রকাশ করবো এবং একজন অনুগত তল্পীবাহকের ন্যায় সাফাই পেশ করতে লেগে যাবো। আর তাতে সদর সাহেবের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে এবং ক্রোধের পরিমাণ কমে আসবে। জনসাধারণও এরূপ ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হবে যে, প্রেসিডেন্ট আসর মাত করে ফেলেছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল কিছুটা ভিন্ন রকম। তাদের কোন প্রত্যাশাই পূরণ হয়নি।

আমার ও ইখওয়ানের ওপর যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিলো এক এক করে আমি তার সবগুলোরই দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলাম এবং আরোপিত সব অভিযোগ সম্পর্কে বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করে দিলাম যে, এগুলো ডাহা মিথ্যার বেসাতি। পুরো সম্মেলন কক্ষে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিলো। আমি এই বলে আমার বক্তৃতার সমাপ্তি টেনেছিলাম যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ এসব অবাস্তব ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করতো তাহলে আমি আপনার কাছে নালিশ করতাম। কিন্তু আফসোস এ আপনি নিজেই হে মুহাম্মাদ ! হে আনোয়ার ! হে সাদাত ! এসব অপবাদ আরোপ করেছেন। তাই আমি আহকামুল হাকেমীন ও আ'দালুল আদেলীন

www.amarboi.org

আল্লাহর পবিত্র সত্তার সমীপেই আমার মোকদ্দমা দায়ের করছি। হায়রে মানুষটি! তুমি আমাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছো। আমি তোমার মুখ থেকে যা কিছু শুনলাম তা আমাকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত শয্যাশায়ী করে রাখবে।

ঔদ্ধত্যের মোহাবিষ্ট দুর্বিনীত মস্তক অবনত হলো

আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, সে দৃশ্য ছিল দর্শনীয়। সাদাতের ঠোঁট কাঁপছিলো এবং চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠছিলো। সে বললো ঃ উস্তাদ ওমর আমি কখনো আপনার ব্যক্তিগত দোষত্রুটি কিংবা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করার ইচ্ছা করিনি। তাছাড়া আমার অন্তরে আপনার কিংবা সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষও নেই। অতএব আপনি আপনার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিন।

এই সর্বপ্রথম সাদাত সাহেব আমাকে উস্তাদ বলে সম্বোধন করলেন। ইতিপূর্বে তিনি ওমর, হে ওমর, নামটাই আবৃত্তি করতেন। আমি বললাম ঃ "আমি আমার অভিযোগ সেখানে পেশ করেছি যেখান থেকে তা প্রত্যাহার করে নেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

সম্মেলন শেষ হওয়ার পরপরই সাদাত উজীরে আওক্বাফ ডঃ আবদুল মোনায়েম আন নাসের এবং সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রী মিষ্টার মনসুর হাসানকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। উভয় মন্ত্রীই তখনো যেসব লোক সেখানে বসে কথাবার্তা বলছিলো তাদের উপস্থিতিতেই আমাকে বললেন, "মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনার সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা তার অন্তরে পোষণ করেন না। আপনাকে কষ্ট দেয়াও তার উদ্দেশ্য ছিল না। শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি আপনার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হবেন।"

১৯৮১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ভাষণে রাষ্ট্রপতি এই ধারণা দেন যে, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কখনো সাক্ষাতকারের অভিলাষী ছিলাম না। এমন কোন প্রয়োজনও আমি বুঝতে পারিনি। কোন কোন লোক কেন এত নির্ভীক এবং গুনাহের ব্যাপারে এমন বেপরোয়া হয়ে যায় যে, জীবন্ত সত্যকে ধামাচাপা দিতে গিয়েও তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে না।

আবারো জুলুমের ঝঞ্ঝা

১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মংগলবার সকাল বেলায় সমস্ত মিসরে এক ভূতুড়ে নীরবতা নেমে আসে। যেন বিজলীর কোন ঝলক মিসরবাসীর জীবনের গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। অকস্মাৎ সমস্ত নীরবতা ভংগ করে সরকার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ধর পাকড় করতে শুরু করে। বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, এখন আর কোন অত্যাচার উৎপীড়ন করা হবে না। অথচ বিগত শাসনামলে এটা খুবই মামুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো। আপনি এমন জাতির ব্যাপারে কি ধারণা পোষণ করবেন যারা সন্ধ্যার সময় পরিপূর্ণ শান্তি ও

www.amarboi.org

নিরাপদ অবস্থায় শয্যা গ্রহণ করে, তারপর মধ্যরাতে হঠাৎ পুলিশ কোন প্রকার অনুমতি ব্যতীতই তাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তন্ন তন্ন করে ঘরের সমস্ত জিনিস তল্লাসী করে। বিস্মিত হতভম্ব নগরবাসীরা এই অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলো যে, তাদের সকলকেই হয়তো হাতকড়া পরিয়ে দলে দলে কারাগারে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হবে ? যে রাতের কথা আমি উল্লেখ করছি সেই রাতে প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর জেলখানার দরওয়াজায় পুলিশের এক একটা গাড়ী এসে দাঁড়াতো এবং তা থেকে নিরীহ ও নিরপরাধ লোকদের নামিয়ে জেলখানার অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। অনেকের মাথায় ছিল টুপি পাগড়ী ও হ্যাট। অধিকাংশকে নাংগা মাথায়ই তাদের শয্যা থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছিলো। কারো কারো পায়ে ছিল জুতা। কেউ কেউ আবার হাওয়াই চপ্পল পরিধান করে ছিলো। প্রত্যেকে ছিল বিস্ময় বিমূঢ় এই ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে যাচ্ছে !

মিসরের ওপর কি মুসিবত নাযিল হয়েছিল, আর দেশ মাতৃকার এই সন্তানদের বর্তমানে দেশের অব্যাহত শান্তি ও নিরাপত্তা কি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল ? বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনার অধিকারী লোকদেরকে ভেঁড়া-বকরীর মত জেলখানার কাল কুঠরীসমূহের মধ্যে বন্ধী করা হয়েছিলো। এই কয়েদীদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও সাংগঠনিক ধারণার সমন্বয় ঘটেছিল এক জায়গায়। আর তা ছিল এই যে, তারা সকলেই কার্টার, মেনাহিম বেগিন এবং হেনরি কিসিঞ্জারের ন্যায় ইসলামের কট্টর দুশমনদের পদতলে মস্তকাবনত করতে অস্বীকার করেছিলো। ক্ষমতাসীন সরকারের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সম্মুখে নতি স্বীকার করার পলিসি সমগ্র জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আর এটাই ছিল একমাত্র অনুভূতি যা সকল গ্রেফতারকৃতদের পরস্পরকে একই লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

তুররা জেলখানার মধ্যে আমাকে সাত নং সেলে ভাই ইবরাহীম সারফ এবং আরো কতিপয় ব্যক্তির সাথে বন্ধী করে রাখা হলো। তাদের কারো কারো নামই এখন আর আমার মনে নেই। কিন্তু উস্তাদ আল ক্বাজী মরহুম, ডক্টর ইসমাত সাইফুদ্দৌলা, জনাব আবুল ফজল আর জিযাভার ছেলেরা এবং উস্তাদ কামাল আহমদ প্রমুখের নাম আমার মনে আছে। প্রত্যেকের মুখেই ছিলো একই আলোচনা যে, এই অজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রসূত আচরণের কারণ কি ? কারো এটা জানাও ছিল না যে, কি উদ্দেশ্যে গ্রেফতারীর এই মহড়া। আল্লাহ তায়ালা যিনি সকল অপরাধ ক্ষমাকারী তিনিই মিসরবাসীদেরকে হযরত আইয়ুব (আ)-এর মত ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ফলে তারা সকল মুসিবতকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন।

জিন্দানখানার পুরনো মেহমান

ইখওয়ানুল মুসলিমুন সম্পর্কে আমি বাড়িয়ে বলছি না, আত্মপ্রশংসাও আমাদের নীতি নয়। আমাদের জন্য এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত ছিল না। ইখওয়ানের ইতিহাস এমন ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। বার বার তাদের বাড়ীতে পুলিশ মধ্যরাতে হানা দিয়েছে এবং

www.amarboi.org

তাদেরকে গ্রেফতার করে জিন্দানখানার চার দেয়ালের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে। জেল কর্মকর্তা এবং কারারক্ষীদের কাছেও এসব মেহমান অপরিচিত নয়। তারা বরং খুব ভালভাবেই তাদেরকে জানে। রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াত এবং নামাযের মাধ্যমে এই লোকেরা দীর্ঘ সময় ধরে জেলখানার কুঠরীগুলোকে আলোকিত করে রেখেছে। কতবার যে জেল কর্মকর্তাগণ গালির বৃষ্টি এবং মারপিটের তুফান দ্বারা এই লোকগুলোকে স্বাগত জানিয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অথচ এই মেহমানগণ তাদের মেজবানদের এতসব মেহেরবানী সত্ত্বেও সর্বদা হাসিমুখে এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করতে থাকে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের জন্য এই সমস্ত ধর পাকড় ও গ্রেফতার কোন প্রকার বিস্ময়ের উদ্রেক করার কারণ ছিল না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইস্রাঈলের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা ও মনোভাবের কারণে দীর্ঘকাল কিংবা স্বল্পকাল সরকারী মেহমানখানায় অতিবাহিত করতেই হবে। এই পথে ভোগ করা সকল বিপদ মুসিবত আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এটা কোন ছোটখাটো কিংবা হীন সওদা নয়। বাকী লোকদের গ্রেফতারী সম্ভবত এই জন্য ছিল যে, এই পদক্ষেপ যেন নিরংকুশভাবে ইখওয়ান নিধন হিসেবে চিহ্নিত না হয়। অথবা ভয়-ভীতির সাহায্যে নাসেরী শাসনামলের ন্যায় সকলের মুখে তালা লাগিয়ে দেয়ার ফায়সালাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

যে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, অত্যাচার নির্যাতন দ্বারা ইখওয়ানকে সত্যের পথে কুরবানী দেয়া থেকে বিরত রাখা যেতে পারে তিনি নিজেই নিজেকে প্রতারিত করছেন এবং বোকার স্বর্গে বাস করছেন। এই গ্রেফতারির বিস্তারিত বিবরণ যে ব্যক্তিই দেখতে পাবে সে-ই এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে পারবে না যে, তাদের পশ্চাতে ইস্রাঈলের নির্দেশ ছিল সক্রিয়। কতবার তারা নীরবে এমন কিছু বলে দেয় যা মুখে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এই বিষয়ে আমাদের শাসনকর্তাদের নীরবতা খুবই অর্থবহ। যিনি সবজান্তা ও প্রকৃত জ্ঞানী তিনি সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত আছেন যে পর্দার অন্তরালে কিছু রহস্য অবশ্যই আছে।

এবারের গ্রেফতারির পূর্বের আমলে সাধারণ কয়েদীদেরকে ইখওয়ানীদের সাথে মিলিত হতে দেয়া হচ্ছিলো না। কারারক্ষীগণ ইখওয়ানের সাথীদের সাথে মাঝে মধ্যে যেসব কথাবার্তা বলতো তা একথার ইংগীত বহন করতো যে, ইখওয়ান সমস্ত অনিষ্টের জন্য দায়ী এবং সন্ত্রাসী। ইখওয়ানের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন তারা এসব কথা নীরবে হজম করতেন এবং কোন প্রকার প্রত্যুত্তর করতেন না। তাদের দৃষ্টিতে "অজ্ঞ মূর্খদের জবাবে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়"—মূলনীতি এমন পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম কর্মপন্থার মর্যাদা রাখছিল। কিছু কিছু আবেগপ্রবণ ইখওয়ান অবশ্য এসব কথাবার্তা শুনে নিশ্চুপ থাকতে পরতো না এবং এসব মিথ্যা অভিযোগের যথোপযুক্ত জবাব দিতো।

এসো হে বুলবুল এক সাথে আহাজারি করি

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত গ্রেফতারের ঘটনার পর বিভিন্ন দলের সাথে সম্পর্কিত লোকদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে জেলখানায় রাখা হয়। ওয়াফদী,

www.amarboi.org

নাসেরী, ইখওয়ানী এবং তাজাম্মুয়ী সবই ছিল একাকার হয়ে। অবশ্য তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। যখন কোন কয়েদীর বাড়ী থেকে খানা আসতো তখন তারা সকলেই তা মিলে মিশে ভাগ করে খেতো। আমার মনে পড়ছে আমার বার্ধক্য অবস্থার কারণে ইখওয়ান ছাড়াও অন্যান্য সকল দলের সদস্যগণই আমাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন এবং আমার আরাম আয়েশের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতেন। হিযবে তাজ্জাম্মু দলের কোন কোন সাথী তো তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতো। আমার বাড়ী থেকে যদি কোন জিনিস আনানোর প্রয়োজন হতো অথবা কোন পয়গাম পাঠাতে হতো তাহলে এই বন্ধুগণ একান্ত সহৃদয়তার সাথে এই খেদমত আঞ্জাম দিতেন। মিসরীয় কবি শাওকী (র) কতই না চমৎকার উক্তি করেছিলেন যে, দুঃখে সহমর্মিতার অন্তরসমূহকে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ করে দেয়। হয়ত আমাদের ব্যাপারটাও এমনি একটা কিছু ছিল। বুলবুলদের দুশ্চিন্তা ছিল ফুলের জন্য, আর কবির ছিল ব্যথায় ভরা দরদী অন্তর। কিন্তু বিপদ মুসিবতের অংশীদারীত্ব দু'শ্রেণীকেই একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো।

প্রত্যেক পক্ষেরই নিজ নিজ মতামত ছিল যা অন্যেরা পুরো শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আলাপ আলোচনা থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করা হতো। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সহযোগিতা এবং কল্যাণকামিতার অনুভূতিও অনুপ্রেরণাই ছিল এই সময় বেশী কার্যকরী ও সময়ের দাবী। ব্যায়াম, পরিশ্রম, সাহিত্য, সংগীত, রাজনীতি এবং বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ, মোদ্দাকথা সকল বিষয়েই আলাপ আলোচনা হতো কিন্তু কোন ব্যাপারেই কোন বড় ধরনের মতানৈক্য দেখা দিতো না। এই সমস্ত ব্যাপারেও যদি কোন ভুল বুঝাবুঝি দেখা দিতো তাহলে তা আপোষ, আদব ও শিষ্টাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। ইত্যবসরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যে কাদা ছোড়াছুড়ি করা হতো তার কোন নাম নিশানাও এখন আর পরিদৃষ্ট হতো না। আফসোস ! সেই সখ্যতা ও হৃদ্যতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য জেলখানার চার দেয়ালের বাইরে এসে কেন স্থায়ীভাবে ধরে রাখা গেলো না।

নিজের কয়েদী বন্ধুদের সম্পর্কে আমার অন্তরে অকৃত্রিম মর্যাদা ও ভালবাসা সদা জাগরুক রয়েছে। ফুয়াদ সিরাজ উদ্দীন, ডাক্তার ইসমাঈল সাবরী আবদুল্লাহ, ডাক্তার ফুয়াদ নুহ্হী প্রমুখ কারাবন্ধুদের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে আর কি বলবো। এতটুকু বুঝে নিন যে, এটা ছিল এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। সেই দিনগুলো মনে পড়ে যখন আমরা একত্রে জেলখানায় ছিলাম এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্যকরূপে অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলাম। আমরা যদিও পূর্ব থেকেই একে ভালভাবেই জানতাম কিন্তু কারাজীবনের এই অনুপম সম্পর্ক ও একান্ত সান্নিধ্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের উত্তম ও মহত দিকগুলো এমনভাবে প্রকটিত করে তোলে যা এত ভালভাবে আগে আর কখনো জানার সুযোগ হয়নি।

www.amarboi.org

ওপরে আমি যেসব ব্যক্তির উল্লেখ করলাম তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা সুষ্ঠু জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক প্রদান করেছেন। তাদের মনমানসিকতা ছিল স্বদেশ প্রেমে উদ্দীপ্ত। আমার আন্তরিক অভিব্যক্তি হচ্ছে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেন মাঝে মধ্যে এসব লোকদের সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে মিলিত হওয়ার ও পারস্পরিক মতামত বিনিময়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। তাহলে দেশ ও জাতি সমভাবে উপকৃত হতে পারবে। এতে রাষ্ট্রপ্রধানও এমন মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবেন যা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তার অগ্রগামী। কিন্তু এজন্য তাকে উদার দৃষ্টিভংগী নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা উচিত।

সাদাত ও তার ইস্রাঈলী বন্ধু

যে ধরপাকড় ও গ্রেফতারির উল্লেখ আমি এই মাত্র করে এসেছি তার নির্দেশ দিয়েছিলেন সাদাত সাহেব নিজেই। এতদসত্ত্বেও তাঁর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল, ইনসাফের দাবী হচ্ছে আমি যেন সেই ঘটনা বর্ণনা করি। আল কানাতিরুল খাইরিয়াস্থ রেষ্ট হাউসে ১৯৭৯ সনের ডিসেম্বর মাসে সাদাত সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সাদাত সাহেব সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পর অকপটে আমাকে বলতে লাগলেন যে, "ইসরাঈলী শাসকগণ 'আদ দাওয়া' সাময়িকীর ব্যাপারে খুবই আপত্তি উথাপন করছেন। ইখওয়ানের একাদিক্রমে আক্রমণের কারণে ইসরাইল সরকার বার বার আমাদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছে। রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের সম্মুখে টেবিলের ওপর 'আদ দাওয়া' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা রাখা ছিল। আমি আরজ করলাম "শান্তি চুক্তি সম্পর্কে আমাদের মনোভাব ও ভূমিকা সম্পূর্ণ দ্বীনি দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ইস্রাঈল সম্পর্কে আমরা যা কিছু লিখছি তা আমাদের দেশের ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়ে নয় বরং আমাদের আকীদা ও দ্বীনের সমস্যা জড়িত। আমার দ্বীনের দাবী হচ্ছে আমি এই নিরিখে আমার লেখনি অব্যাহত রাখি যাতে ভ্রান্ত ধারণা কল্পনার কালো মেঘের অবসান ঘটে এবং প্রকৃত সত্যের আলো সমুদ্ভাসিত হয়ে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যদি এই ব্যাপারে সৃষ্টির সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করি তাহলে সৃষ্টিকর্তার অসন্তোষের শিকার হতে হবে অবশ্যই। এই সওদা এতই মহার্ঘ যে আমি তা কল্পনাও করতে পারি না------- ।"

আমি পুরোপুরি ইনসাফ ও ন্যায়ত একথা সুধী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই যে, রাষ্ট্রপতি মহোদয় আমার একথাগুলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনলেন। তারপর তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বললেন ঃ "আমি আপনার বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত। এই দৃষ্টিভংগীতে আপনি আপনার লেখনী অব্যাহত রাখুন। সাদাত আমার সাথে যে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছেন তা বর্ণনার পাশাপাশি তার চরিত্রের ভাল দিকগুলোও পাঠকদের সামনে তুলে ধরা অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আমার ওপরও রহমত করুন আর ক্ষমা করে দিন সাদাতকেও।

www.amarboi.org

ছাব্বিশতম অধ্যায়

ইসলাম না সমাজতন্ত্র ?

আমাদের শাসকগণ এবং তথাকথিত চিন্তাবিদগণ সমাজতন্ত্রের ঢাকঢোল পিটাচ্ছেন যা ভিনদেশ থেকে আমদানীকৃত অনৈসলামী মতবাদ। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সা)-এর সুন্নাহর বর্তমানে আমাদের অন্য কারো কাছে আদর্শের সন্ধান করা নির্বুদ্ধিতা নয়তো আর কি ? তাদের বক্তব্য হলো, সমাজতন্ত্র শ্রেণীগত ব্যবধান নিশেষ করে দেয়। অথচ তাদের জানা নেই যে মানবেতিহাসে শ্রেণীগত বিভেদের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি সেদিনই হয়ে গিয়েছিলো যে, দিন রাসূল (সা) বিশ্ববাসীর সম্মুখে দ্বীন ইসলাম পেশ করেছিলেন।

ইসলামে বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে কেউ কারো ওপর কোন মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে পারে না। কেউ আর্য হোক বা সেমিটিক, ধনী হোক আর গরীব তাতে কিছুই যায় আসে না। আমাদের দ্বীনে শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ তাকওয়া ও আমল। যে-ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিমদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে সেই সর্বোত্তম।

সমাজতন্ত্র মানবীয় স্বাধীনতার দাবী করে ঠিকই কিন্তু কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে আজ পর্যন্ত তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়নি। ইসলাম আদেশ ও নিষেধের সীমার মধ্যে এমন এক আদর্শ কায়েম করেছে যার ছায়ায় মানবতা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার নির্ধারিত স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করে। সমাজতন্ত্রের শ্লোগান হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সর্বদা কাজ ও উন্নতির সুযোগ প্রদান করা হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা বাস্তবে এর কোন উদাহরণ পেশ করতে পারে না। অথচ ইসলাম এর যাত্রার দিন থেকেই মানবতাকে প্রকৃত সাম্যের নিয়ামত দান করেছে। তাফসীর ও হাদীস এবং ফিকাহশাস্ত্রে মুসলিম উম্মাহ কোন প্রকার সংরক্ষণ ছাড়াই এমন সব লোকদের নেতৃত্ব স্বীকার করেছে যারা ছিল দাস বংশোদ্ভূত। শুধু তাই নয় বরং দাস বংশের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি ইসলামী দেশসমূহে সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।

দাস আর প্রভু বলে কিছুই রইল না

আমাদের ইতিহাসে হযরত ওমর বিন খাত্তাবের একটা কথা অত্যন্ত স্মরণীয়। তাঁর ওপর যখন প্রাণনাশী আক্রমণ করা হয়েছিল তখন নতুন খলিফা নির্বাচনের জন্য তিনি ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করে বললেন ঃ "যদি (হযরত হুযায়ফার ক্রীতদাস) সালেম জীবিত থাকতো তাহলে আমি কমিটি গঠনের পরিবর্তে তাকেই আমার স্থলাভিষিক্ত করতাম।" সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের জন্য শুধুমাত্র গালভরা বুলি আওড়ায় কিন্তু আমাদের কাছে এই শ্লোগানের বাস্তব নিদর্শন রয়েছে। একবার

www.amarboi.org

জনৈক কুরাইশ বংশীয় সর্দার কোন এক হাবশী গোলামকে বললো, "হে কালো মায়ের সন্তান।" রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা একথা শুনে লাল হয়ে ওঠে। তিনি ক্রোধভরে বলতে লাগলেন, "এটা জঘন্য প্রকৃতির জুলুম এটা সুস্পষ্ট সীমা লংঘন।" কুরাইশ সরদার রাসূল (সা)-এর ক্রোধের মাত্রা দেখে ভীত হয়ে এবং মাটিতে শুয়ে পড়ে। সে তার গন্ডদেশ মাটির ওপর রেখে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে থাকে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ক্রীতদাস তার গন্ডদেশে তার পা রেখে না দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ সে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবে না। আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের লোকেরা সেই সব জীবন্ত দৃষ্টান্ত পুনরায় তাজা করতে চাই। মানুষ একে সেকেলে চিন্তা বলে অভিহীত করতে পারে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, একদিন আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে সফল হবো। "আর স্মরণ করো সেই দিনের কথা যেদিন মু'মিনগণ আল্লাহর সাহায্যে খুশী হবে।"

যারা আসতে চাও জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়ে এসো !

হাসানুল বান্না শহীদ ও হাসান আল হুদাইবি মরহুম কিংবা তাদের পরে আগত ইখওয়ান কর্মীগণ মানুষের সম্মুখে কখনো এমন দাবী করেনি যে, আমরা তাদের সকল প্রত্যাশা পূরণ করে দেবো এবং তাদের জন্য আকাশের তারকা এনে দেবো। বরং আমরা বলে থাকি যে, আল্লাহর রাস্তায় আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি তিনিই এই কল্যাণের পথের অভিযাত্রীদের সংরক্ষক এবং তাঁর সাহায্যেই আমরা আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবো। "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উত্তম আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না।" বিগত নির্বাচনে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া এমন কথা বলতে পারি না যে, সফলতা সমাগত। তথাপি আমাদের ইস্পাত কঠিন সংকল্প হচ্ছে, রাস্তা দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। এই পথ কখনো ফুল বিছানো ছিল না। আরো কত দুর্গম ঘাঁটি এখনো অতিক্রম করতে হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। মনযিল বহুদূর এবং সফর আরো কঠিন। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য সেটাই যা নির্ধারিত হয়ে গেছে।

বিশ্বরাজনীতি পরিক্রমা ও ইখওয়ান

বৈদেশিক বিষয়ে ইখওয়ানের দৃষ্টিভংগী এই মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন দিকে ঝুঁকে না পড়েই নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে এবং সকল প্লাটফর্মে সত্য ও ন্যায়ের সমর্থনে এগিয়ে যেতে হবে। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ববাসী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আঞ্চলিক দল গঠন করে শান্তি শৃংখলা লাভ করার শত চেষ্টা করেও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কতিপয় দেশ একটা বিশ্ব সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু তা খুব বেশী দিন চলতে পারেনি। এই সংগঠন যা "লীগ অব নেশানস্" নামে পরিচিত ছিল। এটা ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অগ্রজ। সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের চার্টার খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু এর ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যতীত এর বাস্তবতা বলতে কিছুই নেই। পরাশক্তিগুলো ভেটো পাওয়ার তাদের নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে। যা সরাসরি জুলুম এবং

www.amarboi.org

দুর্বলদের অধিকার মারারই নামান্তর। বড় বড় শক্তিগুলো পরস্পরে এমন গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছে যে, তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে মনগড়া কার্যকলাপ চালাতে থাকে কিন্তু কেউই তাদের ত্রুটি নির্দেশ করতে পারে না।

ভালুক ও নেকড়ের বানরের ন্যায় পিঠা বন্টন

সম্ভবত সবার মনে আছে যখন রাশিয়া তার সৈন্য বাহিনী আফগানিস্তানে প্রেরণ করে তখন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কার্টার যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তার অর্থ ছিল এই যে, রাশিয়ান বাহিনীর আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে আমেরিকার কোন আপত্তি ছিল না। অপরদিকে ইস্রাঈলের ধৃষ্ঠতামূলক তৎপরতার প্রতি লক্ষ্য করুন যার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে আমেরিকা। এ ক্ষেত্রে রাশিয়া নীরব দর্শক হিসেবে তামাশা দেখছে কিংবা খুব বেশী কিছু করলে কখনো শৃগালের ন্যায় ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে থাকে। সমগ্র দুনিয়া এই দু'টি ব্লকে বিভক্ত। কিছু দেশ আমেরিকার ক্রোড়ে আশ্রিত আবার কিছু দেশ রাশিয়ার তল্পীবাহী। লাল উপনিবেশবাদ হোক বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সবই ইসলামের সমান দুশমন। ভারতকে দেখুন এ দেশটি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের স্তম্ভ। মিসর যখন রাশিয়ার তৈরি মিগ জঙ্গী বিমানের জন্য ভারতের নিকট খুচরা যন্ত্রাংশ চায় তখন সে টালবাহানা শুরু করে এবং রাশিয়ার নিকট অনুমতি কামনা করে। যেহেতু মিসর রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো। এজন্য কমিউনিষ্ট সরকার ভারতকে স্পেয়ার পার্টস মিসরের নিকট বিক্রি করতে নিষেধ করে দেয়। এতে একদিকে জানা গেলো যে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুধুমাত্র ঢং। অপরদিকে জানা গেল পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র রাশিয়া ও আমেরিকার ইংগীতেই চলে থাকে। আমাদের মুসলিমদের জন্য এতে একটা শিক্ষা রয়েছে। আহ্ ! আমাদের চোখ যদি খুলে যেতো এবং আমরা দেখতে পেতাম যে, কমিউনিষ্ট, হিন্দু, ইহুদী ও ঈসায়ী তথা সকল অনৈসলামিক শক্তিই আমাদের দুশমন—"আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদাহ"—সকল কুফরী শক্তিই এক ও অভিন্ন।

আত্মনির্ভরতার অভাব ও মানসিক গোলামী

এটা ঠিক যে আমরা আজ যে যুগে বাস করছি তা হচ্ছে বস্তু যুগ এবং উন্নত দেশগুলো আমাদের চেয়ে কতবেশী শক্তিশালী। কিন্তু আমাদেরকে নিজেদের বাহ্যিক কর্মকৌশল চিন্তা-ভাবনা করে বিন্যাস করা উচিত। আমাদেরকে বিশ্বের শক্তিধর দেশসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে অবস্থান করে সুইজারল্যান্ডের ন্যায় নিজেদেরকে জোট নিরপেক্ষ রাখা উচিত। আমাদের অবস্থা খুবই করুণার যোগ্য। রুশদের পদতলে যুগ যুগ ধরে নতজানু হয়ে থাকি। সেখান থেকে গুতা খেয়ে পথিমধ্যে কোথাও না থেমে সোজা আমেরিকার চরণ তলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা নেই। মানুষের কাছেও আমাদের কোন মান-সম্মান নেই। আমরা যে ব্লকেই যাই না কেন এই সত্য কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, দুই ব্লকই ইস্রাঈলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দানের ক্ষেত্রে সমভাবে অংশগ্রহণ করছে। কবির ভাষায় ঃ

www.amarboi.org

تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں
فرنگ کی رگِ جاں پنجۂ یہود میں ہے!
سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات
خودی کی پرورش و لذتِ نمود میں ہے!

"তোমার দাওয়াই না আছে জেনেভায় না আছে লন্ডনে
ফিরিংগীদের জীবন ইহুদীদের থাবায়
আমি শুনেছি গোলামীর জিঞ্জির থেকে উম্মতের মুক্তি
আছে আত্মবিশ্বাসের প্রতিপালন ও তার বলে বলীয়ান হওয়ায়।"

আমরা যে চোরাবালিতে আটকে আছি তাথেকে মুক্তি লাভ করা বাস্তবিকই কঠিন কাজ। আর যে আক্টোপাস আমাদের রক্ত শোষণ করে চলেছে তার থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আমরা অবশ্য এমন দাবী করছি না যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন রাতারাতি জাতিকে এ সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমাদের দাবী হচ্ছে, যদি সঠিক লক্ষ্যে পদেক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তাহলে কখনো না কখনো মনজিল দৃষ্টিগোচর হবেই। এই জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বছরের পর বছরের। কিন্তু মুসলিম সরকারগুলো যদি তাদের জনগণকে সাথে নিয়ে এক দেহ এক আত্মার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তাহলে সকল বিপদের মোকাবিলা করা যেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি চলতে দিয়ে আমরা কোনদিনও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবো না।

মিসরের অর্থনীতি এবং সরকারের ধ্বংসনীতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বড় রকমের ভুল করেছে। মিসর মূলত একটা কৃষি প্রদান দেশ। অথচ সরকার কৃষির তুলনায় শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। তথাপি শিল্প ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়নি। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও অনগ্রসরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুদানের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভাল। এই দুই ভ্রাতৃপ্রতীম দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ এবং ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে হলেও সেজন্য কোনরূপ ইতস্তত করা ঠিক হবে না। সুদানে রয়েছে বিস্তর চাষাবাদের ভূমি আর মিসরের আছে প্রচুর জনশক্তি ও পর্যাপ্ত কারিগরি সাজসরঞ্জাম। দু'দেশ পারস্পরিক সহযোগিতায় এতবেশী কৃষিজাত পন্ন উৎপন্ন করতে পারে যার ফলে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বাবলম্বীই হবে শুধু তাই নয় বরং রপ্তানীও করা যেতে পারে। ইখওয়ানুল মুসলিমুন এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীগণকে আল্লাহ তায়ালা যেন তাওফীক দেন যাতে তারা এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। কবি কতই না চমৎকার গেয়েছেন ঃ

www.amarboi.org

موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز
جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان

মওসুম উত্তম, পানি পর্যাপ্ত আর মাটিও অত্যন্ত উর্বর
এতদসত্ত্বেও যে উৎপন্ন করতে পারে না সে কেমন কৃষক।

বস্তুত কোন জাতিই অলস ও শ্রমবিমুখ হয়ে কোন উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। এজন্য পরিশ্রম ও কষ্ট ক্লেশ নীরবচ্ছিন্নভাবে সহ্য করতে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে ভ্রান্ত নীতির ফলে পরিস্থিতির এত অবণতি হয়েছে যে, আমাদের লক্ষ লক্ষ যুবক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে অলিগলি ও সড়ক মহাসড়কগুলোতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কোথাও কর্মসংস্থান হয় না। ফলে তারা কফিখানা ও রাস্তাঘাটে বসে আড্ডা দিয়ে নিজেদের সময়ও নষ্ট করে এবং যোগ্যতাও ধ্বংস করে। এ যুবক যুবতীদের প্রতিভা ও যোগ্যতা দ্বারা দেশ ও জাতির বড়ই উপকার হতে পারে যদি আমরা বিচক্ষণতার সাথে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি।

সমৃদ্ধি লাভ কি এভাবেই সম্ভব !

আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। যদি তারা অনীহা প্রকাশ করে তবুও আমাদেরকেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে কাছে টেনে আনতে হবে। যদি তারা কোন ব্যাপারে সীমালংঘন করে তা হলে আমরা তা সহ্য করবো। তারা যদি কখনো অশালীন ও অশোভন আচরণ করে বসে তবুও আমরা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবো। যেখানেই প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে সমাধানও অবশ্যই পাওয়া যায়। আমাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার, রাজনৈতিক ও সামাজিক দেউলিয়াপনার প্রতিকার ও প্রতিবিধান এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের রহস্য মুসলিম উম্মার নিষ্ঠাপূর্ণ ঐক্য ও সংহতির মধ্যেই লুকায়িত।

আমাদের দেশসমূহে প্রচার মাধ্যমসমূহ ফিতনা ও বিপর্যয় ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই করছে না। উলঙ্গপনায় পরিপূর্ণ চরিত্র বিধ্বংসী ও নগ্ন ছায়াছবি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে এবং নৈতিকতা বিবর্জিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তাছাড়াও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সম্বন্ধে শত্রুতামূলক প্রোপাগান্ডা চালানো হয় আর এভাবে এসব দেশের যুব সমাজ অন্য দেশের জনগণের ব্যাপারে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব অন্তরে লালন করতে থাকে। তা না হলে কেন সিরিয়া, মরক্কো, মিসর, ইরান, আলজিরিয়া, সুদান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের উলামা ও জ্ঞানীগুণীদেরকে একদেশ হতে অন্য দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে যুবসমাজকে উপদেশ দানের সুযোগ দেয়া হয় না? যদি তা করা হয় তবে উম্মাতে মুসলিমার বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ব্যক্তিগণ একে অন্যের ব্যাপারে সঠিক

www.amarboi.org

ধারণা লাভ করতে পারবে এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার মত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কবির ভাষায় ঃ

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبیؐ، دین بھی، ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

এই জাতির লাভ ও লোকসান এক ও অভিন্ন
সকলের নবী (সা)ও একজন, দ্বীন এক, ইমানও এক
হারামে পাক, আল্লাহ্ এবং কুরআনও এক
কতই বড় ব্যাপার হতো যদি মুসলিমরাও হয়ে যেতো এক।

করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ

আজকের যুবসমাজ আগামীতে ক্ষমতার আসনে সমাসীন হবে। প্রশ্ন হলো, আমরা আমাদের যুব শ্রেণীকে এই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য তৈরী করেছি কি? আমি কখনো নিরাশ হই না। বিশেষত যুবকদের ব্যাপারে আমি খুবই আশাবাদী। কিন্তু এই অসহায় যুবকদেরই অপরাধ কি?

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا
کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ

গলা টিপে তোমাকে হত্যা করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ
আর কোথা থেকে উচ্চারিত হবে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আওয়াজ?

আমি তো একথাই বলতে চাই যে, আমাদের ভরসা করা উচিত একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সত্তার ওপর। সাথে সাথে কাজে লাগাতে হবে তারই প্রদত্ত সমস্ত উপায় উপকরণ। প্রত্যেক যুবক যুবতীকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমাদের সরকার ও কর্তৃপক্ষ সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারেই অসতর্ক। অকস্মাৎ যে কোন মুহূর্তে তারা যার মুখোমুখি হতে পারে। অথচ আমাদের দুশমনেরা সদাসচকিত এবং প্রস্তুত। এমতাবস্থায় নারী পুরুষসহ জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই প্রতিরক্ষার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

যারা ইরাকের এটমিক এনার্জি কেন্দ্র ধ্বংস করেছিলো। তারা অন্য যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সাথেও অনুরূপ আচরণ করতে পারে। কোন প্রতিশ্রুতি এবং চুক্তিই তাদের হাত সংযত রাখতে পারবে না। তাই এখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সযত্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। যার উদ্দেশ্য হবে শুধু আত্মরক্ষা করা। কারো ওপর আক্রমণ করা নয়। ইসলাম সামরিক প্রস্তুতির যে নির্দেশ প্রদান

www.amarboi.org

করেছে তা কারো ওপর আক্রমণ করার জন্য নয় বরং এজন্য যে, আমাদের শত্রুরা আমাদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবারও সাহস না পায়।

"واعدوالهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عد والله وعدوكم"

"তোমাদের দুশমনদের মোকাবিলায় তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করো এবং সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করে তা দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভয় দেখাবে।"

অবশ্য আমাদেরকে সকল দেশের সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং নিজস্ব মূলনীতির ওপর অটল থেকে প্রত্যেকের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হতে হবে। ধোঁকা, প্রতারণা এবং নাজায়েজ কাজ-কারবারের সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের বাজারকে উন্মুক্ত করত আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের দরজা খুলে দিতে হবে।

মুসলিম দূতাবাসগুলোর স্বপ্ন

আমাদের দূতাবাসগুলোর পুনর্গঠন খুবই জরুরী। আমরা বাহ্যিক শান শাওকাত ও চাকচিক্যের ওপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি একেবারেই নেই। দূতাবাসের কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে যে কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তা উপলব্ধি করা। অথচ বর্তমানে আমাদের দূতাবাসগুলোর অবস্থা হচ্ছে এই যে, কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সারা বছর ঘুমিয়ে কাটায়। কায়রোতে আমরা বিদেশী দূতাবাস কর্মচারীদেরকে দেখি তারা অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে বসে থাকে না বরং কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, আসিয়ুত এবং অন্যান্য শহরে বন্দরে ঘুরে বেড়ায়। তারা যদিও তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সদা সক্রিয় কিন্তু ভাবখানা দেখায় যেন ভ্রমণের জন্য কিংবা কোন বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন। অথবা হাওয়া বদলের জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়েছিলেন এসবই বাহ্যিকরূপ। তারা তাদের সরকারসমূহকে স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী তথ্যাবলী ও রিপোর্ট পাঠানোর জন্য অত্যাধুনিক ঘটনা তথ্য সরবরাহ করে থাকে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহ যখন আমাদের ব্যাপারে কোন পলিসি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে তখন তাদেরকে অন্ধকারে হাতড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। বরং তাদের কাছে থাকে সঠিক এবং বিস্তারিত তথ্যাবলীর সমন্বয়ে পূর্বপ্রস্তুতকৃত ফাইল। আমরা দেখি বিদেশী দূতাবাস কর্মীরা পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর অফিসে প্রায়ই ঘোরাঘুরি করেন। সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও লেখকদের সাথে থাকে তাদের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক এবং এভাবে লাভবান হতে তারা সদা তৎপর থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের দূতাবাস প্রতিনিধিরা আরাম আয়েশ ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকা ছাড়া আর কোন কাজই করে না।

www.amarboi.org

সাংস্কৃতিক দল ! উম্মাতে মুসলিমার প্রতিনিধি

ইসলামই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষাদান করেছে। আমরা না কারো সীমালংঘন সহ্য করে থাকি, না কারো ওপর অত্যাচার করা বৈধ বলে মনে করি। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা অন্য দেশের প্রতিনিধিগণকে আমাদের এখানে ডেকে আনবো এবং নিজেদের প্রতিনিধিগণকে তাদের দেশে প্রেরণ করবো যারা আমাদের দৃষ্টিভংগী সেসব দেশের জনসাধারণের সম্মুখে উত্তমরূপে উপস্থাপন করবে। আমরা সাংস্কৃতিক দলের যে বিনিময় করে থাকি তাও আমাদের সুনাম সুখ্যাতির ওপর কলঙ্ক লেপন করে থাকে। নৃত্যগীতকারী ভাঁড় এবং নৃত্য ও সংগীতে পারদর্শিনী গায়িকারা দেশের বাহিরে গিয়ে আমাদের যে ভাবমূর্তি তুলে ধরে তা কারো অজানা নয়। শিল্পকলার দিক থেকেও প্রায় সকল কণ্ঠশিল্পীই অত্যন্ত ভাসা ভাসা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অনেক সময় তারা সংগীতগুলো মুখস্ত করে নেয় বটে কিন্তু তা উপস্থাপনায় অনেক সাহিত্য ও শিল্পগত ভুল করে ফেলে।

আমাদের দূতাবাস ও কুনস্যুলেটগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে নতুনভাবে বিন্যাস করা আবশ্যক। উন্নত বিশ্ব আমাদের কাঁচামালের মুখাপেক্ষী আর আমরা তাদের শিল্প সামগ্রী। যদি আমরা পদযুগল ছড়িয়ে ঘুমানোর পরিবর্তে চিন্তা-গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক কিছু লাভ করতে পারি। আমরা নিজেদেরকে সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার জটাজালে শৃংখলিত করে ফেলেছি এবং এরই সূত্র ধরে বিশ্বশক্তি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ খুব মজা করে আমাদের রক্ত শোষণ করছে। এসব এই মিথ্যা তথাকথিত সাহায্যের নামে তারা আমাদেরকে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের নিকট সকল বিষয়েই এত বিপুল সংখ্যক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ জনশক্তি রয়েছে যে, তাদের সাহায্যে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিজেরাই প্রস্তুত করতে ও চালাতে পারি। কিন্তু অবস্থা এই যে, আমাদের এসব কারখানার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশীরা। এটা একটা মারাত্মক ভুল। আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীগণ পাশ্চাত্য দেশসমূহে গৌরবজনক কাজ সম্পাদন করছে। তাদের ওপর আস্থা রেখে ও কাজে লাগিয়ে নিজেদের দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করার কার্যকরী উদ্যোগ কেন গ্রহণ করা যাবে না?

ইরাক-ইরান যুদ্ধ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়

বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা বার বার ভুল করে চলেছি। ইরাক-ইরান যুদ্ধে আমাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ভ্রান্ত। মুসলিম রাষ্ট্র হোক বা অমুসলিম রাষ্ট্র কোন দেশের সাথেই আমাদের অকারণে শত্রুতামূলক মনোভাবের পরিচয় দেয়া উচিত নয়। আমাদের যুদ্ধ ও সন্ধি কেবলমাত্র ইসলামী মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও সত্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

www.amarboi.org

ইরানের বর্তমান সরকার মাঝে মধ্যে ইখওয়ানের ওপর এমনকি স্বয়ং আমার ব্যক্তিত্বের ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে এবং এমন অভিযোগ করেছে যে, আমরা আমেরিকার এজেন্ট। আমরা যদি বাস্তবিকই আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে কাজ করতাম তাহলে তাদের আক্রমণের জবাবে আমরাও তাদেরই সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলতাম। ইসলামের দুশমন শক্তিগুলো তাদের এজেন্টদের সাহায্যে মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ ও কলহ সৃষ্টি করে থাকে। এই দাবানল প্রজ্জলিত করার ক্ষেত্রে আমাদের বিচক্ষণ শত্রুগণ ছাড়াও আমাদের অজ্ঞ বন্ধুদেরও যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। ইখওয়ানের ওপর ইরানের এসব আক্রমণ মোকাবিলায় আমাদের জবাব নীরবতা। তাছাড়া ইরানের দায়িত্বশীলদের এসব আক্রমণ সত্ত্বেও আমরা এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে ইরানের বিরুদ্ধে কখনো মুখ খুলিনি। আমরা বুঝতে পারি যে, এই যুদ্ধ দ্বারা উভয় দেশই ইসলামের প্রভূত ক্ষতি করে চলেছে।

ইরাক ও ইরানের মধ্যে লড়াই যখন শুরু হয় তার ঠিক আগের দিনই আমি রাব্বুল আলামীনের সমীপে আরজ করেছিলাম, "হে আল্লাহ ! আরব ও মুসলিম সরকারগুলোকে তুমি তাওফীক দাও তারা যেন এই সর্বগ্রাসী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধকে বন্ধ করতে পারে।" এই লড়াই যুগপৎভাবে দু'মুসলিম রাষ্ট্রকেই ধ্বংসের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে। অনর্থক নরহত্যা, অর্থনীতির ধ্বংস সাধন ইসলামের শত্রুদের জন্য নিশ্চিত উল্লাসের কারণ। আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে আমি এই দোয়াই করছি। তিনি যেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর তাওফীক দান করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে সাইয়েদ হোসনী মোবারকের নীতিতে আমিও আশাবাদী। কেননা তিনি মিসরীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু লিখতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্যও তাকেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করতে হবে। এজন্য নিরপেক্ষ উদ্যোগ ও প্রয়াস যারপরনেই অত্যাবশ্যক।

হোসনী মোবারক ও জাফর নিমেরীর সাক্ষাতকার

মিসর ও সুদানের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যেসব ব্যক্তিগত সাক্ষাত হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে আমার মতামত হচ্ছে, তাতে দুই দেশের রাষ্ট্রপতি ছাড়াও প্রত্যেক দেশের পক্ষ থেকে ন্যূনপক্ষে একজন করে প্রতিনিধি শরীক হওয়া আবশ্যক। এসব সাক্ষাতের বিষয়বস্তু দুই রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয় বরং উভয় দেশের স্বার্থ সম্পর্কেও আলোচনা হয়ে থাকে। মানুষ মাত্রই যে কোন সময় ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া থেকে প্রস্থান করতে পারে। আল্লাহ্ না করুন যদি এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে আলোচনার টেবিলে স্থিরকৃত বিষয়াবলী সম্পর্কে দেশবাসীকে কে অবহিত করবে। ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং জাতির দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তিই এরূপ পরিস্থিতিতে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাতে পারে।

www.amarboi.org

আমি অবশ্য সরকারী প্রটোকল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ না ওয়াকিফ। তাই হয়ত আমার এ দৃষ্টিভংগীর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তথাপি আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করলাম। কারণ অনেক সময় অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কথাও বেশ উপকারী হয়ে থাকে।

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহই নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে

আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই। এটা আমার বিশ বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সারনির্যাস। যে জাতিকে স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত করা হয় সংস্কারকদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের থেকে কল্যাণকর কোন কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না। এরূপ দাবী যে শান্তি ও নিরাপত্তার হিফাজত এবং সন্ত্রাসবাদীদের মূলোৎপাটন প্রয়োজন। এই যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপন করে যে, আযাদী ও স্বাধীনতাই মস্তবড় নিরাপত্তা বিশেষ। এমনকি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিকশিত করার জন্য প্রকৃত আযাদীর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। কাগজে নাগরিকতার দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয় যতদিন নাগরিকগণ দেশের স্বাধীনতার স্বাদ কার্যত গ্রহণ করতে পারে। যে দেশে নাগরিকদের অধিকারসমূহ নিরাপদ ও সুরক্ষিত নয় এবং তার কোন মতামত—যা হয়তো যথার্থ—কিন্তু তাতে সমকালীন শাসক সন্তুষ্ট নয় বরং এর ফলে যদি তার জান-মালের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয় তাহলে এমন নাগরিকত্ব অনর্থক। আর এমন দেশ মাতৃভূমি আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যাবলী এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান একটাই, আর তা হচ্ছে এই যে, নাগরিকদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা। মৌলিক অধিকারসমূহ লাভ করার পর নাগরিকগণ নিজেদেরকে সরকারের কার্যাবলীতে অংশীদার বলে মনে করে। এখান থেকেই দেশ প্রেমের অনুভূতি বিকশিত হতে শুরু করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই দেশের নিরাপত্তাও দেশবাসীর স্বার্থের অনুভূতিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাকী থেকে যায় সেই সব জনগণ যাদেরকে ভেঁড়া বকরীর মত শাসকরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদের মধ্যে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে না।

www.amarboi.org

সাতাশতম অধ্যায়

মাঝে মধ্যে সেই প্রাচীন কিস্‌সা কাহিনীর সান্নিধ্য লাভ

আমি ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বার বার সফর করেছি। উদ্দেশ্য নিজের দুর্বল শরীরের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা। যখনই আমি চিকিৎসা ব্যাপদেশে কোন দেশে যাই তখন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইখওয়ানরা আমার চারপাশে এসে সমবেত হয়। দলে দলে তাদের আগমন আমার নিরাপদে সেখানে গিয়ে পৌঁছার আনন্দে কিংবা শীঘ্রই আমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশার কারণে হতো না। বরং তারা তাদের সেই দ্বীনি ভাইকে এক নজর দেখার জন্য আগমন করতো যিনি মুর্শিদে আ'ম হাসানুল বান্না শহীদের সাথে তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত করেছেন। তারা তাদের সেই দ্বীনি ভাইকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে এবং তাঁর মজলিশে বসে নিজেরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে। কারণ তাদের এই দ্বীনি ভাই শহীদ ইমামের সাথে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করেছে। তাঁর প্রশিক্ষণ লাভে ধন্য হয়েছে এবং তার কাজকর্ম ও আচার আচরণকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার মর্যাদা লাভ করেছে। যে সংস্কারকের দাওয়াতী কার্যক্রম এই যুবক শ্রেণীর জীবনে বিপ্লব সাধন করেছে। তাদের আকাংখা ও ঐকান্তিক কামনা হলো, হায় ! যদি এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় স্বচক্ষে তারা একবার দেখতে পেতো। এখন যেহেতু ইমাম শহীদকে দেখাতো আর সম্ভব নয়, অতএব তাঁর সংগীদেরকে দেখেই এসব যুবক সন্তুষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান যুগে ইসলামী রেনেসাঁর যে তরঙ্গ পরিদৃষ্ট হচ্ছে তাতে ইমামের খুব বড় অবদান রয়েছে। যিনি সহজ-সরল দ্বীনের বিশাল ভান্ডারের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করেছেন। আমার এই যুবক ভাইয়েরা ইমাম শহীদের দাওয়াতকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। তারপরও তারা সেই ব্যক্তির মুখ থেকে কিছু শুনতে চান যিনি তাদের সম্মুখে নিকট অতীত ও সুদূর অতীতের ঘটনাবলীর চিত্র অংকন করতে পারেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে এর শত্রুরা মিথ্যা ও বাতিলের যত ষড়যন্ত্র রচনা করেছে তার সবকিছুই এই সাক্ষাতের সময় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

হিজাযের পথের ধূলাবালির আকাংখা

এ দ্বীনের দুশমনদের সংখ্যা অনেক এবং সর্বত্রই তারা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যেভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিরুদ্ধে দ্বীনের দুশমনরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এরূপ অন্য কোন ইসলামী সংগঠনের বিরোধিতা করতে সাধারণত তাদের দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন হলো ইখওয়ানের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে ইসলামের শত্রুরা এত বেশী তৎপর কেন ? ইখওয়ান কি কোন নতুন দ্বীন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল ? ইখওয়ান কি কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোন

www.amarboi.org

জিনিসের আনুগত্য ও অনুসরণ করছিলো ? তারা কি জুলুম ও সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেছিলো ? কখনো নয়। ইখওয়ান এসব জিনিস থেকে ছিল বহু দূরে এবং এখনও রয়েছে। আমাদের দেশপ্রেম এবং দ্বীনের সাথে সম্পর্কের স্বরূপ আমাদের রবই ভাল জানেন। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সুদৃশ্য এলাকা এবং চিত্তাকর্ষক দৃশ্য রয়েছে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তা প্রিয় জন্মভূমির ধূলিকণার সমতুল্যও নয়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার কোন জিনিসই মকবুল হজ্জের রাস্তার তুলনায় আমার নিকট প্রিয় নয়।

যবের রুটি ও আলী হায়দারের বাহু

হাসানুল বান্না শহীদ মজলুমদের আর্তচিৎকারে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে ছিলেন সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। তিনি কোন বড় বিপদকেও তোয়াক্কা করতেন না। বীরপুরুষ মাত্রই সকল মুসিবতক্লিষ্ট লোকের সাহায্যার্থে জালিমের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মজলুম তার পরিচিত হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। পক্ষান্তরে ভীরু ও কাপুরুষ ব্যক্তি তার জাতির প্রতিরক্ষা এবং আপনজনদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া থেকেও পালিয়ে বেড়ায়।

মিসরে এমন একটা সময়ও এসেছিলো যে, রাতের বেলা রাস্তা ঘাটে ডাকাতি হতে লাগলো। পেশাগত অপরাধীরা সড়কের ওপর বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভান করে দাঁড়িয়ে যেতো এবং গাড়ী থামানোর জন্য ইশারা করতো। যেই মাত্র কোন গাড়ী থামতো সংগে সংগে তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং আরোহীদের মালপত্র ও কাপড় চোপড় লুট করে নিয়ে যেতো। সে আমলেরই কথা, ইমাম হাসানুল বান্না কোন সফর থেকে মধ্যরাতে কায়রো ফিরে আসছিলেন। রাস্তার মধ্যে একস্থানে তিনি সড়কের পার্শ্বে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। যার পাশে এক ব্যক্তি সড়কের ঠিক কিনারে দাঁড়িয়ে তাঁর গাড়ি থামানোর ইংগিত দিচ্ছে। ডাকাতির খবরাখবর ইতিমধ্যে প্রত্যহ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিলো। তথাপি ইমাম গাড়ীর চালক ভাইকে গাড়ী থামানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি একাকী গাড়ী থেকে বের হলেন এবং সেই ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞস করলেন যে, তার কি প্রয়োজন ! সে জানালো যে, তার গাড়ীর পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে তাই সে নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত যাওয়ার মত পেট্রোল দেয়ার অনুরোধ করছে। তৎকালে বর্তমান সময়ের ন্যায় গাড়ীতে হর্ণ থাকতো না। বরং একটা ধাতু নির্মিত নল থাকতো যার এক প্রান্তে লাগানো থাকতো রবারের বেলুন। হর্ণ দেয়ার জন্য ড্রাইভার সে রবারের বেলুনের ওপর চাপ দিতো তখন তার বাতাস হর্ণের মধ্যে আওয়াজ সৃষ্টি করতো। ইমাম সাথে সাথে তার গাড়ীর হর্ণ খুলে নিলেন। কয়েকবার তাতে পেট্রোল ভর্তি করে উক্ত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফিরের গাড়ীর টেঙ্কিতে ঢেলে দিলেন। অথচ ইমাম সে ব্যক্তির নিকট তার নামটি পর্যন্ত জানতে চাইলেন না। কিংবা তার মর্যাদা ও ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করলেন না............সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাজই এই যে, তারা মহৎকার্যাবলী সম্পাদন করেও নীতির ওপর অটল থাকেন। এ আচরণে সেই অচেনা ব্যক্তি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে নিজেই ইমাম শহীদকে জানালো

www.amarboi.org

"আমার নাম মুহাম্মাদ আবদুর রাসূল ; আমি কায়রো আদালাতের একজন জজ। আপনার পরিচয় ; "ইমাম শহীদ তার স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভংগীতে আরজ করলেন, "আমার নাম হাসানুল বান্না, আমি সাবতিয়া প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক।" জজ সাহেব অনুসন্ধানী ভংগীতে জিজ্ঞেস করলেন, "হাসানুল বন্না ! ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মুর্শিদে আ'ম !!" ইমাম শহীদ জানালেন, "জি-হা।" সেদিন থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ আবদুর রাসূল মরহুম আদালত এলাকার মহল্লায় ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সব চেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও হিতাকাংখী হয়ে যান। শাবিনুল কানাতির আদালতের জজ থাকাকালে মরহুম জজ সাহেব নিজে এ ঘটনা তার এক বন্ধুকে শুনিয়েছিলেন।

এই ছিলেন সেই হাসানুল বান্না যাকে বিপজ্জনক, সন্ত্রাসী এবং সকল অনিষ্টের মূল নায়ক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সারা বিশ্বের মুসলিম সরকারগুলো তার নাম নিশানা মুছে ফেলতে চেষ্টারত। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির মহৎচরিত্র ও অক্ষয় কীর্তিকলাপের ওপর পর্দা টেনে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তির সামনে দীপ শিখার মর্যাদা কি হতে পারে ?

আযাদ অফিসার-এর বিশ্বাসঘাতকা

আযাদ অফিসারের জন্য যদি কোন ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করার বৈধতা থাকে তাহলে মিসরের ইতিহাসে সে রকম এক ব্যক্তি আছেন অর্থাৎ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মুর্শিদে আ'ম হাসানুল বান্না। এ ব্যক্তিই তাদের জন্য পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাদের প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার জন্য তার সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাদের আন্দোলনকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্য জনগণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন তিনিই। যদি হাসানুল বান্নার আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকতো তাহলে আযাদ অফিসার কিছুতেই তাদের উদ্দেশ্য লাভে সফল হতো না। যদিও ইমাম শহীদের শাহাদাতের তিন বছর পর এই আন্দোলন সাফল্যমন্ডিত হয় তথাপি আযাদ অফিসার ইমাম শহীদ ও তাঁর সহকারী মেজর মাহমুদ লাবীব মরহুম-এর সাথে তাদের সাক্ষাতের কথা কি ভুলে গেছেন ? আযাদ অফিসার কি একথাও ভুলে গেছেন যে, তারা যে ফার্মে গোপন অনুশীলন করতেন তা ছিল ইখওয়ানের একজন রুকনের। আলহামদু লিল্লাহ ! ইখওয়ানের সে রুকন আজও বেঁচে আছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্যও। তিনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমুনের স্বভাব এমন নয় যে, আল্লাহর পথে তারা যা কিছু নজরানা পেশ করেছেন তজ্জন্য কাউকে ঋণী করবেন। তাদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। আযাদ অফিসারগণ কি জেনারেল সালাহ শাদী, জনাব ফরিদ আবদুল খালেক, জনাব সালেহ আবু রাকীক এবং জনাব হাসান আল আসমাভী মরহুমের সাথে তাদের সাক্ষাত ও ইখওয়ানের পক্ষ থেকে তাদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা এবং পরিপূর্ণ ঐক্য ও সংহতির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন ?

আমি আযাদ অফিসারগণকে আর কি স্মরণ করাবো ? তাদের কি সেই সব সম্মেলন-সমাবেশের কথা মনে নেই, যা মহামান্য শাইখ মুহাম্মাদ হাসান আল

www.amarboi.org

আউনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হতো ? ঐসব সমাবেশে আযাদ অফিসারগণ ফাদিলাতুস শাইখ মুহাম্মাদ হাসানের সাথে সালাত আদায় করতেন এবং নামাযের পর তারা নিয়মিত শপথও করতেন যে তারা সফলতা লাভ করলে শরীয়াতে ইলাহিয়া পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করবেন। ইখওয়ানের সাথে যে কথার উপর তাদের ঐকমত্য হয়েছিলো। যদি নিষ্ঠার সাথে তা বাস্তবায়িত করা হতো তাহলে কেবল মিসরেই নয় বরং পুরো অঞ্চলের অবস্থাই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতো। আজ অত্র এলাকায় যে অশান্তি, দুর্বলতা এবং নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে তদস্থলে শক্তি ও বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা ও স্বাবলম্বিতার জোয়ার আসতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটে যা আল্লাহ তায়ালা চান।

তাকওয়াই সর্বোত্তম পথের সম্বল

হাসানুল বান্না শহীদ একটা ভ্রাম্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরং ইউনিভারসিটির সম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই সফরে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সফর সরঞ্জাম থাকতো খুবই সংক্ষিপ্ত। একদিকে আমি দেখি এমন সবলোকদেরকে যারা কখনো সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে তাদের সম্মুখে পশ্চাতে মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা এবং নিরাপত্তা কারসমূহের সারি লেগে যায়। গরীব জাতির পয়সা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অপব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ তাতে লাভ কিছুই হয় না। এসব রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিরা কেউ যখন দৃশ্যপট থেকে সরে যান তখন তার আকাশ ছোয়া মূর্তি তৎক্ষণাৎ ভূতলে লুটিয়ে পড়ে। না কেউ তার আলোচনা করে, না কারো অন্তরে থাকে তার প্রতি অবশিষ্ট এতটুকু সম্মানবোধ। পক্ষান্তরে ইমাম শহীদকে দেখুন, তিনি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে হাতে থাকে মামুলি ধরনের একটা ব্যাগ। তাতে থাকে কয়েকটা জরুরী জিনিসপত্র যেমন একটা আয়না একটা চিরুনী এবং রাত্রিযাপনের পোশাক। এতদসত্ত্বেও আজ হাসানুল বান্না মানুষের মনের মণি কোঠায় চির জাগরুক আর তার প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনই তার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

হাসানুল বান্না এখন কারো প্রশংসার অনেক উর্ধে। কেননা তিনি মহত ও নেক জীবন অতিবাহিত করে তাঁর রবের সমীপে পৌছে গেছেন। যেখানে মহান আল্লাহ তাঁকে তার কার্যকলাপের উত্তম বিনিময় দিয়ে থাকেন। এ মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবনেতিহাস আলোচনার দ্বারা নিশ্চয়ই সেইসব লোকের উপকার হবে যারা সত্যের পথে চলে নিজের আখেরাত গড়ে নিতে চায়। বর্তমানে পয়গামে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার কোণে কোণে তার দীপ্তি ছড়িয়ে চলেছে। এতে হাসানুল বান্নার ভূমিকা ভুলে যাওয়ার মত নয়। অতএব হকের অনুসন্ধানীদের জন্য এ ব্যক্তির পরিচিতি লাভ করা সংকল্পের বলিষ্ঠতা সৃষ্টি ও মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক হবে। তিনি তাঁর মহত চরিত্র এবং কর্মের নিষ্ঠা দ্বারা আলোক স্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছেন।

ইমাম শহীদ কোন বিশেষ বেশভূষা ও পোশাক পরিচ্ছদেও অভ্যস্ত ছিলেন না। কখনো কখনো তিনি আবা পরিধান করতেন আর মাথায় পরতেন পাগড়ি। অধিকাংশ

www.amarboi.org

সময় তাঁকে স্যুট ও তুর্কী টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখা যেতো। তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ কোন আড়ম্বরের পক্ষপাতি ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় যাদুকরী ব্যক্তিত্ব দান করেছিলেন। তিনি যে কোন ধরনের পোশাকই পরিধান করতেন তাতেই তাঁকে বেশ মানাতো । তিনি ছিলেন পোশাকের সৌন্দর্য বর্ধক।

উন্নত নৈতিক চরিত্রের নমুনা ও বীরত্বের উদাহরণ

এই মর্দে মু'মিন আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতেন না। অথচ তাঁর ভাল করেই জানা ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এবং তার শক্ররা তার জীবন কেড়ে নেয়ার জন্য চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। তথাপি তিনি অতসব বিপদাপদের কোন তোয়াক্কা না করেই দাওয়াতে হকের কাজ জারী রাখেন। তিনি জানতেন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তৎপর নয় বরং সরকারের পুরো মেশিনারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর জন্য একটি সময় নির্ধারিত আছে যা এক মুহূর্ত আগে বা পরে হতে পারে না। আমি এসব ঘটনাবলী হাসানুল বান্নার ব্যক্তিগত সাহসিকতা বর্ণনা করার জন্য আরম্ভ করছি না। কারণ তার শৌর্যবীর্য ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং উপলব্ধি করবে যে, এ পথ বিপদসংকুল পথ। মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে এ পথে নামতে হয়। এ মহত উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে নিজের প্রিয়তম সম্পদ কুরবানী করে মানুষকে বুঝতে হবে যে, আমি ঠকবার মত সওদা খরিদ করিনি।

হাসানুল বান্না (র) চা বা কফি কোনটাতেই অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু কোন ইখওয়ানী কিংবা অইখওয়ানীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে যা কিছু পেশ করা হতো তাই আগ্রহ ভরে খেতেন। পানাহারের ক্ষেত্রে তাঁর কর্মনীতি ছিল সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্থক রূপায়ন। যে কোন জিনিসই পেশ করা হতো তিনি সর্বদা তার প্রশংসা করতেন এবং কখনো কোন খাদ্যের দোষ ধরতেন না। মেজবান ও তার পরিবার পরিজনের জন্য কল্যাণের দোয়া করতেন। সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার পর বারী তায়ালার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত প্রকৃতির এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ। কেউ কথা বললে তিনি এমন মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করতেন যেন কোন বড় বক্তার বক্তৃতা শুনছেন। আল্লাহ তায়ালা এ মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে বহু গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। এমন ব্যক্তি কি প্রতিদিন কোথাও জন্মগ্রহণ করে?

কালের অবদান যুগ স্রষ্টা

হাসানুল বান্না যেভাবে তার সংগঠনকে বিন্যস্ত করেন—বিভিন্ন বিভাগে তা বিভক্ত করেন প্রত্যেক বিভাগের জন্য নীতি-পদ্ধতি ও বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক

www.amarboi.org

ময়দানের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী নির্বাচন করেন। এগুলো এবং অনুরূপ অন্যান্য কার্যক্রম দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কত উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী মহাপ্রাণ নেতা এবং যোগ্যতম সংগঠক ছিলেন। সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগেই তিনি ছাত্র সংগঠন, লেবার ইউনিয়ন, চাষী সংগঠন, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাজীবি সংগঠন, মুক্তপেশা ব্যক্তিগণের বিভাগ, দাওয়াত সম্প্রসারণের বিশেষ অধিদপ্তর এবং ইসলামী জাহান ও সমগ্র দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিদেশ বিষয়ক দফতর স্থাপন করেছিলেন। এই কর্ম বন্টন দেখে আপনি সহজেই সে প্রতিভার অনুমান করতে পারবেন যা এসব বিভাগ ও দফতর সংস্থাপনের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল। সরকারী কর্মকর্তাগণ আজ পর্যন্তও এ কালের অবদান এবং যুগ স্রষ্টা ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য সদা সচেষ্ট রয়েছেন। এ ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র মিসরের সীমানায়ই মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। বরং সমকালীন ইতিহাসে সমগ্র বিশ্বের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় আপন দীপ্তিতে ছিলেন ভাস্বর। সরকারী কর্মকর্তাগণ এরূপ জঘন্য চেষ্টায় কেন নিয়োজিত রয়েছেন তার জবাব হয়তো আমি দিতে সক্ষম কিন্তু দেশের প্রচলিত আইন পথে অন্তরায় হয়ে আছে। যা হোক একদিন সমস্ত গোপন রহস্য আপনা থেকেই উদঘাটিত হবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় পরায়ণের আদালত থেকে ফায়সালা ঘোষণা করে দেয়া হবে।

সমস্যাবলীর সমাধান করার উত্তম যোগ্যতা

সমস্যা সমাধানের বিশেষ যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা ইমাম শহীদকে প্রদান করেছিলেন। একবার পরিস্থিতি এক ভাইকে কায়রো থেকে কোন এক ছোট শহরে বদলি হয়ে যেতে বাধ্য করে। এ ভাই সেখানে গিয়ে পৌছার পর স্থানীয় সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। স্থানীয় আমীর উপলব্ধি করেন যে, নবাগত ভাই ইলম, তাকওয়া এবং যোগ্যতার দিক থেকে তাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। তাঁরা সে ভাইয়ের নিকট প্রস্তাব করেন যেন তিনি ইমারতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। উভয়ে বার বার মত বিনিময় করেন কিন্তু নবাগত ভাই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সর্বদা অপারগতাই প্রকাশ করতে থাকেন। ইত্যবসরে ঘটনাক্রমে ইমাম শহীদ ঐ শহরে পর্যবেক্ষণে গমন করেন। সমাবেশ চলা কালে স্থানীয় আমীর ইমামকে বললেন, "আপনি ইরশাদ করেছিলেন যে, যদি অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া যায় তাহলে এ শহরের ইমারতের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হবে। এখন এ ভাই সৌভাগ্যবশত এখানে শুভাগমন করেছেন। তিনি আমার চেয়েও অধিকতর যোগ্য ও জ্ঞানী। আপনি তাকে নির্দেশ করুন যেন তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।" তিনি সে ভাইয়ের দিকে তাকালেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, তিনি এ দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য আদৌ প্রস্তুত নয়। অতএব তিনি স্থানীয় আমীরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আপনি এখানকার আমীর। আপনি যদি কোন ভুল করে বসেন তা হলে কে আপনাকে সংশোধন করবে ?" আমীর সাহেব সেই নবাগত ভাইয়ের নাম বললেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "যদি তিনি আমীর হয়ে

www.amarboi.org

যান এবং ভুল করে ফেলেন তবে তার পরিশুদ্ধি করবে কে ? একথা শুনে স্থানীয় আমীর নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং ইমারতের দায়িত্ব পালন করার জন্য ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন।

এ ঘটনা অত্যন্ত মামুলি ধরনের। তথাপি তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংগঠনের কর্মীরা কত সুন্দরভাবে মতানৈক্যকে দূর করে, যদি তা কোন মূলনীতির পরিপন্থী না হয়। ইমাম শহীদের প্রশিক্ষণের প্রভাব হয়েছে এই যে, সাধারণত ইখওয়ানের মধ্যে মতবিরোধের সমাধান সহজেই করা যায়। যদি মতানৈক্য দীর্ঘায়িত হয় এবং ঐক্যের কোন উপায় খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে যে ভাই সন্তুষ্ট হতে পারতেন না তিনি কোন বাক বিতন্ডা না করে নীরবে সংগঠন থেকে আলাদা হয়ে যান।

ঈমান প্রবৃদ্ধিকর ঘটনাবলী

একবার একজন ইখওয়ানী ভাই তার নাম ফিলিস্তিন জিহাদের স্বেচ্ছাসেবকদের দফতরে লিপিবদ্ধ করান এবং সম্মুখ সমরে যোগদান করেন। তার পিতা ইখওয়ানী ছিলেন না। তিনি এ ঘটনায় বড়ই ক্রুদ্ধ হন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে. মুর্শিদে আ'ম-এর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে তার ছেলে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য চলে গিয়েছে। তিনি তার সাথে দেখা করার জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে আগমন করেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি মুর্শিদে আ'মকে বহু মন্দ কথা বললেন। ইমাম উপলব্ধি করলেন যে, লোকটির মধ্যে অতিমাত্রায় সন্তান বাৎসল্য রয়েছে এবং তিনি তার সন্তানকে ডেকে পাঠাতে চাচ্ছেন। তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং তিনি অত্যন্ত কোমল স্বরে আরজ করলেন, "আমি আপনার আবেগ অনুভূতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করছি। আপনার ছেলেকে ফিলিস্তিন থেকে ডেকে আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।" বর্ণিত ব্যক্তি একথা শুনে প্রশান্ত হয়ে যায়। তার দৃষ্টিশক্তি ছিল কিছুটা ক্ষীণ। কামরায় প্রবেশ করার সময় লোকজন দরজায় জুতা খুলে রেখে আসতো। এ বুজুর্গ যখন ফেরত যেতে উদ্যত হলো তখন ইমাম সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার পাদুকা তুলে নিয়ে তার পায়ে লাগিয়ে দেন। মেহমানের এমন প্রত্যাশা মোটেও ছিল না যে, তার এত কঠোর ও নির্মম কথাবার্তার পরও মুর্শিদে আ'ম তার সাথে এরূপ মহত আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। উক্ত ব্যক্তি নিজেই প্রকাশ করেছেন যে, মুর্শিদে আ'ম-এর এমন উত্তম ব্যবহারই আমার ওপর যেন ঠান্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে। সাথে সাথে আমার মনের সকল ক্ষোভ নিমিষেই বিদূরিত হয়ে যায়। কাফেলার প্রধান এমনি ছিলেন সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী যার চিত্তাকর্ষক ও মনোহরী কথাবার্তা এবং অকৃত্রিম ভালবাসার প্রভাবে সর্বস্তরের মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসতো।

এ ঘটনাও খুবই সাধারণ প্রকৃতির। তারপরও আমি এত গুরুত্ব সহকারে এটি এজন্য বর্ণনা করলাম যেন মানুষ জানতে পারে ক্রোধান্বিত ব্যক্তিদেরকে কিভাবে ধৈর্য

www.amarboi.org

ও মিষ্টি-মধুর কথা দ্বারা বশীভূত করা যায়। উত্তম আচরণ এমন এক মহৎগুণ যার সাহায্যে মানুষের অন্তর জয় করা সম্ভব। আমাদের শাসকগণ যদি এই ইসলামী চরিত্র রপ্ত করে নিতে পারে এবং প্রজাসাধারণের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে কোন প্রকার প্রশ্ন করে, তাদের নিগৃহিত করার পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সাথে তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভের দেয়াল ধসে পড়বে এবং পারস্পরিক ভালবাসার দিগন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকবে।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াতের প্রতি যুবকরা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ দাওয়াত যুবসমাজের সম্মুখে কোন বস্তুগত সুযোগ সুবিধা পেশ করেনি যা তাদেরকে সবুজ শ্যামল বাগান দেখাতে পারে। এরূপ গণসমর্থন ও স্বীকৃতির কারণ যুব মানসের এ আস্থা যে, ইখওয়ান উম্মাতে মুসলিমার জন্য সম্মানের অভিলাষী, তারা সকল সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের চির অবসান কামনা করে। তাদের দাওয়াতের দাবী হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সকল প্রকার গোলামীর গোলক ধাঁধাঁ থেকে মুক্তিলাভ করুক। ইমাম শহীদ তাঁর কর্মীদের এ শিক্ষাই দিতেন যে, "নিশ্চিতই আল্লাহ তায়ালা এমন কারো কর্মফল বিনষ্ট করেন না যারা উত্তম আমলকারী।" বিরুদ্ধবাদীদের জন্যও তার জবাব ছিল কুরআন মজীদ থেকেই গৃহীত "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মনীতি সংশোধন করেন না।"

এভাবে ইমাম শহীদ আমাদের মনের মণিকোঠায় এ মূলনীতি বদ্ধমূল করে দেন। আমাদেরকে এ পথে ধৈর্য, দৃঢ়তা, আনুগত্য, সন্তুষ্টি এবং আত্মতৃপ্তির যে শিক্ষা তিনি প্রদান করেন তাই আমাদের শ্রেষ্ঠতম পুঁজি। কবি বলেছেন ঃ

میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفرازی

میں اسی لیے مسلماں میں اسی لیے نمازی

আমার জীবনের উদ্দেশ্য তোমার দ্বীনের উৎকর্ষতা সাধন

আমি এ জন্যই মুসলিম আর এ কারণেই নামাযী।

তার কাছে এ দাওয়াতের মোকাবিলায় কোন জিনিসেরই কোন মর্যাদা ও মূল্য ছিল না। এ জন্যে নিসন্দেহে সবকিছু কুরবান করে দেয়াই ছিল তার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। নাকরাশী পাশা নিহত হওয়ার পর চরম সংকট সৃষ্টি হলে তিনি হিযবুস সাদীর মন্ত্রীসভার সাথে সাক্ষাত করার চেষ্টা করেন যাতে সংকটের সমাধান খুঁজে বের করা যায়। মন্ত্রীদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা তার সান্নিধ্য থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে চাইতেন। তিনি কোন মন্ত্রীর দফতরে কয়েকবার যেতেন। মন্ত্রী সাহেবের পিএ তাঁকে ঘন্টা দেড়েক বসিয়ে রাখার পর অপারগতা প্রকাশ করে বলতো যে, মন্ত্রী সাহেব জরুরী কাজে বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু সেজন্য তিনি কখনো কোন বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করতেন না। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত মেজাজের অধিকারী। তিনি খুব ভাল করেই অন্যদের সম্মান করতে জানতেন। কোন পরিস্থিতিতে তিনি তার

www.amarboi.org

মেজাজের ভারসাম্য হারাতেন না। কয়েকবার তিনি এসব মন্ত্রীদের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন কিন্তু তারা তাঁকে এড়িয়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে শহীদ করা হয়।

ইমাম হাসানুল বান্নার অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে একটা দুর্লভ গুণ এই ছিল যে, তিনি মানুষের পছন্দ-অপছন্দ, মেজাজ ও রুচিশীলতা এবং আবেগ ও আগ্রহের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতেন। সাধারণ লোকেরা এসব দিকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ইমামের ভাল করেই জানা ছিল যে, দায়ী ইলাল্লাহর জন্য লোকদেরকে দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত মনযোগের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই মনযোগ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না আপনি ব্যক্তির রুচি অভিরুচির ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত না হতে পারবেন।

উস্তাদ ওমর বাহাউদ্দীন আল আমিরী দাওয়াতে হকের বিখ্যাত মুজাহিদগণের অন্যতম। এ পথে তাঁর কৃতিত্ব ও অনুপম ত্যাগ এবং কুরবানী সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ইমাম শহীদের জীবদ্দশায় উস্তাদ ওমর আল আমিরীর সাথে তাঁর অত্যন্ত বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ছিল। ওমর আল আমিরীর ওয়ালিদ মুহতারাম ছিলেন বড়ই কৌতুক প্রিয় এবং পরিচ্ছন্ন স্বভাবের অধিকারী সম্মানী ব্যক্তিত্ব। দামী পুস্পসজ্জিত ফুলদানীর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন তিনি। এক সময় এ মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্ব কায়রো গমন করেন এবং একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। যেদিন তিনি তার বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য ট্রেনে আরোহণ করেন সেদিন তাঁর পুত্র জনাব ওমর আল আমিরীও রেলষ্টেশনে বিদায় জানাতে যান। গাড়ী রওয়ানা হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। ওমরও গাড়ীর বগীতে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি প্লাট ফরমের ওপর মুর্শিদে আ'মকে দেখতে পেলেন যে, তিনি দ্রুত গতিতে কামরার দিকে ছুটে আসছেন। জানালার পাশে এসে তিনি খুব সুদৃশ্য অত্যন্ত সুঘ্রাণ যুক্ত এবং তরতাজা ফুলের অনেক বড় ফুলদানী শুভেচ্ছান্তে বড় মিয়ার খেদমতে পেশ করেন। পিতা পুত্রের ওপর এ তোহফার যে প্রভাব পড়ে তার ফল হয়েছিল এই যে, এ উত্তম আচরণের কথা পুরো পরিবার সর্বদা স্মরণ করতেন। তিনি সবসময় একথা আলোচনা করতেন যে, মুর্শিদে আ'ম তাঁর রকমারী দায়িত্ব কর্তব্য পালনের সাথে সাথে সংগীদের অতি সাধারণ অভ্যাসের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন এবং সেগুলো পূরণ করার জন্য সময় বের করে নিতেন।

এ ঘটনাও উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য শুধু এই জন্য যে, এ থেকে আমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। অধিকাংশ লোক অনেক সময় প্রশ্ন করে যে, দাওয়াতের কাজ কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায়। এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে খুবই সুদূর প্রসারী। এই উদাহরণ আমাদের সামনে এ বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দায়ীর প্রতিভা ও যোগ্যতা এবং তার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সর্বদা তাকে দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রসারণের কাজেই ব্যস্ত রাখে। জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা দায়ীর

www.amarboi.org

মৌলিক গুণাবলীর অন্যতম। সাথে সাথে তার অন্যান্য দায়িত্ব কর্তব্য ও বাধাগ্রস্ত হতে না দেয়া ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। নেতার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে, তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করার সমস্ত কলা কৌশল খুব ভাল করেই জানবেন। এখানে হৃদয়ের আবদ্ধ দুর্গের সমস্ত দ্বার খোলার কৌশল জানতে হয়। আর এ জন্য এমনসব মহৎগুণাবলীর প্রয়োজন যা ইমাম শহীদের চরিত্র ও সামগ্রিক কর্মতৎপরতায় পরিদৃষ্ট হয়। কবির ভাষায় ঃ

لقد كانت فى حياتك لى عظات

وانت اليوم اوعظ منك حيًا

তোমার জীবনে ছিল আমার জন্য অনেক গ্রহণযোগ্য উপদেশ
মরণের পর আজ তুমি আমার নিকট হয়ে উঠেছো আরও আকর্ষণীয়
তোমার জীবনাদর্শ আমাকে তোমার বক্তৃতা বিবৃতি থেকেও
বেশী হেদায়াত ও পথ নির্দেশনা দিচ্ছে।

আল্লাহর এ দুনিয়াতে মানুষ এক প্রকারের নয় কিছু লোক রয়েছে এমন যাদের দেখে চক্ষু বিস্ফারিত হয়। দিল ও দেমাগ পেরেশান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কিছু লোক আবার এমনও রয়েছে যারা চক্ষুর আড়ালে চলে গেলেও তাদের স্মৃতি অন্তর থেকে মুছে ফেলা যায় না। তাদের হৃদয় গ্রাহী স্মৃতি এবং মহৎ ঘটনাবলী ঈমানকে উদ্দীপ্ত করে এবং অন্তরকে প্রশান্তি দান করে। হাসানুল বান্না এমন অনুপম ব্যক্তিত্ব যে, তার স্মৃতি হৃদয় মনে সদা জাগরুক ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে এবং প্রেমের এ কাফেলাকে লক্ষ্য অভিমুখে পথ প্রদর্শন করতে থাকবে।

www.amarboi.org

আটাশতম অধ্যায়

শোকাহত হৃদয়ের বেদনাদায়ক ক্ষত

এ স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে আমি যুবসম্প্রদায় এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের অন্তরে ইসলামের মর্যাদা বোধের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। এক সময় মুসলিম উম্মাহ বিশ্বব্যাপী শক্তি ক্ষমতা ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক ছিল এবং দুনিয়ার সকল বাতিল শক্তি তাদের ভয়ে সদা প্রকম্পিত থাকতো। দুর্ভাগ্যবশত আজ মুসলিম মিল্লাত যে অপমান ও লাঞ্ছনার অসহায় শিকার তা থেকে মুক্তি লাভের কোন চিন্তাই করা হচ্ছে না। এক্ষণে আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের সার্বিক কর্মকান্ডের ফায়সালা আমাদের দুশমনদের হাতে সোর্পদ করা হয়েছে। তারা আমাদের অবগতি ও অনুমতি ছাড়াই যা ইচ্ছা তাই ফায়সালা করে। মনে হয় আমরা যেন মশা মাছির সমতুল্য। আমি রেঁনেসার রূহ জাগরিত করে তুলতে চাই। যার ফলে উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তি নিত্য নতুন প্রেরণা ও জীবন্ত অনুভূতির মূর্তপ্রতীক হিসেবে পরিদৃষ্ট হতে পারে। উম্মাতের অপমান ও লাঞ্ছনা তার জন্য হয়ে উঠবে অসহ্য। এমনকি সে নিজে নিজেকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর পার্শ্ব পরিবর্তনরত বলে অনুভব করবে। এরূপ অনুভূতি চাংগা হয়ে ওঠার পরই একজন মুসলিম যুবক চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম হবে যে, সে কোন আকাশের বিচ্যুত তারকা। বর্তমানকালের মুসলিম শাসক ও শাসিত সবাই লাঞ্ছনার চাদর মুড়ি দিয়ে খরগোশের ন্যায় সুখ স্বপ্নে বিভোর। কারো ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের ওপর হামলা হলেই সে কত অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। এমনকি কোন কোন সময় হত্যা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হয়। অথচ আকীদা ও ঈমান ব্যক্তিগত মর্যাদা অপেক্ষা কত বেশী মূল্যবান। আর মুসলিম ভ্রাতৃদের অপমান যা খানায়ে কা'বা থেকেও বেশী সম্মানিত—তার দৃষ্টিতে কোন প্রকার গুরুত্বই বহন করে না। আমার ঐকান্তিক কামনা এই যে, আজকের যুবকরা ইসলামী মর্যাদাবোধ দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃত ইজ্জতকে বহাল করতে সক্ষম হোক এবং যেভাবে তাদের পূর্বসূরীগণ দ্বারা মাথার মুটুককে পদ পিষ্ট করে ছিলেন। তারা নিজেরাও সেরূপ সকল তাগুতকে মস্তকাবনত করার বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করুক।

জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ অধপতন থেকে মুক্তির পথ

ইহুদীরা ফিলিস্তিন ভূ-খন্ডের ওপর তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে এবং মুসলিম সমাজের রক্ত দ্বারা হলিখেলা অব্যাহত রয়েছে। তারপরও এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম রয়েছে যারা ইহুদীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখেছে। এমনকি তাদের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করতেও কোন প্রকার লজ্জা অনুভব করে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন তাদের নিকট ফিলিস্তিনের মাটি মুসলিমদের নয় এবং ফিলিস্তিনবাসীও মুসলিম নয়। কাফেলার সাজ সরঞ্জাম হারিয়ে যাওয়ার জন্য কি কম দুঃখ ছিল ? এখন

www.amarboi.org

সেই কাফেলার অন্তর থেকে ক্ষয়ক্ষতির অনুভূতিও লোপ পেতে বসেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে !

রাশিয়া আফগানিস্তানের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ করতঃ আধিপত্য বজায় রেখেছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলিম এ অন্যায় আচরণকে আদৌ কোন গুরুত্ব দিতে চায় না। এমনকি উল্টো তারা রুশদের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা প্রদানেও সদা তৎপর। গোলান ও দক্ষিণ লেবাননকে ইস্রাঈলীরা তাদের নাপাক পায়ের নীচে দলিত মথিত করে চলেছে। অথচ আমরা শুধু মৌখিক জমা খরচ ব্যতীত আর কিছু করার হিম্মত দেখাতে পারছি না। এরূপ প্রতিবাদ বিবরণে ইস্রাঈলের দিল ও দেমাগ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে এই শূন্যগর্ভ বিবৃতি মুসলিমদের অন্তরের ওপর করাত চালানোরই নামান্তর। আমরা সেই মর্যাদাবোধকে চাংগা করে তুলতে চাই যা আমাদেরকে আমাদের পবিত্র ভূমিসমূহ পুনরুদ্ধার করতে অনুপ্রাণীত করতে সক্ষম হবে। আমরা হৃদয়ের পরতে পরতে যে অলসতা-উদাসীনতার সে প্রলেপগুলোর মূলোৎপাটিত করতে চাই যেগুলো আমাদের জীবনকে উদ্দেশ্যহীন এবং আমাদের অস্তিত্বকে নিরর্থক করে দিয়েছে। আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা যদি সার্থকতা মন্ডিত হয়ে যায় তাহলে একাধারে ফিলিস্তিন, গোলান, দক্ষিণ লেবানন ও আফগানিস্তান তথা সমগ্র অধিকৃত মুসলিম অঞ্চল উম্মাতে মুসলিমার অন্তরের দীপ্তি ও হৃদয়ের কম্পনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যাবে। এ প্রাণপ্রিয় ও মহামূল্যবান ভূ-খন্ড দুশমনদের আধিপত্য ও ছোবল থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনার সাহায্যেই কেবল পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। নিজেদের হৃত ভূ-খন্ড পুনরায় ফিরে পাওয়ার চিন্তা সফলতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ। অলসতা উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততার ফল এই দাঁড়াবে যে, পরিস্থিতির আরো অবণতি ঘটবে এবং পশ্চাদপদতার মেঘরাশি অধিকতর গাঢ়রূপ পরিগ্রহ করবে। আমেরিকা, রাশিয়া, ইস্রাঈল এবং পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত ইসলাম বৈরী শক্তি ইরাক-ইরান যুদ্ধের পশ্চাতে উস্কানি দিয়ে চলেছে। অথচ এ বিধ্বংসী যুদ্ধ দ্বারা দু'টো ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম রাষ্ট্রই তাদের শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষ করে চলেছে। অতি সম্প্রতি আবার ইরাকের কুয়েত জবর দখল একই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এ দৃশ্য দেখে ইস্রাঈল আনন্দে আটখানা। তার পোয়াবারো এই ভেবে যে, তার শক্তি বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে। ইস্রাঈল এ অশান্ত পরিস্থিতি জনিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে পুনরায় সিনাইয়ের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে বসে কি না। বিপদের গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ চক্ষুষ্মান লোকদের দৃষ্টি সমক্ষে যথার্থই ভেসে উঠছে। কিন্তু আরব ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ভোগ বিলাসের মহা সমুদ্রে নিমজ্জিত রয়েছেন। এ শাসনকর্তাদের আচার আচরণ দেখে সকল ধৈর্যশীল ও শান্তপ্রকৃতির লোকের মন-মেজাজও বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং প্রত্যেক ধৈর্যধারণকারী মুসলিম ব্যক্তির ধৈর্যও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ঐকান্তিক কামনা হচ্ছে মুসলিম জাতির আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠুক এবং সর্বোচ্চ আসন থেকে এমন কার্যকরী ঘোষণা দেয়া হোক যার ফলে দেখা যাবে যে মুসলিমদের অন্তর থেকে ঈমানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আজও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে

www.amarboi.org

যায়নি। তাদের ওপর চেপে বসা অপমান ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে যায়নি। তারা তাদের হারানো গৌরব ও সম্মান পুনরায় লাভ করতে পারে। পারে শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ইন্দ্রজাল নিষ্ক্রিয় করে দিতে। ইচ্ছা ও ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কি করা সম্ভব নয়?

আমরা যখন আমাদের পক্ষ থেকে সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা শেষ করবো এবং এতদসত্ত্বেও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থকাম থেকে যাবো তখন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ অবশ্যই তার সাহায্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দেবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজও যদি বদরের প্রান্তর সৃষ্টি করে নেয়া যায় তাহলে আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে। নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার পর যখন সর্বশক্তিমানের দরবারে হাত তোলা হয় তখন তা খালি ফিরিয়ে দেয়া হয় না। "অসহায় নিরাশ্রয়ের ডাকে কে সাড়া দেয়—যখন তাকে আহ্বান করা হয় এবং তার ওপর আপতিত বিপদাপদই বা কে দূরীভূত করে দেয় আর কেইবা পৃথিবীতে তোমাদেরকে তার প্রতিনিধির মর্যদাদানে ধন্য করেছেন।" আমরা চাচ্ছি এ স্মৃতি কথা নিকট ও দূর ভবিষ্যতে আমাদের সূক্ষ্ম আত্মমর্যদাবোধের উন্মেষ সাধনে এবং সুপ্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য যেন উপলক্ষ হতে পারে।

ইসলামের দুশমনেরা আজ আমাদেরকে চলমান লাশ সদৃশ্য মনে করে। তাদের মতে আমাদের মাঝে জীবনের চাঞ্চল্য আর অবশিষ্ট নেই। হে যুব সম্প্রদায় ! তোমরা কি বাস্তবিকই এ অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছো? ইমাম শহীদ তার জীবদ্দশায় যুবকদের মধ্যে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে ছিলেন। তাদেরকে জিহাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যুবকদের ভেতর এরূপ জীবন দায়িনী মনোবল ও বলিষ্ঠতা দেখে আমাদের শত্রুদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তারা তাদের অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবকদের নির্দেশ প্রদান করে যেন এ আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয়। যার ফলে মুসলিম শাসনকর্তারা ইসলামের দুশমনদের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার হক পুরোপুরি আদায় করতে গিয়ে হকের পথে আহবানকারীদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান আরম্ভ করে দেয়। এতো বিগত দিনের স্মৃতি চারণ মাত্র। হে যুব সমাজ ! তোমরা কি কোন মূল্যবান কীর্তিগাঁথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে যেতে চাও না? যা দেখে ভবিষ্যত প্রজন্ম গৌরব বোধ করতে পারে। ওঠো ! এবং বাতিলের চোখে চোখ রেখে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করে দাও ঃ

شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے

পলায়ন পর রাত্রির অন্ধকার শেষ পর্যন্ত প্রখর সূর্যের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে;
এ বাগান তাওহীদের সুমধুর সংগীতের মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে উঠবে।

www.amarboi.org

আরো শুনে রাখো, যদি উম্মাতে ইসলামিয়া অপমান ও লাঞ্ছনার পোশাক ছুঁড়ে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হয় তাহলে স্থায়ী লানতের বেড়ি তাদের নসীব হবে। আমি দিগন্তের কিনারে প্রত্যাশার আলোকচ্ছটা ঝলমলিয়ে উঠতে দেখছি। আকাশের অসীম নীলিমা থেকেও প্রদিপ্ত আশার আলোক রশ্মি প্রদীপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসার দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করছি। হতাশা ও নিরাশায় ভেংগে পড়ার কোনই কারণ নেই। সত্য পথের পথিকদের সর্বাপেক্ষা বড় আশ্রয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা রহমতে রাব্বানী। হে গভীর নিদ্রায় অচেতনরা ! অনেক ঘুমিয়েছো অলসভাবে কাটিয়ে দিয়েছো অনেক সময়। এবার উঠে পড়ো। তাকিয়ে দেখো এক্ষণে প্রভাতকালীন উষার আলো আকাশ থেকে আয়না সদৃশ্য পোশাক পরিধান করে ধরণীর বুকে আগমন করতে যাচ্ছে এবং রাতের সকল অন্ধকার এখনই শূন্যে মিলিয়ে যেতে চাচ্ছে।

কর্মফলেই জান্নাত ও জাহান্নাম

নিজে নিজেকে তুচ্ছ মনে করো না এবং স্বীয় দুশমনদের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসো না। কর্মতৎপরতাই জীবনের পরিচায়ক, আর অলসতা ও কর্মবিমুখতা মৃত্যুরই নামান্তর। শ্রমের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতাই দুঃখ ডেকে আনে। বিপদ মুসিবত সহ্য করেই স্বর্ণে পরিণত হওয়া যায়। মৃত্যুর দরজা অতিক্রম করতে মুহূর্ত মাত্র দরকার হয়। তারপরই তো পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং জান্নাতের সুসংবাদ মিলে। এভাবে যে বাতিলের পতাকাবাহী হয়ে পড়ে কিংবা তার ছত্রছায়ায় থাকতে সন্তুষ্ট হয়ে ন্যক্কারজনক জীবন যাপন করতে থাকে—তাদেরকেও তো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হিমশীতল শরাব পান করতেই হয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত মৃত্যুর ঘাট পাড়ি দিয়ে সোজা জাহান্নামবাসী হতে হয়। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আপনার নিজেরই দায়িত্ব যে দু'টি ঠিকানার মধ্যে কোন ঠিকানা আপনি নিজের জন্য বেছে নেবেন। মানুষ যে বীজ বপন করে সে ফসলই ঘরে তুলতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ওপর কখনো কোন জুলুম ও অন্যায় করেন না।

১৯২৮ সালে মিসরে যদি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন আরম্ভ না হতো তাহলে কে জানে আজ এখানে কি পরিস্থিতি বিরাজ করতো। যদি এ আন্দোলন দানা বেঁধে না উঠতো তাহলে ইস্রাঈল ফিলিস্তিনকে এমনভাবে গলধঃকরণ করতো যে, প্রতিবাদ পর্যন্ত করা হতো না। তার নিন্দা জ্ঞাপনের জন্যও কেউ মুখ খুলতো না। আর কারো সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠার তাওফীক হতো না। ইমাম শহীদ শুরু থেকেই এ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই লাগাতর সর্তকবাণী উচ্চারণ করতে ও বিপদ সংকেত বাজাতে থাকেন। তিনি সর্ব-সাধারণের মনে আসন্ন এই বিপদের অনুভূতি সৃষ্টি করেন এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারীদের সক্রিয় করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু আফসোস ! দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ সক্রিয় হলেন বটে কিন্তু নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধে। জিহাদের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সাধারণ মানুষের মনে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো তাকে তাদের শ্লোগান

www.amarboi.org

সর্বস্ব বক্তৃতা এবং অন্তসারশূন্য বিবৃতির সাহয্যে নির্বাপিত করে ফেলে। মুসলিম শাসকদের গাদ্দারীকে আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না। নাকরাশীপাশার মন্ত্রীসভা ইস্রাঈলের সাথে শান্তি ও আপোষ আলোচনা করে কার্যক্ষেত্রে ফিলিস্তিন ভূ-খন্ডের ওপর ইস্রাঈলকে তার থাবা বিস্তার করার সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। আমাদের জন্য জরুরী ছিল ইস্রাঈলের সাথে কোন প্রকার আপোষ আলোচনায়ই না বসা। একান্তই যদি আলাপ আলোচনা করতে হতো তাহলে মিসরের বৃটেনের সাথে মতামত বিনিময় করা উচিত ছিলো। কেননা জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনের তত্বাবধানের দায়িত্ব বৃটেনের ওপরই অর্পণ করা হয়েছিলো। এ আলাপ আলোচনার সময় আমাদের একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা উচিত ছিলো যে, আমরা ইস্রাঈল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারি না। তাছাড়া ফিলিস্তিনের ওপর ইস্রাঈলকে চাপিয়ে দেয়ার অধিকার কারো নেই।

নব্য ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহ

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখে রাশিয়া ও আমেরিকা দু'পরাশক্তিই তাকে খতম করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারা ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা হ্রাস করা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ইসলামের নামেই বেশ কিছু সংগঠন তৈরী করে এবং পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়া হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমুন বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাতিল শক্তির সম্মুখে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জেলখানার অভ্যন্তরে ইখওয়ানের সাথীগণ সশ্রম কারাদন্ডের নির্যাতন ও অমানুষিক নিপীড়ন ভোগ করেন। ইখওয়ানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ কারাগারগুলোর সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে জিন্দানখানাগুলো জেল বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন করে দেয়া হয়েছে।

এ দাওয়াতকেই লক্ষ্যবস্তু বানানোর জন্য আবদুন নাসের ও সাদাত এমন পন্থা অবলম্বন করে যা কল্পনা করতেই শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাদাতের নির্দেশেই যে ব্যাপক ধরপাকড় পরিচালিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল ইখওয়ানকেই টার্গেট বানানো। কিন্তু শুধু পরিস্থিতি আড়াল করার জন্য অন্যান্য লোককে গ্রেফতার করা হয়। দেশে স্থায়ীভাবে জরুরী আইন জারী করা হয় যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এ কাজও করা হয় ইখওয়ানকে লক্ষ্য বানানোর জন্য।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন গোটা প্রাচ্য জগতে পরিস্থিতি পরিবর্তন সাধন করে। ক্রুসেডের যুদ্ধ সুপরিচিত রূপে বহুদিন পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এ আন্দোলনের প্রারম্ভে সুদীর্ঘ নয়শত বছরের নীরবতার পর পুনরায় যুদ্ধের সূচনা নতুনভাবে হয়। প্রাচ্য জগত আমেরিকা ও রাশিয়ার মাঝে বিভক্ত। এ দু'টি শক্তির লক্ষ্য হচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের বিনাশ সাধন করতে হবে। কেননা তা তাদের নেতৃত্ব কোন ক্রমেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ওপর যখন

www.amarboi.org

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তখন আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের চাপ তার পশ্চাতে কার্যকরী ছিল। এটা কি ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড নয়?

ইখওয়ানুল মুসলিমুন এসব বিদেশী শক্তির দুশমন। কারণ তারা নিজের দেশকে তাদের নাপাক প্রভাব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত করতে চায়। আমরা কেবলই শ্লোগান দিতে অভ্যস্ত নই। আমরা সিদ্ধান্তকরী যুদ্ধ লড়ার পক্ষপাতি। কে জানে না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ডিপো সুয়েজখালের তীরে কারা উড়িয়ে দিয়েছিল? সেই মহাপুরুষের নাম আমি উল্লেখ করতে চাই না। যিনি উপনিবেশবাদ থেকে নিজ দেশকে আযাদ করানোর জন্য এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, পশ্চিমা শক্তিসমূহ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবগত। তাই তারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শয়তানী কূটকৌশল প্রয়োগ করে এ আন্দোলনকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

মহাবিচারকের আদালত

আমরা যেখানে দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের সমৃদ্ধির জন্য সকল বিপদ হাসি মুখে বরণ করে নিতে প্রস্তুত সেখানে আমাদের এ অবস্থাও রয়েছে যে, আমরা দেশের বিরুদ্ধে কখনো কোন তৎপরতায় অংশগ্রহণ করাকে জায়েযই মনে করি না। আমাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপকারীদের চিন্তা করা উচিত যে, একেতো এসব অভিযোগের স্বরূপ আপনা থেকেই উন্মোচিত হয়ে পড়বে। অন্যথায় মহাবিচারকের আদালতে সকল সত্য কোন প্রকার কম বেশী না করেই গোটা মানবতার সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। জাভীয়াতুল হামরা নামক স্থানে যে অপরাধ সংঘটিত হয় তার রহস্য শীগ্র হোক বা বিলম্বে হোক লোকের সম্মুখে উদঘাটিত ও প্রকাশিত হবেই। এ অপরাধের অভিযোগও ইখওয়ানের বিরুদ্ধে করা হয়েছিলো। অথচ তার পশ্চাতে অন্য কোন অপরাধীর হাত ছিল। যেদিন ঘটনা সংঘটিত হয় সেদিন প্রত্যুষেই আমাকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডেকে পাঠান। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বহু বিশ্বস্ত লোকের নাম উল্লেখ করলাম যারা এ ভয়াবহ ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। মন্ত্রী সাহেব সেসব লোককে ডেকে পাঠান এবং তাদের বর্ণনা শ্রবণ করেন। তারপরও আমার বিস্ময়ের অবধি রইলো না যে, এতসব সাক্ষ্য প্রমাণের পরও ঘটনার সমস্ত দায়দায়িত্ব ইখওয়ানের ওপরই চাপানো হয়। ভ্রাতৃপ্রতীম মহামান্য শেখ সোলায়মান রাবী, শেখ মুহাম্মাদ আল গাযালী, শেখ হাফেজ সালামাহ্ এবং শেখ সালাহ আবু ইসমাঈল আজও জীবিত আছেন। আল্লাহ তাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন। এসব ঘটনাপ্রবাহ এ সাক্ষ্যই বহন করে যে, আমি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত ব্যাপদেশে এসব ফিতনা ও সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমার সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। ঐ সময়ই আমাকে "আমীরুল উমারা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যার জন্য আমি উল্লসিত নই কিংবা সে জন্য আমি অভিলাষীও ছিলাম না।

www.amarboi.org

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন যদি না থাকতো তাহলে আবদুন নাসের এবং সাদাতের বেআইনি কাজকর্ম এবং জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে সমগ্র দুনিয়া থাকতো সম্পূর্ণ নাওয়াকিফ। এসব লোক পার্লামেন্টকে রাবার ষ্ট্যাম্প বানিয়ে রেখেছে। আমরা তাদের দাসত্ব কবুল করতে প্রস্তুত নই তাই তাদের প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি। যখনই আমি মিসরের বাইরে গিয়েছি কিংবা ফিরে এসেছি তখনই আমাকে এয়ারপোর্টে খামাকা ভয় দেখানো হতো, তামাশা করা হতো। আবার ছাড়া পাওয়ার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হতো। অন্য কোন দেশে আমি যখন গিয়ে পৌঁছতাম তখন সেখানেও আমার সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাখা হতো যে, একজন মস্ত বিপজ্জনক লোক সফরে আসছে। একবার মিউনিখ বিমান বন্দরে আমাকে আধাঘন্টা পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। কর্তব্যরত ইমিগ্রেশন অফিসার ওয়ারলেস যোগে তার সিনিয়ার অফিসারদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে থাকে। আমার পক্ষে তার কিছুই বুঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বার বার আমার নাম উচ্চারণ করা ও পাসপোর্টের বরাত দেয়াতে আমি এতটুকু বুঝতে সক্ষম হই যে, আমার সরকার আমার সম্পর্কে এখানে তথ্য সরবরাহ করেছেন। এ ধরনের কষ্টদায়ক ও অবমাননাকর পরিস্থিতির অসহায় শিকার কেবলমাত্র আমিই নই। সমস্ত ইখওয়ানী ভাইকেই হতে হচ্ছিলো। আমার মনে পড়ে, শুধু একবার মাত্র অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার কায়রো প্রত্যাবর্তনের সময় আমাকে সাধারণ মুসাফিরদের ন্যায় কোন প্রকার হয়রানি ব্যতীতই এয়ার পোর্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। আমাদের সাথে এ ধরনের আচরণ এজন্য করা হতো না যে, আমরা কোথাও কোন বেআইনি কাজের সাথে জড়িত ছিলাম কিংবা আমাদের কোন কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এমনটি করা হতো। আমরা হচ্ছি দাওয়াতে হকের কর্মী। এ কারণেই আমাদেরকে অনুরূপ মেহেরবানীর উপযুক্ত বলে মনে করা হতো। এ লড়াই শুধু জালিমদের এবং ইখওয়ানদের লড়াই নয়। এসব নির্বোধরা খোদ আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ জারী রেখেছে। অথচ তাদের জানা নেই যে, মহাশক্তির আধার সেই সত্তার সাথে লড়াইয়ের সূচনা করে তারা কি মারাত্মক পরিণতির শিকার হবে!

আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অব্যাহত আন্দোলনের ফলে আজ দশজন নিষ্ঠাবান দায়ী ইলাল্লাহ্ পার্লামেন্টে পৌঁছেছেন। ইনশাআল্লাহ ভাবিষ্যতে ক্রমশ এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইখওয়ানের নিবেদিত প্রাণ কর্মী এবং অন্যান্য ইসলামী শক্তির সাহায্যে শরীয়াতে ইসলামীয়া বাস্তবায়িত হবে। সুদানে ইসলামী আইন প্রবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের পশ্চাতে ইখওয়ানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা অনস্বীকার্য। সকল মুসলিম রাষ্ট্র থেকেই ইসলামের পতাকাবাহী পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে। এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও যদি সাহিত্যের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বর্তমানে

www.amarboi.org

ইসলামী সাহিত্যিকদের রচিত বই পুস্তক ছাড়া তা পূর্নাঙ্গ ও সার্থক মনে করা হয় না। মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহে প্রতি দিনই অব্যাহত গতিতে ইসলামী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন প্রত্যেক দেশেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামী আইন প্রবর্তনের দাবী করে আসছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে সাধারণত উলামায়ে দ্বীন ও ফকীহগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব গঠনমূলক ও ইতিবাচক দিক বর্তমান সময়ের আন্দোলনেরই ফল মাত্র।

এ আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া নিজ নিজ পছন্দের বহু সংগঠন কায়েম করেছে। সমাজতান্ত্রিক ইসলাম ও আমেরিকান ইসলাম কিভাবে সফলতা লাভ করতে পারে? এ আন্দোলনের প্রভাবের ফল এই যে, বর্তমানে কোথাও কোন হাউজিং স্কীম তৈরী করা হলে তাতে অবশ্যই মসজিদও নির্মিত হয়ে থাকে। ইখওয়ানুল মুসলিমুন উম্মাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক। অথচ মানুষ তা বেমালুম ভুলে বসেছে। অতএব আজ মিসরের সকল মসজিদে যাকাত কমিটি গঠিত হয়েছে। এ আন্দোলনের চিন্তা ও চেতনার ধারা এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে, বর্তমানে সকল ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্বশীল ব্যক্তিই ইসলামের পতাকাবাহী।

নাসের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। ফলে গণমানুষের মধ্যে তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা দানা বাঁধতে থাকে। সে জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করার অভিনয় করে। এই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে আমাদের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইংগিত দিয়েছি। ১৯৫৬ সালের ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের সূচনা হয় তাতে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার হস্তক্ষেপ করে মিসরকে রক্ষা না করতো তাহলে ১৯৬৭ সালে পরাজয়ের গ্লানি নাসের সাহেবকে তখনি ভোগ করতে হতো। আবদুল করিম কাশেম ও আবদুন নাসেরের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে বাগদাদে বড় বড় মিছিল হয়। সেসব মিছিলে "নাসের মুর্দাবাদ" শ্লোগান দেয়া হয়। নাসের যখন এ সম্পর্কে অবগত হন তখন আবদুল করিম কাশেমকে টেলিফোনে বলেন, "আমিও জানি আর তুমিও জান যে, এসব কিভাবে করা হচ্ছে।" নাসেরের একথা সত্য ছিল। কারণ স্বৈরাচারী ও একনায়করা এ ধরনের নাটকের অভিনয় করে থাকে। নাসেরের পুরো শাসনামলেই তো এরূপ নাটকের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ওপর নাসের নির্যাতন চালাতে শুরু করলে বহু ইখওয়ান অন্য দেশে চলে যায়। সেখানেও তারা তাদের দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রাখে। আর এভাবে দাওয়াতের দুশমনদের হাতেই আমাদের পয়গাম বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে। ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাদের সামর্থ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ইসলামের উপস্থাপিত

www.amarboi.org

রূপরেখা জাতির সম্মুখে পেশ করতে সচেষ্ট হয়। কতিপয় স্বার্থান্ধ ও জ্ঞানপাপী অজ্ঞতার ভান করে জিজ্ঞেস করে থাকে, "আজ পর্যন্ত ইখওয়ানুল মুসলিমুন কি কি কাজ করেছে।" এরূপ প্রশ্ন তারা জানার উদ্দেশ্যে করে না বরং এসব বিকারগ্রস্ত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এরা উজ্জ্বল দিবালোক অস্বীকার করাকে প্রগতিবাদিতা বলে মনে করে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বসলেই সত্য বদলে যায় না। অদূর ভবিষ্যতে ইখওয়ানের ইতিহাস তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে মানুষের সম্মুখে এসে যাবে। অনন্তর কর্ণকুহরে জোর পূর্বক তুলা ঢুকিয়ে দেয়া এবং চোখের ওপর পট্টি স্থাপনকারী লোকেরা আল্লাহর ডংকা শুনতে পাবে এবং সত্যের স্বরূপ দেখতে সক্ষম হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইনশাআল্লাহ্ সেদিন আর বেশী দূরে নয়।

আমি বার বার একথারই পুনরাবৃত্তি করে এসেছি যে, ১৯৩৬ সাল থেকে আরম্ভ করে আজকের এদিন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর মেরুদন্ডে রয়েছে এক ও অভিন্ন আর তা হচ্ছে ইখওয়ানুল মুসলিমুন। একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, এ গতিশীল অকুতোভয়, দৃঢ়তাপূর্ণ ও সুস্পষ্ট দাওয়াতকে ইসলামের শত্রুরা তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য মস্তবড় বিপদ বলে মনে করে। আমি বলতে চাই যে, ইনশাআল্লাহ্ মিসরের মাটিতে কোন তাগুত তার আনুগত্যের জোয়াল চাপিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত তার প্রভাব আরো বৃদ্ধি করবে এমনকি অলসতা ও আপাদমস্তক আন্দোলনের দোলায় সক্রিয় হয়ে উঠবে। জেগে উঠবে গভীর ঘুমে অচেতন অসাড় সকল মানুষ। সব শ্রমবিমুখ কর্মচঞ্চল ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়ে যাবে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদাররা তোমরা ধৈর্যধারণ করো, পরস্পরে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং আল্লাহর পথে দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে যাও আর আল্লাহকে ভয় করো। এভাবে নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হবে।"

www.amarboi.org

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

ইসলামী ঐক্যের আহবায়ক

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ছিলেন উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রনায়ক। পারস্পরিক মতোবিরোধের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঘৃণা। তাঁর বক্তৃতা বিবৃতি মুসলিম উম্মাহর মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ সৃষ্টি করার লক্ষে কেন্দ্রীভূত থাকতো। তিনি কখনো তাঁর কথা ও লিখনীতে এমন কোন শব্দ বের হতে দিতেন না যাতে কারো মনে কষ্ট হতে পারে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মনীতিই হচ্ছে এই যে, সকল বিরোধ ও অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে সব মুসলিমকে বুনিয়াদী নীতিমালার ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ وان هـذه امـتكـم امـة واحـدة "আর নিশ্চিয়ই তোমাদের এই উম্মাত একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত।"

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে শিয়া মাযহাবের একজন আলেম সাইয়েদ আল কুমাই ইখওয়ানের মেহমান হয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে অবস্থান করছিলেন। সে আমলে ইমাম এ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে, বিভিন্ন ইসলামী মাযহাবসমূহের মধ্যে সকল মতপার্থক্যের মূলোৎপাটন করে ফেলতে হবে যাতে ইসলামের শত্রুদের জন্য ইসলামী উম্মাহর মধ্যে মতভেদ ও কলহ সৃষ্টি করে দলে উপদলে শতধা বিভক্ত করার সুযোগ লাভ করতে না পারে। এটা সেই সময়ের কথা যখন আমরা তাঁর নিকট জানতে চাইলাম যে, সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে পার্থক্য কি ? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, এ ধরনের বিতর্কে জড়িত হওয়া একেবারেই নিরর্থক। এরূপ আলোচনা সমালোচনা থেকে রিবত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের করার মত আরো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। আমাদের দুশমনরা সরিষার পাহাড় বানিয়ে আমাদের মাঝে আগুনের লেলিহান শিখা প্রজ্জলিত করতে থাকে। এ কারণে আমাদের গতিবিধি ও আচার আচরণ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। আমরা পুনরায় আরজ করলাম "আমাদের উদ্দেশ্য তো মতপার্থক্যকে উৎসাহিত করা নয় বরং আমরা শুধু আমাদের জ্ঞানের জগতকে আরো সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। নিসন্দেহে শিয়া ও সুন্নী মাযহাবগুলোর ওপর অসংখ্য বই-পুস্তক বর্তমান রয়েছে। কিন্তু আমাদের হাতে এত অবসর কোথায় যে, আমরা সেগুলোর চর্চায় সময় দিতে পারি।"

ইমাম শহীদ জবাব দিলেন ঃ "সংক্ষেপে এতটুকু জেনে রাখুন যে, সুন্নী ও শিয়া সকলেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর' ওপর ঈমান পোষণ করে থাকে। আর এই কালেমাই আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তি। অতএব সুন্নী ও শিয়া সকেলই নির্বিশেষে মুসলিম ; নীতিগতভাবে এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তথাপি সেসব মতভেদ এমন নয় যে, তা দূর করা যায় না।"

www.amarboi.org

আমরা আবারো আরজ করলাম, "একথাটাকে একটা উদাহরণের সাহায্যে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করে দিন।" তিনি জবাবে বললেন ঃ আহলে সুন্নাতের নিকট চার ইমামের দিক থেকে চার মাসলাক পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে শিয়াদের মাঝেও বহু ফেরকা লক্ষ্য করা যায়। যেমন শিয়া ইমামিয়া—বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম ইসলামে বাধ্যতামূলক। এমনকি ইমাম ব্যতীত ইসলামের অস্তিত্বই কায়েম হতে পারে না। তারা বারজন ইমামের প্রবক্তা ; আর এ জন্যই তাদেরকে "ইসনা আশারী"ও বলা হয়ে থাকে। তাদের মতে দ্বাদশ ইমাম গায়েব ও অদৃশ্য হয়ে গেছেন। যার পুনরাগমনের জন্য তারা প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। সেই ইমামের আগমনের পর তার নেতৃত্বে এসব লোক জিহাদের পক্ষপাতি। তাদের নিকট শরীয়াতের হিফাজত করা ইমামের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাঁর ফরমান ও দিকনির্দেশনা কোন প্রকার ওজর আপত্তি ছাড়াই মেনে চলা বাধ্যতামূলক এবং তাঁর ফায়সালাই চূড়ান্ত। নিসন্দেহে এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগী তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু এ মতপার্থক্যকে ভিত্তি করে তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেয়া আমাদের জন্য আদৌ শোভনীয় নয়--।"

তিনি আরো বলেন ঃ "আরও কিছু মতবিরোধ রয়েছে এমন যেগুলোর অপনোদন ও মূলোৎপাটন সম্ভবপর। উদাহরণ স্বরূপ শিয়াদের কোন কোন ফিরকা মোতা' বা সাময়িক বিবাহের পক্ষপাতি। অনুরূপ আরো কতিপয় মতবিরোধপূর্ণ কথাবার্তা রয়েছে। উভয় মাযহাব পরস্পরে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সাথে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রেখে নিজ নিজ ফিকাহর ওপর আমল করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দু'মাসলাকই সুদীর্ঘ কাল থেকে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ঝগড়া বিবাদ ছাড়াই সহঅবস্থান করে আসছে এবং উত্তম প্রতিবেশীর ন্যায় শান্তিময় জীবন যাপন করছে। বেশীর ভাগ মতপার্থক্য কেবল কিতাবের পাতায়ই পাওয়া যায়।

আবু লাহাব নীতির বিদায় ও নবী মোস্তফা (সা)-এর আগমন

ইরাক এবং ইরানের মধ্যেকার যুদ্ধকে শিয়া সুন্নীর রঙে রঙিন করার চেষ্টা চলছে। অথচ এ লড়াই দ্বীনের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে না। বরং উভয় দেশই নিজ নিজ মিথ্যা গর্ব ও বাহ্যিক শৌর্য বীর্য প্রদর্শনের জন্য নিরপরাধ মানব গোষ্ঠীকে মৃত্যুর ঘাটে পৌছিয়ে দিচ্ছে। এভাবে দু'সম্প্রদায়ই আপনাপন জিদ ও হঠকারিতার মহড়া দিয়ে চলেছে। অথচ তাদের এ অপরিণামদর্শী আচরণের অপূরণীয় ক্ষতির দায়দায়িত্ব বর্তাচ্ছে সামগ্রিকভাবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ওপর। ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ এ অযৌক্তিক ও ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য উস্কানি দিয়ে চলেছে। এদিকে বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ই এর সাথে নিজেদের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত বলে মনে করে। আমরা মনে করি যদি দু'গোত্রই নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ও নিরাপত্তার দিগন্ত উন্মোচিত করতে পারে এবং ক্ষোভ

www.amarboi.org

ও ক্রোধ প্রশমিত করে ইনসাফ ও সুবিচারের পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এতেই নিহিত রয়েছে উভয়ের কল্যাণ। সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষে সংঘটিত এ সমর আত্মঘাতি হলাহল স্বরূপ। আফসোস ! এ তিক্ত বাস্তবতা যদি যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষগুলো উপলব্ধি করতে পারতো।

যাদের শৌর্য বীর্য

প্রাচ্যবিদ ও তাদের বিশ্বস্ত শাগরেদগণ অত্যন্ত নির্মমভাবে ইমাম হাসানুল বান্না ও তার সংগঠনের ওপর সন্ত্রাসের অভিযোগ আরোপ করে আসছে। আমরা বহুবার তাদের এই অভিযোগের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছি। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা কখনো কখনো এ দাওয়াতের পক্ষথেকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে বেছে নেন। যেমন মিসরীয় টেলিভিশনে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় একটা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে, যার নাম দেয়া হয়েছে "নুদওয়াতুন লিরায়ী" (আলোচনা সভা)। এ অনুষ্ঠানের পরিচালক হচ্ছেন উস্তাদ হিলমী আল বালাক। এতে আল আযহার ইত্যাদি স্থান থেকে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ১৯৮৪ সনের ২৪শে আগষ্ট তারিখে আমি এ অনুষ্ঠান দেখে ছিলাম। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং স্বনাম ধন্য আলেম শাইখ আতিয়া সাকারও ছিলেন। শাইখ মুহাতারাম মিসরীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। তিনি মন্তব্য করেন "আমি মিসরের উচ্চ ভূমি এলাকায় কর্মরত ছিলাম। ইত্যবসরে একবার ঘটনাক্রমে একজন ইসলামী দায়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি অত্র এলাকায় প্রায়ই আগমন করতেন। এবং জনসাধারণকে ইসলামী রীতিনীতির প্রতি আহবান জানাতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার দাওয়াতের কর্মপন্থা কি ? "তখন তিনি জবাবে বললেন "আমাদের উদাহরণ একজন কৃষকেরই মত। যে কার্পাসের চাষ করে। বীজ বপন করার পূর্বে ভূমি উত্তমরূপে তৈরী করে নেয়। অঙ্কুর উদগমের পর ঘাস ও লতা-গুল্ম পরিষ্কার করে নেয়। আক্রমণকারী কীট-পতংগ থেকে সেগুলোকে রক্ষা করে। পাতা ও ফুলে লেগে যাওয়া পোকা মাকড় থেকে তার নিরাপত্তা বিধান করা। চারাগুলো খুব হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠে। তাতে ফুল আসে এবং ছয় বা সাত মাসের মধ্যে ফসল তৈরী হয়ে যায়। এ সুদীর্ঘ সময় চাষী ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে একের পর একটা দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকে অব্যাহতভাবে। তারপর সে তার পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। তখন সে তার ফসল নিয়ে যায় বড় বড় হাটে বাজারে। তদ্রূপ আমরাও আমাদের দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে থাকি। আমরা তাড়াহুড়া করা এবং কাঁচা ফল তোলার পক্ষপাতি নই। যেসব ব্যক্তি অযৌক্তিক কিছু করতে চায় তারা আমাদের সাথে চলতে সক্ষম হয় না।" উক্ত দায়ীয়ে ইসলাম মরহুমের কথায় আমি সীমাতিরিক্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ি।" (শাইখ আতিয়া সাকারের কথা এখানেই শেষ হয়ে যায়)। এটা ছিল হাসানুল বান্নারই যথার্থ চিত্রাঙ্কন। এ মনোবল ও কর্মনীতি ছিল তাঁরই উদ্ভাবিত।

www.amarboi.org

এটা ছিল একজন মহাপ্রাণ শাইখের বলিষ্ঠ সাক্ষ্য। তিনি কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ছাড়াই কেবলমাত্র সত্য বর্ণনা করার স্বার্থেই একথাগুলো উপস্থাপন করেন। রিপুর সেবাদাসদের এ সাক্ষ্যের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। অবশ্য এটা সত্য যে, শাইখ আতিয়া সাকার এ দায়ীর কথা বলতে গিয়ে তার নাম বর্ণনা করেননি। তথাপি সমগ্র দুনিয়া জানে যে, তিনি কে ছিলেন ? যিনি মিসরের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত দাওয়াতে হকের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার জন্য থাকতেন সদা তৎপর। শাইখ আতিয়া এ দায়ীর পরিচয় যেভাবে তুলে ধরেন তারপর আর এতে কোন সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তিনি আলোচ্য দায়ীর কথা বলতে গিয়ে রাহমাতুল্লাহও বলেন যার ফলে নাম না নিয়েই তিনি সেই মহাত্মার প্রতিই ইংগিত করেছেন।

হিকমাত ও কৌশল মুমিনের হারানো মিরাস

কতিপয় তথাকথিত মুসলিম দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ করে থাকেন যে, তা বর্তমান সময়ের সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম। হাসানুল বান্না শহীদ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলে মনে করতেন এবং তা সর্বকালের জন্য সমভাবে কার্যকরী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। সাথে সাথে তিনি যুব সমাজকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা এবং তাতে পরিপূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোতাবেক এ বিষয়ের ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন যে, হিকমাত ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা মুমিন ব্যক্তির হারানো সম্পদ। সে যেখানেই তা পায় লাভ করতে চেষ্টা করে। তিনি বলতেন, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিজ্ঞানের ওপর কোন ঠিকাদারী নেই। ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণ এবং মংগলের জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অগণিত সৃষ্ট বস্তু নিয়ে পুরোপুরি চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের কর্তব্য। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, আমাদেরকে ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। আইন প্রণয়নে, প্রকৃতি বিজ্ঞানে, রসায়ন শাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে, চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং টেকনোলোজিতে আমাদের অগ্রজদের ন্যায় সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করতে হবে। জাবের বিন হাইয়ান, আল ফারাবী, ইবনে সিনা এবং অগণিত অন্যান্য মুসলিম মনীষী বৈজ্ঞানিক উন্নতি-অগ্রগতি এবং আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মৌলনীতি প্রণয়ন করেন। আর আজ আমরা কেন এসব ময়দানে পদচারনা করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়বো ?

তিনি সংকীর্ণমনা, কূপমন্ডুক, সাম্প্রদায়িক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের সর্বাধিক বিরোধী ছিলেন। তিনি পশ্চিমা স্যুট ও তুর্কী টুপি পরিধান করতেন, টেবিলে বসে খানা খেতেন। প্রয়োজনে ছুরি-কাঁটার ব্যবহারেও আপত্তি করতেন না। সুপরিচ্ছদ প্রিয়তা ও সূক্ষ্মদর্শিতা এতবেশী ছিল যে স্বীয় হাত ব্যাগে সবসময় আতরের শিশি পুরে রাখতেন। অইখওয়ানী মেহমান সৌজন্য সাক্ষাতকারের জন্য আগমন করলে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁদের সাদর সম্ভাসন জানাতেন। মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী এবং মৃদু হাসি তাঁর চেহারায় সদাসর্বদা প্রতিভাত

www.amarboi.org

হতো। পশ্চিমের কিছু সংখ্যক অন্ধ অনুসারী চিন্তাবিদকে পাশ্চাত্যের সকল সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এবং ইউরোপের সার্বিক ফ্যাশনের প্রতি আত্মভোলা বলে মনে হতো। কিন্তু ইমাম শহীদের অবস্থা ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তিনি প্রায়ই বলতেন যে কল্যাণধর্মী ও প্রজ্ঞাময় কথাবার্তা অবলম্বন করো কিন্তু অনিষ্টকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সবকিছু একেবারেই দূর করে দাও।

যুগের বিপ্লব

ডক্টর ত্বাহা হোসাইন প্রণীত গ্রন্থ "মিসরের ভবিষ্যত সংস্কৃতি"-এর ওপর তিনি যে সমালোচনা করেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, আমরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও গোলামীর তীব্র প্রতিবাদ করছি। তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন তাহলে আমরা টেষ্টটিউবের সাহায্যে জন্মগ্রহণকারী শিশু এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের মত বিষয়গুলোর ওপর তার বিজ্ঞোচিত মতামত ও দৃষ্টিভংগির দ্বারা উপকৃত হতে পারতাম। এটা বড়ই বিস্ময়কর কথা যে, এখন কিছু কিছু মুসলিম পদবী ও গোত্রীয় পরিচিতির অন্ধ পূজায় আত্মতৃপ্তি খুঁজে পায়। অথচ পশ্চিমা পন্ডিতরা টেষ্টটিউবের শিশুদের ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা করে তাকে খুব ফলাও করে প্রচার করছে। বুঝে আসে না কেন স্বভাবসম্মতভাবে ভূমিষ্ঠ ভাবী প্রজন্মকে এক দিকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে। আর অপরদিকে অস্বাভাবিক উপায়ে টেষ্টটিউবের মধ্যে লালিত বংশধারার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন মানদন্ড ও পরস্পর বিরোধী আচরণ

আমার মনের কোণে অনেক সময় একটা প্রশ্ন উদিত হয়ে থাকে। সমগ্র দুনিয়ার সাহিত্যিক ও লেখকগণ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে কেন অব্যাহতভাবে বিষোদগার করে আসছেন। খোদ মিসরে এমন কি মিসরের বাইরে আরো অনেক ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা রয়েছে। একথা কি একান্ত বাস্তব সত্য নয় যে সকল সংগঠনই ব্যাপক ভাল কাজের সাথে সাথে কখনো কখনো কোন ভুল ত্রুটিও করে বসে। সমালোচনা মুখর সাহিত্যিক সাংবাদিকগণ অবশ্য কোন কোন সময় অন্যান্য দলের বিরুদ্ধেও কলম ধারণ করে থাকেন কিন্তু তারপর আবার চুপসে যান। কিন্তু ইখওয়ানের বিরুদ্ধে এ ধারা একেবারে বিরতিহীনভাবে ও অব্যাহত গতিতে কেন পরিচালিত হয়ে আসছে? আমাকে বলুন যে, ইখওয়ান কি কখনো কোন ভাল করেনি? এ সংগঠনটি আগাগোড়া ভুল-ভ্রান্তিতেই ভরা? ইখওয়ানের কোন গুণ কি এসব সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না? যে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে কিংবা কোন ভালও মন্তব্য করা যেতে পারে? আল্লাহ তায়ালা কি ইখওয়ানকেই সকল গোনাহর আচরণের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?

আল্লাহ তাঁর নূরকে (দ্বীনকে) পূর্ণতা দান করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে

এসব কাদা নিক্ষেপকারীদের আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এরূপ আচরণ ও কর্মতৎপরতার দ্বারাই কি তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গিয়েছে? ইখওয়ানুল

www.amarboi.org

মুসলিমুনের দাওয়াত কি দুর্বল হয়ে পড়েছে ? ইখওয়ানের অস্তিত্ব কি ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে ? এ আন্দোলনের গতি কি স্তব্ধ হয়ে গেছে ? না, কান পেতে শুনে নাও তোমাদের একান্ত প্রত্যাশা সত্ত্বেও ইখওয়ানের শক্তি ও দাওয়াতের বিস্তৃতিই ঘটেছে। এ মিথ্যা প্রচারক ও অপবাদ দানকারীদের মোকাবিলায় কখনো কখনো কোন কোন স্থান থেকে হকের আওয়াজই উত্থিত হয়ে থাকে। তপাথি আমাদের নিকট এমন কোন উপায় উপকরণ নেই যে, আমরা প্রত্যেকের জবাব দিতে পারি। আমাদের দুশমনদের সার্বিক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আল্লাহ্ তায়ালা তার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে আমাদের পয়গামকে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত প্রসার লাভ করার সুব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আমরা দুর্বল অক্ষম ; কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার কুদরাত ও ক্ষমতা অসীম।

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন ইখওয়ান পুরোপুরিভাবে ছিল সুসংগঠিত। যদি ইখওয়ান ইচ্ছা করতো তাহলে মিত্র শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু ইমাম শহীদ এ পরিস্থিতিতে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা নিরাপদ রেখে কেবলমাত্র দাওয়াতী কাজের সম্প্রসারণের জন্য দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন। তিনি তার সংগঠনের সমস্ত কর্মী ও শাখাকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তারা নীরবে নিজ কর্ম সম্পাদন করে যেতে থাকে এবং মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে অক্ষ শক্তির সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ইতিবাচক কাজে আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইমাম শহীদ সমীচীন মনে করেননি যে, দুই বাতিল শক্তির লড়াইয়ে কোন এক পক্ষকে সাহায্য প্রদান করা হোক। যদিও কোন কোন লোকের মনোভাব এরূপ ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদকে ঘায়েল করার জন্য জার্মানীকে সাহায্য করা উচিত। ইখওয়ানের নির্লিপ্ততা ও পক্ষপাতহীনতা মিত্র শক্তিগুলোর সফলতা ও বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়। এতদসত্ত্বেও জনগণ ইমামকে ও ইখওয়ানকে খুবই খারাপ বিনিময় প্রদান করে। ইমামের বিরোধিতায় শত্রুদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে ছিল না। বরং ছিল এ দাওয়াতের কারণেই যাকে দুশমন তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করতো। অলস নিদ্রায় বিভোর মুসলিম মিল্লাতকে এ দাওয়াত পুনরায় জাগিয়ে তোলে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও সৃষ্টি করে যে, ইসলাম শুধু পূজাপার্বণের ধর্ম নয়। বরং একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের নাম নয় বরং এগুলোর ওপর ইসলামী আদর্শের মজবুত ও আলীশান মহল নির্মিত হওয়া উচিত। মুসলিম জাতির শক্তি, সম্মান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং উন্নতি ও অগ্রগতির রহস্য অইসলামী আদর্শকে খতম করে ইসলামী আদর্শ কায়েমের মধ্যেই নিহিত। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপরই ফরজে আইন পালন করা জরুরী। যদিও ফরজে কেফায়ার জন্য অন্ততপক্ষে একটা দল থাকাই যথেষ্ট। যদি এ দলই ফরজে কেফায়া আদায় করতে থাকে তাহলে সওয়াব তো তারাই লাভ করবে। কিন্তু গোনাহ থেকে পুরো উম্মাত বেঁচে যাবে।

www.amarboi.org

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন সমস্ত উম্মাতের পক্ষ থেকে দাওয়াতে হকের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। অমুসলিমগণ কিছুতেই এ মহতী উদ্যোগকে পছন্দ করতে পারে না যে, মুসলিম জাতি পুনরায় তাদের হৃতগৌরব ফিরে পাক। আলহামদু লিল্লাহ এখন রোগ নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব এর চিকিৎসা করা সম্ভব। রোগের জীবানু চিহ্নিত করা হয়ে গেছে সত্য কিন্তু জানা নেই যে, কেন উম্মাতে মুসলিমাহ তার প্রতিকার করতে ব্রতী হচ্ছে না। এখন যদি এ ব্যাধি থেকে রক্ষা না পাওয়া যায় তাহলে শুধুমাত্র রোগীদের অনমনীয়তা এবং চিকিৎসা থেকে পলায়নী মনোভাবই হবে তার জন্য দায়ী।

ইখওয়ান ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ

ইমাম শহীদ বহুদিন পূর্বেই ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এতে ইখওয়ানের অংশগ্রহণ করা উচিত। তার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, ইখওয়ানের অংশগ্রহণের ফলে একাধারে ইউনিয়ন ও ইউয়ন সদস্যগণের উপকার হবে। এ চিন্তা-ভাবনা কোন বিদায়াত ছিল না। ইসলামী সরকারসমূহের মধ্যে বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ আপনাপন সংগঠন কায়েম করছিল। যেমন তামার কর্মকার-কয়লা বিক্রেতা এবং অন্যান্য বণিক ও ব্যবসায়ীগণ পথনির্দেশনা লাভের জন্য নিয়মিতভাবে কোন না কোন শাইখের সাথে সম্পর্ক রাখতো। তারা তার নিকট থেকে সামগ্রিক ব্যাপারেও লেন-দেনের সকল ক্ষেত্রে দিকনির্দের্শনা লাভ করতো। বর্তমান কালে সম্পূর্ণ নতুন ভংগীতে সেই প্রথা ও প্রচলনেরই সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। অতএব ইমাম হাসানুল বান্না দ্বীনের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী যুবকদেরকে উপদেশ দেন যেন তারা এ দিকটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করে। বাহ্যত এ কাজটি বড়ই কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু নিয়মিতভাবে ও পরিকল্পিত উপায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দ্বীনের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তি ও শক্তি সকল ছোট বড় ট্রেড ইউনিয়নে কার্যকরী ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, ইমামের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ইখওয়ান সকল ট্রেড ইউনিয়নে মজবুত শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়।

ইমাম হাসানুল বান্না এ ময়দানে অত্যন্ত মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভংগির অধিকারী পথ প্রদর্শক। ছোট বড় সকল ব্যাপারে গভীর দূরদৃষ্টি ছিল। আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করুন যেন মানুষের সম্মুখে প্রকৃত সত্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায় এবং তারা মনে প্রাণে এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, ইখওয়ান কোন ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্য করে না। কিংবা তাকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে না। ইখওয়ান বরং তাওহীদী আকীদার পতাকাবাহী এবং এ আকীদা-বিশ্বাসই তাদের দিল ও দেমাগে বদ্ধমূল। এ আকীদা বিশ্বাসেরই প্রতি ফলন ইখওয়ানের আমলী জিন্দেগীতে দেখতে পাওয়া যায়। নেতৃত্ব হাসানুল বান্নার হাতে থাকুক কিংবা অপর

www.amarboi.org

কোন ব্যক্তি এ গুরু দায়িত্ব সামাল দিক তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। যদিও ফজিলত ও মর্যাদা অগ্রগামীরাই লাভ করে।

সুস্পষ্ট ঘোষণা

আপনি কি জানেন ইখওয়ানুল মুসলিমুন কি চায় ? এ প্রশ্ন কত মানুষের মনে উদিত হয়ে থাকে। বিশেষত সেই সব লোকদের মনে যারা বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতিতে প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতার প্রতীক বলে মনে করে। তারা এ প্রশ্ন নানা ভংগীতে উত্থাপন করে। অথচ এর জবাব আমাদের নিকট খুবই সোজা ও সুস্পষ্ট। আমরা আজও তাই চাই যা ১৯২৮ সালে আমাদের প্রাণ প্রিয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্নে বলেছিলাম।

১–জীবনের ছোট বড় সকল ব্যাপারেই আল্লাহর শরীয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

২–বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সকল প্রকার জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়া। এগুলোর উৎসমূল যাই হোক না কেন ! এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কথা যদি ইহুদীদের নিকট থেকেও পাওয়া যায় তা হলেও তা অকপটে গ্রহণ করতে হবে। তা নিসন্দেহে আমাদেরই হারানো সম্পদ।

৩–ইসলামী ঐক্য সংহতি ভৌগলিক সংকীর্ণতার পরিসমাপ্তি। এ কৃত্রিম সীমারেখাসমূহ উম্মাতে মুসলিমার অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী উৎস। আমরা একটি উম্মাতের অন্তর্গত—যাদের দেশ ইসলাম এবং শ্লোগান কালেমায়ে তাইয়্যেবা।

৪–মুসলিমদের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার তাদের শক্তি–সামর্থ, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং শান্তি ও নিরাপত্তাকে পুরোপুরিভাবে সমস্ত মানবতার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া।

৫–পারস্পরিক বুঝাপড়া ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব সমস্যাসমূহকে হকের ভিত্তিতে সমাধান করা। উপনিবেশবাদ দ্বাসত্য ও লুটতরাজের অবসান।

উপরুল্লিখিত দফাগুলোকে কেউ কেউ অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে করে। কিন্তু এটা ভাবে না যে, এগুলোই ইতিহাসের পাতায় অংকিত রয়েছে। আমরা কল্পনাবিলাসী নই। বরং বাস্তববাদী। আমরা জীবনকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে থাকি এবং একজন সভ্রান্ত, পবিত্র ধ্যান-ধারণা ও স্পষ্টভাষী মু'মিনের জীবন যাপন করে থাকি।

আমাদের বিরোধীরা কি আমাদের মনোভাব সম্বন্ধে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হয়ে গেছেন ? নাকি তাদের চিরাচরিত অভ্যাসকেই আকড়ে ধরে চলবে ? আমি ইসলামী জাহানের সমস্ত দায়িত্বশীলের সমীপে আরজ করতে চাই যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে এ দাওয়াতের মূল্যায়ণ করুন এবং দেখুন যে এর মধ্যে তাদের জন্য এবং তাদের জাতিসমূহের জন্য কি পরিমাণ কল্যাণ ও মংগল নিহিত রয়েছে।

www.amarboi.org

তাদের গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করা উচিত যে, এ মহতী দাওয়াতের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা তাদেরই জাতি এমনকি স্বয়ং নিজেদের জন্যও কল্যাণকর কিছু করছে না। এ জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং আগামীকালের আগমন নিশ্চিত। সে দিনের ব্যাপারে আল্লামুল গুয়ুব ইরশাদ করেন ঃ

"فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ .... بِالنَّوَاصِي

وَالْاَقْدَامِ - فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" -

"(অতপর কি হবে তখন) যখন নভোমন্ডল দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মত রক্ত বর্ণ ধারণ করবে ....অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে এবং তাদের কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামত ও শক্তিকে অস্বীকার করবে?"

বর্তমান আইনের সংশোধন কি সম্ভব নয়? অনুরূপভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নৈতিক-চরিত্র এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সংস্কার কি করা যায় না? এসবই সম্ভব। তাহলে এড়িয়ে চলা এবং টালবাহানা কেন? মুসলিম শাসকদেরকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যখনই মুখ খুলবো তখন তোমাদের কল্যাণ কামনা ও সদুপদেশের জন্যই খুলবো। আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষমতার মসনদের সংস্কারই সকল সংশোধনের মূল উপায়। ক্ষমতার মসনদের সংশোধন ও সংস্কার যদি হয়ে যায় তাহলে সমগ্র পৃথিবীবাসী সংশোধিত হয়ে যাবে। পুলিশের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করতে সচেষ্ট হও। তোমাদের সম্মান তোমাদের দেশ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত। একইভাবে তোমাদের জাতির সম্মান ও মর্যদা নিবিড়ভাবে জড়িত তোমাদের সাথে। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালা সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক। কবির ভাষায় ঃ

"তোমরা যদি মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারো তাহলে আমি তোমাদের এ দুনিয়া আর এমন কি লাওহ্ ও কলম পর্যন্ত তোমাদের হয়ে যাবে অধীন।"

www.amarboi.org

ত্রিশতম অধ্যায়

মন্ত্রীত্বের আকাঙ্খায়

জনাব শাইখ আল বাকুরী মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবির অনুমতি না নিয়েই মন্ত্রীত্ব কবুল করেছিলেন। মুর্শিদে আ'ম শাইখ আল বাকুরীকে জিজ্ঞেস করেন, "এখন ইখওয়ান সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভংগি ও মনোভাব কি"? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি মাকতাবে ইরশাদে গিয়ে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।" পুনরায় প্রশ্ন করলেন "তারপর"? শাইখ বাকুরী জবাব দিলেন, "ইখওয়ানুল মুসলিমুনের বুনিয়াদী রুকুনিয়াতের পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

শাইখ বাকুরীর মন্ত্রীত্বের মোহ ও নেশা তাকে আন্দোলন থেকে পুরোপুরি সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিলো। ইখওয়ান অস্থির হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে, তিনি কত নিকৃষ্টতম সওদা করে ফেলেছেন। কি খারাপ সিদ্ধান্তেই না উপনীত হয়েছেন। মুর্শিদে আ'ম ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি শাইখ আল বাকুরীর দফতরে তাশরীফ নিয়ে যান এবং মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তাকে মোবারকবাদ জানান। এ সময়-মন্ত্রণালয়ে মুর্শিদে আ'ম এবং শাইখ আল বাকুরীর সাক্ষাতের যুগ্ম ছবি সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। শাইখ বাকুরীকে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, মুর্শিদে আ'ম-এর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? জবাবে তিনি আলোচ্য ছবির প্রতি ইংগিত করে বলেন, "তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, আমি মুর্শিদে আ'মের সম্মুখে এমনভাবে বসে রয়েছি যেমন করে কোন শাগরেদ তার উস্তাদের সামনে শালীনতা ও সৌজন্যবোধ সহকারে বসে থাকে।" আন্দোলন থেকে শাইখ বাকুরীর বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা তার কতিপয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দেই। তিনি ছিলেন বড় উত্তম আচরণের অধিকারী ও মহৎ নৈতিক চরিত্রের গুণে বিভূষিত। আল্লাহ তায়ালা তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়

জামাল আবদুল নাসের ইখওয়ানের বিরুদ্ধে যখন অভিযান শুরু করেন তখন মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাকেও বাদ দেয়া হবে না। তথাপি তিনি সত্য প্রকাশের দায়িত্ব অব্যাহতভাবে আদায় করতে থাকেন। ইখওয়ানের কত নিরপরাধ ও নির্দোষ সাথীদের সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে কঠোর শাস্তির নির্দেশ শুনানো হয়। আমাদের এসব ভাই উচ্চ খান্দানের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ডাক্তার হোসাইন কামালুদ্দিন, উস্তাদ মুনীর দাল্লা এবং ডাক্তার মুহাম্মাদ কামাল খলিফা তিন জনকেই ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডাদেশ শুনানো হয়। উস্তাদ মুনীর দাল্লা ছিলেন মিসরের বিখ্যাত ও স্বনামধন্য ধনী এবং প্রখ্যাত দাল্লা বংশের প্রদীপ্ত প্রদীপ ও গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মিসরবাসীর খেদমতে এ গোত্রের কৃতিত্বের পরিচয় নতুন করে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ডঃ হোসাইন কামাল

www.amarboi.org

উদ্দীন ছিলেন সে আমলে আইন কলেজের অধ্যক্ষ এবং সুপরিচিত আলেম আল্লামা শাইখ আহমদ ইবরাহীমের বংশধর। অনুরূপ ডাক্তার কামাল খলিফা ছিলেন সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী মুহাম্মাদ পাশা আল আসমাভী মরহুমের জামাতা।

মুর্শিদে আ'ম শাস্তির ফায়সালা শুনতে পান। তিনি নিজেও বিচার বিভাগের সদস্য ছিলেন। এজন্য এসব ফায়সালা দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে ছিলো যে, সরকার ইখওয়ানের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা রুজু করে সাজা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ইংরেজদের সাথে আবদুন নাসেরের মৈত্রী চুক্তির সমালোচনা করেন এবং তার সকল নেতিবাচক ও অনিষ্টকর দিকগুলো প্রমাণসহ এবং বিজ্ঞজনোচিতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

তার মতে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতে গিয়ে যদি জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয় তাহলেও মু'মিন বান্দাকে সত্যের স্বার্থে তা কুরবান করা উচিত। তিনি একজন আই-নবিশেষজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ এবং মুর্শিদ হিসেবে জীবন যাপন করেন। তার পুরো জীবনের রেকর্ড ছিল নিষ্কলুষ এবং উজ্জ্বল। সম্ভবত অধিকাংশ লোক এ সত্য সম্পর্কে অনবহিত যে, ইখওয়ানের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আমরা তাকে বার বার বহু অনুরোধ উপরোধ করি। অথচ তিনি বরাবরই তার শারীরিক দুর্বলতা এবং এ গুরুদায়িত্বের বোঝা উপলব্ধি করে অক্ষমতা প্রকাশ করতে থাকেন। আমরা যখন বার বার অনুরোধ জানাই তখন তিনি এ পদ গ্রহণ করেন। একবার তিনি এ বোঝা কাঁধে তুলে নেয়ার পর তার হকও যথাযথ পালন করেছেন। আন্দোলনের স্বার্থে তিনি তার যথা সর্বস্ব কুরবানী করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইখওয়ানের ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখার জন্য এবং দাওয়াতে হকের প্রদীপ সমুজ্জল রাখার লক্ষ্যে তিনি তার সর্বশেষ রক্তবিন্দুও এ পথেই ব্যয় করেছেন।

স্মরণীয় ছবি

একবার আমরা তাঁর সাথে হালওয়ান মরুভূমি এবং হাওফ উপত্যকায় সফরে যাই। ভ্রমণ ব্যাপদেশে মরুভূমিতেই মধ্যহ্নভোজের সময় হয়ে যায়। আমরা এক জায়গায় থেমে নামায পড়লাম এবং খাবার গ্রহণ করলাম। পানাহার শেষে তিনি তার মূল্যবান স্যুট পরিহিত অবস্থায়ই বালির ওপর শুয়ে পড়লেন এবং কয়েক মিনিট আরাম করলেন। আমি এ স্মরণীয় মুহূর্তে তাঁর ছবি তুলে নিলাম। ফিরে আসার পর আমি তাকে সেই ছবি দেখালাম এবং এ ছবি ছাপানোর অনুমতি চাইলাম। তিনি খুব কঠোরভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কখনো এ ধরনের সস্তা খ্যাতি ও নাম-যশের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রতিটি কাজই শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে। আর আমাদের রব আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তাই মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়ানোর কোনই প্রয়োজন নেই। আমি এ ছবি নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছি। এমনকি ১৯৫৪ সালে আবদুন নাসেরের গোমস্তারাও আমার গৃহে অভিযান চালিয়ে সমস্ত রেকর্ডপত্র নিয়ে যায় যার মধ্যে এ ছবিটিও ছিল।

www.amarboi.org

মুর্শিদে আ'ম হাসান আল হুদাইবি তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ কাল বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। সকল ব্যাপারেই তার দৃষ্টিভংগী আইনের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। যে সংগঠনের পরিচালনার দায়িত্ব এমন নিয়মানুবর্তী ব্যক্তির ওপর থাকে তার কখনো কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণের সুযোগই থাকে না। আমাদের শত্রুরা আমাদের ওপর সর্বদা দোষারোপ করতেই অভ্যস্ত অথচ আমরা তার জবাবে নীরবতা অবলম্বন করাটাকেই অধিকতর সমীচীন বলে মনে করি।

বন্ধুদের মাঝে বিনম্র কিন্তু হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে ইস্পাত কঠিন

দ্বিতীয় মুর্শিদে আ'ম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আবার বাতিলের মোকাবিলায় ছিলেন অকুতোভয়। মিসরের কারাগারে আমি তাঁর সাথে একই সেলে বন্দী ছিলাম। তৎকালীন কায়রোর গভর্ণর যার নাম এখন আর আমার মনে নেই একবার জেলখানা পরিদর্শনে আগমন করেন। গভর্ণরের আগে আগে সামরিক জোয়ান চলছিলো। সে প্রতি সেলের সামনে গিয়ে সজোরে পা মাটির ওপর মারতো এবং ফৌজি কায়দায় নির্দেশ জারী করতো। সে আমাদের সেলের সম্মুখে পৌঁছলে জেলখানার নিয়মানুযায়ী আমি উঠে দাঁড়ালাম। মুর্শিদে আ'ম (র) অবিচলভাবে স্বস্থানে বসে রইলেন এমনকি বিন্দুমাত্র নড়াচড়াও করলেন না। ভাবখানা যেন কিছুই হয়নি। ফলে গভর্ণর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "যদি তোমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাহলে আল্লাহ্ আমাদের মোকাবিলায় তোমাদের সাহায্য করতো।" তিনি সম্পূর্ণ অনমনীয়ভাবে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট থেকে অত্যন্ত প্রশান্ত বদনে জবাব দিলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মুসলিমদের পরাজয় হয়েছিলো। অথচ তাঁর সত্যের পথের দিশারী হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের ও তোমাদের বর্তমান অবস্থাকে ভিত্তি করে হক ও বাতিলের ফায়সালা করা একেবারেই অর্থহীন।

গভর্ণর তার এ জবাব শুনে নীরবে চলে গেলেন। তার চলে যাওয়ার পর মুর্শিদে আ'ম আমাকে তিরস্কার করেন এবং বলেন ঃ "তুমি দাঁড়িয়ে গেলে কেন ? তোমার জানা থাকা উচিত যে, জালিমের জন্য তার মিথ্যার ঔদ্ধত্যের পরাজয় অপমানবোধের কার্যকর উপায়। অত্যাচারী যখন দেখতে পায় যে, জনগণ তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত এবং তার সামনে করজোড়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তার দুর্বিনীত প্রবৃত্তি আরো ঔদ্ধত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে, জনসাধারণ তাকে কোন গুরুত্বই দেয় না—তখন তার আমিত্বের তাজমহল ধড়াস করে মাটিতে পড়ে যায়। আর সে অংগারের ওপর গড়াগড়ি খেতে থাকে। তার এই কর্মনীতিতে হকপন্থীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

ফেরাউনকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো, "কোন্ জিনিস তোমাকে ফেরাউনিয়াত পর্যন্ত এনে পৌঁছিয়েছে ?" ফেরাউন জবাব দিয়েছিলো, "কেউ আমার কোন কথা অমান্য করতে পারতো না তাই আমি ফেরাউনে পরিণত হয়েছি।" জালিমের মধ্যে

www.amarboi.org

কোন উত্তম স্বভাব এবং নৈতিক গুণাবলী থাকে না। যে মানুষ তার সম্মান করবে সে তার বস্তুগত শক্তি এবং বাহ্যিক শান-শওকত দ্বারা মানুষের ওপর মিথ্যা প্রভাব সৃষ্টি করে। যখনই সে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তখনই গাধার ন্যায় অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে একজন নিষ্ঠাবান দায়ীয়ে হক তার শক্তির জন্য বাইরের কোন বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয় না। সে হাতিয়ার ছাড়াই নিজ ঈমানী শক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধের কারণে বলীয়ান হয়ে ওঠে। সে বড় থেকে বড় তাগুত এবং অত্যাচারী বাদশাহর সম্মুখেও কালেমায়ে হক বলতে সংকোচ বোধ করে না। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে তার সামনে কারো কোন গুরত্বই নেই যাকে সমীহ করে চলা যেতে পারে।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তার ওপর কোন এক অত্যাচারী শাসক অত্যাচার চালায়। অনন্তর সে জালিম মজলুম ব্যক্তিকে বলে, "আমি এবার তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম—এখন তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও।" নিগৃহীত ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো, "আমাকে অমর জীবন দান কর।" জালিম লোকটি বলে উঠলো, "এ তো আমার ক্ষমতা বহির্ভূত।" মজলুম বললো, "আচ্ছা এটা যদি তুমি করতে না পারো তাহলে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও।" জালিম উত্তর দিলো, "একাজও তো কেবল আল্লাহ্ তায়ালার। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে জান্নাতে দাখিল করাতে পারেন।" অতপর মজলুম ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বললো, "তোমার ইখতিয়ারে দুনিয়াও নেই আখেরাতও নেই। তাহলে তুমি কোন ভরসায় আমাকে উৎসাহিত করতে পারলে যে চাও কি তোমার পেতে ইচ্ছা করে।" ওগো জালিমদের ভয়ে অস্থির ব্যক্তিগণ ! এটা কি নির্মম সত্য ও বাস্তবতা নয় যে, জালিম নিজেই কত দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় ! তারপরও আবার তাকে ভয় করে ও সমীহ্ করে চলার কি অর্থ থাকতে পারে।

সৎলোকদের সাহচর্যের প্রভাব

হাসানুল বান্না এবং হাসান আল হুদাইবি যুগপৎভাবে কোন ব্যক্তির ওপর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া আদৌ পছন্দ করতেন না। যেসব লোক সংগঠন থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো দুই মুর্শিদের কেউই তাদের সম্পর্কে কখনো কোন কঠোর আচরণ ও নির্দয় ব্যবহারের নীতি অবলম্বন করেননি। উস্তাদ হাসানুল বান্না (র) একবার আল বুহাইরা প্রদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এক জায়গায় জনৈক প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি তার মেহমানদারী করেন। মেজবান ইতিপূর্বে কখনো মুর্শিদে আ'ম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানার সুযোগ পাননি। তিনি শুধু একজন সম্মানিত মেহমান মনে করেই তাঁর অবস্থান করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তার কথাবার্তা শুনলেন তখন বলতে লাগলেন, "আপনি যা বর্ণনা করলেন তাতে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত ও বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছি। অবশ্য আমি কিছু কিছু ভাল কাজও করে থাকি, যেমন মিছকিনদের পৃষ্ঠপোষকতা, গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য সহযোগিতা এবং সালাত ও সওমের নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু তার সাথে সাথে

www.amarboi.org

আমার মধ্যে একটা কবিরা গুনাহের কুঅভ্যাসও আছে। আমার মনে হয় যেন আমি এ গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করতে পারবো না।"

মুর্শিদে আ'ম জিজ্ঞেস করলেন, "এটা এমনি কি গুনাহ যা আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না ?" আমীর ব্যক্তি জবাব দিলেন, "আমি মাঝে মধ্যে মদ্য পান করে থাকি। আর এ বদ অভ্যাসই আমার সংগঠনে যোগদান পথে অন্তরায় হয়ে আছে।" কোন মানুষ ধারণাও করতে পারে না যে, এই পরিস্থিতিতে ইমাম সে মদ্যপ ব্যক্তিকে কি জবাব দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই তার উত্তর ছিল অনন্য ও অসাধারণ ! কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, এ জবাব ছিল একেবারেই সময়োপযোগী সমীচীন। ইমাম শহীদ বললেন, "আমাদের সাথে শামিল হয়ে যাও আমরা এ অবস্থায়ই তোমাকে বরণ করে নেবো।" সে ব্যক্তি খুবই বিস্মিত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো।

ইমামের এ ইরশাদের অর্থ আবার এও নয় যে, তিনি মানুষের মদ্য পানাভ্যাসকে জায়েজ বলে মনে করতেন। কখ্খনো নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তার দূরদর্শিতার পরিচায়ক। যদি সে ব্যক্তিকে ঐ অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে সে হয়তো আর কখনো শরাবখুরী ছেড়ে দিতে পারতো না। অপরদিকে যদি তাকে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যেতো এবং তাকে মুসলিমদের সাথে একই মোতির মালায় গ্রথিত করে দেয়া হতো তাহলে তাদের সাহচর্য্যের প্রভাবে তার মদ্যপান অভ্যাস পরিত্যাগের সম্ভাবনাই ছিল বেশী।

কার্যত ইখওয়ানের সাথে যোগদানের পর সে ব্যক্তির সান্নিধ্যের প্রবল প্রভাব পড়ে এবং সে উম্মুল খাবায়েস থেকে পরিপূর্ণ রূপে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। গুনাহগারদের সংশোধনের পন্থা, পদ্ধতির মধ্যে এটাও একটা যে, তাদের ধিক্কার দেয়া ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার পরিবর্তে নিজের কাছে টেনে নিতে হবে। চালাতে হবে তাদের সংশোধনের সযত্ন প্রয়াস।

আমাদের আন্দোলনের জীবনে অনুরূপ বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। আমি তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে যাচ্ছি না। এ উদাহরণ পেশ করার উদ্দেশ্য হলো সুধী পাঠকগণকে জানিয়ে দেয়া যায় যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন আত্মগর্ভ থেকে পূত-পবিত্র থাকতে রয়েছে তৎপর এবং লোকদের জন্য তাওবার দরজা তারা কখনো বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেনি। আমাদের পয়গাম মানুষকে রহমাতে রব্বানীর জন্য আশাবাদী করা তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দেয়া নয়। এই যাদের কর্মপদ্ধতি তারা কি কখনো সন্ত্রাস এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির পথ অবলম্বন করতে পারে ?

মরীদ থেকে মুর্শিদে আ'ম

উস্তাদ হাসানুল বান্না তাঁর সংগীদের ব্যক্তিগত বিষয়সমূহের ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিতেন এবং তাদের সাথে একান্ত সাক্ষাতের সময় ব্যক্তিগত বিষয়ও জানতে চেষ্টা করতেন। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি আদালতের

www.amarboi.org

দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ কর না ?" প্রত্যুত্তরে আমি আরজ করলাম, আদালতের সদস্যদেরকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকি এবং এ পদ আমার নিকট অত্যন্ত সম্মানজনক বলেই মনে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মাননীয় জজ ও বিচারপতিগণকে বহু অন্যায় ও অবৈধ বিধি-নিষেধের শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ অনেক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমি স্বভাবতই আমার নিজেকে এরূপ ধরাবাঁধা নিয়েমের বন্ধন থেকে মুক্ত রাখতে চাই যাতে আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর অনুমোদিত সীমানার মাঝে কোথাও আমার সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়াতে না পারে। আমি চাই, আমার সময় কোন চাকুরীর শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে না পড়ুক। চাকুরীকে যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই তা বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন উকিল বা আইনজীবী হিসেবে আমার যে স্বাধীনতা রয়েছে আমি তা জলাঞ্জলী দিতে পারি না। এখন আমি স্বাধীন, তাই যেভাবে ইচ্ছা আমার প্রোগ্রাম তৈরী করতে পারি।" তিনি আমার জবাব শুনে প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং এ বিষয়ে আমাকে আর কখনো কোন প্রশ্ন করেননি।

আমি আমার দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করি। অনেক সময় আমি চিকিৎসা ব্যাপদেশে ইউরোপ ও আমেরিকা যাই। যদি সেখানে দীর্ঘদিন থাকতে হয় তাহলে দেশের কথা স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়ি। ফলে কতবার আমি ডাক্তারদের পরামর্শ থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখে মিসরে এসে পড়েছি। প্রসংগক্রমে এখানে জনসাধারণের একটা আপত্তিরও জবাব দেয়া সংগত বলে মনে করছি। কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, এ বয়োবৃদ্ধ লোকটি না আছে কোন রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা না আছে বিষয় সম্পত্তি তারপরও কিভাবে প্রায় বিদেশ ভ্রমণের এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করে থাকে ? সত্য কথা হলো, আমার কাছে প্লেনের টিকেট ক্রয় করার মত টাকা পয়সাও থাকে না। কিন্তু সমগ্র দুনিয়ার কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা ইখওয়ান জোরজবরদস্তি করে আমাকে এসব দূর পাল্লার সফরের কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করে। এবং আমার সফর চিকিৎসা ও থাকা খাওয়ার সমুদয় ব্যয় নিজেদের পকেট থেকেই বহন করে। দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা এসব ভ্রাতাগণকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন যারা শুধু আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের নিমিত্তেই আমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকে এবং সর্বদা বিমানে আমার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকেটের ব্যবস্থা করে। আমি সেই সব ইখওয়ানের অনুরোধক্রমেই একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন করে থাকি এবং সর্বত্রই আমার দ্বীনি ভাইগণ আমার সার্বিক সহযোগিতা করার জন্যে এগিয়ে আসে। সর্বোপরি তারা আমাকে বিপুল পরিমাণ তোহফা ও উপঢৌকন দ্বারাও ধন্য করে থাকেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর এসব তোহফা আমার বন্ধু বান্ধব এবং সংগঠনের সাথী সংগীদের মাঝে বন্টন করে দেই। কিছু কিছু সংগী সাথী হাসি তামাশাচ্ছলে বলতে থাকে যে, পরবর্তী সফরের সুযোগ আবার কবে আসছে। বিমান বন্দরে যাতায়াতের পথে আমার সাথে যেসব আচরণ করা হয়ে থাকে তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করে এসেছি। এসব দুঃখ কষ্টের মোকাবিলায় যখন ইখওয়ানের সাথে দেখা

www.amarboi.org

সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনার সুযোগ লাভ করি তখন সবকিছুই তুচ্ছ বলে মনে হয়। আমি আল্লাহ্ তায়ালার সমীপে বিনম্র প্রার্থনা করছি যেন আমাদের এ পারস্পরিক ভালবাসা বিশেষভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের স্বার্থেই হয়। সম্ভবত এ বিবরণের দ্বারা সেসব লোক সান্ত্বনা খুঁজে পাবে যারা আমার বার বার বিদেশ ভ্রমণের কারণে চোখ কপালে তুলে থাকেন।

একটা তাজা উদ্যম একটা মহৎ ইচ্ছা

আমি যে দেশেই গিয়েছি সে দেশেই বিপুল সংখ্যক যুবককে আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখেছি। এসব যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করেছি এবং ইসলামী আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখে হৃদয়-মন ভরে উঠেছে। এর সাথে আল্লাহ্ তায়ালার প্রভূত সাহায্য সহযোগিতাও রয়েছে। কাজেই এর অকাল মৃত্যু হবে না। (ইনশাআল্লাহুল আযীয)

একবার আমি একটা মুসলিম রাষ্ট্রে সফরে গিয়েছিলাম। আমাদের সফরসঙ্গীগণ এক জায়গায় মস্তবড় এক হল রুমে লেকচারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বক্তৃতার সময় হওয়ার সাথে সাথে মিলনায়তনে পর্যাপ্ত প্রশস্ততা সত্ত্বেও স্থান সংকুলান না হওয়ার অভিযোগ করতে দেখা গেলো। সকল বিবেচনায়ই শ্রোতাদের মধ্যে যুবসমাজের সংখ্যাই ছিল অধিক। ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে অবহিত করা হলো যে, এ হলের মধ্যেই অধিকাংশ সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক জনতার উপস্থিতি শুধু এবারই দৃষ্টিগোচর হলো। যখন ইসলামী আন্দোলনের কোন স্বনাম ধন্য ব্যক্তি ভাষণ দিতে আসেন তখন এ পরিস্থিতি একথারই ইংগিত দেয় যে, ইখওয়ানের দাওয়াত এবং এর শান্তিপ্রিয় কর্মনীতি যুবসমাজকে আকৃষ্ট করতে ও তাদের মন জয় করতে সক্ষম হচ্ছে। তারা স্বভাবতই দেখতে পাচ্ছে যে, এসব বক্তৃতা বিবৃতিতে রোমাঞ্চকর ও চটকদার কোন কথা নেই। কিংবা কারো বিরুদ্ধে কাদা ছুঁড়াছুড়িও নেই। এসব বক্তা অলীক কাহিনী শুনান না বরং নিজেদের লক্ষ্যবস্তু ও নির্ধারিত বিষয়ের ওপর মার্জিত, গবেষণামূলক ও ইলমী যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে থাকেন।

আমার ঐকান্তিক বাসনা হচ্ছে, এ স্মৃতিকথা প্রকাশের সময় আন্দোলনের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরবো। আমি যা কিছু উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি তা কোন ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া কথাবার্তা নয় বরং সেসব স্মৃতিকথা যা আমার জীবনোদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে ব্যক্তি শুধু ঘটনাপ্রবাহকে পাঠকদের সম্মুখে সাজিয়ে পেশ করতে চায় তার স্মৃতিচারণের ভাবভংগি আমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। আমার উদ্দেশ্য আন্দোলনকে উপলক্ষ বানিয়ে সে আংগিকে আমার স্মৃতিমালা তুলে ধরা। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন নয় বরং জীবনোদ্দশ্যে পরিবেশন। আমরা এ দাওয়াতের সাহায্যে আল্লাহ্ তায়ালা, তাঁর রাসূল (সা) ও তাঁর দ্বীনের প্রতি মহব্বত পোষণ করতে শিখেছি। এ পথে আত্মত্যাগ করতে হবে এবং এরই স্বার্থে সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার

www.amarboi.org

করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার কামনা বাসনা সেই দ্বীনের অধীন না হয়। যা নিয়ে আমি আগমন করেছি।" আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, রিসালাতে মা'আব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আনীত পয়গাম কতইনা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মানুষের অন্তরে যতদিন না প্রেম ভালবাসা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার দ্বারা কোন বড় কাজ সমাধা হতে পারে না। আমি খুবই আবেগ ও অনুরাগ প্রবণ মানুষ। আমার এই প্রেমপ্রীতি আল্লাহর দ্বীন ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলনের সাথে একই সূত্রে গ্রথিত। আপনারা জানেন যে, একজন প্রেমিক কোন মাহফিলে হউক কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর ভাষণ দিতে থাকুক সকল অবস্থায়ই সে তার প্রেমিকার আলোচনা না করে থাকতে পারে না। অনুরূপ আমারও এ দুর্বলতা রয়েছে। আমি ও আমার মা'শুকার নাম উল্লেখ না করে কোন কথা বলাকেই সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ বলে মনে করতে পারি না।

যদি প্রেম-প্রীতির চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত ভালবাসার অনুপ্রেরণা এবং জীবনের ঝুঁকি নেয়ার মত শপথের বলিষ্ঠতা না থাকতো তাহলে আন্দোলনের স্বার্থে ইখওয়ান যে অতুলনীয় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তা কখনো সম্ভব হতো না। গ্রেফতার ও বন্দী জীবনকে স্বাগত জানানো এবং ফাঁসির মঞ্চকে চুম্বন করা এ প্রেমেরই চাক্ষুষ প্রমাণ যা আমাদের শিরা উপশিরায় সতত প্রবাহমান। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "يحبهم ويحبونه" (আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসে) যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি মহব্বত পোষণ করে সে কেবল আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। আর যে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় তার সম্মুখে দুনিয়া এবং তার তাবৎ রূপ-সৌন্দর্য বস্তুগত উপায়-উপকণ, বৈষয়িক শান-শওকত এবং অস্থায়ী মান-মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তির আর কোন প্রভাব ও গুরুত্ব অবশিষ্ট থাকে না।

قل الله ثُمَّ ذرهم فى خوضهم يلعبون

(শুধুমাত্র এতটুকু বলে দিন আল্লাহ অতপর তাদেরকে যুক্তিতর্কের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার জন্য ছেড়ে দিন।)

ইসলামী আন্দোলনের প্রসংগ উপেক্ষা করে আমি কিভাবে আমার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করতে পারি? আন্দোলনের কথা বাদ দিলে আর আমার নিজের আত্মজীবনী বলতে কিইবা অবশিষ্ট থাকে? কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, প্রেম কি? তদুত্তরে আমি বলবো, প্রেমই আমার জীবন এবং আমার পোশাক। আমি ভালভাবে জানি যে, আমাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, মানুষের চক্রান্ত এবং রাজা বাদশাহদের রক্তচক্ষু থেকে একটা জিনিসই মুক্তি দিতে পারে, তাহচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা। "اتخشى الناس والله احق

انْ تَخْشَاهُ (তুমি কি মানুষকে ভয় করো ? অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ্ই সর্বাধিক উপযুক্ত যে তাকেই ভয় করে চলবে।) হে মুসলিম জাতি ! আল্লাহর দিকে ফিরে এসো তিনি তোমাদের হিফাজত করবেন তোমাদের শক্তিশালী করবেন। তোমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। তোমাদের সম্মুখে আগত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দেবেন। তোমরা তার প্রতি মহব্বত পোষণ করে মনুষ্যত্বকে সমুন্নত করে তোল তবেই তিনি তার উলুহিয়াতের বরকত দ্বারা তোমাকে অধিকতর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবেন।

তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল

ইখওয়ানের পূর্ববর্তী উভয় মুর্শিদে আ'মই আপনাপন সংগী সাথীদের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। সকল সুখে দুঃখে তারা তাদের সাথে শরীক হতেন। সুদিনে মোবারকবাদ জানাতেন উপহার উপঢৌকন পাঠাতেন এবং নিজেই এ উপলক্ষে তাদের বাড়ীতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। একান্তই যদি নিজে যেতে না পারতেন তাহলে কোন প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দিতেন। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে ভাইয়ের দুঃখ বেদনার ভাগ নেয়ার জন্য তাদের পাশে গিয়ে হাজির হতেন। তাদের এ আচরণ আমীর-গরীব, বিত্তবান ও বিত্তহীন সকলের ক্ষেত্রেই সমান হতো। কারো ওপর কারো কোন পার্থক্য বা শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। তারা তাদের নিত্য দিনের নির্ধারিত দায়িত্ব কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সাথে সাথে এসব কাজ-কর্মের প্রতিও খুবই গুরুত্ব দিতেন। এই দুই অনুপম ব্যক্তিত্বই নেতাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্তস্থাপন করে গেছেন।

ইখওয়ান তাদের উল্লেখিত দু'জন মুর্শিদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত আছে। দুই মহান নেতাই তাদের চারিত্রিক মাধুর্য ও বাস্তব কর্ম-তৎপরতা দ্বারা সকল পরীক্ষায়ই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে থাকেন। আমাদের যুবক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমি এ দিশারী ও পথপ্রদর্শকদ্বয়কে নমুনা ও আদর্শ হিসেবে পেশ করছি। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, আন্দোলনের কর্মীগণ আজও এ ঐতিহ্যকে উত্তমরূপে অনুসরণ করে চলেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফলাফল মূল্যায়ন করে দেখুন আপনার সম্মুখে এ বাস্তব সত্য উদঘাটিত হবে যে শীর্ষস্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীগণ দ্বীনি মানসিকতার ধারক ও বাহক। শালীন যুবক ছাত্র ও পর্দানসীন ছাত্রীদের ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর প্রকাশিত খবর পাঠ করে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় মন ভরে ওঠে। সত্য সত্যই দ্বীনই হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কামিয়াবী এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রেম

ইমাম হাসানুল বান্না এ দাওয়াতের বুনিয়াদ মজবুতভাবে স্থাপন করে ছিলেন এবং এর কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছিলেন। এ রাস্তায় তিনি এমন জিহাদ করেন যতটুকু করলে জিহাদের হক আদায় হয়। এভাবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি শাহাদাতের অমীয় ধারা পান করে স্বীয় রবের নিকট পৌঁছে যান। তার অবর্তমানে শাইখ হাসান আল হুদাইবী

www.amarboi.org

নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব বহন করেন। তখন তার বয়স ছিল ষাট বছরেরও অধিক। স্বাস্থ্য ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এটা ছিল তাঁর ঈমান এবং এ জীবনলক্ষের প্রতি প্রবল অনুরাগেরই পরিচায়ক। যা তাকে এরূপ ভারী পাথর উত্তোলনের জন্য অনুপ্রাণীত করেছিল। মিসরে অধিকাংশ বিচারপতিই অবসর গ্রহণের পর প্রাইভেট প্রাকটিসের পেশা অবলম্বন করে থাকেন। এমনি করে তারা মজলুম ও অত্যাচারীতদের সাহায্য সহযোগিতা করেন এবং জনসাধারণকে তাদের অধিকার আদায় করে দিয়ে জীবিকা অর্জনের উপকরণ যোগাড় করেন। হাসান আল হুদাইবির সহকর্মীরা রিটায়্যারমেন্টে যাওয়ার পর প্রাকটিস করতে শুরু করেন। অথচ তিনি নিজেকে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনের জন্য কোন প্রকার বিনিময় ছাড়াই পেশ করেন। তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি শুধু তাই নয় বরং এ পথে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিপদ-মুসিবতকেও হাসি মুখে বরণ করে নেন। এটা সেই মহান সত্তার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসারই প্রমাণ যিনি অনাদি অনন্ত এবং প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায়ই সমান ক্ষমতার অধিকারী। কত শিক্ষক, আইনজীবি ও বিচারপতিইতো এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আজ পৃথিবী তাদের নামও জানে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও তাদের উল্লেখ নেই। কিন্তু একজন শিক্ষক হাসানুল বান্না এবং একজন আইনজীবি ও বিচারপতি হাসান আল হুদাইবির নাম আজও দীপ্তিতে ভাস্বর। বস্তুত পৃথিবীর সকল বস্তুই ধ্বংসশীল। কিন্তু একমাত্র সংগ্রাম-সাধনা এবং এর প্রতি আহবান করার চিত্রই স্থায়ী হয়ে থাকে। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়া তার দ্বীনকে মজবুতভাবে ধারণ করা। তার প্রতিরক্ষার জন্য বুক টান করে দাঁড়ানো এবং সুখে দুঃখে সকল অবস্থায়ই তার সাথে অটল অবিচল থাকাই চিরস্থায়ী আমল।

সকল জেলখানাতেই একজন করে দারোগা থাকে। যাকে সহযোগিতা করে থাকে নিরাপত্তা কর্মচারী ও সিপাহীরা। প্রত্যেক কয়েদখানায়ই একজন ডাক্তার থাকে যার তত্বাবধানে থাকে নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারী। রাজবন্দীদেরকে জেলখানাতে বিশেষভাবে নির্যাতন করা হয় এবং জেলখানার দারোগারা স্পেশাল ফরমান জারী করে থাকেন যেন এই শ্রেণীর বন্দীদেরকে নির্যাতনের বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। তারপর আবার জারীকৃত এসব আদেশের বাস্তবায়ন রিপোর্টও গ্রহণ করা হয়। এ অত্যাচার-নির্যাতনের বিশেষ লক্ষ্য হতো ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীগণ। আল্লাহ্ তায়ালার অসীম ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করুন যে, জেলখানার কোন কোন কর্মকর্তা এবং হাসপাতালের কিছু কিছু কর্মচারী ওপরের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কয়েদীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ও সহৃদয় আচরণ করতো। তারা কেবল নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে আরাম পৌছানোর চেষ্টা করতো না বরং কয়েদীদের পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে তাদের খবরাখবরও আদান প্রদান করতো। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নির্যাতনের মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারপরও এসব ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তাদের আচরণ দেখে নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখন জালিমদের প্রবল আকাংখা সত্ত্বেও তিনি মজলুমদের জন্য সবকিছু সহজ ও সুগম করে দেন।

www.amarboi.org

একত্রিশতম অধ্যায়

সত্যের পথে আহ্বানকারীর জীবন চরিত্র

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে এবং সব রকম প্রদর্শনী থেকে মুক্ত। তিনি অল্পদামী কাপড় পরিধান করতেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তার নিকট গাঢ় রং এবং কারুকার্য খচিত পোশাকের পরিবর্তে সাদা ও দরবেশী রং ছিল অধিকতর পছন্দনীয়। কথাবার্তার সময় তার বাচনভংগি সর্বজন বোধগম্য সহজ-সরল ও জটিলতা মুক্ত হতো। তার কথাবার্তা অশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত সর্বস্তরের লোকদের জন্য সমান বোধগম্য ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হতো। সাক্ষাতকারের সময় তিনি থাকতেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও হাসি খুশী। কোন অতি সাধারণ লোকও তার সাথে মিলিত হতে আসতো তার পক্ষেও এরূপ কিছু উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না যে, সে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের সম্মুখে বসে রয়েছেন। কারণ তিনি ছিলেন ভয়-ভীতির পরিবর্তে প্রেম-ভালবাসার মূর্তপ্রতীক। অনুরূপ কোন অতি বড় এবং শক্তিশালী ব্যক্তিও যদি কখনো তার নিকট আগমন করতেন তিনি তাদের সামনেও নিজেকে ছোট হিসেবে পেশ করতেন না। তার জন্য সকল কাজই ছিল অত্যন্ত সহজ। কেননা আল্লাহর ওপর ভরসা ছিল তাঁর, তাঁর কাছে থেকেই তিনি শক্তি ও সম্মান লাভ করতেন।

তার সরলতা ও শালীনতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, তিনি তার দাওয়াতী কাজের সূচনা করে ছিলেন হোটেল রেষ্টুরেন্টে গিয়ে জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তার মাধ্যমে। সে দৃশ্য কতই না বিস্ময়কর। যখন একজন সাধারণ শিক্ষক একটা ছোট্ট ব্লাকবোর্ড নিয়ে একটা কফিখানা থেকে অপর রেষ্টুরেন্টের মাঝে যাতায়াত করতেন। তিনি প্রথমে কফিখানায় উপবিষ্ট সর্বসাধারণের পরিচয় গ্রহণ করতেন। তারপর বিভিন্ন ক্লাব, লেক ও সুইমিংপুলসমূহে গিয়ে জনসাধরণের নিকট দাওয়াত পৌছাতে চেষ্টা করতেন। একজন মাত্র ব্যক্তির নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস এমন সুফল বয়ে আনলো যা কোন বড় সংগঠন এমনকি সরকারের দ্বারাও সম্ভব ছিল না।

আজহার শরীফের রয়েছে দুনিয়া জোড়া সুখ্যাতি। এর দায়িত্বশীলদের মর্যাদা ও অবস্থানও অত্যন্ত সম্মানজনক। কিন্তু ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের শুভ সূচনা হয় এই প্রাচীন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে একটা প্রাইমারী স্কুলের অজ্ঞাত একজন শিক্ষকের হাতে। তিনি তার কাজে মগ্ন থাকতেন এবং কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা না করেই দাওয়াতী কাজের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থাকতেন। যখন তিনি কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়ে আসেন তখন জাতীয় সংসদভবনের নিকটস্থ একটি হোটেলের নীচ তলায় ছোট্ট একটা অফিস স্থাপন করেন। সেখানে কোন বৃহদায়তন সাইনবোর্ড লাগানো ছিল না। কিংবা বিজলী বাতিও ছিল না। এ প্রাথমিক অবস্থায়

www.amarboi.org

তিনি লাগাতর সফরে থাকতেন। দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকায় ঘুরে ফিরতেন। ভ্রমণের যে দুঃখ কষ্ট তিনি বরণ করেছিলেন তারই ফলে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের আন্দোলন আজ এত ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। তিনি যেখানেই যেতেন সর্বপ্রথম স্থানীয় মসজিদে উপনীত হতেন। দূর দূরাঞ্চলের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে অবস্থান কালে তিনি চাটাই কিংবা ইট ও মাটি নির্মিত শক্ত বেঞ্চের ওপর বসে পড়তেন। এমনকি অনেক সময় শুধু মাটির ওপরই শুয়ে পড়তেন।

তাঁর শত্রু ও বন্ধু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি ছিলেন যুগের কৃতিসন্তান, অতুলনীয় প্রতিভা ও অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী। কোন পাশ্চাত্য লেখক ও সাহিত্যিক প্রথমদিকেই মন্তব্য করেছিলেন যে, হাসানুল বান্না কেবলমাত্র মিসরেই নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের দিশারী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। এ অনন্য সাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা শয়তানী চক্রের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কারণেই তারা তাকে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার পূর্বেই অন্যায়ভাবে হত্যা করে। যদি এ দাওয়াত হাসানুল বান্নার দাওয়াত হতো তাহলে তাঁর হত্যাকান্ডের সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এটা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার নিজের দাওয়াত। তাই যে কেউ এর বিরোধিতা করবে তাকেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে। যে এর সাথে সহযোগিতা করবে সে অমর জীবন লাভ করতে পারবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা দান করেন যাকে ইচ্ছা অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।

হাসানুল বান্না তার নিজের অস্বাভাবিক যোগ্যতার সাহায্যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। তাঁর অনুসারীগণ বিভিন্ন শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে থাকার পরও সমানভাবে তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষাণ করতেন এবং তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। সব শ্রেণী ও পেশার মানুষ তাঁর সম্মুখে এমনভাবে আসন গেড়ে বসতেন যেভাবে কোন শাগরিদ তার উস্তাদের সামনে অথবা কোন মুরীদ তার মুর্শিদের সম্মুখে আসন পেতে বসে। এই সম্মান কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ছিল না। বরং সর্বসাধারণের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করতো যে, ইমামের সাথে রয়েছে তার অত্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক। তাঁর সাথী সংগীগণ তাঁর সাথে যে সম্মান, ভালবাসা ও আমানতদারী পরিচয় দিতো তা দেখে আমার সেই হাদীসটি মনে পড়ে যায় যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ)-কে বলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। অতএব তুমিও তার প্রতি ভালবাসা পোষণ করতে থাকো। তখন জিবরাইলও তাকে মহব্বত করতে শুরু করে। তারপর সে আকাশ রাজ্যের সমস্ত ফেরেশতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর মাহবুব বান্দা। তোমরা তাকে মহব্বত করতে থাকো। অনন্তর আকাশ ও জমিনের অধিবাসীগণের নিকটও এ বাণী পৌছে দেয়। তখন সে মাহবুবে এলাহী বিশ্ববাসীরও প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে মস্তবড় নিয়ামত।"

www.amarboi.org

বাহুবল ও শক্তি প্রয়োগ

তিনি আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহের বদৌলতে দাওয়াতে হকের পথে পুরোপুরি লাভের সন্ধান করেন। ইসলামী দিবস পালন, যেমন হিজরাতে নববী ইত্যাদি উপলক্ষে তিনি বিশেষ জনসমাবেশের আয়োজন করতেন যাতে ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশার বিপুল সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করতো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হতো যে, হাসানুল বান্না গণমানুষের হৃদয়ের স্পন্দন এবং তিনি তাদের মনের কথাই বলে থাকেন। তিনি মানুষের মনের আশা-আকাংখা জীবিত রাখার প্রয়াস পেতেন এবং তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি ও অবসন্নতার পূর্বেই আপন বক্তব্য সমাপ্ত করতেন।

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও প্রভুত্বের ওপর তার ছিল প্রগাঢ় আস্থা। তার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য অন্য সকলের বৈশিষ্ট্য থেকে ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তার এ অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতাই তার মধ্যে এমন আত্মিক শক্তি সৃষ্টি করেছিলো যার কোন তুলনা ছিল না। তাঁকে দেখে এমন একজন সত্যিকার মুজাহিদের চিত্র দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠতো যিনি কোন বাহ্যিক ও বৈষয়িক উপায় উপকরণ ব্যতীতই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ওপর ভরসা করে ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার রবের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর থাকে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। মানুষ যে কাজকে স্বভাবত অসম্ভব বলে মনে করে থাকে তাকেই তিনি সম্পূর্ণ সম্ভব ও বাস্তব করে দেখাতেন।

আল্লাহ তায়ালার ওপর তাঁর ভরসা ও নির্ভরতার একটা কাহিনী আমি এবার আপনাদের সম্মুখে আরজ করছি। "তিনি কেন্দ্রীয় দপ্তরের জন্য ইমারত ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যার মূল্য সাব্যস্ত হয়েছিল আট হাজার পাউন্ড। তখন তার পকেটে পাঁচ পাউন্ডের বেশী ছিল না। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো অর্থ তার হাতে এসে যায়। ঐ অর্থ দিয়ে তিনি আন্দোলনের জন্য বিল্ডিং ক্রয় করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ওপর ভরসা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের বদৌলতে তিনি শেষ পর্যন্ত তার চাকুরী জীবন থেকেও ইস্তফা দেন। তখন তাঁর নিকট দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন আয়েরও ব্যবস্থা ছিল না।

মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও পৌরুষ নামক দু'টি মহৎ গুণ তাঁর মধ্যে এত অধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিল যে, সেগুলোই তাঁকে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দান করে এবং তার ওসব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করে যার রূপায়ণে বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারও ছিলো। তার মর্যাদা কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং তা ছিল একটি বিশ্বমানের শিক্ষাগার সদৃশ্য। তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে যেমন ছিলেন সত্যবাদী তেমনি আকাংখা পূরণেও ছিলেন পাকা ও সুদক্ষ, লেন-দেন ও আচার-আচরণে বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক এবং ত্যাগ ও কুরবানীর জীবন্ত নমুনা। জীবনের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী তিনি তার মহৎ লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে অকপটে কুরবান করে দেয়ার অনুপ্রেরণা তার অন্তরে তরংগায়িত ছিল। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ, ইবাদাত, সরলতা, বিনম্রতা, তাহযীব-তামাদ্দুন, মার্জিত ও বিশুদ্ধ আরবী মাধ্যমের কথাবার্তা তার ব্যক্তিত্বকে এমন

www.amarboi.org

আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছিল যে, যে কেউ একবার তার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছে সারা জীবন তা ভুলতে পারেনি। তিনি মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং খুঁটিনাটি ও গুরুত্বহীন ব্যাপারসমূহ থেকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতেন। তিনি সকলের সাথে বন্ধুত্ব ও মহব্বতের আচরণ করতেন। কখনো কোন ব্যাপারেই কাউকে ধোঁকা দেননি। কিংবা সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেননি। তিনি কোনরূপ কূটিলতা ও শঠতার আশ্রয় না নিয়েই প্রতিটি কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে তিনি শুরুতেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিতেন যে, এ পথ বড় বন্ধুর। এ পথের পথিকদেরকে ইসলামের শত্রুদের আক্রমণের শিকার হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে বিপদ-মুসিবত সহ্য করার এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করার মত হিম্মত ও ভরসা পায় সেই যেন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে সওয়াবের আশায় নিজের জাহাজ তরংমালায় সোপর্দ করে দেয়। আর যদি কেউ এরূপ সৎসাহস ও যোগ্যতা বোধ না করে তাকে গোড়াতেই অক্ষমতা প্রকাশ করে সরে যাওয়া উচিত।

তার এ উক্তি কত বাস্তব। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা সম্ভব বিপদসঙ্কুল ও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করার পরেই। আর দোজখ থেকে বাঁচতে হলেও কামনা-বাসনা ও স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ করতে হবে। তিনি তার মাওলার সম্মুখে একটা সত্য অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন সে ওয়াদার আলোকেই তিনি ছিলেন নম্রতা-শালীনতা ও শিষ্টাচারের মূর্তপ্রতীক, যাদুকরী ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আদেশ ও নিষেধের পুরো অনুসারী। আল্লাহ তায়ালার অনুগত ও অবাধ্য প্রত্যেকের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। তাঁর বড় বড় দুশমনও তাঁকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেও তাকে নীতিচ্যুত করতে পারেনি।

সা'দ জগলুল পাশার গাম্ভীর্য

মিসর জাতির ইতিহাসে অপর এক সমকালীন ব্যক্তিত্ব সা'দ জগলুল পাশাও ধৈর্য ও সহ্য গুণের জন্য বিখ্যাত। তথাপি তাকে এমন সব নাজুক ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয়নি যাকে অতিক্রম করে সামনে এগুতে হয়েছিল হাসানুল বান্নাকে। আমার মনে পড়ে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন মিসরের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। চুক্তিতে চারটি বিষয়ে গ্যারান্টি প্রদানের শর্তে মিসরকে আভ্যন্তরীণভাবে স্বায়ত্বশাসন দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল। তৎকালীন উজীরে আযম আবদুল খালেক সারওয়াত পাশা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ছিলেন। কিন্তু সাদ জগলুল এসব নিশ্চয়তামূলক শর্তাবলীর কঠোর সমালোচনা করেন এবং দেশবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলেন যে, এ অসম চুক্তি ও অপমানকর সন্ধি বাতিল করতে হবে। সা'দ জগলুলের মতে মিসরকে কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই পুরোপুরি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। শর্তাবলীর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি আমার মনে পড়ছে ঃ

১–ইংরেজ প্রণীত ও প্রবর্তিত আইন-কানুনের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ।

২–সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান।

www.amarboi.org

৩–মিসরের মধ্য দিয়ে বৃটেনের অবশিষ্ট উপনিবেশিক এলাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার অধিকার প্রদান।

সা'দ জগলুলের আক্রমণের জবাবে সারওয়াত পাশা তার নিকট এ মর্মে দাবী করেন যে, তিনি এ সমস্যাকে যেন আদালতে পেশ করেন এবং সেখান থেকে ডিক্রি নিয়ে আসেন। সা'দ জগলুল তার এ আহ্বানের জবাবে সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন যাতে তিনি এ প্রস্তাবকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিবৃতিতে সা'দ যে ভাষা ব্যবহার করেন তার প্রতিটি শব্দ আমার আজও মনে আছে।

"তোমাদের সামনে মিম্বার ও মঞ্চ রয়েছে যদি শ্রোতা মন্ডলী যোগাড় করতে পারো তাহলে তোমরা মিম্বারে দাঁড়িয়ে তোমাদের বক্তব্য শুনিয়ে দাও। তাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীও রয়েছে তোমাদের হাতে। যদি পাঠকগণ তোমাদের লিখনী পড়তে প্রস্তুত থাকে তাহলে তোমাদের বক্তব্য লিখিত আকারে তাদের হাতে তুলে দাও তারপর অবশিষ্ট থাকে আদালাতে মামলা মোকদ্দমায় লড়ার পালা তো সেখানকার জন্য আমি তোমাদের সমকক্ষ নই।

আমার স্মরণ আছে যে, সা'দ জগলুল সম্পূর্ণ অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর স্নায়ুর ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম ছিলেন এবং কখনো ক্রোধান্বিত হতেন না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, মিসর ও সুদানে বৃটিশ সেনাবাহিনী প্রধান স্যার দার লিটাক যখন নিহত হয় তখন মিসরে নিযুক্ত বৃটিশ সরকারের ভাইসরয় জেনারেল আমীনবি সামরিক পোশাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গমন করেন। সা'দ জগলুল তখন তার দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ জেনারেল সাহেব অনুমতি কামনা না করেই সোজা দরজা খুলে ভিতরে চলে যান এবং তীব্র ক্রোধভরে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সা'দ জগলুলকে হুমকী ধমকী দিতে থাকেন। জেনারেল সাহেবের মুখে যা আসলো কোন প্রকার চিন্তা-বিবেচনা না করেই তিনি তা উগলে দিতে লাগলেন। তার একটা হুমকী এটাও ছিল যে, সুদানের মাটি থেকে মিসরীয় সেনাবাহিনীকে কাল বিলম্ব না করে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সা'দ জগলুল তার স্বভাব সুলভ আচরণ অনুযায়ী অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে লাট সাহেবের সকল হুমকী ধমকী হজম করে যেতে লাগলেন এবং নিজের আসনের ওপর বসে তার মুখ পানে তাকিয়ে থাকলেন। অবশেষে যখন হুমকী ধমকী শেষ হয়ে যায় তখন অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, লাট সাহেব আর কি উত্তম খবর আছে? লড়াই ছড়িয়ে পড়েনি তো? লাট বাহাদুর সাহেব ঘৃণাভরে ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সহকারে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রত্যুত্তর না দিয়ে দপ্তর থেকে বেরিয়ে যান।

মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আমি আমার স্মৃতিকথাগুলোকে সন্নিবিষ্ট করার প্রাক্কালে এবার আমি অফদ পার্টি সম্পর্কে কিছুকথা আরজ করতে চাই। "এ পার্টির ব্যাপক স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল গণমানুষের নিকট। এতদসত্ত্বেও ১৯২৪ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৮ বছর সময়ে এ পার্টি শুধু ৮ বছর পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদে সমাসীন ছিলেন। এর মৌলিক কারণ এই ছিল যে, হিযবুল অফদ ইংরেজদের

www.amarboi.org

সুরে হা কিংবা না বলার তাল মিলাতো। তাদের আট বছরের শাসনামলে এ পার্টিও বেশ কিছু ভুল-ভ্রান্তি করে বসে। তথাপি সামষ্টিকভাবে এ দল অন্যান্য মন্ত্রীসভার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল।

সামরিক বিপ্লবের পর নতুন শাসকগোষ্ঠী মিসরের ইতিহাসকে মারাত্মকভাবে রদ-বদল করে দেন। রাজ্যের সমস্ত পদস্থ কর্মকর্তাই স্বীয় প্রতিকৃতি নির্মাণ করার জন্য মিসরের স্বনামধন্য ও বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যেমন হাসানুল বান্না, আহমদ হোসাইন, সা'দ জগলুল, হাসান আল হুদাইবি, মোস্তফা এবং অন্যান্য বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বগণের নাম চিহ্নও মুছে ফেলার প্রয়াস পান। বর্তমান হোসনী মোবারকও এ গতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

কিন্তু ইখওয়ানের পথপ্রদর্শক অদ্যাবধি এরূপ আচরণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যা বিগত সরকারগুলোর শাসনামলে মিসরীয় সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাথে করা বৈধ মনে করা হতো। প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারককে ইতিহাসের ঋণ পুরোপুরিভাবে আদায় করে দিতে হবে। আধা সংস্কার সংশোধন কার্যক্রমের সাহায্যে এ ঋণ কখনো শোধ হবে না কিছুতেই শোধ হতে পারে না।

শাহ অপেক্ষাও অধিক শাহ পূজারী

সকল সমাজে ও প্রত্যেক দেশেই "শাহ থেকেও বেশী শাহের পূজারী" উপাদানসমূহ সর্বকালেই বর্তমান থাকে। ইখওয়ানকে যখন জিন্দানখানায় শৃংখলিত করা হয় তখন কারাগারের অফিসারগণ তাদের সিনিয়র অফিসারগণের মনস্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে একে অন্যের তুলনায় অধিকতর অগ্রণী হয়ে আমাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতো। নিজেদের এ জঘন্য আচরণসমূহকে তারা বড়ই গর্বভরে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গোপন প্রতিবেদন আকারে পৌঁছাতো। এসব লোকের আচরণ সৌজন্য ও আভিজাত্যের সকল মানদন্ডে নিন্দনীয় এবং বর্বরতা ও পাষন্ডতার ছিল নিকৃষ্টতম উদাহরণ। এরূপ অশালীন তৎপরতার সাহায্যে তারা সরকারের দৃষ্টিতে ইজ্জত সম্মান এবং অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো। বাস্তবিকই অধিকাংশ লোকের পদোন্নতি ও ভাগ্য প্রসন্ন করার ক্ষেত্রে এসব কৃতিত্ব ও কার্যকলাপ, বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক গুণাবলী রূপে পরিগণিত হতো।

আলওয়াহাত জেলখানায় আমাদের ঠাঁই হয়েছিল। শাবান মাসের শেষের দিকে কারাগারের দারোগা যার নাম আমি বর্ণনা করতে চাই না। একটা সুখবর শুনান। তিনি বলেন, পবিত্র রমজান মাস সমাগত প্রায় তাই তোমরা যদি বাড়ী থেকে খাবার আনাতে চাও তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এ মোবারক মাসে তোমাদের ঘর থেকে প্রেরিত খাদ্য কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকেই তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ সংবাদে আমরা কিছুটা আনন্দবোধ করি এবং প্রবল উৎসাহ ও কৌতুহল ভরে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের নিকট এ খবর পৌঁছে দেই। আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ আমাদেরকে নিয়মিত খানা পাঠাতে শুরু করে। কিন্তু তা একদিনের জন্যেও আমাদের হাতে পৌঁছতে পারেনি। দারোগা সাহেব

www.amarboi.org

আনীত সকল খাদ্য সামগ্রী পরিপূর্ণ হেফাজতের সাথে তার নিকট রেখে দিতেন এবং রমজানের শেষ ভাগে যখন সেসব কিছু পঁচে গলে একাকার হয়ে গিয়েছিল তখন প্যাকেটে করে আমাদের বাড়ীর লোকদের নিকট ফেরত দিয়ে দেয় এবং বলে যে এগুলো কয়েদীদের হাতে পৌঁছানোর অনুমতি নেই। সুধী পাঠকমন্ডলী ! আপনারা এতে অনুমান করতে পারেন যে, এ আচরণের ফলে আমাদের অন্তরে কতবড় আঘাত লেগেছিল। আর আমাদের পরিবার পরিজনের মনের অবস্থাই বা কেমন হয়েছিল।

রিজিক ধ্বংস করা এমনিতেই মস্তবড় অপরাধ। তদুপরী এ জন্য যেসব টাকা পয়সা ও মাল-দৌলত খরচ করা হয়েছে এবং যে আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে আমাদের ঘরের লোকজন সে খাদ্য তৈরী করেছে ও আমাদের প্রিয়জনেরা উহা প্রত্যহ যে কষ্ট ক্লেশে জেলখানা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে তা একটু ভেবে দেখুন ও কল্পনা করুন। বিপরীত দিকে জেলখানার উক্ত ফেরাউনের আচরণ এবং কর্মকান্ড খতিয়ে দেখুন। ছোট ছোট ফেরাউনের বাচ্ছারা বড় বড় ফেরাউনদের খুশী করার জন্য কিসব কাজ করে চলছিল। এসব লোভ-লালসার বান্দারা মানুষ নামের কলঙ্ক; মানবতা ও মনুষ্যত্বের দুশমন মানবীয় গুণাবলী এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি শূন্য এসব মহামানবগণ তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করতে বাধ্য হবে।

ইখওয়ানী শহীদগণকে ইহুদীদের ইংগীতেই ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে

মিসরের জাতীয় ইতিহাসের সকল ছাত্রই এ বেদনাদায়ক বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত রয়েছে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের যেসব নেতা পরিচালকগণ ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইস্রাঈলদের দাঁতভাংগা জবাব দেন। তারা সকলেই তাদের সরকারের পক্ষ থেকে শিরচ্ছেদের শাস্তির শিকার হয়। ইমাম হাসানুল বান্নাকে ইবরাহীম আবদুল হাদীর সরকার শহীদ করে দেয়। শাইখ মুহাম্মাদ ফারাগলী শহীদ, জনাব ইবরাহীম আল তীব শহীদ ও আল আখ তথা ভ্রাতৃপ্রতীম ইউসুফ তালাত শহীদ প্রমুখকে জামাল আবুদন নাসেরের সরকার ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে দেন। এগুলো কি কোন দৈবক্রমে সংগঠিত ঘটনা ছিল ? পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিগণ খুব ভাল করেই জানেন যে, এসব ধীর স্থির ও শান্তশিষ্ট মস্তিষ্কের ষড়যন্ত্রেরই ছিল ফলশ্রুতিমাত্র কোন আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনা ছিল না।

১৯৬৭ ঈসায়ী সালের লড়াই স্বয়ং জামাল আবদুন নাসেরই শুরু করেছিলো। যা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ললাটে কলঙ্কের টীকা স্বরূপ হয়ে রয়েছে। এ যুদ্ধ সম্পর্কে বহু বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয় ও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনাগতকালের ঐতিহাসিকগণ লড়াইর অনেক কষ্টিপাথরে যাচাই করে ফায়সালা করবে যে, এ যুদ্ধে কে কি ভূমিকা পালন করেছে ? অনেক কথাই বলা হয়ে থাকে কিন্তু আমি প্রামাণ্য, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতীত কোন বিবরণ পেশ করতে অভ্যস্ত নই। অবশ্য একটা বিষয় তো ইতিমধ্যে প্রমাণীত হয়েই গিয়েছে যে, আমাদের যুবকদের হাতে

www.amarboi.org

যেসব অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ অকেজো ও ব্যবহারের অনুপযোগী। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমাদের যুবক শ্রেণীকে জেনে বুঝে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবেও এটা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এ যুদ্ধের পূর্বে নাসের ও কোন কোন ইহুদী দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মাঝে শারামুস শাইখ এবং অন্যান্য স্থানে একান্ত সংগোপনে দেখা সাক্ষাত, শলা পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হতে থাকতো। ওসব লোক যারা কোবরা ছোগরা প্রয়োগের মাধ্যমে গনে পড়ে ফলাফল বের করতে সিদ্ধহস্ত তারা এসব ঘটনাবলী কেন মূল্যায়ন করে না। ওপরে বর্ণিতঘটনা প্রবাহ এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যাকান্ডের মধ্যে কি কোন যোগসূত্রের সন্ধান করা যায় না ? ইখওয়ানের ওসব নেতৃবৃন্দ যারা ইহুদীদের আরাম হারাম করে দিয়েছিলেন কার অদৃশ্য হাতের সূক্ষ্ম ইংগিতে এসব ক্ষমতাশীন শাসক গোষ্ঠীত নিষ্ঠুর হস্তে মৃত্যুর ঘাটে নিয়ে উপনীত করা হয়েছিল।

আমি একথা কখনো ভুলে যেতে পারছি না যে, নাকরাশী পাশা ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে ঘোরতর যুদ্ধচলাকালীন সময়ে গ্রেফতার করায়। ফিলিস্তিনের সম্মুখ সমর থেকে এসব মুজাহিদগণকে সোজা মিসরের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐতিহাসিক সমালোচকগণ এ ঘটনার কি বিশ্লেষণ পেশ করে থাকেন ? আমি যদি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের অন্তর্ভুক্ত না হতাম তাহলে এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলতে পারতাম। এখন যদি আমি কিছু বলার চেষ্টা করি তাহলে উহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আমি এমন অনেক নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য উদঘাটন করে দিতে পারি যা বড় বড় আমলাদের মজবুত দুর্গসমূহকে ভূ-গর্ভে প্রোথিত করে দিতে পারে। সত্য কথা এই যে, এসব আমলাদের কৃত্রিমকেতাদুরস্ত কীর্তিকলাপের স্বরূপ সকলেরই জানা আছে। আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে থাকি। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মনীতি প্রণয়নকারী। আমাদের শহীদগণও জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেছেন। আর তাদের ওপর যারা অত্যাচার নির্যাতনের ষ্টীমরোলার পরিচালনা করেছে তারাও তাদের উপযুক্ত কর্মফলের মুখোমুখি হয়ে গেছে। এখন আর কিছু বললে কি আর এসে যাবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল পেয়ে থাকবে। কবির ভাষায় ঃ

> হে গালেব ! নৌকা যখন কূলে এসে ভীড়ে গেছে তখন আর আল্লাহর ওপর উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে কি লাভ আর মাঝির দুর্নাম করেই বা কি হবে ?

বিশ্রী ও ন্যক্কারজনক খেলা

ইতিহাসের কাজ হচ্ছে সত্য ও বাস্তবতাকে কোন প্রকার কম-বেশী না করে যথাযথ ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। কিন্তু অনেক সময় ইতিহাস এর প্রকৃত দায়িত্ব পালনে অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়ে। ইতিহাস ওসব জঘন্য বিশ্রী ও কদর্য চেহারা জগদ্বাসীকে দেখাতে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছে যাদের হাত মানুষের রক্তে রঞ্জিত

www.amarboi.org

হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে কিছু কথাবার্তা মানুষের সম্মুখে উদঘাটিত হয়ে পড়েছে আর বাকীগুলোও শীগ্রই প্রকাশিত হয়ে যাবে। সংবাদপত্রে এখন প্রত্যহ প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছে "অমুক এবং অমুকের সম্পর্কে"-ইনি কার পুত্র এবং কারই বা জামাতা যাদের সম্বন্ধে কারুণের দৌলতের উপন্যাস ও উপাখ্যান তগুতাজা হয়ে উঠেছে ? কোটি কোটি পাউন্ডের ধনদৌলত, বিত্তবৈভব ও সহায় সম্পত্তি যেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে ক্ষোভ ও ঘৃণায় মন ভরে উঠে কোথা থেকে নাজিল হয়েছে তারপর আবার এগুলো কি করে মিসরের বাইরে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে ? ইউরোপে বড় বড় মহল ও বালাখানাসমূহ এবং পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকী ওসব লোক কিভাবে কিনে নিয়েছে ? ওরা অস্ত্রশস্ত্রের বিশ্ব বণিকে কিরূপে পরিণত হয়েছে ? সকল প্রকার হালাল হারাম কারবারে তারা কেমন করে তাদের পাঞ্জা গেড়ে বসেছে ? রেখে দিন, হালাল হারামের আলোচনা তো এসব লোকের জন্য অর্থহীন। তারা তো পয়সার পূজারী। ইহার আমদানী কোত্থেকে কিভাবে হচ্ছে সে প্রশংগই তাদের জন্য অবান্তর। তাদের লাজ লজ্জা কোথায় যেন উবে গেছে ? গুনাহ্ কিংবা পাপের কোন প্রকার ভয়-ভীতি এবং ময়দানে হাশরের আদালাতের কোন ডর ও শংকা কি তাদের মনে উদয় হয় না ?

১৯৫২ সালে সংঘটিত বিপ্লব ও অভ্যুত্থান ছিল আমাদের সযত্ন প্রয়াস-প্রচেষ্টারই ফসল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিপ্লবের নেতৃত্ব ইহার সঠিক গতিপথ থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যা জাতির মুক্তি ও দেশবাসীর নাজাতের জামিন হতে পারে। শানদার বাংলো, বড় বড় স্থল পথ ও নৌপথের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীসমূহ এবং পরিবার ও বংশের ছোট বড় সকলের নামে অগণিত অফুরন্ত সহায় সম্পদ আসলো কোত্থেকে ? এসব বিপ্লবী শ্লোগানে মুখরিত ব্যক্তিগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখুন। সাথে সাথে নিরপরাধ নিরীহ লোকদের ওপর তাদের ক্ষোভ ও দোষারোপের প্রতি লক্ষ্য করুন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, অভ্যুত্থানের পূর্বের অবস্থা ও বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির তুলনা করে বলুন যে, এসব প্রাচুর্য ও ধন-সম্পদ কি তাদের জন্য ভূ-গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে নাকি আকাশ থেকে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হয়েছে ? এসব কিছু কি একটা মিসকীন ও অসহায় জাতির পকেট কেটে লাভ করা হয়েছে নাকি চাঁদের দেশ থেকে এসব দৌলত তাদের হাতে এসে ধরা দিয়েছে ?

আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, এসব কলঙ্কিত লোকদের সহিত না আমাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং না বংশীয় কোন যোগসূত্র। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল অপকর্ম থেকেও আমাদের রক্ষা করেছেন। এমনকি তাদের উঠে পড়া অংগুলিসমূহ থেকে আমাদের নিরাপদে রেখেছেন। এসব লোক এতবেশী বদনাম ও কুখ্যাত হয়ে পড়েছে যে, তাদের কুকীর্তি ও অপকর্মসমূহ সর্বস্তরের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন তাদের সম্পর্কে যদি কোন ভিত্তিহীন অবান্তর গুজবও ছড়িয়ে পড়ে তথাপি মানুষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয়। এমনিতেই এটা বাস্তব সত্য যে আগুনের অস্তিত্ব ব্যতীত ধোয়ার কল্পনাও করা যায় না। তেমনিভাবে উটের উপস্থিতি ছাড়া উটের বিষ্ঠা অচিন্তনীয়।

www.amarboi.org

পি, এইচ, ডি-এর থিসিস ও ইখওয়ান

স্বীয় স্মৃতিচারণের এ সন্ধিক্ষণের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে আমি উস্তাদ মুহাম্মাদ ফাতী শীর বিরচিত প্রবন্ধের উল্লেখ করতে চাই। যার ওপর ভিত্তি করে তাকে ডক্টরেট ডিগ্রীর দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হয়। তার নিবন্ধের শিরোনাম ছিল "ইখওয়ানের প্রচার প্রসার ও সুনাম সুখ্যাতি মুদ্রণ মাধ্যম।" বিজ্ঞ নিবন্ধকার অত্যন্ত পান্ডিত্যপূর্ণভাবে ও জ্ঞানগর্ভ ভংগীতে বিষয়বস্তুর পুরোপুরি হক আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রকৃত সত্য ও নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে তার বলিষ্ঠ লিখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। যাতে তিনি তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে কোন প্রভাব সৃষ্টি করার ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করার সুযোগ দেননি। প্রসংগক্রমে এখানে আমি ওসব গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি যা আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১–ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস-------এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, এটা আমাদের সেই মজবুত কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় যার ভিত্ কখনো নড়বড়ে হয়ে যায়নি। আমি আল্লাহ তায়ালার সমীপে অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করছি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে পুরোপুরি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসের ওপর কায়েম রাখুন। নির্ভেজাল তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর মজবুত একীন, মুতাশাবিহাত থেকে রক্ষা এবং খুঁটিনাটি ও গুরুত্বহীন বিষয়াবলীর ওপর আলোচনা সমালোচনায় জড়িয়ে পড়া থেকে দূরে থাকা আমাদের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংশ বিশেষ।

২–আনুগত্য ও অনুসরণে আপ্রাণ প্রয়াস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা-------ইহার সহিত আমি আরও যোগ করতে চাই যে আকীদা-বিশ্বাসের নিরাপত্তার বাস্তব দলিল ও কার্যকরী প্রমাণ হচ্ছে এ'তেকাদের দাবী পূরণ করে চলা এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য অনুসরণে সতত যত্নশীল হওয়া।

৩–আল্লাহর জন্যেই মহব্বত ও প্রেম ভালবাসা----এর সাথে আমি আরো যোগ করতে চাই যে, প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং পারস্পরিক মহব্বত ও ভালবাসার পরিচয় দিয়ে থাকে এবং আল্লাহর দুশমনদের প্রতি তাদের ঘৃণাবোধ থাকে সমভাবে।

৪–ইত্তেহাদে ইসলামীকে বলিষ্ঠভাবে ধারণ করা------- আমি বলতে চাই যে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য সহযোগিতার পর মিল্লাতে ইসলামীর ঐক্য ও সংহতিই হচ্ছে সর্ববৃহৎ শক্তি যা মুসলিম জাতির হৃত গৌরব হারানো ঐতিহ্য সম্মান ও মর্যাদা পুনর্বহাল করার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৫–প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধি ---------এ প্রসংগে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ মূলনীতিকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে সততা বিশ্বস্ততা সদাচরণ, আল্লাহর

www.amarboi.org

সাথে কৃত ওয়াদা পুরো করা, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সুগভীর বন্ধন গড়ে তোলা, কর্মীর সাধারণ মানুষের সাথে এমনকি স্বয়ং তার নিজের অস্তিত্বের সাথে প্রগাঢ় সত্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা বাধ্যতামূলক ও অত্যাবশ্যকীয় পথের সম্বলের মর্যাদা রাখে।

৬–দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের প্রাণান্ত প্রয়াস-প্রচেষ্টা------এখানে আমি বলতে চাই যে, দাওয়াতে হকের দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য উহার প্রচার ও প্রসারে সকল আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা অতীব জরুরী।

৭–ইসলামী শিষ্টাচার ও শালীনতা রপ্ত করা---------জীবনের আদাব আখলাক আমার দৃষ্টিতে ইসলাম যে উন্নত মানদন্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে তার তুলনা কোথাও মেলে না।

৮–নিজস্ব মূলনীতি ও আদর্শের ওপর অটল অবিচল হয়ে থাকা -------আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান কখনো টলটলায়মান হতে পারে না। সবর ও ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী এবং শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব এমন মৌলিক যুগান্তকারী ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা জালেম ও অত্যাচারী এবং ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় মুমীন বান্দাকে পেশ করতে হয়। এগুলোই তার ঢাল ও শিরস্ত্রান আবার এগুলোই তার অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার।

৯–হক ও খাইর তথা সত্য ও কল্যাণের প্রতি অনুরাগ............আমি বলতে চাই যে, এ দু'টো জিনিসই ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের বুনিয়াদী পাথর সদৃশ্য। ঈমানের কোন অস্তিত্বই লাভ করা সম্ভব নয় যে পর্যন্ত আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য ওসব কিছু পছন্দ করতে না পারবেন যেগুলো আপনার নিজের জন্য আপনি পছন্দ করে থাকেন।

যাতে করে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাই থাকে সমুন্নত

ইখওয়ানুল মুসিলিমুন তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রচার করার জন্য শরীয়াত সম্মত সকল উপায় উপকরণ অবলম্বন করার প্রয়াস পায়। ইমাম শহীদ বিশটিরও বেশী সংখ্যক ইসলামী সাহিত্য-পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেন। এগুলোতে তিনি সমস্ত মুসলিম জাহানের সমস্যাবলীর ওপর আলোকপাত করেন। তিনি শুধুমাত্র মিসর ও ফিলিস্তিন সমস্যার ওপরই তার লিখনীকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তার আকাংখা ছিল সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে দেয়ার প্রতি। আমরা বহুবার বলেছি ও লিখেছি যে, আমরা ক্ষমতার লোভী নই আর না রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব ও অবস্থানের বিরোধী। আপনারা অনুগ্রহপূর্বক ১৯৪৮ সালের ১৩ই জুন তারিখে উজীরে আযমের উদ্দেশ্যে ইমাম শহীদের লিখিত এ অংশটির প্রতি লক্ষ্য করুন।

www.amarboi.org

যদিও আপনার আমলে আমাদের ওপর ও আমাদের প্রাণপ্রিয় আন্দোলনের ওপর যুগপৎভাবে কঠোর দমননীতি চালানো হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন শত্রুতা ও ক্ষোভ নেই। আপনার সংস্কারমূলক মহতী পদক্ষেপসমূহ এবং সেগুলোর সফলতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি আমরা জ্ঞাপন করছি। ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে আপনার এসব মহতী কার্যাবলী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর আমরাও এগুলো মনে রাখবো। আমরা এমন এক পূত-পবিত্র দাওয়াতের দায়ী ও আহবায়ক যা ব্যক্তিগতভাবে কারো সাথে বৈরিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শত্রুতা ও প্রতিহিংসা পোষণ করাকে আদৌ জায়েযই মনে করে না।

সুধী পাঠক ! আপনারা কি দেখার সুযোগ পাননি যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের ষ্টীমরোলার পরিচালনাকারীদের ব্যাপারে কিরূপ আচরণ ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে ? তথাপি আমাদের ওপর এরূপ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা সন্ত্রাসবাদী এবং মানুষের রক্ত পিপাসু !

"ওগো আল্লাহ ! আপনি মেহেরবানী করে আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায়সম্মত ফায়সালা করে দিন আর আপনি তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী" মিসর ও সুদানের মধ্যে ইত্তেহাদ তথা ঐক্য ও সংহতির আওয়াজ সর্বপ্রথম ইমাম হাসানুল বান্না শহীদই তুলেছিলেন। তার জানা ছিল যে, সার্বিক উন্নতি অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ উভয় দেশের একীভূত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। দু'দেশই এ লক্ষ্যে পারস্পরিকভাবে একে অপরের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো। তারপর আসে আবদুন নাসেরের শাসনকাল। তিনি না বুঝে না শুনেই মিসর ও সুদানকে আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করে দেন। তিনি ভ্রাতৃপ্রতীম দু'দেশের মাঝে একটা খোঁড়া অজুহাতকে ভিত্তি বানিয়ে সিদ্ধান্তকরী অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেন। তিনি তার সাধারণ অনুমান দ্বারা তার এ সিদ্ধান্তকে জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার নামান্তর বলে স্থির করেন। মিসরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক এবং সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী উভয় দেশের একত্রীকরণের জন্য প্রেচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নাসের যে ন্যক্কারজনক ভুল করে ছিলেন এখন গিয়ে তারই সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ওপরে আমরা দাওয়াত প্রসার ও প্রচারের আলোচনা করে এসেছি। সংবাদপত্র প্রসার ও প্রচারের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মাধ্যম এবং ইখওয়ান এ ময়দানে নেহায়েত শীর্ষস্থানীয় ও উত্তম উদাহরণসমূহ স্থাপন করেছে। কোন কোন ইখওয়ান "কাঁশকুলুল জাদীদ"নামক সাময়িকী চালু করেন এবং পর্যায়ক্রমিক সংবাদপণ্যের ন্যায় উহাকে বিন্নস্ত করে প্রকাশ করেন। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের সংবাদপত্র অংগনেও একটা নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। ইমাম শহীদ যখন সংশ্লিষ্ট সাময়িকীর ক্রমিক সংখ্যা দেখতে পান তখন তিনি উহার সম্পাদকের নামে এ মর্মে চিঠি লিখেন ঃ

"তোমরা যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছো উহার সাথে আমি একমত হতে পারছি না। যে আংগিকে আমি "আল কাশকুলুল জাদীদ"কে দেখতে পেয়েছি

www.amarboi.org

তা আমার মোটেও ভাল লাগেনি। আমি আশা করি যে, তোমারা বর্তমান রীতি ও ধারা বাদ দিয়ে নিজেদের আন্দোলনের দৃষ্টিভংগি সংবাদপত্রে উপস্থাপনের সযত্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।"

(বিজ্ঞ নিবন্ধকার ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় ইমামের লিখিত উল্লেখিত পত্রেরও উল্লেখ করেন।)

আরশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সাহস প্রয়োজন

ইখওয়ানের সাথে সরকারের বিরোধ ছিল দীর্ঘ দিনের। আমাদের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ইসলাম দ্বীনও এবং একই সময় রাজনীতিও। দ্বীনের ব্যাপারে এটাই সঠিক দৃষ্টিভংগী। কিন্তু সরকার আমাদের এ দৃষ্টিভংগির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের মাজহাব পূজা পার্বণের মাযহাব নয় বরং এটা পূর্ণাঙ্গ একটা জীবনব্যবস্থার নাম। ইহা পুরো জীবনের সংস্কার ও সংশোধন কামনা করে। ইহার দৃষ্টিতে দুনিয়ার এ জীবন শস্যক্ষেত্রেরই নামান্তর। যার ফল লাভ করা যাবে আখেরাতে। এখানে আমরা যা কিছু বপন করবো সে ফসলই পরকালে কর্তন করবো। মানুষের সকল কাজ-কর্ম এবং তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগ ইসলামের প্রদর্শিত হেদায়াত ও রৌশনীতে সমুজ্জল। সরকারের সাথে আমাদের এ আচরণ সম্ভবত এভাবেই চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওসব লোকের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারসমূহ খুলে দেবেন এবং তাদেরকে দ্বীনের সঠিক ধারণা দান করবেন। সুদূর দিগন্তে উজ্জল রশ্মির আভা ও কিরণমালা পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং পরিবর্তনের লক্ষণ অত্যাসন্ন প্রায়। যে সমস্ত কথাবার্তার কারণে আমাদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিলো আজ ওসব কথাই সর্বস্তরের গণমানুষের মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মিসরের সকল রাজনীতিবিদগণই এখন ইসলামী শরীয়াত প্রবর্তনের দাবী জানিয়ে আসছে। ইহা ইখওয়ানের কামিয়াবী ও সফলতা এবং বিজয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। মূলনীতির ব্যাপারেও মৌলিকভাবে সকলেই একমত হয়ে গেছেন। এখন বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করার শুভ সূচনাই শুধুমাত্র বাকী রয়েছে যার জন্য আমরা তীর্থের কাকের ন্যায় অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষার প্রহর গুনছি।

(আর সে বহু প্রত্যাশিত সুদিন কেবল তখনই আসতে পারে যখন আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে লব্ধ বিজয়ের ওপর বিশ্ব মুসলিম হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং দয়ালু। এ ওয়াদা আল্লাহ নিজেই করে রেখেছেন। আর আল্লাহ তো কখনো তার অংগীকার ভংগ করেন না। কিন্তু এ সত্য অধিকাংশ লোকই জানে না। মানুষ তো জানে দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক মাত্র আর আখেরাতের ব্যাপারে তারা নিজেরাই গাফেল—উদাসীন ও অমনোযোগী।)

আমরা আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও অভিষ্ট বস্তুকে ফল-ফুল ও পত্র-পল্লবে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হতে দেখতে পাচ্ছি। ইসলামী মূল্যবোধের আমলে নতুন সূর্য

www.amarboi.org

উদিত হওয়ার আর কোন দেরী নেই। বাতিলের অন্ধকার কেটে যাওয়ার জন্য উদ্যত। অগণিত শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। এ জগত আবার ইসলামের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ইনশাআল্লাহ্ ঝলমলিয়ে উঠবে।

ওগো আল্লাহ্ ! এসব স্মৃতিচারণের সময় আমি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি এবং বলার চেষ্টা করেছি একে তুমি বিশেষভাবে তোমার জাতে করীমের জন্য কবুল ও মনজুর করে নাও। আর হে পরওয়ারদিগার ! যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার থেকে কোন ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে থাকে তুমি নিজ গুণে তা ক্ষমা করে দাও। বস্তুত তুমি ব্যতীত আর কেইবা মাগফিরাত ও দয়া অনুগ্রহ প্রদান করতে পারেন ?

---

www.amarboi.org

বত্রিশতম অধ্যায়

আশা আকাংখা ক্ষীণ কিন্তু উদ্দেশ্য মহান

অনেকে দু'মুর্শিদে আ'ম ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ এবং সাইয়েদ হাসান আল হুদাইবি (র) মরহুমগণের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনা করে থাকেন। দু'ব্যক্তিত্বের মধ্যে কয়েকটি যুক্ত বৈশিষ্ট্য ছিল। আবার কতগুলো গুণাবলীতে একজন ছিলেন অপরজন অপেক্ষা ভিন্নতর ও ব্যতিক্রম। দু'ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভংগি প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাস্তব কর্মজীবনের সূচনা লগ্ন এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র ছিল বিশেষ ধরনের। কিছুলোক বড়ই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত করে থাকেন। কিছু কিছু লোক এসব বই পুস্তক পাঠ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। পক্ষান্তরে অনেকে আবার এরূপ তুখোর সমালোচনার এ প্রক্রিয়া আদৌ পছন্দ করেন না। আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, পাঠকদের সম্মুখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তার -রূপে উপস্থাপন করা উচিত। যাতে করে তারা এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, যে ব্যক্তির জীবনালেখ্য তারা পাঠ করছে সে যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বহুল পরিচিত। তারা যেন চাক্ষষভাবে তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হচ্ছে। যতদূর ইখওয়ানুল মুসলিমুনের যোগসূত্র রয়েছে তারা সকলেই তাদের মুর্শিদের হাতে আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থেই বাইয়াত করেছিলো। এ বাইয়াতের শর্ত পূরণ করাই হচ্ছে আসল কাজ। বাকী থেকে যায় সাধারণ সাহিত্যিকগণের রীতি-পদ্ধতি নওজোয়ানদের নিকট আদৌ উহার কোন গুরুত্ব নেই। তারা শুধু জানে যে, যে ব্যক্তিত্বের হাতে হাত রেখে তারা বাইয়াতের শপথ গ্রহণ করেছে তিনি তার জীবনকে কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্যই ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন।

চিত্তাকর্ষক বাচনভংগী ও মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি

আমি ইখওয়ানের একজন কর্মী হিসেবে দু'মুর্শিদে আ'ম-এর হাতেই বাইয়াত করেছিলাম। এ পর্যায়ে প্রসংগক্রমে প্রথম মুর্শিদ সম্পর্কে দ্বিতীয় মুর্শিদের মন্তব্য বিদগ্ধ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। হাসান আল হুদাইবি কোথাও লিখে থাকবেন অথবা আমি নিজেই তার মুখে এরূপ উক্তি শুনতে পেয়েছি যে—

"হাসানুল বান্না যখন জনসাধারণের সম্মুখে বক্তব্য কিংবা বিবৃতি পেশ করার জন্য মুখ খুলতেন তখন জনগণের লোভাতুর দৃষ্টি তার চেহারার প্রতি পলকহীনভাবে পড়ে থাকতো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি গভীর মনোযোগ সহকারে তার কথাবার্তা শুনতে থাকতো। তার মুখ থেকে শব্দমালা হিরা, মতি ও পান্নার ন্যায় ঝরে পড়তো এবং শ্রোতাদের হৃদয়ের গভীরে গ্রথিত ও প্রোথিত হয়ে যেতো। বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে উপস্থিত জনতা এমন নীরব নিথর হয়ে শুনতে থাকতো যেন তাদের মাথার ওপর

www.amarboi.org

পাখী বসে রয়েছে। তাদের অন্তর বক্তার মুষ্টিতে আবদ্ধ। আবার যখন তার ভাষণ সমাপ্ত হয়ে যেতো তারপর গিয়ে লোকদের অন্তরাত্মা পুনরায় তাদের নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসতো এবং তারা প্রশান্ত পরিতৃপ্ত অন্তকরণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতো। কিন্তু আমার অবস্থা হতো সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রমধর্মী। আমি তার বাগ্মিতাপূর্ণ আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আমার মনকে মহান বক্তার নিকট রেখে দিয়েই গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যেতাম।"

অন্তর ও দৃষ্টির মুসলিম

ইমাম শহীদ যে দাওয়াতের সূচনা করে গেছেন তা আল্লাহর ফজল ও অনুগ্রহে উজ্জ্বল সূর্যের দীপ্তির ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে থাকবে। যার সম্মুখে তারকারাজির ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হয়ে যায়। সূর্য যদিও দিনের বেলায় প্রখর আলোয় ভরপুর থাকে। কিন্তু রাতের আগমনের সাথে সাথে অস্তমিত হয়ে যায়। অপরদিকে এ দাওয়াত কখনো হারিয়ে যাওয়ার নয়। ইহার রৌশনী চিরন্তন এবং উহার দীপ্তি চির বসন্তে ভরা। যদি সময় পশ্চাৎগামী হয়ে পড়ে এবং সে সুদিন পুনরায় ফিরে আসে যেদিন শহীদ মুর্শিদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিলো। আর আমাকে বলা হবে যে, আমি আমার জীবনের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করতে চাই? তাহলে আমি নিঃসংকোচে ও কোনরূপ ইতস্তত না করেই সে কর্মপন্থাই অবলম্বন করবো যার ওপর আমি আজীবন চলে আসছি। এটা হচ্ছে সে রাস্তা যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত করেছেন এবং যার উপলক্ষ হয়েছিলেন ইমাম শহীদ নিজে। হেদায়াত প্রদানের ক্ষমতা অবশ্য আল্লাহ তায়ালার হাতেই নিবদ্ধ কিন্তু আমার নিকট পর্যন্ত এ বাস্তবতা ইমাম শহীদের মাধ্যমেই পৌঁছেছিল।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাওয়াত আমার সামনে সে সত্য উন্মোচিত করে দিয়েছিল যে সম্বন্ধে আমি ছিলাম একেবারেই না-ওয়াকিফ ও অনবহিত। এমনিতেই তো পৃথিবীতে অগণিত মুসলিম বাস করছে কিন্তু যাদের অন্তর ইসলাম ও মুসলিমদের মহব্বতে পরিপূর্ণ তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমি নিজে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করছি যে, এ আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে আমি ঈমানের বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণ সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত হয়েছি। যদি কোন মুসলিম উত্তর মেরুতে ভুখা থাকে তাহলে তা শুনে আমি আমার হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করে থাকি। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে কোন মজলুম মুসলিমের একবিন্দু রক্ত মাটিতে ঝরে পড়ে তাহলে আমার মনে হয় যেন আমার নিজের শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কোন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার ওপর যদি কোন দুশমন হাত তোলে তখন আমার রাতের নিদ্রা হারাম হয়ে যায়। আমার মনে হয় যেন আমার বসত বাড়ীর ওপর শত্রু তার প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

এ আন্দোলন আমার মধ্যে এ অনুভূতিরও সঞ্চার করেছে যে, আমার পকেটে যা কিছু রয়েছে উহা আমার মালিকানাধীন নয় বরং এটা আমার নিকট আমানত রাখা

www.amarboi.org

হয়েছে মাত্র। ইমাম শহীদ দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রারম্ভেই ইখওয়ানের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী সংগঠনকে আর্থিক সহযোগিতা দান করবে। ইহা কোন পূর্ব নির্ধারিত চাঁদা ছিল না। বরং প্রত্যেকের পরিপূর্ণ আযাদী ও ইখতিয়ার ছিল যে যতটুকু পারে আর্থিক কুরবানীর মহড়া প্রদর্শন করতে থাকবে। ইখওয়ান এ ময়দানে তাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কখনো কার্পণ্য করতো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজের ব্যাপারে কখনো এতটুকুন চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম না যতটুকু আমি আমার অন্যান্য মুসলিম ভাই বন্ধুদের চিন্তায় সর্বদা অস্থির থাকতাম। জীবনতো এরই নাম যে মানুষ অন্যদের জন্য ত্যাগ ও কুরাবনী স্বীকার করতে থাকবে। এক্ষেত্রে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একশ্রেণীর লোক তো কবির ভাষায় এমন কথাও বলে বেড়ায় যে, যদি তাদের বৃষ্টির নেয়ামত দ্বারা সিক্ত না করা হয় তথাপি তারা এ ব্যাপারে প্রশান্তিই থাকে যে কোথাও না কোথাও রহমতের বৃষ্টির ধারা জমিনকে সিক্ত করে থাকবে এবং তাদ্বারা মানবজাতি উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। এরূপ নির্লিপ্ত ও সভ্রান্ত লোকের সংখ্যা খুব কমই হয়ে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা কবির সে উক্তির ন্যায়ই হয়ে থাকে যে, যদি আমি তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে পড়ি কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে যাই তবুও যেন মর্তের মাটিতে এককোটা বারিবিন্দুও নাজিল না হয় যাতে করে ছোট বড় সকলেই আমার মত অসহায়ভাবে পিপাসার হাতে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়।

বাঁচার জন্য খাওয়া নাকি খাওয়ার জন্য বাঁচা

দু'দলের লোকই দুনিয়াতে পাওয়া যায় এবং আপনাপন ঋণাবদ্ধ জীবন প্রত্যেকেই অতিবাহিত করে নেয়। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আসমান জমিনের ফারাক রয়েছে। এক গ্রুপ এজন্য খেয়ে থাকে যে বেঁচে তো থাকতে হবে। অপরদিকে অপর গ্রুপ এজন্য জীবিত থাকে যেন খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। অর্থাৎ "বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা" এবং "খাওয়ার সুযোগ লাভ করার জন্য বেঁচে থাকা" এর মূলনীতির ওপর উভয় সম্প্রদায়ই কর্মতৎপর। এক কুয়া পানিতে কানায় কানায় ভরে উঠে ; পক্ষান্তরে অন্য কূপ সম্পূর্ণ শুষ্ক ও পানিশূন্য জমিনের এমন একটা টুকরা হয়ে থাকে যে, এগুলোতে যদি পানি সিঞ্চন করা হয় তাহলে উভয়টিতেই জীবনের সঞ্চার হয়ে থাকে। কোন কোন ভূ-খন্ড পানিতে সিক্ত হওয়ার পর নিরেট পাথরের রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। না উহাতে বীজ অঙ্কুরিত হয় আর না চারা গজায়। এমনি করে জীবনের কয়েক রূপ পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। যে ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী জীবন গড়ার চিন্তায় অস্থির থাকে এবং অন্য কারো মংগল ও কল্যাণের ধারণা পর্যন্ত কখনো হৃদয় মনে স্থান দিতে না পারে তার ধ্বংসের ব্যাপারে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে। সেতো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।

মানবসমাজকে অন্ধকারের কুহেলিকা থেকে বের করে উজ্জ্বল আলোয় নিয়ে আসা এবং নির্যাতন, নিষ্পেষণ এবং দাসত্ব ও গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে মানবতাকে আযাদী ও স্বাধীনতার নেয়ামত প্রদানকারী আল্লাহর বান্দাহগণের সংখ্যায়

www.amarboi.org

খুব কমই হয়ে থাকেন। এসব জীবন্ত মানুষগুলো সত্যের ওপর কায়েম থাকে। যদিও দুনিয়া তাদের শত বিরোধিতাই করুক না কেন। মানুষ কি সে ঐতিহাসিক কাহিনী সম্পর্কে অবহিত নয় যাতে একটা নওজোয়ান ছেলে তার জাতিকে জাগিয়ে তোলে এবং সমকালীন শাসকের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রতিবাদী ও ক্ষিপ্ত করে তোলে। জালিম বাদশাহ সে দুঃসাহসী ছেলেটিকে হত্যা করে তার ছোবল থেকে রক্ষা পেতে চাইলো কিন্তু যুবকের ওপর কোন অস্ত্রই কার্যকরী করা গেলো না। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ সে ছেলেটিকে তার নিকট ডেকে পাঠায় এবং তাকে বলে, "তুমি আমার প্রজাসাধারণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করে দিয়েছো। আর আমি তোমাকে খতম করার জন্য যে কৌশলই প্রয়োগ করি তা-ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তুমি কারো সম্মুখেই তোমার মস্তকাবনত করতে চাও না। এখন তুমিই আমাকে বলে দাও যে, আমি কি উপায়ে তোমার হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি ? প্রত্যুত্তরে নওজোয়ান বলতে লাগলো,—"আপনি অকারণে শুধু শুধুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন—এটা তো খুবই সহজ কাজ"। বাদশাহ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তা কি রূপে সম্ভব ?" ছেলেটি জবাবে বলতে শুরু করলো, "ঈদের দিন চাশতের সময় সমস্ত দেশবাসীকে একটা খোলা ময়দানে সমবেত হওয়ার আদেশ জারী করে দিন এবং সমাগত আপামর জনতার সামনে আমাকে কোন উঁচু জায়াগায় দাঁড় করিয়ে তীরন্দাজকে হুকুম দিয়ে দিন যেন সে আমার বক্ষ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তীর ছোড়ার পূর্বে যেন সে বলে দেয়, এই ছেলের রবের নামে।"

বাদশাহ সে ছেলেটির পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেন। ছেলেটি তীরন্দাজের অব্যর্থ তীরের আঘাতে মাটিতে ঢলে পড়লো এবং শাহাদাতের মর্যাদালাভে ধন্য হয়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত জনতার সকলেই একযোগে কালেমায়ে তাওহীদের ওপর ঈমান আনলো। ফলে অবোধ বাদশাহর জন্য অপমান, আফসোস ও শোচনীয় পরাজয় ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এ নওজোয়ান যে সত্যবাদিতার জন্য তার জীবনের বাজী লাগাতে প্রস্তুত হয়ে গেলো সে দুনিয়া এবং আখেরাত দু'প্রতিযোগিতাতেই একযোগে জিতে গেলো। এ নওজোয়ানের ন্যায় ইখওয়ানের আন্দোলনের পতাকা ওপরে তুলে ধারণকারী নওজোয়ানগণও প্রবল আত্মত্যাগের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। যত প্রতিবন্ধকতা এবং বাধার পাহাড়ই তাদের চলার পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হউক না কেন তারা কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত হবে না। যেদিন সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরে যাবে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে যাবে এবং সমগ্র দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন কে ছিলেন ? এরা হচ্ছে ওসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য আল্লাহর কিতাবে শক্তি, কামিয়াবী ও বিজয়ের ওয়াদা রয়েছে।

আমাদের মত কেউই নয়

এটা কতই না আফসোস ও দুঃখজনক কথা যে, আমাদের দেশের সমস্ত সংবাদপত্র ও সাহিত্য সাময়িকী সকল ব্যাপারেই নেতিবাচক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি পেশ করে থাকে। কিন্তু ইখওয়ান সম্পর্কে তাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

www.amarboi.org

ইখওয়ানের মধ্যে কোন ইতিবাচক ও সম্ভাবনাময় দিক তারা দেখতে পায় না। তাদের নিকট ইখওয়ান আপাদমস্তক নিকৃষ্ট, ঘৃণীত ও অবাঞ্ছিত মাত্র।

ইখওয়ান আল্লাহর অনুগ্রহে সমস্ত দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত ও অমুখাপেক্ষী। এমনকি তারা কারো সমীপে কখনো এমন কোন আবেদনও জানায় না যে, তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব করা হোক। কিন্তু সাংবাদিকতার অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে এই যে, সাংবাদিক সকল পক্ষপাতমুক্ত এবং ইনসাফপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করবে। সত্য থেকে বিমুখ ও বিচ্যুত লোক যেসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে সেগুলো সম্পর্কে ছোট বড় সকলেই অবগত হয়ে যায়। আমাদের সাথে ওসব লোকের আচরণ খুবই দুঃখজনক তো বটেই কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। এরা হক থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই বিপ্লবের সময় ইখওয়ানের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে কে না জানে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে নাসের এবং অপরাপর আযাদ অফিসারগণের যোগাযোগের ব্যাপারে কোন সাংবাদিকই না-ওয়াকিফ নন। আযাদ অফিসারগণ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সহকারী মুর্শিদে আ'ম মেজর মাহমুদ লাবীবের শাগরেদ ছিলেন। এসব বাস্তবতা সম্বন্ধে তারা কিছুই না জানার ভান করছিল। এমনকি তারা ইখওয়ানকে বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের দুশমনরূপে চিহ্নিত করে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো নিমক হালালী করার প্রয়াস পেতো। এটা কি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নাকি ধীরস্থির মস্তিষ্কের পূর্ব পরিকল্পনা? মিসরে বিগত কয়েক শতাব্দি পূর্বে জনৈক ফেরাউন এরূপ আচরণরই করেছিল। আমীস সানী বা দ্বিতীয় আমীস যখন ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি তার পূর্ববর্তী সকল ফেরাউনের সমস্ত কীর্তিকলাপ ও নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। যাতে করে ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায় তারই নামের অংশবিশেষে পরিণত হয়ে যায়। নব্য যুগের ফেরাউনও অনুরূপ আচরণেই পুনরাবৃত্তি ঘটানোর প্রয়াস পায়। দাওয়াতে ইসলামের বিরোধিতায় বিভিন্ন শাসনকর্তাগণ তাদের ব্যক্তিগত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই কর্মনীতি অবলম্বন করে থাকে। বুদ্ধিজীবি, বিশেষজ্ঞ, ওয়াকিফহাল মহল এবং সংবাদপত্রসেবীদের নিকট প্রশ্ন রাখতে চাই, অন্ততপক্ষে মন্তব্য করুন—এ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ কি না?

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

সাইয়েদ কুতুব শহীদ মিসরীয় ভূ-খন্ডের সে গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বদা বেঁচে থাকবেন। সাইয়েদ কুতুবের ক্ষুরধার লিখনীর দ্বারা বহু গ্রন্থ প্রণীত ও সংকলিত হয়। এসব অমূল্য গ্রন্থের জ্ঞানগত মান খুবই উন্নত এবং লিখার গতি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। এমনিতেই তো তিনি সকল বিষয়ের ওপর কলম ধরেছিলেন এবং চমৎকার উপস্থাপনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তন্মোধ্যে তার বাক যুদ্ধ সম্বলিত

www.amarboi.org

তাফসীর "ফি জ্বিলালিল কুরআনিল ইজতিমাইয়া" এবং "মুআলিমুন ফিত্ তরীক" বাস্তবিকই অতুলনীয় সৃষ্টি।*

সাইয়েদ কুতুব শহীদের সংকলনসমূহ সকল জাহেলিয়াত ও জুলুমের বিরুদ্ধে নেহায়েত কার্যকরী ও বলিষ্ঠ আওয়াজ এবং সমগ্র মানবজাতির অধিকারের পতাকাবাহী। সাইয়েদ শহীদের দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত হালাল হারামের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। সাইয়েদ শহীদ ইসলামের ওপর গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তার সাথে সাথে আধুনিক সভ্যতার ওপরও ছিল তাঁর প্রাগাঢ় পান্ডিত্য। তিনি উন্নত বিশ্বের বিরাজমান পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন করার প্রয়াস পান। তাদের সামাজিক স্বাধীনতার গভীরে প্রবেশ করেন। অনন্তর উম্মাতে মুসলিমাকে আজীবন এ সত্য বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, শরীয়াতে ইলাহিয়া প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানবতার সত্যিকার মুক্তি এবং দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব। তার দৃষ্টিতে শরীয়াতের সীমালংঘন করে মানুষ না কোন সংস্কার সাধন করতে পারে আর না প্রকৃত মুক্তি লাভ করতে পারে।

"মুয়ালিমুন ফিত্ তরীক" ছিল তার এমন জ্বালাময়ী গ্রন্থ যাকে উপলক্ষ বানিয়ে সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা-চেতনায় কোন নিত্য নতুন ও অদ্ভূত অভিনব চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটেনি। বরং তার সমুদয় লিখনী সে বুনিয়াদী চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে যার উল্লেখ আমরা ওপরে করে এসেছি। এ গ্রন্থ শহীদ কারাগারে বসেই লিখেছিলেন। জেলখানার চার দেয়ালের অভ্যন্তরে যেরূপ দানবীয় ও নারকীয় হিংস্রতা ও বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতো সরকারী গোমস্তাগণ সে ভয়াল দৃশ্য দেখে প্রত্যেক সভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় আলোড়িত ও প্রকম্পিত না হয়ে পারে না। সাইয়েদ কুতুব ছিলেন তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি এসব দৃশ্য দেখে তার সে চিন্তা চেতনাকে শরীয়াতে ইসলামীয়ার বাস্তবায়নকে মুসলিম জীবনের সর্বাধিক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নির্ধারণ করেছেন এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভংগিতে এ অমূল্য গ্রন্থে তা উপস্থাপন করে দিয়েছেন। শরীয়াত বিরোধী সকল আইন-কানুনের সর্বদা প্রবল বিরোধী ছিলেন তিনি। কিন্তু এ বইতে তাঁর কলমের গতি ছিল উদীয়মান।

সাইয়েদ কুতুব শহীদের ওপর মিথ্যা অভিযোগসমূহ

সাইয়েদ কুতুবের ওপর এ দোষারোপ করা হয়েছিল যে, তিনি দেশের মানুষকে কাফের মনে করে থাকেন। এ অভিযোগ ছিল ডাহা মিথ্যার বেসাতি মাত্র। তিনি কখনো কোন মুসলিমকে কাফের বলে অভিমত ব্যক্ত করেননি। তার ভালভাবেই জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসে

* "ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা" নামে এ বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

www.amarboi.org

ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মন দিয়ে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর ওপর ঈমান আনবে সে কিছুতেই চিরদিন দোজখে থাকবে না। আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, জাহান্নামের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে কাফেরদেরই। কেননা তারা মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী। তিনি তার গতিশীল লিখনীতে জাহেলীয়াতের সামাজিক পরিভাষার বহুল ব্যবহার করেন। এ প্রচলন দ্বারা সমাজকে কাফের প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য তার কখনো ছিল না। বরং জালিম, তাগুত, অসভ্য ও সংশয়গ্রস্থদের স্বরূপ উদঘাটনই তার মূল লক্ষ্য।

আবরী ভাষার সুস্পষ্ট বর্ণনাভংগী জানা আবশ্যক। কোন একটা শব্দের শাব্দিক অর্থ নিয়ে সরিষার পাহাড় রচনা করা ও তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে বসা বড়ই বেমানান এবং অবিবেচনা প্রসুত কর্মপদ্ধতি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরাআন মজীদে কাফেরদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন – وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
"অর্থাৎ কাফেরদেরকে মর্মপীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

–সূরা তাওবা ঃ ৩

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দোজখের কঠিন এবং কঠোর আযাব থেকে ভয় দেখানো আর উহার তীব্রতা ও ভয়াবহতা প্রকাশ করা। কিন্তু এ লক্ষ্যার্জনের জন্যও বিশারত বা সুখবর শব্দই প্রয়োগ করা হয়েছে। যা সাধারণত সচ্ছল অবস্থা, প্রাচুর্য ও কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)তার বহু হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেখানে এসব শব্দ থেকেও ওলামায়ে উম্মাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয় বরং আলোচ্য আমলের অনিষ্ঠকারিতা বর্ণনা করে মানুষকে উহা থেকে বিরত রাখাই মূল উদ্দেশ্য। যেসব লোক সাইয়েদ কুতুব শহীদকে জানে তারাই একথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্র ও সম্ভ্রান্ত আচার ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধকে তিনি সর্বদা সম্মুখে রাখতেন। কাউকে কাফের বলে অভিযুক্ত করা ছিল তার স্বভাব প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তিনি ছিলেন তাঁর সমসাময়িক ইসলামের দায়ীগণের শীর্ষস্থানীয়। যে সমস্ত লোক তার লিখনী থেকে তাদের মর্জি বিরোধী উদ্ধৃতি উদ্ধার করে সেগুলোর মনগড়া অর্থ বর্ণনা করে তাদের জালিম রূপে অভিহিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। তার তেজদীপ্ত লিখনী যা যুব মানস ও বর্তমান প্রজন্মকে খুবই প্রভাবিত ও আলোড়িত করতে সক্ষম হচ্ছিলো এবং তার অকৃত্রিম ভালবাসা, অনুরাগ ও সম্মানবোধের প্রেরণা পাঠকদের মনে দানা বাঁধছিল। আর এ জিনিসই তাগুতি শক্তিগুলোর অন্তরে কন্টকের ন্যায় প্রবিষ্ট হচ্ছিলো। তাইতো তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল যে, এ মুজাহিদকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

সাইয়েদ কুতুব শহীদের ব্যক্তিত্ব ও সংকলন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। এত স্বল্প সময়ে বিষয়বস্তুর হক আদায় করা যাবে না। "মুয়ালিমুন ফিত্ তারীক" বা "ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা"-এর বিষয়বস্তু যে কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তার সারনির্যাস ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি সুধী পাঠকগণের সম্মুখে আরও আরজ করবো যে,

www.amarboi.org

"মুয়ালিমুন ফিত্ তারীক" মুদ্রণ ও প্রকাশের পূর্বে উহার পান্ডলিপি দেখার সৌভাগ্য আমার লিমান তারাস্থ জেলখানার হাসপাতালে বসে হয়েছিল। অদ্যাবধি এ অমূল্য কিতাবখানি রাহে হকের মুসাফিরগণকে মনজিল ও অভিষ্ট লক্ষ্যপানে পথপ্রদর্শন করে চলেছে।

সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে আমি অতি সংক্ষেপে যা কিছু আরজ করলাম তাই যথেষ্ট। কেননা তিনি কোন পরিচিতির মুখাপেক্ষী নন। প্রসংগক্রমে আমি এখানে আরো একটি কথা যোগ করতে চাই। আমরা তখন জেলে আটক ছিলাম। ইত্যবসরে সাইয়েদ কুতুব শহীদকে সরকার মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ মুক্তি লাভের পর পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে ফেলা হয়। এবারে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এবং তাকে ফাঁসির সাজার ডিক্রী শুনানো হয়। ছাড়া পাওয়ার পর সাইয়েদ কুতুব জেলখানায় আমাকে পয়গাম দিয়ে পাঠান যে, ইরাকী সরকার তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠিয়েছেন। সাইয়েদ শহীদ আমার নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ কামনা করেন। আমি তাকে এ মর্মে পরামর্শ প্রদান করলাম যে, এ আমন্ত্রণ আপনি স্বাদরে গ্রহণ করুন এবং অবিলম্বে ইরাকের উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করুন। বিপ্লবীদের অসৎ উদ্দেশ্য আমি লক্ষ্য করছি ও দেখতে পাচ্ছি। এমনকি স্বয়ং সাইয়েদ শহীদের জীবনই আমি খুব বিপদাপন্ন বলে মনে করছিলাম। আমার এ পরামর্শ প্রদানের পরও সাইয়েদ কুতুব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, স্বীয় মতামত এবং তার পান্ডিত্যপূর্ণ ধ্যান ধারণা প্রতিহত করার জন্য তাকে মিসরেই অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা যা কিছু নির্ধারিত করে রেখেছিলেন তা থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় ছিল না। আর না কোন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ তা হটিয়ে দিতে সক্ষম। আবদুল ফাত্তাহ ইসমাঈল শহীদও আমাদের আন্দোলনের অপর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যার দীপ্তি পথ হারা পথিকদের পথ দেখাতে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি ব্যক্তিগতভাবে আবদুল ফাত্তাহ্ শহীদের ব্যাপারে বেশী কিছু জানার সুযোগ পাইনি। কেননা যখন তাকে ফাঁসির শাস্তি প্রদান করা হয় তখন আমি দীর্ঘ দিন যাবত কারাগারের সাজা ভোগ করছিলাম এবং আমাকে কাটাতে হয়েছিল বিভিন্ন জিন্দানখানার চার দেয়ালের অভ্যন্তরে।

আবদুর রহমান সিন্ধী মরহুম

আবদুর রহমান সিন্ধী মরহুম আন্দোলনের গোড়ার দিকে ছিলেন সংগঠনের বড়ই অনুগত এবং ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের অনুসরণে ছিলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। ইখওয়ানের সামরিক বিভাগ (বিশেষ বিভাগ)-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার ওপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শয়তান তাঁর মনে কুমন্ত্রণা দিতে সক্ষম হয় যে ইখওয়ানের সদস্যগণ মুর্শিদে আ'ম অপেক্ষাও তার বেশী অনুগত। ফলে তিনি মুর্শিদে আ'ম-এর মোকাবেলায় তার নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে ও প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। ইতিমধ্যেই মুর্শিদে আ'মকে

www.amarboi.org

শহীদ করে ফেলা হয়। অতপর যখন হাসান আল হুদাইবি মরহুমকে মুর্শিদে আ'ম হিসেবে মনোনীত করা হয় তখন আবদুর রহমান সিন্ধী মরহুম তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও নগ্নভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। সাথে সাথে ইখওয়ান সিন্ধী মরহুম এবং তার পৃষ্ঠপোষকদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দেন যে, তারা তাদের মুর্শিদে আ'ম- এর মোকাবেলায় অপর কোন ব্যক্তিত্বকে কোন প্রকার গুরুত্বই প্রদান করে না। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইখওয়ান সদস্যগণও সিন্ধী সাহেবকে বুঝিয়ে দেন যে, মুর্শিদে আ'ম-এর নিদের্শ ক্রমেই তারা তার আনুগত্য করে আসছে। এক্ষণে তার বিদ্রোহের পর তারা কিছুতেই তার অনুগত নয়। অনন্তর সিন্ধী সাহেব ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহমত নাজিল করুন। আমি কবরস্থ মৃত মানুষের লাশ কিছুতেই তুলে আনার পক্ষপাতি নই। আমি তার সমালোচনা করতে চাই না। অবশ্য সাংগঠনিক স্বার্থে এতটুকু বলতে হবে যে, আমানত রাখা বস্তু সতর্কতার সাথে হেফাজত করা কর্তব্য এবং পরিস্থিতি যে দিকেই মোড় নিক না কেন নিজের সংগঠনের খবরাদি সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। সিন্ধী সাহেবের ওপর নাসের এমন প্রভাব ফেলেন যে তিনি শুধু তার গুণগ্রাহী হয়েই ক্ষান্ত হননি বরং সংগঠনের আদিঅন্ত সব বৃত্তান্ত তার নিকট ফাঁস করে দেন। মুকারম ওবায়েদ ও নুহাস পাশার সাথে অনুরূপ আচরণই করেছিল। যেসব লোক দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তারা আর প্রতিরোধমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। তাদের নিয়ে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠাকে আমি শরাফত ও শালীনতা পরিপন্থি বলে মনে করি। উলামা ও বিশেষজ্ঞগণ সমাজ বিজ্ঞান ও নৈতিক চরিত্রকে এভাবে বিন্যস্ত ও সংগঠিত করে গেছেন। গোপনীয়তা রক্ষা করার অংগীকার ভংগ করার ওপর সম্যকরূপে অবগত হয়ে এবং বিষয়ভিত্তিকভাবে কলম ধারণ করা উচিত।

আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ

আবদুল কাদের আওদাহ শহীদের স্মৃতিকথা আমার অন্তরে জাগরুক রয়েছে। তিনি ইখওয়ানের সহকারী মুর্শিদে আ'ম-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি পান্ডিত্য ও যোগ্যতার জীবন্ত আদর্শ এবং বিচারালয়ের স্বনামধন্য বিচারপতি ছিলেন। স্মৃতির বাতায়নে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে আমি সে ঘটনাকে আমার কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি যখন আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ আদালতের জজ ছিলেন। তখন কোন কোন ইখওয়ান ভাইকে কোন মোকদ্দমায় তাঁর আদালতে পেশ করা হয়। ইখওয়ান ভ্রাতাগণের বিপক্ষে লড়েন বড়ই অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কৌশুলিগণ। তারা আইনের খুবই সূক্ষ্ম মারপ্যাচ উপস্থাপন করেন আদালতে। এদিকে আবদুল কাদের আওদাহ শুধু একজন জজ মাত্রই ছিলেন না যে, শুধু উকিলগণের যুক্তিপ্রমাণের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে। বরং তিনি নিজেও আইন শাস্ত্রের ওপর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি রাখতেন। ফলে তিনি আসামী ও অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করে দেন। এবং তার ফায়সালার যথার্থতার পক্ষে এমন সব দলিল পেশ করেন যেগুলোর ভিত্তিতে তিনি তাদের নির্দোষ হওয়ার নির্দেশ জারী করেন। দু'পক্ষের আইনজীবিগণ আওদাহ শহীদের যুক্তি-প্রমাণ

www.amarboi.org

এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তথ্যের মোকাবেলায় তাদের আইন বিষয়ক ধারণাকে খুবই অপ্রতুল বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন।

আদালত কিংবা বিচারালয়ের আসনে উপবিষ্ট হওয়া খুবই বিপদসংকুল গুরুদায়িত্ব। একজন বিচারক শুধু মামলার ফাইল পত্র, অভিযোগ খন্ডনের যুক্তি প্রমাণ, সাক্ষী সাবুদ এবং বর্ণনা বিবরণ পর্যন্তই তার নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে সকল মোকদ্দমায় ইনসাফ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। তাকে তার সঙ্কটজনক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হয়। আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ-এর দুর্লভ গ্রন্থ "ইসলামের ফৌজদারী আইন" গুণীজনদের ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করেছে। এ অমূল্য গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় যে, এর লেখক কতটুকু বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। ইখওয়ানের মধ্যে নাসেরের সাথে প্রথমদিকে শহীদ আওদাহই সর্বাধিক সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। নাসের যখন বাদশাহী নখর বিস্তার করতে শুরু করে তখন আবার আওদাহ শহীদই তার বিরোধিতায় তৎক্ষণাৎ নিঃসংকোচে দাঁড়িয়ে যান। তার এই ঈমানদীপ্ত নির্ভীকতায় নাসের ভীত হয়ে পড়ে। এরপর সে তার কবল থেকে রেহাই লাভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে। তাকে স্বকপোলকল্পিত এক অভিযোগের সাথে জড়িত করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়।

আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ নিজেই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাসেরের সাথে তার আলাপ হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে নাসের বললো, "আমি আমার বিরোধীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে পারি, তারা সংখ্যায় যত বেশীই হউক না কেন"। জবাবে আবদুল কাদের আওদাহ শহীদ বলতে লাগলেন, "যেসব লোককে তুমি সমুচিত শিক্ষা দিতে চাও তারা তো কোনদিন শেষ হবে না। তাদের ওপর হাত উত্তোলনকারীরা যতই শক্তিশালী এবং সংখ্যায় যত অধিকই হউক না কেন! কোন অবস্থায়ই তারা পরাজয় মেনে নেবে না। একজন দ্বিখন্ডিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লে আর একজন এগিয়ে এসে পতাকা সামলে নেবে।"

আবদুল কাদের আওদা যেভাবে নাসেরের চোখে চোখ রেখে একথাগুলো বলেছিলেন যার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়িয়েছিলো যে, সে ভীরু ও কাপুরুষ শত্রু তার মত ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান প্রতিপক্ষকে ময়দান থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টাই করবে।

আবদুল কাদের আওদাহ ওকালতি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মস্তবড় শিক্ষিত লোক। কোন মোকদ্দমায় তদবীর করতে গিয়ে তিনি সাধারণ আইনজীবীদের ন্যায় আইনের মারপ্যাচ, বাকপটুতা ও অনলবর্ষী বক্তৃতার ওপর সীমাবদ্ধ থাকার পরিবর্তে খুব ওজস্বী দলিল-প্রমাণ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং আইনগত জটিল দৃষ্টিভংগী পেশ করতেই ছিলেন অভ্যস্ত। ইখওয়ানের সাথে তাঁর ছিল প্রগাঢ় সম্পর্ক ও অকৃত্রিম মহব্বত ভালবাসা। তার বিরুদ্ধে যখন সামরিক আদালতে মামলা

www.amarboi.org

রুজু করা হয় তখন তিনি আদালতে এ সূক্ষ্ম পয়েন্ট উত্থাপন করেন যে, সামরিক অফিসারগণ যে মোকদ্দমা তৈরী করেছেন তার নিরিখে সেনাবাহিনীই শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। শরয়ী ও বৈষয়িক আইনের দৃষ্টিতে এ আদালতে এরূপ মোকদ্দমার শুনানী হওয়ার অধিকার নেই। তারপরও সামরিক আদালত তার দাবী গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। তার দাবী ছিল এই যে, মামলা কোন নিরপেক্ষ আদালতে পেশ করা হোক। আবদুল কাদের আওদা শহীদ জেনারেল মুহাম্মাদ নাজীবের বড়ই বলিষ্ঠ পৃষ্টপোষক ছিলেন। ইহাও ছিল অন্যতম কারণ যে জন্য নাসের তার প্রাণের দুশমন এবং রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছিলো।

জনাব সালেহ আবু রাকীক

সম্মানিত দ্বীনি ভাই ও উস্তাদ সালেহ আবু রাকীক ছিলেন আরব লীগের উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত। তখন আরব লীগের সভাপতি ছিলেন আবদুর রহমান আযয়েম পাশা মরহুম। জনাব আবু রাকীকের সাথে ছিল তার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এমন কি তিনি তাকে তাঁর সন্তান তুল্য মনে করতেন। তার ওপর নাসের অভিযোগ আরোপ করেছিলেন যে, তিনি তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। জেলখানার অভ্যন্তরে তার ওপর বড়ই অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়। তথাপি তাঁর ঈমানী বলিষ্ঠতায় কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা দেয়নি। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় তথাপি তিনি এখনো পর্যন্ত ইখওয়ানের প্রথম সারিতে জিহাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে শিফা দান করুন এবং দীর্ঘ জীবনে ধন্য করুন।

আমার এ স্মৃতির বর্ণনায় সমাপ্তি টেনে দেয়ার পূর্বেই আমি প্রাচ্য ও প্রতিচ্যে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম ভ্রাতাগণের সমীপে অত্যন্ত জোরদারভাবে আরজ করতে চাই যেন তারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথেই তাদের সকল প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার যোগসূত্র স্থাপন করে নেয়। আমেরিকার শক্তি, রাশিয়ার প্রবল প্রতাপ এবং ইসরাঈলের হিংসাপরায়ণতাকে কোনক্রমেই তোয়াক্কা করা চলবে না। আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি কখনো কাকেও ভয় করে চলে না। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার পরাক্রম ও ক্ষমতার তুলানায় বাতিলের কিইবা গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

উম্মাতের নামে পয়গাম

ইতিহাসের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ও শিক্ষা রয়েছে আমাদের সম্মুখে। ইতিহাসের এক অমোঘ বিধান হচ্ছে এই যে, কোন জাতিরই শৌর্য-বীর্য এবং উন্নতি-অগ্রগতি চিরস্থায়ী হয়নি। আবার কোন জাতি সর্বদা অবনতি-অনগ্রসরতা, হীনতা ও নীচতার অসহায় শিকার হয়ে থাকেনি। উন্নতি-অবনতি, সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্না এবং আনন্দ বেদনা গাড়ীর চাকার ন্যায় আবর্তিত হতে থাকে। আমাদের ভাগ্যও নিঃসন্দেহে পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সে জন্য একটা শর্ত রয়েছে এই যে, আল্লাহ তায়ালাকে আমাদের ভয় করতে হবে যেভাবে ভয় করা উচিত। সর্বাবস্থায় তারই ওপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। এবং স্বীয় সমস্ত কর্মতৎপরতায় ইহসানের রূহ সৃষ্টি করতে

www.amarboi.org

হবে। আর এই ইহসান ও আনুগত্য শুধুমাত্র সালাত, সাওম এবং সাদাকা-যাকাত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইহসান ও ইবাদাত পরিবেষ্টন করবে সকল কর্মকান্ডকে। লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, চেষ্টা-উদ্যোগ ও ইসলামী রেঁনেসা তথা পুনর্জাগরণের পরাকাষ্ঠা মোদ্দাকথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইহসান ও আনুগত্যেরই পরিচয় দিতে হবে। ইসলামের ভুলে যাওয়া শিক্ষা আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহে পুনরায় মানুষের অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে। এবং জীবনের সকল ময়দানে ইহা স্বীয় ভূমিকা আদায় করতে শুরু করে দিয়েছে। ইসলামের শক্তি ও দীপ্তি সকল দিক ও বিভাগে অনুভূত হয়ে চলেছে। আজিকার নওজোয়ানগণ তাদের অলস নিদ্রার মোহ থেকে জেগে উঠেছে। বিগত পাঁচ শতাব্দি থেকে যে অলসতা ও অনুভূতিহীনতা মুসলিম উম্মাহর ওপর জেঁকে বসেছিল আজ সে কালো পর্দা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এসবগুলোই শুভ লক্ষণ ও আশার আলামত। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরাত ও ক্ষমতা আমাদের আশা-আকাংখা পরিপূর্ণ করে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এবং আমাদের শপথকে বলিষ্ঠতা দান করার সকল উপায় উপকরণ তৈরী করে দিয়েছে। যাতে করে আমরা আমাদের সযত্ন প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হই।

আমরা কি প্রত্যহ এ বিষয়টি দেখতে পাই না যে, সহস্র মাইলের সফর এক কদম ও পদক্ষেপের সাহায্যেই শুরু হয়ে থাকে ? আমরা তো আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলেছি। আমাদের যুব সমাজকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, আল্লাহ্ তায়ালার ফজল ও করম এবং দয়া ও অনুগ্রহে তারা একটা মহৎ উদ্দেশ্য হাসিল করা এবং তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবে অনতিবিলম্বে দেখতে পাবে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, সবর, ধৈর্য এবং সতর্কতা ও সাবধানতা এবং রাহে হকে সকল প্রকার বিপদ-মুসিবত, পরীক্ষা-প্রতিকূলতা বরণ করে নেয়ার প্রেরণাই কামিয়াবী ও সফল-তার চাবিকাঠি। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রদত্ত রিজিকই আমরা সকলে খাচ্ছি। এ জমিন যার প্রশস্ততা ও উদারতার সুযোগ নিয়েই আমরা দিব্যি চলাফেরা করছি। আমাদের রিজিকের দায়-দায়িত্ব যদি জমিনের ওপরই সমর্পিত থাকতো তাহলে তো তার রিজিক কত আগেই নিঃশেষ হয়ে যেতো। আমরা তো সে মহান সত্ত্বা কর্তৃক প্রদত্ত রিজিকই খাচ্ছি যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। যার ভান্ডার কোন দিন শূন্য হওয়ার নয়। তারই হাতে রয়েছে আকাশ ও পাতালের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। যদি জমিনের রিজিক যথেষ্ট না হয় তাহলে আসমানের মধ্যেও বান্দাহদের জন্য রিজিক এবং এমন সব জিনিস রয়েছে যেগুলোর যোগান দেয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। হায় আফসোস ! যদি আমরা আঁখি মেলে একটু তাকিয়ে দেখতাম এবং চিন্তা-ভাবনা করতাম।

মানুষের অসহায়ত্ব

প্রসংগত সর্বসাধারণের বোধগম্য একটা উদাহরণ আরজ করতে চাই। যদ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক হওয়া এবং মানুষের অক্ষমতা ও

www.amarboi.org

অসহায়ত্বের স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়ে উঠবে।...........আমেরিকা মহাশূন্যে বহু নভোযান উৎক্ষেপণ করেছে। একের পর এক উৎক্ষিপ্ত এ কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে নিরাপদে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। কেবলমাত্র ভূ-উপগ্রহ নং-৯-এর বেলায়ই ব্যতিক্রম ঘটেছে যে, সার্বিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও ইহা মহাশূন্যে জ্বলে ভস্মিভূত হয়ে গেছে। এ দুর্ঘটনাকে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ কেন প্রতিহত করতে পারেনি। আত্মরক্ষামূলক ও আপদকালীন যন্ত্রপাতি কোথায় হারিয়ে গেছে ? মানুষের বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কোনই মূল্য নেই। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরাত্ ও ক্ষমতাই প্রকৃতপক্ষে সকল জিনিসের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে। বস্তুত এসব ঘটনা দুর্ঘটনা দ্বারা মানুষের শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়ে থাকে।

অগ্নি বিচ্ছুরণকারী ফেটে পড়ে এবং কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। অথচ কোন মানুষই সেই আগুন ও লাভার ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারে না। তুফানী অন্ধকার নেমে আসে তখন আরোহীদের নিয়ে গাড়ীগুলোকে এমনভাবে দূরে নিক্ষেপ করে যেমন কোন শিশু তার খেলনাগুলোকে ছুড়ে মারে। তাপমাত্রা নীচে নামতে নামতে হিমাঙ্কেরও নীচে চলে আসে। এমনি চারদিকে তুষার বৃষ্টিপাতের দৃশ্য নজরে পড়ে, রেলগাড়ী, মটরযান ও হাওয়াই জাহাজ তথা সব জিনিসই একপর্যায়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্ তায়ালার অগণিত-অসংখ্য সৃষ্টি তারই নির্দেশ পালনে ও আপনাপন কর্তব্য সম্পাদনে সদা ব্যস্ত যেগুলোর সম্মুখে মানুষ অত্যন্ত অসহায় অনুন্যোপায় হয়ে পড়ে। এক্ষণে বলুন যে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি তার আবিস্কার উদ্ভাবন এবং বস্তুগত উন্নতি অগ্রগতি কেন এসব সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর হয় না ? হতে পারে না ?

আমরা এসব বিষয়ের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। সাথে সাথে এগুলোর ওপর চিন্তা-গবেষণা করার আহবান জানাই। কিন্তু আমাদের সকলকেই এটা ভালভাবে জেনে নিতে হবে যে, সকল শক্তির ওপর রয়েছে একটা মহাশক্তি এবং সকল কর্তৃত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্তৃত্বের অধিকারী এমন এক সত্ত্বা রয়েছেন তিনি এমন প্রবল পরাক্রমশালী যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কেউ তাকে প্রতিহত করতে পারে না। তার মর্জি ব্যতীত কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। এ প্রচন্ড ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই হাতে নিবদ্ধ। আর তিনিই সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রকৃত বাদশাহ, সম্রাট, মালিক, মনিব এবং প্রভু ও প্রতিপালক।

আযাদী ও স্বাধীনতার ইসলামী তাৎপর্য

প্রাচ্য দেশসমূহে বিশেষ করে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের লোক তারা মুসলিম হোক কি অমুসলিম—অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতার গ্লানি থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না। যতদিন পর্যন্ত না তারা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বর্গীয় নেয়ামত লাভ করতে পারছে। বলা হয়ে থাকে যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে পরিবেশ পরিস্থিতি অন্য রকম। ওসব পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রয়োগ করা আদৌ সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সচেতনতার তুলনা করে যুক্তি পেশ করা হয়ে থাকে যে, সেখানে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের পরিবেশ এ জন্য অনুকূল নয়। এসব খোঁড়া যুক্তির জবাব হচ্ছে এই যে, ওসব দেশেও এরূপ পরিস্থিতি রাতারাতি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। বরং ওসব জাতিকেও অনেক সমস্যা এবং প্রতিকূলতার সঙ্কটজনক ঘাটি অতিক্রম করে আর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভুল-ভ্রান্তি করে করে এক পর্যায়ে এসে এ মর্যাদা ও সম্মান লাভ হয়েছে। আবার অনেক সময় এমন দলিলও পেশ করা হয় যে, কিছু লোক আযাদী ও স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করে থাকে এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রই কাজে লাগিয়ে থাকে। আমি বলতে চাই যে, যদিও স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশে এ ধরনের ঘটনাবলী পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। তথাপি ইহার ক্ষতি বাদশাহী, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের লোকসানের তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা যখন স্বাধীনতার দাবী জানাই তখন উহা দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক স্বাধীনতা বুঝায় না। পশ্চিমা দেশগুলোর স্বাধীনতার ধারণা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আমাদের আযাদীর সীমা চৌহদ্দী আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ-রসূলের হালাল-হারামের বিধানেও কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করার কোন অনুমতি আমাদের আদৌ নেই। কিন্তু নির্ধারিত সীমানার মধ্যে কোন মানবসন্তানের আযাদীর ওপর কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা কারো নিকটই জায়েজ নেই। পশ্চিমের স্বাধীনতা বল্গাহীন ও জন্তু-জানোয়ার সদৃশ্য স্বাধীনতা যে, তারা সর্বসাধারণের সম্মুখে যে কোন ধরনের অপরাধ, নির্লজ্জতা এবং জঘন্যতম আচরণ করে থাকে। এবং স্বাধীনতা বনাম স্বেচ্ছাচারিতার নামে তারপরও তারা নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। ইসলামের স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও রূপরেখা এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানে নিষিদ্ধ সীমানালংঘন করা জঘন্যতম ও মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আমাদের শরীয়াত স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে আদালত ও ইনসাফ, মুসাওয়াত ও সাম্য, ইজ্জত ও শরাফত এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান। আযাদীর এ ধারণার ব্যাপারে কারো কি কোন দ্বিমত থাকতে পারে? তারপরও এখন ইসলামের এ স্বাধীনতার দাবী ও আওয়াজ শুনে লাব্বায়েক বলার মত কেউ আছে কি?

স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত প্রসংগ কথা

আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, আমার এ স্মৃতিচারণে ইতি টেনে দেয়ার পূর্বে আরজ করে দেবো আরও একটা কথা যে, আমি এখানে যত কথা বর্ণনা করেছি কোন কোন ইখওয়ান উহার কিছু কিছু অংশ পছন্দের দৃষ্টিতে নাও দেখতে পারে। এ প্রসংগের গোড়াতেই আমি আমার মধ্যে এ অনুভূতি জাগরুক দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত রয়েছে বিগত আশি বছরেরও অধিক সময়-কালের স্মৃতিকথা মালা যা ইতিহাসের বক্ষে মুদ্রিত হয়েছিলো। এ জীবনকাল কতদীর্ঘ ও সমস্যা সংকুল। হিসেব নিকেশ কত কঠিন হবে এবং জবাবদিহির মনজিল হবে কতইনা কঠোর।

www.amarboi.org

বিশেষত আমার ন্যায় একজন নিঃসম্বল ব্যক্তির কি অবস্থা হবে যে এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যার কোন উপযুক্ততা তার নেই এবং যে সম্পর্কে তার ধারণা কল্পনায়ও কখনো আসেনি যে, এ সম্মানজনক পদ তারই জন্য অপেক্ষা করছে। কেননা আমার রয়েছে জ্ঞানের স্বল্পতা বরং নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাকী থাকে আমার ঈমান—এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কিরূপ আচরণ করবেন। সংকল্প ও সৎসাহস খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল—যার মধ্যে স্বীয় গুরুদায়িত্ব সামাল দেয়ার কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। আমি যখন এসব স্মৃতিকথাকে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত করি যে কোন প্রকার কমবেশী না করে আদ্যন্ত আমার সঠিক ও যথার্থ পরিচয় বিশেষ করে আমার ইখওয়ান সাথীদের সামনে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের সম্মুখে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত পেশ করে দিতে হবে। আমি কোন ব্যাপারেই লেফাফা দুরস্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিনি। আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে কোন জিনিসই গোপন নেই। তিনি আমার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কেই উত্তম রূপে অবহিত রয়েছেন। তারপরও আমি আমাকে মানুষের নিকট থেকে কেন গোপন করতে চেষ্টা করবো যা না আমার নিজের জন্য আর না আমার অস্তিত্বের জন্য লাভ-লোকসানের অধিকারী।

আমার একান্ত প্রত্যাশা ছিল যে, মানুষ আমাকে আমার স্বকীয়রূপে দেখে নিতে পারে। যাতে করে তারা কোন প্রকার অযৌক্তিক আত্মতৃপ্তির শিকার না হয়, আর না কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হয়। আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে একজন অধম বান্দামাত্র। আমি এসব স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে এও সমীচীন মনে করি যে, সকল সমালোচক ও অপবাদদানকারীর সম্মুখেই দিগন্ত প্রসারিত উন্মুক্ত আকাশ ছেড়ে দিতে হবে যাতে করে আমার দ্বীন, আখলাক ও মান-সম্মানের ব্যাপারে যদি তাদের কোন বক্তব্য থাকে তাহলে দলিল-প্রমাণ সহকারে তা পেশ করে দিতে পারে। আমি উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এবং রুকূ-সিজদায় আমার রাব্বুল ইজ্জতের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যে, তিনিই তার অপার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর বদৌলতে আমাকে সকল হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ থেকে মাহফুজ রেখেছেন। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই বরং এটা তার রহমাতেরই ফসল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, "হালালের সীমানা সুস্পষ্ট আবার হারামের চৌহদ্দীও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট আর এতদুভয়ের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে দ্ব্যর্থবোধক।"

আমি সারাজীবন আমার নিজেকে হালাল কাজের মাঝেই ব্যাপৃত রেখেছি। আর আল্লাহ তায়ালা তার কুদরাতের সাহায্যে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করেছেন। বাকী থাকে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ—এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালার রহমাতের প্রশস্ততায় আমি খুবই আশাবাদী যে, তিনি তাঁর দুর্বল বান্দাকে পরিবেষ্টন করে নেবেন।

আমি তখনও ছাত্র ছিলাম। এরই মধ্যে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। অতপর যখন আমি আইন কলেজে শিক্ষারত ছিলাম তখন বাড়ীতে ফিরে এসে

www.amarboi.org

বিষয়বস্তুর প্রস্তুতিতে বসে যেতাম এবং আমার চারদিকে আমার বাচ্চারা খেলাধুলা করতে থাকতো। আমার দাম্পত্য জীবন ছিল বড়ই আনন্দঘন ও মধুর এবং শান্তিদায়ক। আমি স্বভাবগতভাবে অভদ্র, বদমেজাজ ও নিরস কাঠমোল্লা নই। বরং আমি শান্তশিষ্ট, রশিকাতা প্রিয় ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণে অভ্যস্ত।

কোন কোন নিষ্ঠুর প্রাণ ও অত্যাচারী লোক বলে থাকেন, "যেসব জিনিসকে আল্লাহ পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছেন সেগুলোকে পর্দার অন্তরালেই থাকতে দিন।" তাদের এ বক্তব্য একদিক থেকে তো সঠিক ও যথার্থ যে, যেসব কাজ আল্লাহ্ তায়ালা অপছন্দ করে থাকেন সেগুলোকে পর্দার অন্তরাল থেকে জনসমক্ষে টেনে নিয়ে আসা কিছুতেই দূরস্ত নহে। যতদূর পর্যন্ত আমার লেন-দেন রয়েছে আমি কখনো জেনে বুঝে আল্লাহর গযবকে স্বাগত জানাইনি।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে গিয়ে সর্বদা দু'পন্থার মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ রাস্তাই অবলম্বন করে থাকি। যদি তা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানীমূলক কাজ না হয়। এ কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে কারো কোন প্রকার ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নয়। কেননা ইহাই সুন্নাত মোতাবেক কর্মনীতি। আমি চাই যে, যে ব্যক্তি আমাকে জানে কিংবা যে আমার সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করেছে সেই আমার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে অবগত হয়ে যেতে পারবে। এতেই কল্যাণ ও মংগল নিহিত যে, মানুষ পরস্পরে একে অন্যকে সুস্পষ্টভাবে জেনে নেবে এবং কোন প্রকার অজ্ঞতা ও ভুল বুঝাবুঝি না থেকে যায়। যার ফলে একজন অপরজনের সাথে লেন-দেন করতে গিয়ে নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা ও সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে।

এসব স্মৃতিচারণকারী শত সহস্র উকিলদের মধ্যে একজন উকীল মাত্র। যাকে কেবল ওসব লোকই জানার সুযোগ পেয়েছে। যাদের কোন না কোন কাজে তার সংস্পর্শে যেতে হয়েছে কিংবা যারা তার নিকট আত্মীয় স্বজন যারা একান্ত কাছে থেকে তাকে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ইহার অপর একটি দিকও রয়েছে যার মাধ্যমে সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়া এবং বিশেষভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সদস্যগণ তার সাথে সম্যকরূপে পরিচিত। ঘটনার আকস্মিকতাই বলতে হবে যে, ইখওয়ানের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছিলো আমার ওপর। অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, জায়িদ এমন সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে যা থেকে বকর থেকে যায় সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কোন কোন লোক আবার কিছু বলতে চায় অথচ উত্তম ধারণা এবং শিষ্টাচার শালীনতার কথা তাদের মুখ খোলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমার ব্যাপারেও কোন সংগী সাথীর অন্তরে হয়ত কিছু থাকতে পারে। ইখওয়ান সম্পর্কে মানুষ যা কিছু জানে তার সাথে সাথে ইহাও জরুরী যে, এ শিক্ষাও তাদের জেনে রাখতে হবে যা আমি আমার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে উল্লেখ করে এসেছি। বস্তুত এটা আর কিছুই নয় যে, আমি শুধু কোন রং-তুলি ব্যবহার না করে এবং কোন প্রকার অতিরঞ্জনের আশ্রয় না নিয়ে একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় নিজেই নিজেকে

www.amarboi.org

জনগণের সম্মুখে পেশ করে দিতে চেয়েছি। এখন যদি কোন শত্রু কিংবা বন্ধু এসব স্মৃতির ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চায় সে কোন প্রকার ইতস্তত না করে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে তা প্রকাশ করে দিতে পারে।

ইখওয়ান তো কোন ফেরেশতা নয়। তাদের একটা মৌলিক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা তাদের সৌন্দর্য ও গুণাবলীর সাথে সাথে তাদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও খুব ভালভাবেই অবগত রয়েছে। নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হওয়া তো আম্বিয়া ও রসূলগণের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এবং পরিপূর্ণতা ও স্বার্থকতা কেবলমাত্র রব্বুল আলামীনের জন্যই শোভা পায়। সাধারণ মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে না। আর না এমন দাবী করাও তাদের জন্য শোভনীয় হতে পারে। আমরা কখনো এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের দাবী করি না যা আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমরা বাহ্যিক এমন কোন চাকচিক্য ও জৌলুষ দেখানোর প্রয়াস পাইনি যা আমাদের অন্তরের অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কখনো যদি আমাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তখন আমরা উহার সাফাই প্রকাশ করতে ও গর্বভরে সে গুনাহের ওপর অটল-অবিচল হয়ে থাকার চেষ্টা করিনি কখনো। আমরা বরং আমাদের ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাওবা করেও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর সমীপে নতজানু ও অবনত মস্তক হয়ে পড়ি। আমাদের এ স্বরূপ ও প্রকৃতি জনসাধারণের জেনে রাখা উচিত যাতে করে তারা যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকে তাও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে আর যদি অসন্তুষ্ট থাকে তবে উহাও উপযুক্ত দলিলের নিরিখে হয়।

আমার স্মৃতির পাতায় অংকিত এসব কথাবার্তা আমি পাঠকদের খেদমতে পেশ করে দিয়েছি। এতদ্ব্যতীত দেশের ভিতরে ও বাহিরে বহু পত্র-পত্রিকায় আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়ে থাকে। লিখকদের মধ্যে যারা বিরুদ্ধাচরণকারী তারা প্রবল শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এমন সব কথাবার্তা লিখে দেয় যেগুলোর বাস্তবতার সাথে থাকে না কোন সম্পর্ক। পক্ষান্তরে যারা আমাকে পছন্দ করেন তারাও আবেগের আতিশয্যে অতিশয়োক্তি করে ফেলেন এবং তাদের কলমে আমার চিত্র অংকিত হয়ে থাকে যার কোন যোগ্যতা ও উপযুক্ততা আদৌ আমার নেই। এসব স্মৃতিকথা দ্বারা আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণকারীদের জেনে নেয়া উচিত যে, আমি কামালিয়াতের স্তরে উন্নীত হতে পারিনি। সকল দোস্ত দুশমনকে আমার এমন দৃষ্টিভংগীতেই দেখা কর্তব্য যতটুকু যোগ্যতা আমার রয়েছে। যাতে করে কোন প্রতারক ও ধোঁকাবাজ আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে আমাকে ধোঁকা ও প্রতারণার অসহায় শিকারে পরিণত করতে না পারে।

হে মানবজাতি ! আপনারা সর্বান্তকরণে জেনে রাখুন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন কখনো কাকেও এমন করে আমন্ত্রণ জানায়নি যেন তারা তাদেরকে অন্যান্য মুসলিমদের ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মনে করে। আমরা কখনো কাউকে এও বলিনি যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দিকে আসুন ! বরং আমাদের দাওয়াত শুরু থেকে এ-ই ছিল এবং সর্বদা এ-ই থাকবে যে—

www.amarboi.org

"হে জনতা ! এগিয়ে আসুন এমন একটি বিষয়ের প্রতি যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই রকম। আর তা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো আনুগত্য করবো না। তার সাথে কাউকেও শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অপর কাউকে নিজেদের রব বানিয়ে নেবো না।"

আমরা মানুষের সাথে এমন কথা তো কখনো বলি না যে, তোমরা আমাদের আনুগত্য করো। কেননা আমরা নাতো অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠতম আর না জ্ঞান ও পান্ডিত্যের দিক থেকে অগ্রগামী। আমাদের দাওয়াত হচ্ছে এই যে, কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসূলুল্লাহর অনুসরণ করে চলো। আল্লাহ্ তায়ালার ইতিবাচক নির্দেশসমূহকে প্রশান্ত মনে ও হৃষ্টচিত্তে কার্যকরী করে চলো এবং নেতিবাচক আদেশসমূহ থেকে সানন্দচিত্তে বিরত থাকো ও আত্মরক্ষা করে চলার চেষ্টা করো। যদি তোমরা এ কাজ করতে সক্ষম হবে তখন ইখওয়ানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিংবা উহার বাইরে থাকা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আজ যদি আমরা ইখওয়ানের নাম নিয়ে থাকি অথবা আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার কথা বলে থাকি তবুও এগুলো কখনো আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের এটা একটা পন্থা মাত্র। কেননা একক সংগঠন ব্যতীত শক্তি অর্জিত হতে পারে না। আর শক্তি ছাড়া অভিষ্ঠ লক্ষ্য পর্যন্ত গিয়ে পৌছা আদৌ সম্ভবপর নয়।

পরিশেষে আমি এ দোয়ার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে চাই যে, "ওগো আমাদের রব ! ভুল-ভ্রান্তির ফলে ও অজ্ঞতা বশত আমাদের পক্ষ থেকে যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় তুমি আমাদেরকে তজ্জন্য পাকড়াও করো না। মালিক ! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা ও দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। পরওয়ারদিগার ! যে দুর্বহ বোঝা বহন করার কোন শক্তি ও ক্ষমতা আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর বর্তিয়ে দিও না। আমাদের সাথে কোমল ও সহৃদয় আচরণ করো। আমাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করো। আমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করো। তুমিই আমাদের একমাত্র মাওলা ও অভিভাবক ! অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করো।" আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।